প্রথম সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭ (১৯৬০)

এস. দত্ত, কর্তৃক ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিক।৩া-৯ জাতি
পরিষদ হইতে প্রকাশিত ও ৬০, পটুয়াটোলা .লন, কলিকাত
প্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রবীণ নাট্যকার

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

নিবেদন

প্রত্যেক সামাজিক নাটক মাত্রেরই যেমন ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মূল্য আছে, তেমনই একটি সামাজিক মূল্যও আছে, অথচ আমাদের দেশে এ পর্যন্ত নাটকের সমালোচনামূলক গ্রন্থ যে পরিমাণে রচিত হইয়াছে, নাটকের সামাজিক মূল্য বিষয়ে কোন গ্রন্থ সেই তুলনায় কিছুই রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি সেই বিষয়েরই একটি প্রথম প্রয়াস মাত্র, সুতরাং ইহা আশানুরূপ না হইলেও প্রথম প্রয়াস বলিয়া লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সকল সামাজিক নাটক ও প্রহসন রচিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যুগের বাংলার সমাজ-জীবনের একটি নিখুঁত এবং বাস্তব রূপ যদি তুলিয়া ধরিবার আবশ্যক হয়, তবে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমি ইতিপূর্বে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকখানি সন্ধান করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানির মধ্যে আরও কয়েকখানি অধুনা বিলুপ্ত নাটক বা প্রহসনের সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, ভবিষ্যতে ইহাকেই ভিত্তি করিয়া সে যুগের নাটক সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব হইতে পারিবে। ইহাদের মধ্যে ১৮৫৬ সনে রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নামক যে নাটকটির এ পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয়ের আনুকূল্যে তাহার সন্ধান লাভ করিয়া তাহার বিস্তৃত অংশ ইহাতে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই নাটকখানি আর কোনদিন মুদ্রিত হইবে এমন আশা নাই, এই জন্যই এই গ্রন্থের মধ্য দিয়েই ইহার যথাসম্ভব বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকার আরও বহু খ্যাত-অখ্যাত নাটকেরই দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর নাট্য-সাধনার শতবর্ষের পরিচয় রক্ষা করিবার দায়িত্ব যথাসম্ভব পালন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ভবিষ্যতে বাংলার নাট্যসাহিত্য এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে যাঁহারা গবেষণা করিবেন, তাঁহাদের নিকট গ্রন্থখানি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতে পারে।

বাংলার বহুমুখী সামাজিক জীবনের একটি মাত্র বিষয়ের ক্রমবিকাশের ধারাই ইহাতে প্রধানতঃ অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা বিবাহ। নৃতত্ত্ববিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, বিবাহের রীতি অত্যন্ত রক্ষণশীল, তাহা সহজে পরিবর্তিত হয় না, সামাজিক জীবনের কোন্ কোন্ অবস্থা-বিপর্যয়ে বাংলা দেশে তাহারও যে পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থখানি অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই একশত বৎসরের মধ্যে বাংলার সামাজিক জীবনে যে কি অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা বহুবিবাহ হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদের ধারাটি পর্যন্ত অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এই গ্রন্থরচনায় আমি আমার যে ছাত্রদিগের নিকট হইতে সাহায্যলাভ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ডক্টর জয়ন্ত কুমার গোস্বামী এম, এ, ডি, ফিল, শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায় এম, এ, অধ্যাপক শ্রীসুধীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী এম, এ, অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র এম, এ, শ্রীসুকুমার মিত্র বি, এ, বি-টি, প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান সনৎকুমার ইহার শব্দ-সূচী রচনার দুরূহ কার্যটিও নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম লাঘব করিয়াছেন। গ্রন্থখানির পরিকল্পনা বিষয় কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীর গুপ্তের নিকটও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। শ্রীসুনীল দত্ত ইহা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া নাট্যামোদীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বিষয়-সূচী

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

ভূমিকা

এক

(মাত্র কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাংলার বিদগ্ধ সমাজ বাংলা নাটককে সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না; কারণ, আজ পঁচিশ বৎসরেরও বেশি হইতে চলিল, বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে, অথচ তাহার নাট্যশাখাটির বয়স মাত্র দুই বৎসর। এই কথা সকলেই জানেন যে, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রায় জন্মকাল হইতেই ইতিহাস-শাখা, দর্শন-শাখা এবং বিজ্ঞান-শাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আসিতেছে।) আমাদের দেশের সুধী সমাজ কি এই কথাই এতদিন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে, সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞানের যে সম্পর্ক, নাটকের সঙ্গে তাহার সেই সম্পর্ক নাই? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে এই দেশের সুধী সমাজকে যে কি বলিয়া অভিনন্দিত করা যায়, তাহা আমার জানা নাই। (নাটক সাহিত্যের সঙ্গে কেবলমাত্র বহির্মুখী সম্পর্কে সম্পর্কিত ত' নহেই, নাটক সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। কাব্য-সাহিত্য, কথা-সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্যের মত নাট্য-সাহিত্যও যে সাহিত্যরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ এই কথা আমরা কেন যে এতকাল বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। অথচ এই কথা ত' সত্য যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যখন কাব্য-সাহিত্য কিংবা কথা-সাহিত্য কোন কিছুরই জন্ম হয় নাই, তখন একমাত্র নাটকেরই জন্ম হইয়াছিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটক যখন প্রকাশিত হয়, তখন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যই হউক, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই হউক তাহাদের কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এমন কি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলিয়া পরিচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'ও তাহার চারি বৎসর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর, নাটককে আশ্রয় করিয়াই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে সর্বপ্রথম বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারি না।) কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা

সাহিত্য প্রধানত বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবন-বিমুখী রোমান্টিক রচনা মাত্র। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম মধ্যবিত্ত-জীবনভিত্তিক বাস্তবধর্মী রচনা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে বাংলা কাব্য- এবং কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে রোমান্সের প্রেরণা বল্গাহীন অশ্বের মত বাঙ্গালীর মনোভূমির উপর দিয়া উদ্দাম বেগে ধাবমান হইয়াছিল, কেবল নাটকই তাহার সামনে দাঁড়াইয়া একটি বলিষ্ঠ বাস্তব জীবনের আদর্শ প্রকাশ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন, দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের সামাজিক নাটক-প্রহসনগুলিই তাহার প্রমাণ। সুতরাং (প্রত্যক্ষ জীবনাশ্রয়িতা সাহিত্যের যে একটি বিশিষ্ট গুণ, তাহা বাংলা নাটকের প্রথম যুগ হইতেই যেমন ভাবে প্রকাশ পাইয়া আসিয়াছে, তাহা বাংলা কথা- কিংবা কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়া সে'ভাবে কোনদিন প্রকাশ পাইতে পারে নাই।)

তথাপি বাংলা নাটক সম্পর্কে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা কি করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার। কারণ, এ'কথাও সত্য যে, ইহার মধ্যে এমন কোন বিষয় নিশ্চয়ই ছিল, যাহার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। (ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজটির মধ্যে সেক্সপীয়রের নাটকই বাংলা নাটকের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কেন না, সেক্সপীয়রের নাটকের অসাধারণ গুণ এবং শক্তির প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে নাটক সম্পর্কে চিন্তা করা কাহারও পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। অথচ বাংলার সমাজে যে সেক্সপীয়রের নাটক সৃষ্টি হইতে পারে না, এই কথা কেহই সেইদিন গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই। বাংলা নাটক রচনার একেবারে আদিযুগ হইতে এই ধারণা আমাদের দেশের নাট্যানুরাগীদিগকে যে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, মধুসূদনের জীবন হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়) মধুসূদন যখন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজিডি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করেন, তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহাকে সেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে তাহা আরও ঘটনাকণ্টকিত এবং ষড়যন্ত্রসঙ্কুল করিয়া তুলিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই পরামর্শ মধুসূদন গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং এই বিষয়ে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাঙ্গালীর সাহিত্যে যে সেক্সপীয়রের আদর্শে নাটক রচিত হইতে পারে না, এই বিষয়টি তিনি বহুদিন আগেই উপলব্ধি

করিয়াছিলেন। অথচ এদেশের বিদগ্ধ সমাজ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেন,

'Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by master-pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape.'

মধুসূদন তাঁহার হিন্দু কলেজের ইংরেজি-শিক্ষিত বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সেক্সপীয়রের মত নাটক রচনা না করায় সেদিন তাঁহাকে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার আশায় তিনি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'খানি রচনা করিয়াছিলেন, সেই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ইহার অভিনয় হইল না। কিন্তু সেইজন্য বাংলা সাহিত্যে যে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও নহে। অল্পদিনের মধ্যেই তাহা শোভাবাজার নাট্যশালায় অভিনীত হইল এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজিডিরূপে অভিনন্দন লাভ করিল।

উনবিংশ শতাব্দী হইতেই যাঁহারা প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্য সমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা শুধুমাত্র নাটক কেন, সাহিত্যের অপরাপর বিষয়কেও বাঙ্গালীর জাতীয় রস-সংস্কারের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট সেদিন কাব্য- বা কথা-সাহিত্য যে মর্যাদালাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ, আধুনিক কাব্য- কিংবা কথা-সাহিত্যের কোন প্রাচীনতর ধারা এ'দেশে বর্তমান না থাকায় পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার প্রয়োগ-পদ্ধতি তাহাদের উপর আরোপ করিতে কোন বাধা হয় নাই। কিন্তু বাংলা নাটক কেবলমাত্র যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের ফলেই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাই নহে, তাহার একটি নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্যও ছিল —তাহা অস্বীকার করিয়া এ'দেশের নাট্যকারগণ যে সেদিন অন্ধভাবে কোন বিজাতীয় আদর্শ অনুকরণ করিবার জন্য মোহগ্রস্ত হন নাই, সেজন্য তাঁহারা আমাদের অভিনন্দনযোগ্য, অবহেলার যোগ্য নহেন। সেদিন সেক্সপীয়রের

মত একটি আদর্শের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও যে তাঁহারা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার ভিতর দিয়াও এই জাতির এই বিষয়ক ঐতিহ্য যে কত শক্তিশালী ছিল, তাহা অনুভব করা যায়। সুতরাং বাংলা নাটকে যাঁহারা সেক্সপীয়রকে সম্পূর্ণরূপে পাইলেন না বলিয়া বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিলেন, তাঁহারা একদিকে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপটির যেমন সন্ধান পান নাই, তেমনিই এই বিষয়ক জাতীয় ঐতিহ্যের শক্তিটিও অনুভব করিতে পারেন নাই। আজ এতদিন পর বাংলার সুধী সমাজ যদি সত্যই এই বিষয়ে সচেতন হইয়া থাকেন, তবুও তাহাতে দীর্ঘদিনের অজ্ঞতা ও অবহেলার লজ্জা কিছুতেই দূর হয় না।

বাংলার বিদগ্ধ সমাজের এই অবহেলা সত্ত্বেও বাংলা নাটক ইহার ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহার যে একটি গুরুতর ক্ষতি ইতিমধ্যেই সাধিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং তাহারই ফলে আজও বাংলা নাটক কোন কোন ক্ষেত্রে যথার্থ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই। বাংলা নাটকের বিরুদ্ধে সুধী সমাজে এমন একটি সংস্কার ইতিমধ্যেই এরূপ দৃঢ়মূল হইয়াছে, যে তাহা আজ সহসা এক মুহূর্তেই শিথিল করা প্রায় অসম্ভব। দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতেই সাহিত্যের জন্য যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছে, বাংলার নাট্য-সাহিত্য আজ পর্যন্ত তাহার আনুকূল্য লাভ করিতে পারে নাই। বাংলার আধুনিক কাব্য-, উপন্যাস- কিংবা সাহিত্য-গবেষণা আজ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, এ'যাবৎ বাংলার কোন নাট্যকার কিংবা নাট্য-গবেষক সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নহে। তবে এ'কথা সত্য যে, নাট্য-বিষয়ক কোন কোন গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি কিংবা অন্য ভাবেও সম্মান এবং স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অথচ আজও তাহা যদি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে তাহার মূলেও বাংলা নাটক বিষয়ে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত সংস্কারই যে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই কথা আজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে যে, বাংলার নাটক কেবলমাত্র বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে যে ভাবে সহায়ক হইয়াছিল, বাংলা সাহিত্যের আর কোন বিভাগ দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক বাংলা নাটকগুলি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া ইহাদের অভিনয়ের মধ্য

দিয়া দেশব্যাপী জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত করিতে সহায়ক হইয়াছিল। সুতরাং বাংলার এই নাট্য-সাহিত্যের প্রতি আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রের এই উপেক্ষা দেশের নাট্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকটই নিতান্ত বেদনাদায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে।) এই কথাত' ঠিকই যে, আজ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহাদের সৃষ্টি আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের অভিনয়-গুণ প্রকাশ পায়, যাঁহাদের ব্যতীত অভিনয়-কর্মের অস্তিত্বই থাকিত না, তাঁহারাই আজও রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হইয়া আছেন। নাটক এবং তাহার অভিনয় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য—এক জনের সৃষ্টি আর একজন রূপ দিয়া থাকেন; প্রথমে নাটকের সৃষ্টি, তারপর অভিনয়। কিন্তু আজ যে অবস্থা দেখা যায়, তাহাতে স্রষ্টার চাইতে সৃষ্টির মূল্য বেশি,—সাহাজানের চাইতে তাজমহল বড় হইয়া উঠিয়াছে! এই ভ্রান্তি আমাদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে আমাদের সাহিত্যের যথার্থ কল্যাণ সাধন সম্ভব হইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, (বাংলার নাটক বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, বাংলা সাহিত্যের আর কোন বিষয় এতখানি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যখন আমাদের সমাজের কুসংস্কারগুলি আমাদের চোখের সম্মুখে নগ্নরূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল, তখন তাহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার দায়িত্ব লইয়া বাংলার নাট্যকারগণই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন।) সে দিন যদি তাঁহাদের রচনা জীবনবিমুখী এবং পাশ্চাত্ত্য নাটকের অন্ধ-অনুকরণের ফলস্বরূপ হইত, তবে আমরা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের মধ্য দিয়া সমাজের একটি হৃদয়হীন অনাচারের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পাইতাম না। (নব্য বাংলার সন্তান মধুসূদন নব্য বাংলার অত্যাচারের রূপটি তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্য দিয়া যদি এমন স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া না তুলিতেন, তবে তাহার এই বীভৎস পরিচয়টি আমরা অন্য কোন ক্ষেত্র হইতে এত সহজে লাভ করিতে পারিতাম না। তারপর দীনবন্ধুর মত পরদুঃখ-কাতর সহানুভূতি-শীল একজন ব্যক্তি যদি সেদিন তাঁহার শাণিত লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহার নাট্যরচনার ভিতর দিয়া নীলকরের অত্যাচারের ভয়াবহ স্বরূপটিকে এইভাবে প্রকাশ না করিতেন, তবে পৃথিবীর সভ্য জাতি ভারতীয় কৃষক-

দিগের উপর ইংরেজ নীলকরদিগের সেদিনকার অত্যাচারের স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারিত না। সেদিন বাংলা সাহিত্যের আর কোন বিভাগ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সুকঠিন জাতীয় কর্তব্য পালন করিবার পথে অগ্রসর হইয়া আসে নাই। তাহারা এই বিষয়ে যতটুকু দায়িত্ব পালন করিয়াছে, ততটুকু যেমন অপ্রচুর, তেমনই কার্যকারিতার দিক দিয়াও সার্থক নহে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া জাতির সামাজিক জীবন যে ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহার সকল স্তরের সঙ্গেই বাংলার নাটক যোগ রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তারপর এ'দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিল, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সেই মৃত্যুপণ সংগ্রামের মধ্যেও এই বাঙ্গালী নাট্যকারগণই প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। এমন কি, যে গিরিশচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরিয়া পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনার মধ্যেই তাঁহার সৃষ্টিকর্ম সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার সকল রোমান্টিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নূতন নাটক রচনার মধ্য দিয়াই জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র প্রচার করিবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর ক্রমে অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়াও যখন বাংলার রাজনৈতিক জীবন দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হইল, ক্রমে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও দেশবিভাগের চরম অভিশাপের মধ্য দিয়া তাহার কণ্টকপথে সুকঠিন যাত্রা পদে পদে ব্যাহত হইতে লাগিল, তখন জাতির সেই চরম সঙ্কটে বাংলার নাটকই সেই অভাবনীয় বেদনাকে ভাষা দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বরং দেখিতে পাওয়া গেল, এই সময়ের বাংলা নাটক এই যুগের সমগ্র বিপর্যস্ত রূপটিকে প্রকাশ করিবার জন্য ইহার আত্মায় এবং দেহে নূতন ভাব এবং আঙ্গিক গ্রহণ করিয়া ইহাকে এক সম্পূর্ণ নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর সাম্প্রতিক চীনা আক্রমণের মুহূর্তে বাংলার নাট্যকারগণই প্রথম অগ্রসর হইয়া আসিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহার বলিষ্ঠতম প্রতিবাদ জানাইলেন। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৌলীন্য প্রথা হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার চীনা আক্রমণ পর্যন্ত বাংলা দেশের উপর দিয়া যত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহাদের সকল কিছুরই ধারক এবং বাহক রূপে বাংলা নাট্য-সাহিত্য যে ভাবে জাতীয় ভাব প্রকাশের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, আর কোন বিভাগ সেই তুলনায় যাহা করিয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

তবে এখানে একটি কথা উঠিতে পারে যে, নাটকের উদ্দেশ্য কি শুধুমাত্র যুগোচিত জাতীয় ভাব পরিবেশন করা? তাহার কি চিরন্তন কোন সাহিত্যিক দায়িত্ব পালন করিবার নাই? যদি তাহা থাকে, তবে সেই দায়িত্ব বাংলার নাটক কতদূর পালন করিতে সক্ষম হইয়াছে? তাহার উত্তরে এইকথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নাটক যাহাই প্রচার করুক না কেন, তাহা সাহিত্য; সুতরাং তাহার একটি সাহিত্যিক দায়িত্ব আছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিবার উপরও তাহার চিরন্তন জীবনের বাণী প্রচার করিবার একটি গুরুতর দায়িত্ব আছে। কিন্তু নানা যুগের নানা মতবাদ প্রচারের ভিতর দিয়াও মানব জীবনের চিরকালের সেই বাণী কিংবা শাশ্বত তাহার সেই রূপ বাংলা নাটকের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই, এইকথা কি বলিবার উপায় আছে? এমন কি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বাস্তবধর্মী রচনা রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে মতবাদ-প্রচারের মধ্য দিয়াও বঞ্চিতা কুলীন কন্যাগণের যে শাশ্বত হৃদয়-বেদনার অনুভূতি ভাষা পাইয়াছে, তাহা কি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই? তাহা না হইলে শতাধিক বৎসরের পরও আজও এই নাটকের অভিনয় এমন সাফল্য লাভ করিতে পারিত না। সেখানে জীবনের বাস্তব রূপায়ণ আছে, তাহার সুগভীর বেদনা আছে, সেই বেদনার অভিব্যক্তি আছে; কেবল মাত্র যুগোচিত ভাষায় তাহার প্রকাশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার জীবনগুলি চিরকালের। তেমনই মধুসূদনের রোমান্টিক নাটকের মধ্য দিয়াও সর্বকালের মানুষের আশা-বেদনা, স্বপ্ন-কামনা রূপ পাইয়াছে। তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যেও মত প্রচারের যে প্রেরণাই থাকুক না কেন, সেখানেও মানুষের চিরন্তন দুর্বলতার বিষয়ই তাঁহার অবলম্বন হইয়াছে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র ভক্তপ্রসাদ আজও জীবিত আছে। তারপর গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির মধ্য দিয়াও মানব জীবনের চিরন্তন দুর্বলতার কথাই মতবাদ প্রচারের সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইভাবে অনুসন্ধান করিলে বাহির হইতে আপাতদৃষ্টিতে কোন নাটকের মধ্যে যেখানে যুগোচিত মতবাদ প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে, সেখানে একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে যে নর-নারীর চিত্র এবং চরিত্র আছে, তাহা শাশ্বত সাহিত্যগুণ বর্জিত নহে। কারণ, শাশ্বত মানবিক গুণ ব্যতীত চরিত্র হয় না, চরিত্র ব্যতীত কাহিনী হয় না, কাহিনী ছাড়া নাটক হয় না। রামনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া

দীনবন্ধু পর্যন্ত বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদি যুগের যে কয়খানি সামাজিক নাটক বা প্রহসন রচিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটি চরিত্র যদি খুঁটিনাটি করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মানবিক-গুণ বিবর্জিত নহে। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র স্ত্রী-চরিত্রগুলি জীবন্ত, সুখ-দুঃখ-বেদনার অনুভূতিশীল নারী-চরিত্ররূপে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। অথচ এ'কথা আমরা জানি, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' সাহিত্যে-রসবোধে উদ্বুদ্ধ রচনা নহে, বরং ইহা বিশেষ মতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। কোন মতবাদ প্রচার করা নাট্যকারের লক্ষ্য হইলেই যে নাট্য রচনা ব্যর্থ হয় না, তাহা দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ', 'সধবার একাদশী'র মত এত স্পষ্ট করিয়া আর কে দেখাইয়াছে? মধুসূদনের প্রহসন দুইখানিও তাহাই। ইহাদের মধ্যেও বক্তৃতা আছে; সমাজ-জীবনের ভালমন্দ বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে মানুষ আছে। এই মানুষ থাকার অর্থ এই যে, ইহাতে নাট্যগুণও আছে। 'নীল-দর্পণ' নাটকখানির মধ্যে সবল এবং দুর্বলের দ্বন্দ্বের যে পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র নীলকর এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কৃষক জীবনের সম্পর্কটিই যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে—ইহার মধ্যে একটি শাশ্বত জৈব ধর্মেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার কেবলমাত্র বাংলার তদানীন্তন কৃষকদিগের উপর নীলকরদিগেরই কাজ নহে, ইহা একটি চিরন্তন জৈব বিধান। সমগ্র জীবজগতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য নাটকের মধ্য দিয়া ইহার অভিনয় যখন দেখি, কিংবা ইহার বিষয় পাঠ করি, তখন একটি বিশেষ কালের বিশেষ মানুষের রূপটির পরিবর্তে একটি চিরন্তন জীবন-সত্যেরই পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিও শাশ্বত জীবন-সন্ধানী, ইহাদের মধ্য দিয়া যে কাব্যগুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই সাহিত্যের শাশ্বত শক্তি বিধৃত আছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যগুলির ভিতর দিয়া বাংলার জীবন, তাঁহার সংস্কার, তাহার ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণাকেই অনেক ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়াছেন। 'ডাকঘর' প্রমুখ নাটকের মধ্য দিয়া শাশ্বত জীবনের বাণী প্রকাশ করিলেও বাংলার পরিচিত, নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং অপরিসর জীবনের মধ্যেই তিনি তাঁহার সেই বাণীর সন্ধান পাইয়াছেন। অমল-চরিত্রের মধ্য দিয়া তিনি যে শাশ্বত জীবন-বাণীই প্রচার করুন না কেন, অমলকে বাংলার ঘরের শিশুরূপেই তিনি চিত্রিত করিয়াছেন। এই গুণেই রবীন্দ্রনাথের

নাটকগুলি বাংলা ও বাঙ্গালীর নাটক। ইহাতে আপাত-রোমান্টিক পরিচয়ের মধ্য দিয়াও শাশ্বত বাঙ্গালীর প্রাণ স্পন্দিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সংস্কারমুক্ত জীবন-বোধই রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তুলনায় বাংলার নাটকই বাঙ্গালীর জীবনের সহিত নিবিড়তম সান্নিধ্য রক্ষা করিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কাব্যধর্মী রোমান্টিক উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়া স্বপ্নরাজ্য নির্মাণ করিয়া চলিয়াছেন, সেই যুগেই তাঁহার দ্বারা লেশমাত্র প্রভাবিত না হইয়াও তাঁহারই (বঙ্কিমের) অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ দীনবন্ধু বাঙ্গালীর সে'দিনের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনের মধ্যে তাঁহার নাটকের উপকরণ সন্ধান করিয়াছেন। তবে এ'কথা সত্য যে, যুগে যুগেই যে তাহা সম্ভব হইয়াছে, এমন নহে। যে যুগে প্রত্যক্ষ জীবনের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, সেই যুগে বাংলার নাটকগুলিও যে বাস্তব জীবন-বিমুখী না হইয়াছে, তাহা নহে।, কিন্তু সমাজ কিংবা জীবনের প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইয়া কোনদিনই বাংলার নাটক জীবন-বিমুখী হইয়া উঠে নাই। সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলনই তাহার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। আজ বাঙ্গালীর সুকঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে তাহার নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে রোমান্টিক কিংবা আধ্যাত্মিক চিন্তা-বিলাসিতার অবসান ঘটিয়াছে, সেইজন্য রোমান্টিক কিংবা পৌরাণিক নাটক আজ আর কোন নাট্যকার লিখিবার প্রয়াস পান না; বরং তাহাদের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ জীবন-সমস্যামূলক নাটকই আজ রচিত হইতেছে। এই সমস্যাও আজ বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার পরিবর্তে ক্রমে পারিবারিক এবং তারপর ব্যক্তি-জীবনের সমস্যার মধ্যে আসিয়া সীমায়িত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ, ব্যক্তি-জীবনের উপর বৃহত্তর সমাজ এবং এমন কি, ক্ষুদ্রতর পরিবারেরও যে প্রভাব একদিন ছিল, আজ আর তাহা নাই। আজিকার বাংলা নাটক এই সত্যটি স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যক্তি-জীবন-মুখী হইয়া উঠিবার প্রয়াসী হইয়াছে। সুতরাং সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ধারাটিকে স্বীকার করিয়াই বাংলা নাটকের বিকাশ হইতেছে বলিয়া ইহার বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি কোনদিনই লোপ পাইবার আশঙ্কা নাই।

যে জাতির জীবন-সমস্যায় যত জটিলতার উদ্ভব হয়, তাহার নাটকের উপকরণেরও তত প্রাচুর্য দেখা দেয়। বাঙ্গালী ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতর

জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়া চলিয়াছে, সুতরাং একদিন তাহার মধ্যে নাটকের উপকরণের অপ্রাচুর্য ছিল বলিয়াই তাহাকে রোমান্টিক বিষয়-বস্তুর সন্ধান করার প্রয়োজন হইয়াছিল, আজ আর তাহার সেই প্রয়োজন নাই। আজ জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত বাঙ্গালীর মধ্যে যে বহুমুখী সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে পারিলেই বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাটক রচিত হইতে পারে—ইতিমধ্যেই সেই অনুযায়ী প্রয়াসও দেখা দিয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আরও একটি প্রয়াস দেখা দিয়াছে, সে সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা দরকার মনে করি। অনুবাদ এবং স্বাঙ্গীকরণ দ্বারা চিরকালই বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাই পুষ্টিলাভ করিয়াছে; একদিন সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক অনুবাদ করিয়া বাংলা নাটকের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনুকরণ এবং অনুবাদই যদি নাট্যকারদিগের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে, তবে সাহিত্য জাতীয় রসচৈতন্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সহজেই জাতির সঙ্গে সম্পর্ক-চ্যুত হইয়া পড়ে। আজ বাঙ্গালীর জীবনে নাটকীয় উপাদানের অভাব আছে বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন না, অথচ দেখা যায় যে, অধিকাংশ নাট্যকার জাতীয় জীবনের উপকরণগুলিকে তাঁহাদের রচনায় গ্রহণ করিবার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য নাটকের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনের পার্থক্য আছে; এ পার্থক্য অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইবে বলিয়া যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা অসঙ্গতরূপে আশাবাদী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতীয় সমাজ-জীবনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সন্ধান রাখেন না। সুতরাং সে রকম আশার উপর নির্ভর করিয়া এখন হইতেই ভবিষ্যৎ কালের জন্য কোন নাটক রচনা সঙ্গত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুবাদ-নাটকগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাহাদিগকে অনুবাদ বলিয়াই পাঠক ও দর্শক-সমাজ গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু আজিকার নাটকগুলি পুরাপুরি অনুবাদও যেমন নয়, তেমনই পুরাপুরি স্বাঙ্গীকরণও নয়। তাহার ফলে তাহাদের মধ্য দিয়া যে সমাজ-জীবনের পরিচয় আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে, তাহা আমাদের সামাজিক জীবনের আদর্শকে বিভ্রান্ত করে। সাহিত্য জাতির জীবনের সঙ্গে যদি যোগ রক্ষা করে, তবেই সে যথার্থ পুষ্টিলাভ

করিতে পারে—জাতির আচার-আচরণ, জীবন-সংস্কার ইত্যাদিকে অস্বীকার করিলে সাহিত্য পঙ্গু হইয়া গিয়া অচল হইয়া পড়ে। একদিন জাতির জীবনের কর্ম ও চিন্তাধারার সঙ্গে সুনিবিড় যোগ রক্ষা করিয়াই বাংলা নাট্য-সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া কোনদিনই তাহার প্রাণশক্তির অভাব হয় নাই। কিন্তু আজ যদি জাতির জীবনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক বিচ্ছেদের আশঙ্কা দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহার ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ বলিয়া মনে করা যায় না।

এ' কথা সত্য যে, একদিন পল্লীর সমাজ-জীবন আমাদের নাট্য-সাহিত্যে যে প্রেরণা দিয়াছে, তাহা আজ আমাদের সম্মুখে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। রামনারায়ণ-দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ রচনা পল্লী-জীবনভিত্তিক। এমন কি, সাম্প্রতিক কালে তুলসী লাহিড়ী 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়া তার' নামে যে দুইখানি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদেরও ভিত্তি পল্লী-জীবন। নানা রাজনৈতিক- এবং অর্থনৈতিক কারণে পল্লীজীবনের সঙ্গে সেই যোগ আমাদের বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুতরাং বাংলা নাটকের যে কতকগুলি সনাতন ক্ষেত্র ছিল, সেখান হইতে তাহার আর নূতন প্রেরণা পাইবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আর একটা নূতন জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে নাটকীয় উপাদানের অভাব আছে, তাহা ত' কেউই স্বীকার করিবেন না। পল্লীর কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের বিনিময়ে আজ আমরা সহরের শিল্পকেন্দ্রিক এক নূতন সমাজ-জীবন লাভ করিয়াছি। পল্লীর সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য পরিতাপ করিবার পরিবর্তে যদি আমরা শিল্পকেন্দ্রিক শ্রমিক-জীবনের মধ্যে গভীরভাবে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে সেখানে বাংলা নাটকের নূতন নূতন উপকরণ লাভ করিয়া আমরা লাভবান হইব। কারণ, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক পল্লীর কৃষি-জীবন অপেক্ষা সহরের ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্প-জীবন আরও জটিল, আরও অনিশ্চয়তা এবং আশঙ্কা দ্বারা বিক্ষুব্ধ; সুতরাং নাটকীয় উপাদানও সেখানে বিচিত্রধর্মী। শ্রমিকের সমস্যা কেবল তাহার বহির্মুখী অর্থনৈতিক সমস্যাই নহে, তাহার অন্তর্মুখী আরও যে জটিলতর সমস্যা আছে, তাহা উদ্ধার করিয়া নাটকের মধ্যে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্য দিয়া, এক অভিনব জীবন-বাণীর সন্ধান লাভ করা যাইতে পারে। সুতরাং অনুবাদ, অনুকরণ ইত্যাদির পরিবর্তে আজ জাতীয় জীবনের মধ্যে উপকরণ

সন্ধানের প্রেরণা যত বেশি দেখা দেয়, বাংলা নাটকের পক্ষে সকল দিক হইতে ততই কল্যাণকর।

সাম্প্রতিক কালে বাঙ্গালীর নাটকের অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি প্রয়াস দেখা দিয়াছে, তাহা নানা কারণেই অভিনন্দনযোগ্য। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বিলুপ্তপ্রায় নাটকের কেবল মাত্র পুনঃ-প্রচারই নহে, সার্থক পুনরভিনয় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্ব', দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ', মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', অমৃতলালের 'ব্যাপিকা-বিদায়', 'তিল-তর্পণ', গিরিশচন্দ্রের 'য্যায়সা-কি-ত্যায়সা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই বিলুপ্তপ্রায় নাটকগুলির অভিনয়ের ভিতর দিয়া বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিযুগের নাটকগুলিরও যে একটি শাশ্বত আবেদন ছিল, তাহাই বাংলা নাটকের দর্শকবৃন্দ প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কারণ, তাহাদের অভিনয়ের মধ্য দিয়া যে কেবল একটি শিক্ষাগত বা academic কৌতূহলই নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা নহে, তাহাদের ভিতর দিয়া সেই যুগের শক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং তাহা এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যেও নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিবার সুযোগ দিয়াছে।

একদিন বাংলার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ বাংলা নাটক রচনার যে প্রেরণা দিয়াছিল, আজ সেদিক হইতে তাহার প্রেরণা লাভ করিবার সুযোগ যে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, একথা অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। কারণ, এখন ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে একই নাটকের শত শত রজনী অভিনয়ের ফলে নূতন নূতন নাটক পরিবেশন করিবার সুযোগ নাই। কিন্তু এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, আজ যে অসংখ্য সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় বাংলা দেশে সর্বত্রই গড়িয়া উঠিয়াছে, একদিন তাঁহাদের কাহারও অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সেদিন ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের যে দায়িত্ব পালন করিবার প্রয়োজন ছিল, আজ তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব না হইলেও জাতির পক্ষে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কারণ, নূতন নূতন নাটক রচনা এবং তাহাদের পরিবেষণ করিবার দায়িত্ব আজ কয়েকটি সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে পালন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চগুলির বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন আছে। সুতরাং তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার যে পথে চলা অপরিহার্য তাহার সেই পথ হইতে কোন আদর্শের দোহাই দিয়া

নিবৃত্ত করিবার প্রয়াসও অর্থহীন। আজ সবাক্ চলচ্চিত্রের যুগে তাহার সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে বাংলার রঙ্গমঞ্চগুলি বাঁচিয়া আছে, শুধু বাঁচিয়াই আছে নহে, এমন কি, নূতন প্রাণশক্তিতে পর্যন্ত সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কেবল মাত্র ইহার নূতন আঙ্গিক উদ্ভাবন করিয়া নূতন পথ ধরিয়া চলিবার জন্যই সম্ভব হইয়াছে, তাহা না হইলে সবাক্ চলচ্চিত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে ইহা কিছুতেই আজ আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিত না। সবাক্ চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই আজ বাংলার রঙ্গমঞ্চকে ইহার প্রয়োগ-শিল্পের উপর অতিরিক্ত জোর দিতে হইয়াছে, ইহাকেও বাংলা নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, আজ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র কিংবা শিশিরকুমারের মত প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা নাই, অথচ রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণ রক্ষা করিবার দায়িত্ব পূর্বে এই শ্রেণীর অভিনেতা-গণ যখন বর্তমান ছিলেন, তখনকার সময় হইতে অনেক বেশি। কারণ, তখন চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কোন কথাই ছিল না। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় যদি রঙ্গমঞ্চে বহির্মুখী উপকরণ বৃদ্ধি করিয়া কিংবা প্রয়োগ-শিল্পের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়াও তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহার পক্ষে তাহা করাই আজ প্রয়োজন। সেজন্য বাংলার নাটক রচনার ধারা ব্যাহত হইবে না, স্বতন্ত্র ধারা সন্ধান করিয়া তাহা বিকাশ লাভ করিবে। ইতিমধ্যে তাহার লক্ষণও দেখা দিয়াছে।

দুই

আমাদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর নাট্যসমালোচক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর সমালোচক মনে করেন, বাংলা সাহিত্যে নাটক আজও রচিত হয় নাই, তবে ভবিষ্যতে রচিত হইতে পারে; আর এক শ্রেণীর সমালোচক মনে করেন, বাংলা সাহিত্যে এ'যাবৎ যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন নাটক পাশ্চাত্ত্য ভাষায় রচিত যে কোন উল্লেখযোগ্য নাটকের তুল্য গুণসম্পন্ন। এই দুই শ্রেণীর সমালোচকের মত এবং বিশ্বাসের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহা যদি সামান্য মাত্র হইত, তবে তাহা উপেক্ষা করিলেও চলিত; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি মত সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী, সুতরাং গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যাঁহারা ইংরেজি সাহিত্যের একান্ত ভক্ত এবং দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহারাই মনে করিয়া থাকেন যে, বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কোন নাটক রচিত হয় নাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ছোটগল্প কাব্য রচিত হইয়াছে, এ'কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন না। ইহার কারণ, আধুনিক বাংলা উপন্যাস ছোট গল্প এবং কাব্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও আঙ্গিক যে ভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে, বাংলা নাটক রচনায় তাহা সেভাবে অনুসরণ করা হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্য-বিচারে আমাদের দেশে যে অলঙ্কার শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য-বিচারের জন্য তেমন কোন অলঙ্কার শাস্ত্র আজও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, সুতরাং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনা-পদ্ধতিই আজও বাংলা সাহিত্য-বিচার-কালে আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই বিচারে বাংলা নাটক আলোচনা করিতে গিয়া যখন দেখা যায়, যে পাশ্চাত্ত্য নাটক অনুযায়ী ইহা রচিত নহে, তখনই ইহা নাটক নহে বলিয়া এক শ্রেণীর সমালোচক সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা প্রথমেই বিচার করিতে হয়।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এ'দেশে উপন্যাস ছিল না, সেইজন্য ইংরেজি উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাবধারা একান্ত ভাবে অনুসরণ করিয়া আধুনিক যুগে উপন্যাস রচনায় কোন অন্তরায় দেখা দিল না। আধুনিক কাব্য- এবং প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কেও এই কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পর যখন এ'দেশে তাহারই প্রভাব বশতঃ নাটক রচনার প্রেরণা দেখা দিল, তখন এই বিষয়ে অন্ধভাবে ইংরেজি ভাবাদর্শকে অনুসরণ করিবার পক্ষে প্রধানতঃ দুইটি অন্তরায় দেখা দিল, প্রথমতঃ সংস্কৃত নাটকের আদর্শ, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণযাত্রা প্রমুখ বাংলার অন্যান্য লোক-নাট্যের আদর্শ। ইংরেজি নাটক যখন এদেশে প্রথম প্রচার লাভ করিল, তখন সংস্কৃত নাটক কিংবা বাংলার অন্যান্য লোক-নাট্যের প্রভাব যে নিতান্ত স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—বরং উভয়ই তখন অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ'কথা সত্য, ইংরেজি নাটক এ'দেশে প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত নাটকও এক অভিনব প্রাণশক্তি লাভ করিয়া পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক কালে রচিত এবং বহুল প্রচারিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' উভয়ই সংস্কৃত নাটকেরই বাংলা অনুবাদ, ইহাদের বহুল প্রচারের মধ্য দিয়া সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকও সংস্কৃত

নাটকের আস্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তারপর যখন কলিকাতায় ইংরেজিতে নাট্যাভিনয়ের সূচনা দেখা দিল, তখন এ'দেশের বিদ্যোৎসাহী রাজা ও জমিদারগণ সংস্কৃত নাটকেরই বাংলা অনুবাদ করাইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সৌখীন রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া তাহাদের অভিনয় করাইবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। তারপর পাশ্চাত্ত্য নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রভাব বশতঃ দেশীয় কৃষ্ণযাত্রার বৈচিত্র্যহীন ধারাটিরও নূতন নূতন বিষয়-বস্তুর এবং নূতনতর আঙ্গিকের সন্ধান পাইয়া নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, সেই সময়েই কলিকাতার অলিতে-গলিতে এবং সেখান হইতে বাংলার পল্লীগ্রামাঞ্চলেও 'নূতন যাত্রা'র কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিল। সুতরাং দেখা যায়, ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফলে বাংলা কথা- ও কাব্য-সাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন জন্মলাভ করিলেও নাটকের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখা দিল—সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত নূতন নাটক রচিত হইবার ফলে, এই দেশের এই বিষয়ক যে ধারাটি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল, পাশ্চাত্ত্য নাটক অনুশীলনের মধ্য দিয়া জাতি নিজের এই বিষয়ক বিলুপ্ত ঐতিহ্যটির সন্ধান করিয়া লইল, তাহার ফলে দীর্ঘকাল ব্যবধানে সংস্কৃত নাটক এবং দেশীয় যাত্রার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইল। প্রধানতঃ এই জন্য পাশ্চাত্ত্য ভাব এবং আঙ্গিক অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া প্রথম হইতেই এ'দেশে কোন নাটক রচিত হইতে পারিল না। তখন কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য নাটক বাংলায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল সত্য, কিন্তু এই সকল অনুবাদ কিংবা অনুকরণ এই বিষয়ক জাতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া লইতে পারিল না। সেই যুগে ইংরেজী নাটকের বহু বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইলেও ইংরেজি কথা-সাহিত্যের যে কোন বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল না, তাহার কারণও প্রধানতঃ ইহাই। বিশিষ্ট কোন জাতীয় ঐতিহ্য কিংবা আদর্শের অভাবে কথা-সাহিত্য অতি সহজেই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, সুতরাং তাহার অনুবাদের আর প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু নাটক রচনায় দেশীয় ঐতিহ্য এই বিষয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া সেখানে কেবল অনুবাদ ভিন্ন আর কোন উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই।

এখানে একটি কথা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কাব্য-সাহিত্যেরও ত' এ'দেশের একটি ঐতিহ্য ছিল, সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আমরা পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের নূতন আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলাম, তখন

দেশীয় ঐতিহ্য যদি তাহাতে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া না থাকে, তবে নাটকের ক্ষেত্রে এ' কথা কেন প্রযোজ্য হইবে ? কিন্তু তাঁহাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কাব্য-সাহিত্যের যে ঐতিহ্য এ'দেশে ছিল, তাহার বহির্মুখী রূপটি অবলম্বন করিয়াই নবযুগের বাঙ্গালীর নূতন কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ; এমন কি, মাইকেল মধুসূদন্ দত্তও কাব্যের প্রাণের মধ্যে যে নূতনত্বেরই বিকাশ করুন না কেন, কাব্যদেহের গঠনে তিনি দেশীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে তিনি যে চোদ্দ অক্ষরের গাঁথুনিকে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা'র মধ্যে যে বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ও ভাষাকে অক্ষত রাখিতে চাহিয়াছেন, ইহা তাঁহার ঐতিহ্য-প্রীতিরই নিদর্শন ; তথাপি এ'কথাও সত্য, বাংলা প্রাচীন কাব্যের ঐতিহ্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আসিয়া একশত বৎসর ব্যাপী অনুশীলনের অভাবে সম্পূর্ণ গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু লোক-নাট্যের ধারা নানা ভাবে নানা রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়াও দেশীয় কৃষ্ণযাত্রার ধারা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন প্রাণরসে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা কদাচ মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর ধারার মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

এই সকল কারণেই দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে যখন নাটকের প্রথম প্রাদুর্ভাব হইল, তখন তাহা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সাহিত্যের আঙ্গিক অনুকরণ করিতে পারিল না ; চলমান এই বিষয়ক একটি দেশীয় ঐতিহ্যের ধারা ইহার এ' বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করিল। সেইজন্য বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক যাহা রচিত হইল, তাহা কোন ইংরেজিনবিশের দ্বারা রচিত নহে, বরং তাহার পরিবর্তে একজন সম্পূর্ণ ইংরেজি-অনভিজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত দ্বারাই রচিত, তাহা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব-নাটক'। যখন আমরা আধুনিক নাট্য সাহিত্য প্রবর্তনের মূলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা বলি, তখন এ'কথা মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখি না যে, বাংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য আধুনিক নাটক যিনি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হইবার বিন্দুমাত্রও সুযোগ লাভ করেন নাই। অথচ তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই আমরা গণ্য করি।

বাংলা নাটক সম্পর্কে যে যাহাই বলুক না কেন, ইহার সম্পর্কে একটি

প্রধান কথা এই যে, অনুবাদ ব্যতীত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোন বিষয় আবির্ভূত হইবার পূর্বেই মৌলিক রচনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নাটক রূপেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আধুনিক বাংলা সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের প্রথম পরিচয়ই নাটক, ইহার মধ্য দিয়াই মধ্যবিত্ত বাংলার সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়টি প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব-নাটক' যখন প্রকাশিত হয়, তখনও রঙ্গলালের কাব্য, প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাস কিছুই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয় নাই, আরও দশ বৎসরেরও পর বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। এমন কি, ইঁহাদের আবির্ভাবের পরও ইঁহাদের প্রত্যেকেরই রোমান্টিক অনুভূতির প্রাবল্য বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনকে ইহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন কেবলমাত্র সংস্কৃত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলা ভাষায় যে নাটক রচনা করিলেন, তাহা কেবল বাংলা নাটকেরই প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হইয়া রহিল না, ইহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর বৈচিত্র্যহীন জীবনের স্পন্দন প্রথম দেখা দিল। অতএব যে রচনার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জীবনস্পন্দন সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা নাটক হিসাবেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ, এ'কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, সাহিত্যের সকল বিষয়ের মতই ইহার নাটকও জীবনকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, বরং নাটকের মধ্য দিয়া সেই জীবনের প্রকাশ আরও প্রত্যক্ষ। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে'র পাশ্চাত্ত্য নাটক হিসাবে যে ত্রুটিই থাকুক না কেন, ইহার মধ্য দিয়া যে বাঙ্গালী সমাজের একটি অংশের বাস্তব রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ এই জীবন যে সম্পূর্ণ নির্দ্বন্দ্ব তাহা নহে, নাটকীয় ভঙ্গিতেই ইহার মধ্য দিয়া জীবনের উপস্থাপনা দেখা যায়, অর্থাৎ ইহার মধ্যে যেমন প্রত্যক্ষ জীবনের পরিচয় আছে, আবার ইহার মধ্যে জীবনের সংঘাতের চিত্রটিও আছে। ইহার মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বার্থ যে ভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতেই ইহার মধ্য দিয়া একটি নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি হইবার অবকাশ হইয়াছে। কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের সংঘাত ইহাতে নাই বলিয়াই ইহা বাঙ্গালীর নাটক হিসাবে ব্যর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বাঙ্গালীর জীবনের সংঘাত চিরকালই ভিতর হইতেই আসিয়াছে, বাহির হইতে আসে নাই। মুকুন্দরামের

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে দেখিয়া ফুল্লরার মধ্যে যে সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও অন্তর্মুখী ছিল, তাহার বহির্মুখী কোন পরিচয়ই ছিল না। সেই ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী নর-নারীর জীবনে যখনই কোন সংঘাত সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই সেই সংঘাত বহির্মুখী পরিচয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী পরিচয় লাভ করিয়াছে। সুতরাং এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকের অনুকূল বাংলা কোন নাটকে বহির্মুখী সংঘাত যদি দেখা না যায়, তবে তাহাকে বাঙ্গালীর নাটক হিসাবে ব্যর্থ বলিবার কোন কারণ নাই।

রামনারায়ণ তর্করত্নের পর মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনের মধ্য দিয়া যদি দীনবন্ধুর রচনার মধ্যে প্রবেশ করি, তবে সেখানেও দেখিতে পাই, ইংরেজি নাটকের অনুকূলে তাহাদের মধ্যে বহির্মুখী ঘটনার আড়ম্বর সৃষ্টি করা সত্ত্বেও অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাহাদেরও নাটকীয় গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'নীল-দর্পণ' নাটকের দুইটি শক্তির বহির্মুখী বিরোধের মধ্যে কয়েকটি চরিত্রের অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বই ইহাদের নাটকীয় গুণ সৃষ্টির যথার্থ কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। বহির্মুখী বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হওয়া সত্ত্বেও 'নীল-দর্পণ' নাটকে স্ত্রী-চরিত্র যে এত প্রাধান্য লাভ করিল, ইহার কারণ তাহাই। অন্তর্মুখীনতা স্ত্রী-চরিত্রেরই গুণ, পুরুষ-চরিত্রের গুণ নহে ; সুতরাং বহির্মুখী ঘটনা অন্তর্মুখীন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, 'নীল-দর্পণে' তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহাতেও যে জগৎ ও জীবন আছে, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে শাশ্বত ও সত্য, বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস, জীবন-সংস্কার একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা এত শক্তিশালী রচনা। ইংরেজের সমাজ কিংবা জীবন ইহাতে নাই, যে দুই অত্যাচারী ইংরেজ নীলকর ইহাতে আছে, তাহাদের পরিচয় কেবলমাত্র ইহাদের অত্যাচারে, ইহাদের জাতিতে নহে। জাতিধর্ম দেশকালনিরপেক্ষ সবলের যে অত্যাচারী সত্তা দুর্বলের সম্মুখে চিরকালই বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, উড এবং রোগের মধ্য দিয়া তাহারই প্রকাশ দেখা যায়। ইহাদের রূপায়ণে দীনবন্ধুর যে কোন ত্রুটি প্রকাশ পায় নাই, তাহা নিরপেক্ষ সমালোচক অবশ্যই স্বীকার করিবেন। 'নীল-দর্পণ' নাটকের মূল্য যে কেবলমাত্র সাময়িক নহে, বরং তাহার পরিবর্তে ইহার মধ্যে কয়েকটি চরিত্রের চিরন্তন সুখদুঃখের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা ইহার কয়েকটি চরিত্র গভীর ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া যদি এই নাটক রচিত হইত, তবে ইহার মধ্যে এই শক্তি কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারিত না; কারণ, অনুবাদ এবং অনুকরণের মধ্য দিয়া মৌলিক সৃষ্টির শক্তি কিছুতেই প্রকাশ পায় না। দীনবন্ধুর সকল নাটকই চিত্র-প্রধান, পাশ্চাত্ত্য নাটকের মত ঘটনাপ্রধান নহে; ঘটনার পরিবর্তে চিত্রের প্রাধান্য আমাদের জাতীয় রস-সংস্কার হইতেই যে আসিয়াছে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ,আমাদের মধ্যযুগের কাহিনী-মূলক কাব্য অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ঘটনার পরিবর্তে চিত্রের প্রাধান্যই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারই প্রেরণা উনবিংশ শতাব্দীর কাহিনীমূলক রচনার মধ্যে গিয়াও প্রবেশ করিয়াছে। যদিও বাংলা নাট্য-সাহিত্য রচনার প্রথম যুগ অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ, তথাপি মাইকেল কিংবা দীনবন্ধু অনুবাদের পথে অগ্রসর না হইয়া স্বাঙ্গীকরণের দিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্বাঙ্গীকরণের ভিতর দিয়া মৌলিক সৃষ্টির সার্থকতা দীনবন্ধুর নাটকের মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম দেখা যায়।

দীনবন্ধুর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল; এমন কি, পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালও সেই প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র ইংরেজি নাটক পাঠ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই বিষয়ক দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ ছিল বলিয়া পাশ্চাত্ত্য আদর্শকে তাঁহার নাটক রচনায় আনুপূর্বিক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর যে অংশে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাতে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সর্বজয়ী হইলেও নাটকের মধ্যে তাহার প্রভাব যে সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহার কারণও নাটক বিষয়ে বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যের দৃঢ়তা; ইহা যদি কোন দিক দিয়া শিথিল হইয়া পড়িত, তবে সেই সুযোগে পাশ্চাত্ত্য রূপ ও আদর্শ ইহাকে প্রবলভাবে অধিকার করিয়া ফেলিত। সুতরাং এই ঐতিহ্য যে কতখানি সুদৃঢ় ছিল, তাহা ইহা হইতেই বিচার করিতে পারা যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের শাশ্বত পরিচয় যতখানি প্রকাশ পাইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর যুগচিন্তা ততোধিক রূপলাভ করিয়াছে; বিশেষতঃ বাঙ্গালীর অধ্যাত্মচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারাটির সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যোগ রক্ষা করিয়াছেন। এ'কথা সত্য, হয়ত তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি দীনবন্ধুর নাটকের চরিত্রগুলির মত যুগোত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারে নাই,তথাপি জাতীয় জীবনের

ঐতিহ্যকে ধারণ করিয়া থাকিবার যে শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কাহারও মধ্যে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের নাটক সেক্সপীয়র কিংবা পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শ দিয়া নহে, জাতীয় ঐতিহ্যের দিক দিয়া বিচার করা কর্তব্য; কারণ, ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করাই গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল, সেক্সপীয়র কিংবা পাশ্চাত্ত্য নাটকের বহির্মুখী আঙ্গিক তাহার উপলক্ষ্য ছিল মাত্র।

গিরিশচন্দ্রের পরই রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করিতে হয়। দেখা যায় যে, মাত্র কয়েকখানি নাটক যেমন, 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য বিয়োগান্তক নাটকের ভাব ও আঙ্গিকের উপর লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, অন্যান্য নাট্যরচনায় তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাটককে 'পালা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; 'রক্তকরবী' সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'ইহা নন্দিনী নামক মানবীর পালা' ইত্যাদি। এ'কথা সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চের উপকরণ-বাহুল্যকে সর্বদাই নিন্দা করিয়াছেন; এমন কি, শুধু মুখেই নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, লিখিতভাবে তাঁহার মত এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং যে অভিনয়-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাহার মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল এবং সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া এই বিশ্বাস তিনি পালন করিয়াছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তিনি তাঁহার নাটকের নিজস্ব একটি বিশিষ্ট রূপদান করিয়াছেন। এই কথাটি বিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্ত্য নাটকের সংজ্ঞার দ্বারা যখন তাঁহার নাটকের মূল্য বিচার করিতে অগ্রসর হই, তখন ভুল আমারই হয়, নাট্যকারের হয় না। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে বহু মতবাদ বহু দিক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; এমন কি, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার নাটক সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাটকের দোষগুণ সম্পর্কে যে সর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার 'বিসর্জন' নাটকের উৎসর্গ-পত্রে এই নাটকখানি সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।

এই কথাটি কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকই নয়, তাঁহার প্রায় সকল

নাটক সম্পর্কেই প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন বাঙ্গালীর সর্বকালীন-রস-চেতনার সুযোগ্য প্রতিনিধি; সুতরাং তাঁহার সৃষ্টির মধ্য দিয়া কেবলমাত্র একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব নহে, বরং তাহার পরিবর্তে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির রস-চৈতন্যের স্পন্দন অনুভব করিতে পারা যায়। সুতরাং তিনি যখন বলেন, যে তাঁহার নাটকের মধ্যে 'লিরিকে'র বাড়াবাড়ি হইয়াছে,তখন বুঝিতে হইবে, ইহা জাতীয় জীবনের রস-চৈতন্য অবলম্বন করিয়াই তাঁহার মধ্যেও বিকাশ লাভ করিয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে কাহারও মুক্তির উপায় নাই। এ'কথা সকলেই জানেন, সংস্কৃত নাটক 'লিরিকধর্মী'রচনা, কৃষ্ণযাত্রা 'লিরিকধর্মী'রচনা, বাংলা 'নূতন যাত্রা'ও গীতবাদ্য-বহুল 'লিরিকধর্মী' রচনা। কেবলমাত্র যাঁহারা ইংরেজি নাটকের অনুবাদ কিংবা অন্ধভাবে ইংরেজি নাটক অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বাদ দিলে দুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ 'লিরিকধর্মী' রচনা। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটি বিশেষত্ব। সুতরাং যে জাতির নাটক লইয়া বিচার করিব, সেই জাতির মৌলিক চরিত্রগুণের যদি সন্ধান না করিতে পারি, তবে সে বিচার কিছুতেই অভ্রান্ত হইতে পারিবে না। বাঙ্গালীর নাটকের বিশেষত্ব তাহার মৌলিক চরিত্রগুণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে,সেখানে ইংরেজের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই, সেখানে ইংরেজ এক, বাঙ্গালী আর—ইহারা কিছুতেই এক হইতে পারে না। সেই সূত্রেই বাঙ্গালীর নাটক বাঙ্গালীরই নাটক, ইহা কখনই ভিতরে ও বাহিরে ইংরেজি নাটকের পরিচয় লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে, তাঁহার নাটকে লিরিকের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তখন কেবল ইহা রবীন্দ্র-নাটকেরই একটি বিশেষত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে, ইহা বাংলা নাটকেরই বিশেষত্ব, কারণ, বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই ইহার শক্তিটি বিধৃত রহিয়াছে। এখনও এমন সমালোচক আছেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, রবীন্দ্রনাথের পর আর বাংলা নাটক রচিত হয় নাই; কেহ কেহ আরও সামান্য একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত আসিয়াই বাংলা নাট্য রচনার ধারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল সাহিত্য-বিচারে নহে, ব্যক্তিগত জীবনেও এমন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন লোক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয়কে নিতান্ত তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া যাহা পুরাকীর্তি, কেবলমাত্র তাহারই জয়গান করিয়া থাকেন। ইহা এক শ্রেণীর মানুষের একটি সাধারণ প্রকৃতি, নিরপেক্ষ সাহিত্য-সমালোচনা

তাঁহাদের দ্বারা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। মানুষের মন কদাচ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে না, পুরাকীর্তির পার্শ্বেই নূতন কীর্তি স্থাপিত হয় এবং নূতনও একদিন পুরাকীর্তিতে পরিণত হয়। নূতনের মধ্য দিয়া পুরাতনেরও সৃষ্টি হয়, নূতন সৃষ্টি না হইলে পুরাকীর্তিরও সন্ধান পাওয়া যাইত না। সুতরাং এই শ্রেণীর রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন সমালোচকের উক্তির কোন মূল্য নাই। বাংলা নাটকের প্রাণশক্তির প্রধান প্রমাণ এই যে, ইহা সুস্পষ্ট পথরেখা ধরিয়া এক যুগ হইতে আর এক যুগে যত প্রত্যক্ষ ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন বিষয় দ্বারা তাহা সম্ভব হইতেছে না। অতীতে বাংলা নাটক যেমন কয়েকটি যুগ উত্তীর্ণ হইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তেমনই বর্তমানেও আমাদের চোখেরই সম্মুখে ইহা নূতন যুগের সীমানায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাণশক্তিহীন নির্জীব পদার্থের পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভব হইত না। সাম্প্রতিক বাংলা নাটক কেবল সক্রিয় এবং সচেতন বলিয়াই যুগের জীবনটি ইহা নিজের দৃষ্টির মধ্যে ধারণ করিতে পারিয়াছে, নির্জীব হইলে পুরাতন পর্যুষিত রীতিরই অনুসরণ করিত। আমরা যাহাকে নবনাট্য-আন্দোলন বলি, তাহা প্রকৃত অর্থে কোন 'আন্দোলন' না হইতে পারে, তথাপি ইহা যে বাংলা নাটকের প্রাণশক্তির পরিচায়ক, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, ইহার ভিতর দিয়া বাংলার প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনটি যে আজ ভাষা পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে, আত্মবিশ্বাসের অপরিমিত শক্তিতে নব যুগের বাংলা নাটক যে সত্য- এবং সৌন্দর্য-সন্ধানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই। যাহা নির্বীর্য, নিস্তেজ, প্রাণশক্তিহীন, তাহার দ্বারা ঐ কাজ কখনই সম্ভব নহে। এই নব-যুগের একজন মাত্র নাট্যকারের নাম আমি এখানে উল্লেখ করিতে চাই, তিনি তুলসী লাহিড়ী। তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী নাট্যকার। তিনি কয়েকখানি নাটকই রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুইখানি নাটকের সঙ্গে বাঙ্গালী নাট্যামোদী মাত্রেরই পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে একখানির নাম 'দুঃখীর ইমান' এবং আর একখানি নাটকের নাম 'ছেঁড়া তার'। পল্লী-বাংলার জীবন-সংস্কার সম্পর্কে যাঁহার সামান্য পরিচয়ও আছে, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যেমন আছে, তেমনই জীবনের বাস্তব রূপও প্রকাশ পাইয়াছে। এলিজাবেথীয় নাটক

অনুযায়ী ইহাদের মধ্যে বহুমুখী ঘটনার আড়ম্বর কিছুমাত্র নাই, ইহাদের মধ্যে যে জীবনগুলি রূপায়িত হইয়াছে, তাহাদের পরিসর নিতান্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু তথাপি ঘটনার আবর্তে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং সর্বোপরি বাস্তব জীবনের রূপায়ণে ইহারা যে কোন সভ্য দেশের নাটকের সমান মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে।

তথাপি ইহাদের সর্বজনীন স্বীকৃতিতে যে একটি বাধা আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই বিষয়ে ইহাদের প্রথম বাধা, ইহাদের আঞ্চলিক ভাষা, কারণ, ইহাদের ভাষা কাব্যের ভাষা নহে, সাহিত্যের ভাষা নহে, ইহাদের ভাষা বাংলার আঞ্চলিক জীবনাশ্রিত নিরক্ষরের ভাষা। দ্বিতীয়তঃ যে জীবন-সংস্কারটি ভিত্তি করিয়া এই নাটকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের দেশের নাগরিক অধিবাসীর নাই। অথচ ইহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিলে নাটকের পরিণতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিতে পারা যায় না। বাংলা ভাষায় সার্থক নাটক রচনার এইখানেই একটি প্রধান বাধা দেখা যায়। বাংলার নাগরিক-জীবনের অধিবাসীর সঙ্গে পল্লী-জীবনের অধিবাসীর একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পল্লী-জীবনের সংস্কারের শক্তি নাগরিক-জীবনের সংস্কারের শক্তি অপেক্ষা অধিক। অথচ সেই পল্লী-জীবনের সঙ্গে সহুরে নাট্যকারদিগের এবং পাঠক ও দর্শকের যোগ ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তুলসী লাহিড়ীর উক্ত দুইখানি নাটকই একান্তভাবে পল্লীজীবনের সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে, নাট্যকার ইহাদের শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার পাঠক এবং নাটকের দর্শকগণ তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই; যদি তাহা হইত, তবে উক্ত নাটক দুইখানির জন-প্রিয়তা আরও লক্ষিত হইত। আঞ্চলিক ভাষা অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু একদিন নাটকীয় সংলাপ সৃষ্টিতে সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে নাগরিক-জীবনের প্রসার এবং পল্লীজীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য নাটকের ভিতর দিয়া তাহার প্রয়োগ আর জনপ্রিয়তার কারণ হইতে পারে না। পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলের ভাষা ক্রমে আমাদের নিকট অপরিচিত হইয়া আসিতেছে, পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলের ভাষার সংহতি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুতরাং যে সুনিবিড় পল্লী-জীবনাশ্রিত ভাষা একদিন দীনবন্ধুকে তাঁহার নাটকীয় সংলাপ রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, আজ সেই ভাষাও আমাদের সম্মুখে নাই। সেইজন্য বাহিরের দিক দিয়া যথার্থ আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইলেও কাহিনীর

নাটকীয় গুণ এবং চরিত্রের বাস্তব ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তুলসী লাহিড়ীর উক্ত দুইখানি নাটকে তাহার কিছুমাত্র অভাব আছে, এমন মনে করা যায় না।

যুগ-মানসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই আজ বাংলা নাটক ঘটনাত্মক হইবার পরিবর্তে বিশ্লেষণাত্মক হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশ্লেষণাত্মক নাটকের সৃষ্টি হইলেও বাংলা দেশে তাহার প্রভাব সাম্প্রতিক কালের পূর্ববর্তী নহে। সুতরাং বাংলা নাটক কেবলমাত্র প্রাচীন পর্যুষিত রীতি অবলম্বন করিয়াই একটি অবিচল আদর্শের সম্মুখে স্থির হইয়া আছে, এ'কথা বলিতে পারা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার প্রাণশক্তি কদাচ লোপ পায় নাই ; এমন কি, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য যে কোন বিষয়ের তুলনায় ইহার মধ্যেই সর্বাধিক প্রাণশক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। এই গুণেই ইহার স্থায়িত্ব এবং এই গুণেই ইহার বিকাশ ; ইহার সম্পর্কে হতাশার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না।

তিন

বিগত শতাব্দীতে বাংলা নাটক যখন প্রথম বিকাশলাভ করিতেছিল, তখন একটি বিষয়ে ইহার এই সুবিধা ছিল যে, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইতিহাস হইতে নির্বিচারে কাহিনী সন্ধান করিয়া তাহা নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছিল। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ যে জাতির লক্ষ্য, সে জাতির মধ্যে নাট্য-কাহিনীর অভাব কোনদিনই দেখা দিতে পারে না। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকও প্রধানতঃ ইহাদিগকে উপজীব্য করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকও প্রধানতঃ ইহাদের মধ্য হইতেই বিষয়বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে। সেইজন্য গিরিশচন্দ্র প্রায় আশীখানার অধিক নাটক রচনা করিয়াও বাংলা নাটকের কাহিনীর দিক হইতে কোন অভাব বোধ করেন নাই। অবশ্য এ'কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে যুগে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ হইতে কাহিনী সংগৃহীত হইলেও গিরিশচন্দ্র কিংবা তাঁহার অনুসরণকারীদিগের রচনায় তাহা বাঙ্গালীর জীবনরসে জারিত হইয়া বাঙ্গালীরই জাতীয় নাটক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল, নতুবা আশীখানি নাটক গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালী দর্শকের সম্মুখে রাত্রির পর রাত্রি পরিবেশন করিতে পারিতেন না। পৌরাণিক নাটক রচনায় প্রেরণা লুপ্ত

হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন ঐতিহাসিক রোমান্স রচিত হইবার প্রেরণা দেখা দিল, তখনও ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুদীর্ঘ অধ্যায়গুলি ইহাদের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইবার সুযোগ দান করিল। স্বদেশী আন্দোলন লুপ্ত হইবার সঙ্গে ইহাদেরও প্রেরণা যখন সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল, তখনও বাংলার তদানীন্তন রাজনৈতিক সমস্যামূলক নাটক রচিত হইবার এক অবকাশ সৃষ্টি হইল; কিন্তু বঙ্গবিভাগের পর সেই অবস্থারও যখন অবসান হইল, তখন বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু লইয়া এক সমস্যা দেখা দিল।

সামাজিক বিষয়বস্তু ব্যতীত সাম্প্রতিক নাটকের যে আর কোন অবলম্বন হইতে পারে না, তাহা সর্ববাদিসম্মত। বাংলা নাটকে সামাজিক বিষয়বস্তু যে পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা নহে। এ কথা সকলেই জানেন, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাস্তবধর্মী নাটকই সামাজিক নাটক—'কুলীন কুল-সর্বস্ব'। ইহা রচনার পর হইতেই তদানীন্তন বাংলা সমাজের নানা কুসংস্কারের নিন্দা প্রকাশ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতেই শত শত নাটক রচিত হইয়াছে। বিংশতি শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া বাংলার সমাজ-জীবনের কুপ্রথার নিন্দা করিয়া নাটক রচনার অবসান হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, ইহার কুপ্রথাগুলি অধিকাংশই ইতিমধ্যে দূর হইয়া গিয়াছে। তথাপি যতদিন পর্যন্ত দেশ স্বাধীন হইতে পারে নাই, ততদিন পর্যন্ত সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় দেশাত্মবোধক নাটক রচিত হইয়াছে। ইহাদিগকে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করিবার উপায় নাই। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে যে অর্থে সামাজিক নাটক রচিত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে সেই অর্থে সামাজিক নাটক রচিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক কুপ্রথাগুলির অতিরঞ্জিত রূপ সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসনের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের উচ্ছেদের প্রয়াস করা হইয়াছে। বিংশতি শতাব্দীতে সেই সকল কুপ্রথা অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—নাটকের মধ্য দিয়া তাহাদের দোষকীর্তন করিবার জন্যই যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে—বরং শিক্ষাবিস্তারের জন্যই তাহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বিংশতি শতাব্দীতে সেই সমস্যা আর ছিল না বলিয়া সামাজিক নাটক সুস্পষ্টভাবে কোন বিষয়বস্তু অনুসরণ করিতে পারে নাই। তখন পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের আদর্শ বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য কতকগুলি যে নূতন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছিল, তাহাই প্রধানতঃ বাংলা সামাজিক নাটকের অবলম্বন হইল; তাহা প্রধানতঃ

ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্গে সামাজিক- বা পারিবারিক-স্বার্থের সংঘাত। কিন্তু বিভাগোত্তর যুগে এই সমস্যারও অবসান হইয়াছে। এখন বাংলার পারিবারিক জীবন একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়া যৌথ পরিবারের সকল সমস্যা এবং জটিলতার আপনা হইতেই অবসান ঘটাইয়াছে। যৌথ পারিবারিক জীবনের মধ্যে যে নাটকীয় সংঘাতের সুযোগ ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাট্যধর্মী উপন্যাস রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প এবং উপন্যাসের মধ্য দিয়াও যৌথ পারিবারিক জীবন হইতে নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলার পারিবারিক জীবনের এই যৌথরূপ বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের একটি প্রধান ক্ষেত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বিভাগোত্তর যুগে এখন বাংলা সামাজিক নাটকের সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং ক্রমাগতই তাহা এমন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে যে যথার্থ সামাজিক নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আর কিছুই রচিত হইবে না। তখন কেবলমাত্র সমাজ-ধর্মনিরপেক্ষ ও তাহার কেবল মাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়াই নাটক রচিত হইবে, ইতিমধ্যেই তাহার সূচনাও দেখা দিয়াছে।

নাগরিক কিংবা শিল্পকেন্দ্রিক জীবনের যে মানুষ, তাহার কোন বৃহত্তর সামাজিক পরিচয় নাই। অর্থাৎ যে অর্থে উনবিংশ শতাব্দী কিংবা বিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা নাটকের সামাজিক চরিত্র আমরা মনে করিতে পারি, সেই অর্থে বিভাগোত্তর যুগের সামাজিক চরিত্র বলিয়া কিছু নাই। পূর্বে বৃহত্তর সামাজিক আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বার্থের সংঘাত লইয়া যে নাটক রচিত হইত, কিংবা তাহার পরবর্তী যুগেও পারিবারিক-স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বার্থের সংঘাত নির্দেশ করিয়াও যে নাটক রচিত হইয়াছে, সাম্প্রতিককালে তাহা রচিত হইবার কোন উপায় নাই; কারণ, বাংলার সমাজ কিংবা পরিবারের মধ্যে সেই জীবনই আর বর্তমান নাই। এখন স্বামী-স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা লইয়া পরিবার, তাহাতে আর কাহারও স্থান নাই। সুতরাং ইহাতে সংঘাত সৃষ্টি করিতে হইলে স্বামী এবং স্ত্রী অর্থাৎ কেবল দাম্পত্য-জীবনের মধ্যেই সংঘাত সৃষ্টি করিবার অবকাশ আছে—আর কোন দিক দিয়া তাহা নাই। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বাংলার সমাজের দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে পূর্ববর্তী সংস্কারের কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে, তাহা নহে; অর্থাৎ এখনও বাঙ্গালীর সাধারণ পারিবারিক জীবনের

সকল প্রকার দাম্পত্য-অসন্তোষের মধ্য দিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইবারই প্রয়োজন হয়—বিচ্ছেদের মধ্যে তাহা কদাচ সমাপ্তি লাভ করিতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে দাম্পত্য-জীবনের সংঘাতও যথার্থ শক্তিশালী হইতে পারে না। কারণ, যাহা পরিণামে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে দ্বন্দ্বের জটিলতা সৃষ্টি যেমন অসম্ভব, যথার্থ নাটকীয় শক্তি আরোপ করাও তেমনই অসম্ভব। সুতরাং সাম্প্রতিক নাট্যকারদিগের সমসাময়িক সমাজ জীবনের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ বাংলার সমাজ-জীবনের উপরই লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক হয়। প্রকৃত পক্ষে হইতেছেও তাহাই। কিন্তু তথাপি দাম্পত্য অসন্তোষকে কেন্দ্র করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদকেই যে রূপ দেওয়া আজিও সঙ্গত কিংবা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা নহে। বিধবা-বিবাহ যে দিন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই দিন বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বাংলা সাহিত্যে নাটক-উপন্যাস যে পরিমাণে রচিত হইয়াছিল, আজ বিবাহ-বিচ্ছেদ বিধিবদ্ধ হইবার দিন এই বিষয় লইয়া সেই পরিমাণ নাটক-উপন্যাস রচিত হইতেছে না। এই বিষয়টি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধকরণের মধ্য দিয়া যে ব্যাপক সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদ বিধিবদ্ধকরণের মধ্য দিয়া তাহা দেখা দেয় নাই। একদিন সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তি যে ভাবে চিন্তা করিত, আজ সে ভাবে চিন্তা করে না। আজ সামগ্রিক ভাবে সমাজ কোন সমস্যার বিষয় নহে, অর্থাৎ আজ সমস্যা সমাজের নহে। আজ সমস্যা কেবলমাত্র ব্যক্তির। সেইজন্য সামগ্রিক ভাবে সমাজের মধ্যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা চিন্তা করিবার পরিবর্তে ব্যক্তি-স্বার্থ তাহা দ্বারা কি ভাবে ব্যাহত হইতে পারে, তাহাই অনুধাবনের বিষয় হইয়াছে। সেইজন্য সাম্প্রতিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও যে নাটকীয় উপকরণের প্রাচুর্য আছে ; এ'কথা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না। আজ একান্ত পারিবারিক জীবনভিত্তিক নাটক যে রচিত হইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ প্রধানতঃ ইহাই। সেইজন্য যখন পৌরাণিক ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটক রচনার দিন শেষ হইয়া গেল, তখন দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক বিষয়বস্তুর ভাণ্ডারও শূন্য হইয়া গিয়াছে, তাহা আশ্রয় করিয়াও নবযুগের নূতন নাটক রচনা করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে সাম্প্রতিক নাট্যকারদিগের সম্মুখে আজ জাতির এমন কি উপকরণ

অবশিষ্ট রহিল, যাহার উপর আশ্রয় করিয়া এ যুগের নূতন নাটক রচিত হইতে পারে?

এই কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক কালে বাংলা নাটকের অন্তর এবং বাহির উভয়ই যথার্থ শূন্য হইয়া গিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া একদিন ইহা ইতিহাস আশ্রয় করিয়াছিল, ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া বাংলার জীবনের বিচিত্র সমাজকে ইহা আশ্রয় করিয়াছিল, আজ সমাজের উপর ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে ইহা কেবল ব্যষ্টির সুখদুঃখকে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণ নিরলবম্বন হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সেইজন্য আজ বাংলা নাটক-উপন্যাসের অন্তর্মুখী সমস্যা বলিয়া কিছু নাই; যাহা আছে, তাহা বহির্মুখী সমস্যা মাত্র। অথচ পারস্পরিক জীবনের স্নেহ বাৎসল্য প্রেম অবলম্বন করিয়া যে বাংলা উপন্যাস কিংবা নাটক রচিত হইতে পারে, তাহাদের যেমন শক্তি, বহির্মুখী বিষয়ক কথা-সাহিত্য কিংবা নাটকের সেই শক্তি নাই।

সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সাম্প্রতিক ছোটগল্প ছোট হইলেও যথার্থ গল্প নহে, কারণ, তাহাতে কাহিনী বিন্দুবিসর্গও নাই। অথচ এ'কথা ত কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, কথা-সাহিত্যেই হউক কিংবা নাটকেই হউক, কাহিনীই ইহাদের প্রাণস্বরূপা! প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, ভাষাও ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া যায়, কিন্তু কাহিনীর শক্তিতেই দেশ-দেশান্তরের নাটক কিংবা কথা-সাহিত্য বিশেষ দেশ এবং কালের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং যাহাতে কাহিনীর লেশমাত্র নাই, তাহার মধ্যে জীবনী-শক্তি বিকাশ লাভ করিতে পারে না, তাহা পঙ্গু হইয়া পড়িয়া অচিরেই গতিশক্তিহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং বাংলার ছোটগল্প একদিন যে মর্যাদারই অধিকারী হউক না কেন, আজ যে তাহার অধঃপতন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইহাই কারণ। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের পক্ষেও এই কথা আজ প্রযোজ্য। দৃঢ়সংবদ্ধ কাহিনীর অভাব ইহার প্রাণস্ফূর্তির অন্তরায় হইয়াছে। পারিবারিক জীবনের সংহতির মধ্যে কাহিনীর যে নিবিড়তা প্রকাশ পাইত, আজ পারিবারিক জীবনের শৈথিল্যের মধ্যে সেই নিবিড়তার সন্ধান লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

এই কারণেই কলকারখানা, শ্রমিক, মালিক, ইহাদের বিচিত্র অর্থনৈতিক সমস্যা—জীবনের এই সকল বহির্মুখী বিষয় লইয়াই আজ নাটক রচিত

হইতেছে। বাংলার সমাজের পারিবারিক জীবনে নিবিড়তার অভাব, সেখানে দৃষ্টিপাত করিলে নাটকের উপাদানের আর সন্ধান পাওয়া যায় না, অথচ নাটকের একটি প্রধান দাবি এই যে, সমসাময়িক পরিবেশকে ইহার স্বীকার করিতেই হইবে; তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ শ্রমিক, মালিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা যে নাটকের মধ্যে আসিয়াছে এবং বাঙ্গালীর গৃহের কথা যে সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছে, তাহার কারণই এই যে, আজ যে নূতন সমাজ এদেশে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার মধ্যে উপরোক্ত সমস্যাগুলি অস্বীকার করা যায় না এবং তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর গৃহের চিত্রটি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আঞ্চলিক জীবন লইয়া কিছু কিছু নাটক-রচনার প্রয়াস আজকাল দেখা যাইতেছে। উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে এই প্রয়াস সার্থকতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাহা যে সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। ইহার কারণ, আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে একদিক দিয়া যেমন নাট্যকারের অভিজ্ঞতার অভাব, আর একদিক দিয়া তেমনই ইহাতে নাগরিক সমাজের কৌতূহলের অভাব। অথচ কথা-সাহিত্যে যাঁহারা বাংলার কোন কোন আঞ্চলিক জীবন আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সুগভীর জীবনোপলব্ধি, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার জন্য তাহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের নাগরিক-জীবনের সংস্কার ক্রমেই এত দৃঢ়মূল হইতেছে যে, নাগরিক জীবনের সমস্যা ব্যতীত আর কোন সমস্যাকেই সাহিত্যে কেহ রূপায়িত করিবার প্রেরণা অনুভব করিতেছেন না। আমরা মুখে মুখে পল্লী-জীবনের প্রতি যে প্রীতি দেখাইয়া থাকি, তাহা কদাচ আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং পল্লী-জীবনও আজ শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক সমাজের নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত নহে, তাহারও কোন রূপ কিংবা সমস্যা আজ বাংলা নাটকের মধ্য দিয়া যথার্থ শক্তি সঞ্চার করিতে পারিতেছে না।

জাতির সুদীর্ঘ সংস্কারের প্রভাব এক মুহূর্তেই কাটিয়া যাইতে পারে না; সেইজন্য আজ ব্যক্তি-চরিত্রের আত্মবোধের সঙ্গে জাতির সংস্কারের যে সংঘর্ষের কথাও নাটকের মধ্য দিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও সর্বক্ষেত্রেই বাস্তবাশ্রয়ী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্যক্তিজীবনের খেয়ালখুশি চরিতার্থতা এক বিষয়, জাতির সংস্কার অন্য বিষয়। কিন্তু জাতির সংস্কারের পরিচয়েই নাটক

সার্থক, ব্যক্তিজীবনের খেয়ালের কথায় তাহা সার্থক হইতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে ব্যক্তির খেয়ালখুশি যে মর্যাদা লাভ করিতেছে, জাতির সুদীর্ঘকালীন আচার ও সংস্কার সেই মর্যাদা লাভ করিতে পারিতেছে না। সেইজন্য আজ যে নাটক রচিত হইতেছে, তাহা ব্যক্তিজীবনাশ্রিত হইলেও বৃহত্তর সমাজ-জীবনাশ্রিত নহে এবং এইজন্যই ইহা সর্বজনীন ঔৎসুক্যেরও কারণ হইতে পারে নাই। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, নাটকের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যত নিবিড়, সাহিত্যের আর কোন বিষয়ের সঙ্গেই তাহা তত নিবিড় নহে। অথচ এই বিষয়টিকেই সাম্প্রতিক নাট্যকারদিগের কেহ কেহ নিদারুণভাবে উপেক্ষা করিতেছেন। উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা একান্ত আত্মনির্ভর হইতে কোন বাধা নাই, কিন্তু নাটক সম্পর্কে এ'কথা বলা যায় না। অথচ উপন্যাস, কাব্য, রসরচনা প্রভৃতির সংস্কার নাট্যরচনার উপরও আরোপ করা হইতেছে বলিয়া সাম্প্রতিক নাটক যে পরিমাণে নাটক, তাহার অধিক পরিমাণে কোথাও উপন্যাস, কোথাও কাব্য, কোথাও প্রবন্ধ বা রস-রচনা রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে সাধারণভাবে সাহিত্যের যে পুষ্টিই হউক না কেন, অন্ততঃ নাটকের যে পুষ্টি হইতে পারিতেছে না, তাহা সত্য।

চার

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলা নাট্যরচনার যে ধারার সূত্রপাত হয়, তাহার সূচনা হইতেই সামাজিক বিষয়বস্তু ইহার উপজীব্য হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রত্যেক জাতির সাহিত্য সাধনার আদি যুগে যে এক শ্রেণীর নাটক রচিত হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ ধর্মভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বাংলার সর্বপ্রথম মৌলিক নাটক তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' মহাভারত হইতে কাহিনী গ্রহণ করিয়া লিখিত নাটক হইলেও ধর্মভাবযুক্ত নাটক নহে এবং ইহার অনতিকাল ব্যবধানেই যে নাটকখানি রচিত হইয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যকে একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক, তাহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক। বাংলার সামাজিক জীবন যখন পর্যন্তও কাব্য, কথা-সাহিত্য কিংবা অন্য কোন সাহিত্যরূপের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই,

তখনই তাহা নাটকের বিষয়রূপে গৃহীত হইয়া সে যুগের একখানি সার্থক সাহিত্য কীর্তি রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, এই সামাজিক নাটক-খানিই বাংলার সর্বপ্রথম অভিনীত মৌলিক নাটক। বাঙ্গালীর আপাত দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যহীন সামাজিক জীবনের মধ্যেও যে নাটকের উপকরণ বর্তমান আছে এবং সেই উপকরণ যে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া উপভোগ্য হইয়া উঠিতে পারে, তাহাই ইহার ভিতর দিয়া সর্বপ্রথম অনুভব করা গেল। ইহার কয়েক বৎসর পরই মধুসূদন যে কয়খানি নাটক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ক রচনার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন, তাহাদের মধ্যেও তাঁহার রচিত সামাজিক প্রহসন দুইখানি যে সকল দিক দিয়া শক্তিশালী, তাহাও সকলে স্বীকার করতে বাধ্য হইবেন। মধুসূদন রোমান্টিক বিষয়বস্তু লইয়া তিন খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং সামাজিক বিষয়বস্তু লইয়া দুই খানি মাত্র প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার সামাজিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত প্রহসন দুইখানিই পরবর্তী বহু বাংলা নাটক ও প্রহসনের প্রেরণা দান করিয়াছে, তাঁহার রোমান্টিক বিষয়ক নাটক তিন খানি সেই তুলনায় পরবর্তী বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই। মধুসূদনের সামাজিক প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই যে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রহসন 'সধবার একাদশী' রচিত হইয়াছে, এ'কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দীনবন্ধুও সামাজিক বিষয়বস্তু লইয়া যে কয়খানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাই নাট্যকার রূপে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে, রোমান্টিক-ধর্মী নাটকগুলি তাঁহার প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হইতে পারে নাই।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্যযুগে অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র অমৃতলালের যুগে যদিও গিরিশচন্দ্র স্বয়ং পৌরাণিক নাটক রচনার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া-ছিলেন, তথাপি এ'কথা সত্য যে তাঁহার বহুসংখ্যক পৌরাণিক নাটকের তুলনায় তাঁহার একখানি মাত্র সামাজিক নাটকই বাঙ্গালী সাধারণ দর্শকের সর্বাধিক মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা তাঁহার 'প্রফুল্ল'। 'প্রফুল্ল'র যশ গিরিশচন্দ্রের কোন পৌরাণিক নাটকই স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ পৌরাণিক নাটক রচনার স্বর্ণযুগে আবির্ভূত হইয়াও অমৃতলাল বসু সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া যে পরিমাণ প্রহসন ও নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই

পরিমাণ পৌরাণিক নাটক কিছুই রচনা করেন নাই। সুতরাং যে যুগে পৌরাণিক নাটক রচনারই যুগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই যুগেও দেখিতে পাওয়া যায়, সামাজিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত নাটকও নিজের মর্যাদা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহা বাংলার সামাজিক নাটকের একটি বিশেষ শক্তিরই পরিচায়ক।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগে অর্থাৎ যে যুগে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র-লালের আবির্ভাব হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই যুগেই উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক রচিত হইতে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল যে পরিমাণ রোমান্টিক এবং রোমান্টিক ধর্মী ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই পরিমাণ সামাজিক নাটক বিশেষ কিছুই রচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটক রচনার এই দৈন্য সাধারণ পাঠকের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, এ'কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের রস এবং রহস্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, এই বিষয়ে তাঁহার ছোটগল্প এবং উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া তিনি যে প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অথচ তাঁহার বাংলার সামাজিক জীবন সম্পর্কিত বহুমুখী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন নাই, তিনি যে কয়খানি সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা বৈচিত্র্যহীন এবং বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের সুনির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। তাঁহার সামাজিক নাটক মাত্রই প্রধানতঃ প্রহসন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অথচ বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন কেবলমাত্র যে প্রহসনের বিষয়ই নহে, তাহা তিনি নিজেই তাঁহার ছোটগল্প এবং উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং এই বিষয়টিই যে তিনি তাঁহার প্রায় চল্লিশ খানি নাটকের মধ্যে প্রায় একখানি নাটকের ভিতর দিয়াও প্রকাশ করিতে পারিলেন না, তাহার কারণ কি?

দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং নাটক প্রায় সমগোত্রীয়। তিনি নিজেও তাঁহার নাটক সম্পর্কে গভীর ভাবে এই কথাটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি যে সচেতন ভাবে নাটক রচনার মধ্য দিয়া কাব্যের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে, বরং সজ্ঞানেই যেন তাহার নাটক রচনার মধ্যে কাব্যের প্রভাবকে স্বীকার করিয়া

লইয়াছিলেন। নাটকের পক্ষে ইহা ত্রুটি হইলেও তাঁহার পক্ষে যে তাহা অপরিহার্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াই এই বিষয়ে যেন তিনি তাঁহার নাটকের নাট্যধর্ম রক্ষা করিবার জন্য কোন যত্ন প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার নাটক সম্পর্কে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে তাহাতে 'লিরকের বাড়াবাড়ি' আছে কিংবা তাহার কোন কোন অংশ 'কাব্যের জলাভূমি' হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি নাটক রচনায় তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নাটকের ধর্ম রক্ষার জন্য কোন উৎসাহ প্রকাশ করিতে যান নাই। সেইজন্যই তাঁহার নাটক রোমান্টিক নাটকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাস্তব জীবনের সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার ছোটগল্প কিংবা উপন্যাস সম্পর্কে এ' কথা বলা যায় না। নাটক রচনায় তিনি যেমন তাঁহার কাব্যভাষা প্রায় সর্বত্রই ব্যবহার করিয়াছেন, ছোটগল্প এবং উপন্যাস রচনায় তাহার পরিবর্তে তিনি নিজস্ব গদ্যভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের নাটক যতখানি কাব্যধর্মী হইয়াছে, ছোটগল্প এবং উপন্যাস তত কাব্যধর্মী হইয়া উঠিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের সকল শ্রেণীর গদ্য রচনার মধ্যে যেমন একটি স্বাভাবিক রস আছে, তাঁহার ছোটগল্প এবং উপন্যাসের মধ্যে তাহার অতিরিক্ত কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি রচনাকালে তিনি তাঁহার কাব্যরচনার সংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। আঙ্গিকই হউক কিংবা ভাব-প্রেরণাই হউক, উভয় বিষয়েই তিনি তাঁহার নাটক রচনার ক্ষেত্রে কাব্য রচনার ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সামাজিক নাটক রচনায় কাব্যের সংস্কার বিসর্জন না দিলে কেহই সার্থকতা লাভ করিতে পারেন না।

দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকখানি সামাজিক প্রহসন ও নাটক রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রোমান্টিক বা রোমান্টিক ধর্মী ঐতিহাসিক নাটকগুলি অধিকতর শক্তিশালী রচনা; সেইজন্য ইহারাই অধিকতর জনপ্রিয়। সামাজিক প্রহসন রচনার ভিতর দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হইলেও তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের অনতিকাল ব্যবধানেই বাংলাদেশে যে দেশাত্মবোধক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি তাহার দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন, ক্রমে বাংলার সামাজিক জীবনের রূপ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেইজন্য তিনি সেইপথে অধিক অগ্রসর হইবার আর সুযোগ লাভ করিলেন না। তথাপি ইহার মধ্যেও তিনি দুইখানি পূর্ণাঙ্গ

সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেম. মসসাময়িক কালে ইহাদের মধ্য দিয়াও এক বিশেষ আবেদন প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এ' কথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, তাঁহার সামাজিক নাটকগুলি রচনাতে তিনি তাঁহার রোমান্টিক ধর্মী ঐতিহাসিক নাটক রচনার সংস্কার বিসর্জন দিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগে সমাজের পরিবর্তে রাজনৈতিক চেতনাই প্রধানতঃ এ' দেশের লক্ষ্য হইয়াছিল। তথাপি এ'কথা সত্য যে,তিনি যখন নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন,তখন তিনি সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াই নাটক রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইল এবং তাঁহার দৃষ্টিও স্বভাবতঃই সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া গেল। তারপর কিছুদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনই মুখ্য অবলম্বন হইয়া রহিল। স্বদেশী আন্দোলনের কিছুকাল পরই ক্রমে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ইত্যাদির ভিতর দিয়া এ'দেশের নাট্য-সাহিত্য যে প্রচুর উপকরণ লাভ করিয়াছিল, তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছে, গভীরভাবে সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ তাহার হয় নাই।

এই সকল বহির্মুখী আন্দোলনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যখন দেশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিভীষিকার সম্মুখীন হইল, তখনই এ'দেশের নাট্যকারগণ পুনরায় ইহার সমাজ ও তাহার অর্থনৈতিক জীবনের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সুযোগ লাভ করিল। ইহারই প্রেরণা হইতে বাংলা নাট্য সাহিত্য এক নূতন রূপ লাভ করিল এবং তাহার ফলেই বাংলায় নব-নাট্য আন্দোলনের সূচনা দেখা দিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মধ্য দিয়া মনুষ্য জীবনের এক নূতন মূল্যায়ন দেখা দিল। বাংলার অনুভূতিশীল নাট্যকারদিগের হৃদয় তাহা স্পর্শ না করিয়া পারিল না। বাংলাব যে সমাজ একদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগে গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই আবার নূতন রূপে বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল।

এইভাবে দেখা গেল, বাংলা নাট্য সাহিত্যকে যে চারিটি যুগে বিভক্ত করা যায়, যেমন আদি যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ, সাম্প্রতিক যুগ—বাংলার

সামাজিক নাটক ইহাদের প্রত্যেকটি যুগের ভিতর দিয়া নব নব বৈশিষ্ট্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। এক একটি অভিন্ন এবং অবিচল আদর্শ সম্মুখে ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের অগ্রগতির ভিতর দিয়া তাহাদের পরিবর্তনের ধারাটি তত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে না পারিলেও, বিভিন্ন যুগে সামাজিক জীবনের বহুমুখী বিবর্তনের সম্মুখীন হইয়া সামাজিক নাটকগুলির অন্তর ও বহিরঙ্গে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা অতি সহজেই পাঠকের লক্ষ্যগোচর হইতে পারিয়াছে।

পাঁচ

এ পর্যন্ত যে সকল সামাজিক নাটক বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহাকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—বৃহত্তর সামাজিক সমস্যামূলক নাটক এবং ক্ষুদ্রতর পারিবারিক সমস্যামূলক নাটক। যদিও পরিবার সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, তথাপি সমাজ এবং পরিবার উভয়ের সমস্যা এক নহে। যেমন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক সামাজিক সমস্যামূলক নাটক, কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটক পারিবারিক সমস্যামূলক নাটক। তবে এ' কথা সত্য, 'প্রফুল্ল'র মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যারও কিছু সংমিশ্রণ হইয়াছে, তথাপি পারিবারিক সমস্যা ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা লইয়া বাংলা সাহিত্যে যে গল্প উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহাদের তুলনায় এই বিষয়ক নাটকের সংখ্যা অনেক অধিক। এমন কি, এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে, বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা যেমন, বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, বর্ণ-বিদ্বেষ, অস্পৃশ্যতা, মাদকদ্রব্য-বর্জন ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া কোন উল্লেখযোগ্য বাংলা উপন্যাস রচিত হয় নাই, অথচ এই বিষয়গুলি বহুসংখ্যক বাংলা নাটকের উপজীব্য হইয়াছে। মার্কিন দেশীয় সাহিত্যে ক্রীতদাস প্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত সুপরিচিত গ্রন্থ *Uncle Tom's Cabin* উপন্যাস; কিন্তু বাংলায় নীলকরের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ 'নীল দর্পণ' নাটক। সুতরাং দেখা যায়, সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমাজ-চিন্তার ক্রম-বিকাশের যে একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়, বাংলা সাহিত্যে নাটকের মধ্য দিয়া তাহা যত সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে, সেই তুলনায় কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া

তাহা তত সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ পায় নাই। নাটকের মধ্য দিয়া এই সমস্যার বাস্তব রূপটি সর্বদাই প্রত্যক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের মধ্য দিয়া তাহা সর্বদাই আদর্শায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তবে এ' কথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নাটক অপেক্ষা উপন্যাসের শিল্পরূপ অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাংলা নাটকের মধ্য দিয়া এ'দেশের বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাগুলি যত বাস্তব রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তত শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে সমস্যাগুলির বাস্তব পরিচয় যতই অস্পষ্ট হউক, ইহাদের রূপায়ণে সাহিত্যশিল্পের দাবি অনেকখানি পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। এ'কথা সকলেই জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কাহিনীর মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের তদানীন্তন বাংলার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বা বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সমস্যাটির প্রত্যক্ষ কিংবা বাস্তব রূপায়ণের পরিবর্তে ইহার সম্পর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট বক্তব্য কি, তাহাই ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে বঙ্কিমের মানস-প্রকৃতি যতখানি প্রত্যক্ষ হইয়াছে, প্রকৃত সমস্যাটি ততখানি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রের যে কোন সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যায়, দীনবন্ধুর নিজস্ব মানস-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত সমস্যাটি বাস্তব পরিচয় লাভ করিয়াছে। সামাজিক নাটক এবং সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে সাধারণতঃ এই পার্থক্য ইহার সূচনা হইতেই দেখা দিয়াছিল এবং তাহারই ধারা আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আজও বাংলার উপন্যাস এবং নাটকের মধ্য দিয়া এই পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ বৃহত্তর সামাজিক সমস্যামূলক নাটকই রচিত হইয়াছে, পারিবারিক সমস্যামূলক নাটক অধিক রচিত হয় নাই। এমন কি, গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিও আপাতদৃষ্টিতে পরিবারকেন্দ্রিক বলিয়া মনে হইলেও, ইহাদের মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যারও সন্ধান পাওয়া যায়। এমন কি, তাঁহার সুপরিচিত 'প্রফুল্ল' নাটকটিও অবিমিশ্র পারিবারিক জীবনাশ্রিত বলিয়া উল্লেখ করিবার উপায় নাই; কারণ, তাহাতে মদ্যপান নিবারণের সদিচ্ছা যে একেবারে নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না। এমন কি, এই নাটকখানিও সুপরিচিত পারিবারিক উপন্যাস তারকনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র প্রভাবমুক্ত রচনা নহে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকে প্রধানতঃ বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাগুলিই নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সেই সকল সমস্যা দূর হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে যে সামাজিক নাটক রচিত হইতে লাগিল, তাহাতে ক্রমেই পারিবারিক সমস্যা প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল। তখন উনবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাগুলি না থাকিলেও ক্রমে পারিবারিক জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা নাট্যকারদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সমস্যার পটভূমিকাতেই পরিবার-জীবনাশ্রিত সামাজিক নাটক রচিত হইতে লাগিল। পারিবারিক জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইতে আরম্ভ করিল। বাংলা নাটকের মধ্য দিয়াও তাহার রূপ কঠিন বাস্তবতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। অর্থনৈতিক সমস্যা কেবলমাত্র পারিবারিক সমস্যা নহে, বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও ইহার যোগ অবিচ্ছেদ্য। সেই সূত্রে কেবল মাত্র পারিবারিক জীবনের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়াও এই যুগের সামাজিক নাটকগুলির ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া বাংলার সামাজিক নাটক কি ভাবে যে সমাজ জীবনের ক্রমপরিবর্তনের ধারাটি গভীর ভাবে অনুসরণ করিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, এই দেশের বিবাহ প্রথা এবং বিবাহিত জীবন লইয়া রচিত নাটক-গুলি কালানুক্রমিক অনুসরণ করিয়া গেলে যত সহজে বুঝিতে পারা যাইতে পারে, তত সহজে আর কোন বিষয় হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। বাংলার প্রথম নাটক 'ভদ্রার্জুন' অর্জুন এবং সুভদ্রার বিবাহ বৃত্তান্ত লইয়া রচিত, ইহার মধ্যে মহাভারতের কাহিনী থাকিলেও যে বিবাহ প্রথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর; তারপর বাংলার পারিবারিক জীবনাশ্রিত প্রথম বাস্তবধর্মী 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক বহুবিবাহ প্রথার নিন্দাসূচক রচনা। এই ভাবে বহুবিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, অযোগ্য বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, পণপথা, বিবাহিতের ব্যভিচার, দাম্পত্য অসন্তোষ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, সম্মতি (Consent), একাধিক বিবাহের বিলোপ এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া যে সকল বাংলা নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া গেলেই বাংলা নাটক যে প্রথমাবধিই

কতখানি সমাজ-সচেতন ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বিধবা-বিবাহ আইন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহবিচ্ছেদ আইন পর্যন্ত বাংলাদেশে বিবাহ সংক্রান্ত আইনের যত পরিবর্তন হইয়াছে, আর কোন সামাজিক বিষয়ের পরিবর্তন করিয়া তত আইন রচিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিবার পর হইতে বাংলার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন যে ভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার ধারাটি সমসাময়িক বাংলা নাটকের মধ্য দিয়া যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে,বাংলার অন্য কোন ইতিহাস লেখকের রচনায় তাহা সে ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সুতরাং এই সামাজিক নাটকগুলিই বাংলার সমাজ-জীবনের দর্পণ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কোন পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস নাই, কিন্তু ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের যে রূপ বিধৃত হইয়াছে. তাহা ইতিহাস অপেক্ষাও জীবন্ত।

কিন্তু এই শ্রেণীর নাটকগুলি আজ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। একদিন সমাজের একান্ত প্রয়োজনে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ তাহাদের সেই প্রয়োজন বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের প্রয়োজনীয়তাও দূর হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু বাংলা সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা ইহাদিগকে বাদ দিলে আর কোন উপজীব্যের সন্ধান পাইবেন না। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত বিবাহ-বিষয়ক সংস্কারের ধারাটি অনুসরণ করিয়া বাংলার সমাজ-জীবনের এক শত বৎসরের বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করা বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য।

আরও একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। ইহার মধ্যে যে সকল গ্রন্থকে নাটক বলিয়া উল্লেখ করা হইল, তাহাদের অধিকাংশই নাটক নহে—লঘু প্রহসন মাত্র। আবার কেবল রসের দিক দিয়াই যে প্রহসন, তাহা নহে—আকারের দিক দিয়াও অনেক রচনাই সাধারণ প্রহসনের আকৃতি হইতেও ক্ষুদ্র। সুতরাং ইহাদিগকে নিতান্ত শিথিলভাবেই নাটক বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

প্রথম অধ্যায়

বহুবিবাহ

উনবিংশ শতাব্দীতে এ'দেশে একমাত্র ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে দেশের সামাজিক কুপ্রথাগুলি দূর করিবার জন্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই আকস্মিক ভাবে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা নহে—সে'যুগে যদি এ'দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত না-ও হইত, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের ফলে যে সকল কুপ্রথা দূর হইয়াছিল, তাহাও অনতিকালের মধ্যেই আপনা হইতেই লুপ্ত হইয়া যাইত। কারণ, ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রের বাহিরেও এ'দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যেও ইহাদের বিরুদ্ধে সেদিন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। যদি তাহা না হইত, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব যত শক্তিশালীই হউক, তাহা এ'দেশবাসীর এত ব্যাপক সমর্থন লাভ করিতে পারিত না। সমাজ যে সকল প্রথার ত্রুটি অন্তরে অন্তরে পূর্ব হইতেই অনুভব করিয়া তাহাদিগকে বিসর্জন দিবার জন্য আপনা হইতেই সে যুগে উদ্যত হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের ফলে তাহাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বিধবা-বিবাহ; ইহা প্রবর্তন করিবার দাবি সমগ্রভাবে সমাজের মধ্য হইতে আসে নাই, ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রধানতঃ একজন মাত্র সমাজ-সংস্কারকের মনেই উদিত হইয়াছিল; সেইজন্য ইহা বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সমগ্রভাবে সমাজ আজ পর্যন্ত ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু কুলীনের বহুবিবাহের দোষ-ত্রুটির বিষয়-সম্পর্কে সমাজ ইতিমধ্যেই সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল; বল্লালের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ইহা সমাজের একটি অংশকে কি প্রকার বিষক্ষতে পরিণত করিয়া দিয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে কাহারও বাকি ছিল না। সেইজন্য কোন প্রকার আইনের সহায়তা ব্যতীতও সে'দিন ইহা সমাজ-দেহ হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের রচয়িতা এবং পৃষ্ঠপোষক কেহই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা ইংরেজি জীবনাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন না। তথাপি এই নাটকের বর্ণনা ও ভাষায় নাট্য-

কারের যে ক্রোধ ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবেরই ফল মাত্র, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া আমরা একদিক দিয়া যেমন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবের ফলটুকু লাভ করিয়াছিলাম, আবার আর এক দিক দিয়া তেমনই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী কুসংস্কারের প্রতি অন্ধতার বিষক্রিয়ার ফল ভোগ করিতেছিলাম। এই দুইয়ের সমন্বয় হইয়াছিল বলিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সকল সমাজসংস্কারমূলক কর্মসাধনার মধ্যে এত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহা কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত সমাজাশ্রয়ী হইলে ইহার এত শক্তি থাকিতে পারিত না।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে কুলীনের বহুবিবাহ প্রথার উপর এই দুই দিক হইতেই আঘাত আসিয়াছিল, দুইটি আঘাতেরই শক্তি সমান ছিল। একদিকের আঘাতের তাড়নায় রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের রূপ দিয়াছিলেন, আর একদিকের আঘাতের ফলে সেদিন ইহার অভিনয় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজে আন্তরিক অভিনন্দিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহা পরবর্তী বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে ইহার সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ইহা সত্ত্বেও 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনার মুখ্য একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। সে কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি, এখানে আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। তাহা এই—রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সম্বাদ ভাস্কর', 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' প্রভৃতি পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, ইহা হইতেই ইহার উদ্দেশ্যের কথা বুঝিতে পারা যাইবে—'এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।'

মুখ্যত এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনা করেন এবং যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত পুরস্কার লাভ করেন। এই নাটকের মধ্য দিয়া তিনি অনাচারী কুলীন সমাজের হৃদয়হীনতার যে চিত্র পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্তরের একান্ত অনুভূতি-জাত,

কেবলমাত্র গতানুগতিক নহে। এই বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতাও প্রত্যক্ষ ছিল। সেইজন্যই ইহার রচনায় যথার্থ শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। ইহার কাহিনীটি এই—

কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর বংশধর, সেইজন্য সমাজে তাঁহার বিশেষ একটি সম্মানিত স্থান আছে। তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা বেশ সচ্ছল, কোন বিষয়ের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। তাঁহার চারিটি কন্যা, যথাযোগ্য বংশের পাত্রের অভাবে একটিরও এ পর্যন্ত তিনি বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহাদের বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৪ ও ৮। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি সমাজের নিন্দাভাজন হইয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না; দুশ্চিন্তায় তাঁহার দিনের আহার ও রাত্রির নিদ্রা দূর হইয়াছে। অনৃতাচার্য ও শুভাচার্য নামক দুই ঘটককে তিনি পাত্রের সন্ধান করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়া তাহাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। অনৃতাচার্য ধূর্ত,শঠ ও প্রবঞ্চক, ধর্মবোধ বিরহিত, অর্থাৎ সাধারণ ঘটক যেমন হইয়া থাকে, তাহাই। সে কপটতা করিয়া 'সাবর্ণ গৃহে কত শত কৈবর্ত কন্যা,' 'শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা' ইত্যাদির বিবাহ ঘটাইয়াছে। 'আর কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর এ সমস্ত ত' তাহার 'শরীরের আভরণ'। কিন্তু শুভাচার্য এই প্রকৃতির ব্যক্তি নহে—তাহার কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি ও দায়িত্ব জ্ঞান ছিল; কিন্তু সে কোন বিবাহ স্থির করিতে পারিল না। অনৃতাচার্য কুলপালকের চারিটি কন্যার জন্য একটি পাত্র স্থির করিয়া ফিরিয়া আসিল। পাত্রের বয়স ষাট বৎসর। কুলপালক অগত্যা তাহার নির্দেশে তাঁহার চারি কন্যাকেই ইহার হস্তে সমর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করিবার প্রয়াসী হইলেন। বিলম্ব হইলে বরের 'গুণ' প্রকাশ পাইয়া যাইবে, সেইজন্য অনৃতাচার্য সেইদিনই বিবাহের দিন ধার্য করিলেন—কুলপালককেও উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন। সেদিন বিবাহের কোন তারিখও ছিল না, তথাপি অনৃতাচার্য নিরস্ত হইবার পাত্র নহে—সেইদিনই বিবাহের দিন ধার্য হইল।

কুলপালকের স্ত্রী বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। এতদিন পর বহু সন্ধানের ফলে তাঁহার কন্যাদিগের পাত্র জুটিয়াছে জানিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। জামাতার সঙ্গে তিনি কি ব্যবহার

করিবেন, কি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, এই সকল কথাও ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কন্যাদিগকে তখনও তিনি এই আনন্দ-সংবাদ জানাইতে পারেন নাই, প্রথম সে কাজই করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। তিনি গৃহের বাহির হইয়া চারি কন্যার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী ব্যতীত সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জননী তাহাদিগকে বলিলেন, 'ওগো তোদের "বে" হ'বে গো, "বে" হ'বে।'

শুনিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহ্নবী বলিল, 'আর কেন? এইবার যমের সঙ্গে মিলন হইলেই মানায়। বুড়ো বয়সে এই ধেড়ে রোগ কেন?' তাহার কনিষ্ঠা শাম্ভবী বলিল, 'আমরা কুলীনের মেয়ে, আমাদের আবার বিবাহ কোথায়?' পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যা কামিনী উৎসুক হইয়া উঠিল, বলিল, 'শুনিয়া এ' শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল।' 'বর যেমনই হউক, বিবাহ হইলেই হইল।' সর্বকনিষ্ঠা কিশোরী তখন পাড়ায় সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতে গিয়াছিল। অনেক ডাকাডাকির পর সে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে যখন জননী বলিলেন, তাহার বিবাহ হইবে, সে আকাশ হইতে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, 'বে আবার কি? ওটা কি খাবার জিনিষ?' জননী সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন। কিশোরী কিছু বুঝিল, কিছু বুঝিল না। এইবার ব্রাহ্মণী প্রতিবেশীদিগকে সংবাদ দিবার জন্য বাহির হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা আসিয়া কুলপালকের গৃহে সমবেত হইল। বিবাহের কথা শুনিয়া তাহারা নিজেদের বিবাহিত জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিল, তারপর সকলে 'জল সইতে' বাহির হইয়া গেল। যথা সময়ে শুভকার্য নির্বাহ করাইবার জন্য কুলপালকের কুলপুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সহকারী রূপে তাঁহার একটি ছাত্রকেও লইয়া আসিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও আসিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন।

এতক্ষণ জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহ্নবী ও তৎকনিষ্ঠা শাম্ভবী কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, তাহাদের যথার্থই বিবাহ হইবে। কারণ, জননী এই প্রকার বহু মিথ্যাপ্রবোধ তাহাদিগকে ইতিপূর্বেও দিয়াছেন। কিন্তু এখন উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া সত্যসত্যই মনে করিল, বিবাহ হইলেও হইতে পারে। জাহ্নবী তাহার বিগত যৌবনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। শাম্ভবী ভাবিল, 'হউক না, দেখা যাউক।' কামিনী ও কিশোরী বর আসিয়াছে শুনিয়া ছুটিয়া দেখিতে গেল। তাহারা মুখ কালো করিয়া ফিরিয়া আসিল, বড়দি ও

মেজদির নিকট বরের রূপ বর্ণনা করিল,—'প্রবীণ বয়স শীর্ণজীর্ণ কলেবর।' কামিনী বলিল, 'একমাত্র বড়দির সঙ্গে মানাইলেও মানাইতে পারে।' শাম্ভবী বলিল, 'পিতার নিকট গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিব।' কিন্তু সকলে বুঝিল, প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল হইবে না। বিবাহ-সভায় সকলেই দেখিতে পাইল, বর যে কেবলমাত্র বয়সে প্রবীণ তাহাই নহে, অত্যন্ত কদাকার, অকাট মূর্খ, কানা ও বধির। কুলপালক তাহার হস্তেই চারিটি কন্যাকে সমর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করিলেন। অনৃতাচার্য তাহার পারিশ্রমিক গুণিয়া লইল।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের প্রধান ত্রুটি এই, ইহার কাহিনীর মধ্যে বিচিত্র নাটকীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই—নাটকীয় কোন ঘটনা বা dramatic action-এর ভিতর দিয়া বক্তব্য বিষয়ই হউক, কিংবা জীবন-দর্শনই হউক, তাহা প্রকাশ পায় নাই, বরং তাহার পরিবর্তে কেবল মাত্র বক্তৃতার ভিতর দিয়াই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। উপরে নাটকের যে মূল কাহিনী বর্ণনা করা হইল, তাহার অতিরিক্ত ইহার মধ্যে কয়েকটি শাখা-কাহিনীও (episode) আছে। ইহাদের অন্ততঃ একটির মধ্যে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় গুণ ছিল, তাহা ফুলকুমারীর বৃত্তান্ত। ফুলকুমারী বিবাহিতা কুলীন-কন্যা, বিবাহের পর হইতে সে যথারীতি পিত্রালয়েই বাস করিতেছে, বহুপত্নীক স্বামী কদাচ তাহার সংবাদ লইবার সুযোগ পান না। একদিন অর্থের প্রয়োজনে জামাতা শ্বশুর গৃহে আসিয়া উদয় হইলেন। সেই একদিনের ঘটনা একটি নাটকীয় দৃশ্যের ভিতর দিয়া যদি ঘটনার আকারে পরিবেষণ করা যাইত, তবে ইহা এই নাটকের একটি বিশিষ্ট গুণ হইতে পারিত। কারণ, ইহার মধ্য দিয়া দুইটি স্বার্থের একটি নাটকীয় দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পিশাচ-প্রকৃতির কুলীন স্বামীর অর্থলোলুপতার সঙ্গে এখানে ফুলকুমারীর নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলির সংঘাত-বৃত্তান্তটিকে উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণান্বিত করিয়াছে। কিন্তু নাট্যকার সমগ্র বিষয়টি কেবল মাত্র ফুলকুমারীর ভাষণের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; যাহা ঘটনার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা কেবল মাত্র পরোক্ষ মৌখিক বর্ণনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার ফলে ইহার একটি উচ্চাঙ্গের নাটকীয় সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়াছে। অথচ বর্ণনাটির মধ্য দিয়া নাট্যকার বঞ্চিতা নারীর মর্মবেদনাটিকে যে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সচরাচর বাংলা নাট্যকারদিগের মধ্যে আজিও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘটনা-বর্ণনা নাটক নহে, ঘটনা

সংঘটনই যে নাটক রামনারায়ণ পাশ্চাত্ত্য নাটকের এই আদর্শটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, সেইজন্য তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী বর্ণনার উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছেন।

'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের মধ্যে কাহিনী দৃঢ়-সংবদ্ধতা লাভ করিতে পারে নাই, ইহা প্রধানতঃ কতকগুলি পরস্পর শিথিলবদ্ধ চিত্র ও চরিত্রের সমবায়ে রচিত হইয়াছে। ইহার সকল চরিত্রই যে নাটকের পক্ষে অপরিহার্য এমন নহে, কুলীন সমাজের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য মূল কাহিনী-নিরপেক্ষ কতকগুলি চিত্র ও চরিত্র আনিয়া ইহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা হইলেও তাঁহার রচনার নাট্যগুণ অনেকাংশে ক্ষুন্ন হইয়াছে। এই নাটকে মূল নায়ক কিংবা নায়িকা চরিত্র নাই বলিলেই চলে। অপরিসর কাহিনীর মধ্যে কোনও চরিত্রই নায়কোচিত প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং নায়ক কিংবা নায়িকাকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী অগ্রসর হইতে পারিলে ইহার প্রতি যে ঔৎসুক্য ও ইহার পরিণতি সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তাহা ইহার মধ্যে হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। ইহার পুরুষ-চরিত্রগুলি নির্বিশেষ চরিত্র মাত্র, রক্তমাংসের বিশিষ্ট পরিচয়ে এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই, চরিত্রের নামগুলি ইহার প্রমাণ—যেমন কুলপালক, কুলধন, শুভাচার্য, অনৃতাচার্য, ধর্মশীল, অধর্মরুচি, বিবাহ-বণিক, উদর-পরায়ণ, বিরহি-পঞ্চানন, বিবাহ-বাতুল, অভব্যচন্দ্র ইত্যাদি। নাটকীয় চরিত্রের বিশিষ্টতা লাভ করিবার যে একটি বিশেষ দাবি আছে, তাহা এই চরিত্রগুলির ভিতর দিয়া পূর্ণ হইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রগুলি সম্পর্কে এ কথা বলিবার উপায় নাই, যে কয়টি স্ত্রী-চরিত্র ইহাতে আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই নাট্যকার বিশিষ্টতা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের মধ্যে সংস্কৃত নাটক রচনার রীতি ও আঙ্গিক যেমন ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনই এ দেশের মঙ্গলকাব্য রচনার ধারাও কিছু কিছু স্থান দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বিবাহ-বর্ণনা একটি বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যদিও মঙ্গলকাব্যের সমাজ ইতিপূর্বেই এ দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি রামনারায়ণ তাঁহার নাটকের বিবাহ-সম্পর্কিত বর্ণনায় তাহার প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার ফলে বিভিন্ন যুগের বিচিত্র রসোপকরণের সংমিশ্রণে

তাঁহার নাটকের একটি রসগত অখণ্ডতা সৃষ্টি হইতে পারে নাই। এই নাটকের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ও বক্তৃতার আকারে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে কুলীনের বহুবিবাহের দোষ বর্ণনা করিতে গিয়া নাট্যকার কন্যা-বিক্রেতার নিন্দাসূচক সুদীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করিয়াছেন, বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বাল্যবিবাহ রীতিকেও অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, সেইজন্য ইহা একলক্ষ্যমুখীন রচনা নহে, ইহাও নাটকখানির একটি প্রধান ত্রুটি।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক উদ্দেশ্যমূলক রচনা। 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে', তাহা বর্ণনা করাই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল। নাট্যকারও বলিয়াছেন, 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গ দেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।' 'রহস্যজনক' কথাটি এখানে নাট্যকার হাস্যকর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, এই নাটকের হাস্যরসধারার অন্তরালবর্তী একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সুতরাং যে বিষয়টি তাঁহার লক্ষ্য, তাহা যে লঘু কৌতুকাশ্রিত নহে, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এই বিষয়ে নাট্যকারের চেতনা ছিল। সেইজন্য তাঁহার আপাত-হাস্যরসাশ্রিত রচনা কেবল মাত্র কৌতুক-সর্বস্ব নহে—প্রকৃত হাস্যরস ইহাতে থাকিলেও ইহাতে ব্যঙ্গেরও অভাব নাই। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে যদি ত্রুটি দেখা যায়, তাহা হইলেই তাহা ব্যঙ্গের অবলম্বন হয়, এখানেও তাহা হইয়াছে। বিবাহ জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সুতরাং সমাজ-ব্যবস্থার জন্য ইহাতে যদি ত্রুটি প্রকাশ পায় এবং তাহার জন্য যদি ব্যক্তি ও পারিবারিক-জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠে, তবে তাহা যথার্থই ব্যঙ্গের বিষয় হইতে পারে। ব্যঙ্গের কষাঘাত দ্বারা সমাজকে সচেতন করিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে ব্যর্থ হয় নাই।

উদ্দেশ্যমূলক রচনার চিত্র মাত্রই যে একটু অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'রও কোন কোন চিত্র যে অতিরঞ্জিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; ইহাতে পুরোহিতের মূর্খতা, ঘটকের ভণ্ডামি, কুলীন বরের অযোগ্যতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লোভপর-বশতা ইত্যাদির চিত্রগুলিই অতিরঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু বঞ্চিতা কুলীন নারীর

যে সকল দুঃখ-দুর্দশার চিত্র আছে, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। এই উদ্দেশ্যমূলক রচনাটির যাহা কিছু সাহিত্য-মূল্য, তাহা ইহার অপরিসর স্ত্রী-চরিত্রগুলির পরিকল্পনা ও সৃষ্টির সার্থকতার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যত্র উদ্দেশ্যের ভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া আছে।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও বিচার করিতে গেলে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের নাট্যকার এক ঢিলে অনেক পাখী মারিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে কেবল মাত্র কুলীনের বহুবিবাহেরই নিন্দা আছে, তাহা নহে—বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের বিবাহ-প্রথার নিন্দাবাদ আছে, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে কন্যা-বিক্রয় প্রথা (Marriage by purchase) প্রচলিত আছে, তাহার বিরুদ্ধেও শাস্ত্রীয় নজীরের অবতারণা আছে। সুতরাং কুলীনের বহুবিবাহ-প্রথাকে অবলম্বন করিয়া নাট্যকার এখানে তদানীন্তন সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন বিবাহ-প্রথারই নিন্দাবাদ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের উদর-পরায়ণতা, পুরোহিত ঘটক প্রভৃতির ঠকামি ইত্যাদি বর্ণনার ভিতর দিয়াও তদনীন্তন সমাজ-রূপটি প্রত্যক্ষ করাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং এই নাটকের উদ্দেশ্যও যদি এক ও অভিন্ন হইত, তাহা হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি যত সক্রিয় হইতে পারিত, ইহার মধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য লক্ষ্য হইবার ফলে মূল উদ্দেশ্যটি ততখানি শক্তিশালী হইতে পারে নাই। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নিতান্ত অল্পপরিসর রচনা। সুতরাং ইহার মধ্যে এতগুলি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করিতে গেলে তাহাদের কোনটিই যে যথার্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না, এ'কথা সত্য। রামনারায়ণের নাট্যরচনার যে প্রতিভা ছিল, তাহা মূলতঃ এই বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য সাধনার প্রয়াসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই সকল বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া ইহা যদি এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্যমুখী হইতে পারিত, তাহা হইলে ইহার মধ্যে যে শক্তি প্রকাশ পাইত, প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে সে শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহার মধ্যে বাস্তব চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস কোন কোন স্থানে সাফল্য লাভ করিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাস্তব চরিত্র রূপায়ণের প্রথম প্রয়াস ইহার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চরিত্রগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—পুরুষ-চরিত্র ও স্ত্রী-চরিত্র। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে কেবল মাত্র একটি ইতর শ্রেণীর চরিত্র, অন্যান্য সকল চরিত্রই উচ্চশ্রেণী সম্ভূত। এই নাটকে

পুরুষ-চরিত্রের পরিকল্পনা ও সৃষ্টি উভয়ই ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রের পরিকল্পনা অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পুরুষ-চরিত্রগুলির ভাষা এবং আচরণ নিতান্ত কৃত্রিম। প্রত্যেক চরিত্রই বক্তৃতাধর্মী। বিশেষতঃ ইহাদের কেহই রক্তমাংসের বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি নির্বিশেষ আদর্শ মাত্র—ইহাদের নামগুলি হইতেও এ কথা প্রমাণিত হয়, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; যেমন কুলপালক, কুলধন, শুভাচার্য, সুধীর, অনৃতাচার্য, ধর্মশীল, তর্কবাগীশ, অধর্মরুচি, বিবাহ-বণিক, উদর-পরায়ণ, ইত্যাদি। ইহারা কেহই বিশিষ্ট নাটকীয় চরিত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাদের কেহ কেহ রামনারায়ণের নিজস্ব শাস্ত্রজ্ঞানের বাহন মাত্র, মানবিক দোষগুণ ইহাদের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, এই চরিত্রগুলি নাটকীয় কাহিনীর একটি স্বচ্ছ প্রবাহকে আবিল ও বারবার অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এক শ্রেণীর চরিত্রের সার্থকতার ভিতর দিয়া কোন নাটকেরই সামগ্রিক সাফল্য লাভ সম্ভব নহে, সুতরাং স্ত্রী-চরিত্রগুলির যে সাফল্যের কথা পরে আলোচনা করিব, পুরুষ-চরিত্রগুলি ব্যর্থ হইবার ফলে কেবলমাত্র সেগুলি দ্বারাই 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যলাভ সম্ভব হয় নাই।

পুরুষ-চরিত্রগুলি এই প্রকার শোচনীয় ব্যর্থ হইবার প্রধান কারণ এই যে, ইহাদিগকে নাট্যকার কেবলমাত্র দোষের আকর বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। স্ত্রী-চরিত্রের প্রতি তাঁহার যে সহানুভূতি ছিল, পুরুষ-চরিত্রের প্রতি তাহা ছিল না—যে উদ্দেশ্যে তিনি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিতে গিয়া তাহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। সুতরাং এখানে তিনি যথার্থ নাটক রচনার উদ্দেশ্যটি বিসর্জন দিয়া কেবল মাত্র উদ্দিষ্ট বিষয়কেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সহানুভূতিহীন সৃষ্টি ব্যর্থ; পুরুষ-চরিত্রগুলি তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া এমনই ব্যর্থ হইয়াছে। এইবার স্ত্রী-চরিত্রগুলির কথা আলোচনা করিব, ইহদের সম্পর্কে আলোচনার কিছু অবকাশ আছে।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে প্রথমই কুলপালকের চারিটি কন্যার কথা উল্লেখ করিতে হয়। এই চারিটি সহোদরা ভগিনী, একই সুখ-দুঃখের অধীন, একই দুর্ভাগ্যের অধিকারিণী, একই অবস্থার দাস; কিন্তু রূপায়ণের ভিতর দিয়া নাট্যকার চারিটি চরিত্রকেই একাকার করিয়া ফেলেন

নাই—ইহাই নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব, এইখানেই নাট্যকারের চরিত্র-সৃষ্টির প্রতিভার পরিচয়। একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একই মাতাপিতার সন্তান এবং একই অবস্থার অধীন বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়াও নাট্যকার এ'কথা বিস্মৃত হন নাই যে, বয়সের দিক দিয়া চারি ভগিনীর মধ্যে ব্যবধান আছে এবং বয়স অনুযায়ী মানুষের সুখদুঃখবোধ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আকস্মিক ভাবে যখন চারিটি কন্যার একজন বরের সঙ্গেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল, তখন অর্থাৎ বিবাহের দিনই জননী কন্যাদিগকে এই সংবাদ শুনাইতে গেলেন। এই সংবাদ শুনিয়া চারিজনের মধ্যে চারি রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ইহাদের বয়স যথাক্রমে ৩২ ২৬, ১৬ ও ৮ বৎসর, সুতরাং বিবাহ-বিষয়ে ইহাদের কৌতূহল কিংবা চেতনা সকলের এক নহে। জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহ্নবী যখন জননীর নিকট হইতে এই সংবাদ শুনিতে পাইল, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।' অতিক্রান্ত যৌবনে জীবন-সম্পর্কে তাহার সকল কৌতূহল দূর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে আশা ও স্বপ্ন লইয়া নারী দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে, তাহা তাহার আর ছিল না। সেইজন্য এই সংবাদকে সে অভিনন্দিত করিয়া লইতে পারে নাই. ইহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিয়াছে, বিগত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। তাহার কনিষ্ঠা শাম্ভবীর বয়স তাহা হইতে ছয় বৎসর কম, এই ছয় বৎসরের ব্যবধানেও তাহার চরিত্রের মধ্যে কি স্বাতন্ত্র্য থাকা সম্ভব, নাট্যকার তাহা অনুভব করিয়াছেন। স্বপ্ন এখনও তাহার চোখে লাগিয়া আছে। সেইজন্য সে যখন শুনিতে পাইল, পিতা তাহাকে কুলরক্ষা করিয়াই বিবাহ দিতেছেন, তখন সে নির্লজ্জের মত জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও মা তুই কি কুলরক্ষা কর্বি, তবে জাতি রক্ষা কে কর্ব্যে মা।' জাহ্নবী যে আশঙ্কা আর মনে স্থান দেয় না, শাম্ভবীর মনে এখনও সেই আশঙ্কা জাগিয়া আছে। জননী এই কথার কোন জবাব দিতে পারিলেন না, কন্যার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। শাম্ভবী তাহার চোখের সম্মুখে তাহার দিদিকে দেখিয়া কোনদিন আশাও করিতে পারে নাই যে, তাহার কোনদিন বিবাহ হইবে। অনেক কুলীন-কন্যারই ত' বিবাহ হয় না, তাহারও হইবে না, তাহার দিদিরও হইবে না। কিন্তু রক্ত মাংসের লালসা তাহার দেহে ও মনে জাগিয়া আছে, সেইজন্য কুলরক্ষা অপেক্ষা জাতিরক্ষার কথাই তাহার মনে হয়; বিবাহ একেবারে না হউক তাহাও সে চায় না, সুতরাং যখন তাহা হইতেই চলিয়াছে, তখন, 'আচ্ছা

হউক, দেখা যাউক' এই কথাই সে বলে। ইহার বেশী আর কিছু ভাবিতে পারে না। কিন্তু ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী কামিনী ইহাদের দুইজন হইতেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার চোখের সামনে তখনও জীবনের স্বপ্ন রঙিন পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ায়। জীবনের রূঢ়তা ও সামাজিক আচারের নিষ্ঠুরতার কোন পরিচয়ই সে রাখে না, রাখিবার বয়সও হয় নাই। সুতরাং সে এই সংবাদ শুনিয়া বলিয়া 'উঠিল' শুনিয়া এ শুভকথা হয়েছি চঞ্চল।' যে বয়সে মুখের কথা হয় কাব্য, প থচলা হয় নৃত্য, কামিনীর এখন সেই বয়স। সংসারের কোনও আঘাতই তাহার গায়ে লাগে না, সেইজন্য আপনা হইতেই তাহার মুখ দিয়া কবিতা বাহির হইয়া আসিল। দেহের মধ্যে তাহার সদ্য যৌবনের বিকাশ হইলেও, অন্তরে সে এখনও শিশু। বর আসিয়াছে শুনিয়া বর দেখিতে ছুটিয়া যাইবার কৌতূহল সে কিছুতেই দমন করিতে পারিল না, কনিষ্ঠাকে সঙ্গে লইয়া গেল। কিন্তু বর চোখে দেখিবা মাত্র তাহার স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল; একদিন তাহার চোখে যাহা স্বপ্ন ছিল রূঢ় বাস্তবের রাজ্যে তাহার নগ্নরূপ দেখিতে পাইয়া সে বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কোমল হৃদয়ের উপর নির্মম নিয়তির এই দুর্বিষহ আঘাতের বেদনা পাঠকের হৃদয়ও বুঝি স্পর্শ করিল। জাহ্নবী তাহার জীবনের আশা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, শান্তবীর চোখের সম্মুখে তখনও সেই আশা মরীচিকার জাল বিস্তার করিত, কামিনী কোন বিষয়ে স্থির সংস্কার গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, জীবনের পথে এখনও সে লঘুপদে বিহার করিয়া থাকে, কিন্তু সর্বকনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী ইহাদের সকলের অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে সংসারের কোন ধারই এখনও ধারে না, ঘুম হইতে উঠিয়াই সে পাড়ায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতে গিয়াছে। মা তাহাকে ডাকিলেন, ভগিনীরা চীৎকার করিয়া ডাকিল, বহু ডাকাডীকির পর সে ছুটিয়া আসিল। মা তাহাকে বলিলেন, 'আজি আমাদের বাড়ীতে এক শুভকর্ম্ম হবে।' কিশোরী কিছুই জানে না, আব্দার কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও মা, কি শুভকর্ম্ম বল না মা। হে মা বল্, কি শুভকর্ম্ম, বল্ না। বলবিনে বলবিনে ?' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'কেন গো বল্‌ব না কেন, আজি তোদের 'বে' হ'বে।'

'বে' (বিবাহ) কাহাকে বলে সে তখনও তাহা জানেই না। তাহার এই সরল শিশু-প্রকৃতির সঙ্গে নিষ্ঠুর নিয়তির যে নির্মম আচরণ তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে, তাহার একটি সুন্দর নাটকীয় ভাব-বৈপরীত্য সৃষ্টি

হইয়াছে। রামনারায়ণ এখানে বক্তৃতা দ্বারা বিষয়ের নির্মমতাটুকু বুঝাইবার পরিবর্তে নাটকীয় চরিত্রের আচরণের মধ্যে দিয়াই এই ভাবটি সার্থক ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কৃতিত্ব। সুদীর্ঘ প্রবন্ধ, ক্লান্তিকর বক্তৃতার ভিতর দিয়া সে যুগে যে কথা সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে, নাটকীয় চরিত্রের আচরণ যথাযথ করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহা যে কত সহজে প্রকাশ পাইতে পারে, এখানে তাহাই দেখা যায়।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, 'বে' কা'রে বলে মা।' এই নাটক রচনার বহুকাল পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ভিতর দিয়া প্রকৃতি-পালিতা কাপালিক-দুহিতা কপালকুণ্ডলার মুখে একদিন এই বিস্ময়ই জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। নবকুমারকে অধিকারী যখন কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া তাহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন, বিবাহ-কি তাহা তখন সেও বুঝিত না, সেও বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল, বি-বা-হ'। অধিকারী তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ কি তাহা অপরে বুঝাইয়া দিবার বিষয় নহে, নিজে হইতে যে ইহা বুঝিতে না পারে, সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। মা এখানে কন্যাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'বে কাকে বলে জানিসনে বাছা! প্রধান সংস্কার।' কিশোরী কিছুই বুঝিল না। সে বরং জিজ্ঞাসা করিল, 'ও মা! তাকি আমি খাব?' সে তাহার শিশুসুলভ প্রকৃতি লইয়া বুঝিয়াছে, ইহা খাইবার বস্তু। মা বুঝাইয়া বলিলেন, 'বিবাহ খাইবার জিনিস নহে, বড়দির, মেজদির ছোড়দির সবারই আজ বিবাহ হইবে', তখন কিশোরী স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, 'ও মা'। তবে তোর হবে না?' পরিবারস্থ সকলেরই যদি বিবাহ হয় তবে তাহার মা-ই অবশিষ্ট থাকিবে কেন, ইহাও সে বুঝিতে পারিল না। কৌলীন্যের নামে সরল শিশু-প্রকৃতির বালিকাকে কি ভাবে যে বলিদান করা হয়, সে কথা এমন মর্মস্পর্শী ভাবে আর কে বর্ণনা করিয়াছেন? তাঁহার সেই বর্ণনা দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য—

ব্রাহ্মণী। (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) এ কি, এত বেলা হয়েছে, ও মা কি হলো? আজি আমার নানান কম্ম। আজি কি এতো বেলা পর্যন্ত ঘুমবার সময়? কিন্তু ঘুমেরও দোষ নাই, সমস্ত রাত উয্যুগ সংযুগ কত্যে জেগে ছিলাম, যেমন ভোরবেলা পড়িচি অমনি মরে ঘুমিইচি, তাইতেই অনেক বেলা হয়েচে। তা এখন আমি কি করি? অনেক কম্ম। আগে কি অধিবাসের বরণডালা সাজাব, কি পাড়ার

মেয়েদের নিমন্ত্রন্ন কত্তো যাব, কি অন্য কম্ম কর্বো? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) না এ সব পরে হবে, আগে মেয়েদের ডেকে এ সম্বাদ বলি, তাদের 'বে' তারাও এখন টের পায়নি। লোকে বলে "ওট্ ছুঁড়ি তোর বে" আমার মেয়েদের কপালে তাই ঘটেছে; (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা গো মেয়েরা সকল!

জাহ্নবি শাম্ভবি আর কামিনি কিশোরি।
এস এস কন্যাগণ সবে ত্বরা করি॥

জাহ্নবী। যাই।

শাম্ভবী। কেন মা?

কামিনী। ওমা এই যে আমি এইচি, কি মা?

ব্রাহ্মণী। ওগো। শুন্সে গো, তোরা শুন্সে।

[জাহ্নবী শাম্ভবী ও কামিনীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। ওমা, কি?

শাম্ভবী। ওমা কেন ডাক্লি?

কামিনী। ওমা কেন কেন বাবা কি ডাকৃচেন?

ব্রাহ্মণী। (পরমাহ্লাদে)

এত কালে প্রজাপতি হলো অনুকূল।
ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল॥

জাহ্নবী। ওমা, কি বল্লি?

শাম্ভবী। ওমা, বুজ্‌দে পাল্যেম্ না।

কামিনী। ওমা কি বল্‌না মা, আবার বল। বল বল।

ব্রাহ্মণী। ওগো, তোদের 'বে' হবে গো, 'বে' হবে!

জাহ্নবী। (সবিষাদে)

জাহ্নবী যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট।
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাঠ॥
বরযাত্র তাহে মাত্র যমরাজদূত।
বাসর শয়নসুখ হবে অনুভূত॥

শাম্ভবী। (আশ্চর্যান্বিতা)

শাম্ভবীর 'বে' এ যে অসম্ভব কথা।
কুলীন কুমারী যোরা 'ঘর' পাব কোথা॥

বল্লাল বিহিত কুল অকুল সলিলে।
পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে॥

কামিনী। (সোৎসুকা)

কি বল্লি কি বল্লি মা গো সত্য করি বল।
শুনিয়া এ শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল॥
কোথা বর বাসা কোথা এসেছে কি বর।
কবে হবে আজি নাকি বল গো সত্বর॥
বরের বয়স্ কত দেখিতে কেমন।
যা হৌক হলেই হয় এই আকিঞ্চন॥

ব্রাহ্মণী। হবে গো হবে, আজি হবে, আমি মিছা কথা কৈনে।

জাহ্নবী। ওমা, আমার আর 'বে' হলে কি হবে মা? আমি ত যৈবনে জলাঞ্জলি দিতে বসেচি, আর কত কালই বা বাঁচবো, কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।

ব্রাহ্মণী। বাছা! এমন কথা বল্‌তে আছে! কিসের বয়েস? কচি ছেলে, ষেটের বাছা, ষষ্ঠির দাস।

শাম্ভবী। মা! আমাদের 'বে' হবে তা বল্লাল ত টের পাবে না?

ব্রাহ্মণী। টের পেলে কি হবে?

শাম্ভবী। (সভ্রূভঙ্গে) টের পেলে সে টের পাওয়াবে; সে এমন নয়, যেমন মোল্লা বলে' "হেঁদুর পরব্ নাই।" তেমনি বল্লাল বলে "কুলীন বামণের মেয়ের কপালে বে নাই।" তা দেখিস্, সাবধান সাবধান।

ব্রাহ্মণী। বাছা, এখন কি বল্লাল আছে! সে যে অনেক দিন মরেচে।

শাম্ভবী। সে মলে কি হবে মা! তাচ্চেয়ে তার চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচ্চে, দেখিস্।

ব্রাহ্মণী। তোদের ভয় কি মা! আমি কুলরক্ষা কর্ব্যো, কুলীন বর এসেচে।

শাম্ভবী। (সবিষাদে) ও মা তুই কি কুলরক্ষা কর্ব্যি, তবে জাতি রক্ষা কে কর্ব্যে মা?

ব্রাহ্মণী। (অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ও মা শাম্ভবী! তোর, এ কথার উত্তর কি দিব? তার নিমিত্তে আমি বলেছিলাম গো, বলেছিলাম, সেই মিন্সেরে, বলি "হেদে ভাল বর দেখে মেয়েগুলোর

বে দিস্"; তা বাছা, আমি বল্যে কি হবে? সে 'কুল' খোঁজে, বলে 'কুল থাকলেই সব থাকে'। আরো দেক্, মেয়েদের জাত রক্ষা, প্রথমে মা বাপ করে; মা বাপ না করিলে, রাজা; রাজাও যদি জাত রক্ষা না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন। তা বাছা, তোদ্দের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে। এখনকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার ধর্মে হাত দেন না, অভাগ্য আর কি! পূর্বে এক রাজা ছিল তার নাম বল্লাল। সে মিন্সে সকলের জাত নষ্ট কত্যেই এই কাল কুলের সৃষ্টি করেচে, আর আমাদের জাত যায় বিধাতারও এই ইচ্ছে, সেই ত ঐ জন্যে বল্লাল মিন্সেকে রাজ্য দেয়। তবে মা, বাপ, রাজা ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাত নষ্ট কত্যে বসেচে, তখন জাত রক্ষা আর কে কর্বে মা? শাম্ভবি! ক্ষমা কর, জাতরক্ষায় কাজ নাই, কুলরক্ষায় সম্মত হ—আবার কেন নিশ্বাস ফেলে অধোমুখে রহিলি? কি কর্বো, মনোদুঃখ করিস নি। বাছা কামিনি! তুই যে কোন কথা কচ্চিস নে?

কামিনী। না মা, তোর কথায় আর বিশ্বেস নেই, তুই এমন করে আমায় কতোবার ভুলিয়েছিস্।

ব্রাহ্মণী। না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি গো সত্যি।

কামিনী। ও মা? সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাসা দিছিস্ কোথায় মা? চুপি চুপি দেক্‌তে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা?

ব্রাহ্মণী। না বাছা, শুভ দিষ্টি হয় নাই, এখন কি দেক্‌তে আচে? পরে দেক্‌বি, এত উতলা হইস্ কেন, তোদের ছোট বোন্ আদরিণী কিশোরী কোথায় রে!

কামিনী। সে রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণ সঙ্গে পূবপাড়ায় খেলতে গেচে, এখনো আসে নাই।

ব্রাহ্মণী। একবার ডাক দেখি বাছা তাকে।

কামিনী। (পূর্বমুখে) ও ও ও কিশোরী ই ই ই! কিশোরী রে এ এ এ—! না মা, সে ডাক্ শুনলে না, তার এখন কায নেই, আমারই আগে হোক্, তারপর তবে তার হবে।

ব্রাহ্মণী। আঃ বাছা, ডাক্ আর একবার, ছোট ভগ্নী হয়।

কামিনী। (পুনর্ব্বার চীৎকার স্বরে) ও ও ও কিশোরী ই ই ই! পোড়ার মুখী, শীঘ্রি আয়।

কিশোরী। যাই গো যাই।

কিশোরীর প্রবেশ

কিশোরী। কে গা আমায় ডাকলে?

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাক্‌লে?

ব্রাহ্মণী। তুই কোথায় গেছ্‌লি? দেক্‌তে পাইনে কেন?

কিশোরী। ও মা ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেল্‌তে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর এমন্ যেয়ো না, ডাগোর ডোগর হচ্যো আর অমন কি যেতে আছে? লোকে যে নিন্দে কর্ব্যে, ছি।

কিশোরী। ওমা, কেন নিন্দে কর্ব্যে মা? কর্ব্যে না; হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর যেয়ো না, আজি এক কম্ম আছে।

কিশোরী। কি কম্ম মা?

ব্রাহ্মণী। বাছা! আজি আমাদের বাড়ীতে এক শুভ কম্ম হবে।

কিশোরী। ও মা, কি শুভ কম্ম বল্ না মা। হে মা বল্ কি শুভ কম্ম, বল্‌না বলবিনে বল্‌বিনে?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বলবো না কেন, আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) 'বে' কাকে বলে মা?

ব্রাহ্মণী। 'বে' কাকে বলে তাও জানিস্‌নে বাছা? প্রধান সংস্কার।

কিশোরী। ও মা? তাকি আমি খাব?

ব্রাহ্মণী। বাছা 'বে' কি খেতে হয়? রাঙা বর আসবে তোদের 'বে' কর্বে, কতো ঘটাঘটি হবে, সে কি বাছা, কিছুই জানিস্‌নে?

কিশোরী। হাঁ হাঁ, 'বে' তা আমি জানি, তা কার হবে মা।

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ও মা, তবে তোর হবে না?

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ—তোর জ্ঞান হয় নেই, তা কি বল্‌তে আছে? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝিচি, তোর হয়ে গেছে, ও মা! কার সঙ্গে তোর বে হয়েচে বল্‌না মা?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমাকে ব্যস্ত করিস্‌নে, মচ্চিচি নানান্‌ জ্বালায়, তোরা সকলে এখন বাড়িতে যা।

কন্যাগণের প্রস্থান

আমি যাই, আর দাঁড়াব না। পাড়ার মেয়েদের বল্‌তে হবে, বেলা হলো, আমি যা না কর্ব্বো তা হবে না।

ব্রাহ্মণীর প্রস্থান

একদিকে ষাট বৎসর উত্তীর্ণ বৃদ্ধ কাণা ও বধির বর, আর একদিকে এই সরলা বালিকা কিশোরী; ইহাদের বিবাহ বন্ধনের কল্পনার মধ্যেই যে হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়, তাহা আর কি ভাবে এত স্পষ্ট করিয়া দেখান যাইতে পারে? সুতরাং একদিকে উদ্দেশ্য পূরণ ও অন্যদিকে চরিত্র রূপায়ণ উভয় ক্ষেত্রেই রামনারায়ণ এখানে যে সার্থকতা দেখাইয়াছেন, তাহা সে যুগের বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়কর।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য স্ত্রীচরিত্র ফুলকুমারী। কুলীন-কন্যার বঞ্চিত জীবনের নানা দিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইবার প্রয়াস যে এই নাটকে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এই চরিত্রটি তাহার প্রমাণ। কুলপালকের কন্যাদের মধ্য দিয়া কুলীন-কন্যাদিগের বিবাহ না হইবার কিংবা বিলম্বিত হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ফুলকুমারীর মধ্যে কুলীন-কামিনীর বিবাহিত জীবনে বঞ্চনার কথা সুস্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। বিবাহ না হওয়া মাতাপিতা ও যুবতী কন্যার দুঃখ। কিন্তু বিবাহ কোন রকমে একটা ঘটিয়া গেলেই কি সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত? তা ত নয়ই, বরং যন্ত্রণা যে আরও বাড়িয়া যাইত, ফুলকুমারীর ভিতর দিয়া নাট্যকার তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। ফুলকুমারীকে কেবল কৌতুক ও কৌতূহল দ্বারাই চিত্রিত করেন নাই, তাহার বঞ্চিত জীবনের বেদনা গভীরভাবে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, সেইজন্য এই স্ত্রীচরিত্রটি একটু বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে।

বিবাহিতা কুলীন-কন্যা ফুলকুমারীর জীবনের একদিনের এই বৃত্তান্তটি বর্ণনার গুণে কী করুণ হইয়া উঠিয়াছে! সে যশোদাকে বলিতেছে, 'একদিন ঘাটে কাপড় কাচিতেছি, এমন সময় সংবাদ পাইলাম, ওদের জামাই

আসিতেছে। কাপড় কাচা ফেলিয়া রাখিয়া মনের আনন্দ মনে চাপিয়া রাখিয়া বাঁড়ীতে ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম।' তাহার কথা তখন আপনা হইতেই কবিতা হইয়া উঠিয়াছে,—'সে কথা শুনিয়া ভাসি সুখের সাগরে, পথ না দেখিতে পাই আনন্দের ভরে।' যে বয়সে মুখের কথা সহজেই কবিতা হইয়া উঠে ফুলকুমারীর তখন সেই বয়স। এতদিন ধরিয়া স্বামী তাহাকে ভুলিয়া আছেন, সে জন্য তাহার প্রতি কোন অভিমান নয়, বরং এই বঞ্চনা তাহার জীবনে নিতান্ত সহজ প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ক্ষণিকের অতিথি স্বামীকেও সে অভিনন্দিত করিয়া লইবাব জন্যই প্রস্তুত হইল। কিন্তু সেখানেও তাহার অদৃষ্ট তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। জামাতা আসিয়াছেন দেখিয়া সকলে তাহাকে সমাদর করিতে লাগিল, কিন্তু জামাতা জানাইলেন, 'ব্যাভার না পাইলে তিনি পা ধুইবেন না'। সুতরাং বুঝা গেল, তিনি অর্থের প্রয়োজনে শ্বশুর-গৃহে আসিয়াছেন, পত্নীর আকর্ষণে নহে। যাই হোক, জননী থাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিলেন, কিন্তু অল্পতা দেখিয়া জামাতার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। রাত্রে জননী আয়োজন করিলেন, বড় পিঁড়ির সামনে খাবার সাজাইয়া আনিয়া দিলেন। নিতান্ত বিরক্তি-সহকারে সে খাইতে বসিল, তারপর 'ইহা খায় উহা ফেলে নবাবী করিয়া।' ফুলকুমারী বলিতে লাগিল, তারপর রাত্রে শয়ন-গৃহে আমি তাহার অপেক্ষায় ঘুমের ভাণ করিয়া শুইয়া আছি, সে আসিয়াই আমাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, 'শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।' নতুবা সেই মুহূর্তেই চলিয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কাটনা কাটিয়া কিছু কড়ি পুঁজি করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই আনিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে আরও অর্থ দাবী করিল, আর আমার কিছু ছিল না, সেইজন্য দিতে পারিলাম না। পায়ে ধরিয়া নিজের অক্ষমতার কথা জানাইলাম, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না, রাত্রেই গৃহ হইতে চলিয়া গেল, কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বাবার টোলে দরমা পাতিয়া শুইয়া রাত্রি যাপন করিল, তারপর সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই চলিয়া গেল। সারা রাত্রি জাগিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আমার চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছে।' শুনিয়া প্রতিবেশিনী যশোদারও বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—

যশোদা। নাত্‌নি! আর বলিস্‌নে—বলিস্‌নে, বুক ফেটে যায়! (সজল

নয়নে) হাঁরে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি ? কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্তো বলেছিল। কুল ত নয়, কুলের আঁটি—বড় কঠিন। যার কুল আছে, তার কি দয়া নেই ? ধম্ম নেই ? কম্ম নেই ? আহা ! আহা ! কি দুঃখু কি দুঃখু ! নাত্‌নি ! তুই আর কাঁদিসনে। যা, মেয়েদ্দের সঙ্গে যা ; আবার আসবে, ভাবনা কি। রাগ করে গেচে কি কর্বি ? এবার এই অব্‌দি কাট্‌নাটা মাট্‌নাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ—। তবু কাঁদ্দে লাগ্‌লি ? আহা ছেলে মানুষ ! বোন্ ! কি কর্বি তা বল ? এই দেক্ দেখি আমরা কি কচ্চি, তোত্তো আছে, আমার যে নেই—তা কি কর্বো !

ফুল । (চক্ষুর জল মুছিয়া) ঠান্‌দিদি ! এ থাকাচ্চেয়ে না থাকা ভাল ! না থাক্‌লে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, এ থেকে নেই, এ কি সামান্যি দুঃখু ! ঐ যে কথায় বলে "দুষ্ট গরু থাকাচ্চেয়ে শূন্য গোল ভাল।"

যশোদা। (হাস্যমুখে) ও কথা বল্‌তে আছে ? খাড়ু গাচ্‌টা হাতে আছে, তবু ভাল, তবু ভাল। আর সে নাজ্জামাই শালাও আবার এই ফিরে আসে, রাগ করে কদিন থাক্‌তে পার্ব্বে ? (পথে একটা কুক্কুর দেখিয়া সপরিহাসে) ঐ লো নাত্‌নি ! ঐ, আবার ফিরে আশ্চে।

ফুল । (হাস্যমুখে) ঠান্‌দিদি, তোত্তো নেই, তা লোকে বলে "নাপেতে নাজ্জামাই ভাতার" তা তুই নে যা।

যশোদা। না ভাই, আমাত্তো নেই বটে, আমি ও রসে বঞ্চিত, তবে "পরেদ্ধনে ধোপার নাটে" কাজ কি ?

ফুল । ঠান্‌দিদি ! তোর আবার হয় এই, আমি ও পাড়ায় শুন্‌লেম রাঁড়ের বে নাকি চল্‌তি হবে ; তবেই ত তোর হলো।

যশোদা। (সবিষাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুঞ্চি, হয় কৈ ? আমি থাক্তে আর হবে ? আমার তেমন অদেষ্ট নয়, না হোগ্‌গে, আর কাযও নেই। এখন ঘরে যাই ভাই, বেলা হয়েচে।

ফুল । আমিও আসতেম্ না, বড় গিন্নীর অনুরোধেই এলেম ; আমি

বল্লেম জলসৈতে যেতে পারবো না, তা সে বল্যে "না যাস্ না যাবি তুই ঝালিঝাড়া বাটুসে" তা যাই, না গেলে ভাল হয় না।

কুলপালকের গৃহে চারিটি কুলীন-কন্যার যখন একসঙ্গে অনুরূপ একটি বরের সঙ্গে বিবাহের আয়োজন হইতেছে, সেই মুহূর্তে বিবাহিতা কুলীন-কন্যার এই করুণ কাহিনীটি ইহাদেরও ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত দিয়া গেল। এই ভাবে নাটকের বিভিন্ন চিত্র ও চরিত্রগুলি কুলীন-কন্যাদিগের বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। ফুলকুমারীর চরিত্রটিই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল-কুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্যামা-চরিত্রের ভিত্তি।

'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটকে একটি জননী ও শিশুর চরিত্র আছে, তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। বাংলার সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের শিশুচরিত্র আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে রামনারায়ণই সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যবর্তী কালে আর কেহই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এই বিষয়েও রামনারায়ণই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম কৃতিত্বের অধিকারী। একটি নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের জননী সুমতি ও তাহার একটি শিশুপুত্র একটি মাত্র দৃশ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু এই নিতান্ত সামান্য পরিচয়ের ভিতর দিয়াই রামনারায়ণের বাস্তব জীবন-বোধ যে কত সুগভীর ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' প্রচারধর্মী, কৌতুক-সর্বস্ব বা সমাজ-সংস্কারমূলক প্রহসন শ্রেণীর রচনা, কিন্তু এ'কথা যে সত্য নহে, একটি গভীরতর জীবন-দৃষ্টি ইহার মধ্য দিয়া যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ইহার এই চরিত্রগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাদের মধ্যে মত প্রচার নাই, কৌতুকের কোন স্পর্শও অনুভব করা যায় না, সমাজ-সংস্কারের কথা ত আসেই না, এমন কি প্রহসনের লঘু ভাবও প্রকাশ পায় নাই। জননী ও শিশুর চিরন্তন সম্পর্কের পরিচয়ই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

কুলপালকের গৃহে পিতার নিমন্ত্রণ হইয়াছে শুনিয়া শিশুটি পিতার সঙ্গে নিমন্ত্রণ যাইবার জন্য আব্দার ধরিল। জননী সুমতি স্বামীকে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দরিদ্র লোভাতুর ব্রাহ্মণ একান্ত আত্মসুখপরায়ণ, গৃহধর্মের কোন কর্তব্যবোধ তাহার মধ্যে নাই,

সন্তানের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক সেই প্রকারের। সুতরাং সে শিশুকে সঙ্গে লইতে চাহিল না। সুমতি স্বামীকে নানা কথায় বুঝাইয়া এ বিষয়ে অনুরোধ করিতে লাগিল, বলিল, 'ভালমন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও, খেয়ে আস্‌বে।' কিন্তু স্বামী কিছুতেই রাজি হইল না। শিশু কাঁদিল, ফলার করিতে যে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহার শিশু-সুলভ পরিচয় দিল, পিতার যাইবার পথ আগ্‌লাইয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। স্নেহহীন পিতা শিশুকে প্রহার করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া একাই ফলার করিতে চলিয়া গেলেন। শিশুর আচরণটি এখানে যেমন বাস্তব, দরিদ্রা জননীর আচরণটিও তেমনই এখানে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে শিশু-চরিত্র সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে হইলে রামনারায়ণ হইতেই তাহার সূত্রপাত করিতে হয় এবং রামনারায়ণের পর রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর শিশুর জন্ম হয় নাই। সুতরাং রামনারায়ণের এই বিষয়ক প্রয়াস যত অসম্পূর্ণই হউক, তথাপি সর্বপ্রথম বলিয়া অভিনন্দনযোগ্য। দৃশ্যটিও উদ্ধৃতিযোগ্য—

[শিশুকে সঙ্গে লইয়া সুমতির প্রবেশ]

সুমতি । (শিশুর প্রতি) বাছা, একবার ডাক্ না, মন্সে গেল কোথা? ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাক্ কেন?

শিশু । ওমা, তুই আমাকে ফলারে নে যা, আমি তোর সঙ্গে যাব।

সুমতি । বাছা! আমি কি সেথায় যেতে পারি।

শিশু । কেন পারিস্ নে—তুই পার্‌বি।

সুমতি । আমি যে মেয়েমানুষ, কেমন করে যাব?

শিশু । না, তুই মেয়ে মানুষ নয়—তুই যাবি আয়, আমার সঙ্গে আয় (অঞ্চলাকর্ষণ)।

সুমতি । না বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে কর্বে, তুই ডাক্, সে এখন তোকে নে যাবে।

শিশু । ওমা! কাকে ডাক্‌ব? কে নে যাবে মা!

সুমতি । সেই মিন্সেকে ডাক্, থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়।

শিশু । কোন মিন্সেকে মা? যে আমাদের ঘর ছেয়েছিল?

সুমতি । না না, তাকে কেন?

শিশু । (সজলনয়নে) তবে আবার কোন মিন্সেকে ডাকবো?

সুমতি । সেই কত্তাকে রে কত্তাকে, ছেলেটাও তেম্নি !

শিশু । কোত্তাকে, তাই বলনা কেন। আয় তূ তূ তূ।

সুমতি । (সক্রোধে) না রে পোড়া-কপালে ছেলে, কুকুরকে কেন ?

শিশু । (সরোদনে) আঁা, আঁা, তুই যে বল্যি কোত্তাকে, তবে আবার কোত্তা কে ?

সুমতি । সেই তোদ্দের তাকে।

শিশু । (সাভিলাষে) ওমা ! আমাদ্দের তাকে কি আছে মা ? বল্ না মা বল।

সুমতি । কি দায় হলো ! এখানেও কেউ নাই যে বলে দেয়।

[উদরপরায়ণের প্রবেশ]

উদর । কালে কালে সব গেল কি হইল ভাই
পূর্বমত ফলার নয়নে দেখি নাই ॥
থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।
খাইতে খাইতে তাহা হইত অরুচি ॥
দিন দিন কত কত জুটিত ফলার।
এখন মণ্ডার গন্ধ আর মিলা ভার ॥
এমন দুর্ভাগা দেশে মারী ভয় নাই।
ভাবি তাই কোথা গেলে আগু শ্রাদ্ধ পাই ॥
বিবাহের দফা রফা বল্লালে করেছে।
খাতা পত্র যাহা ছিল হারিয়ে গিয়েছে ॥
তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
ফলার সন্ধান করি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ॥
হায় কিছুই হলো না ! এতটা পরিশ্রম করিলাম।
পরিশ্রম হলো সার নাহি মিলিল ফলার
ফল আর জীবনে কি আছে।
গৃহ-অন্নে নাই রুচি ত্যাজিছি লক্ষ্মীর খুঁচি
লুচি বিনে কিসে প্রাণ বাঁচে ॥

শিশু । (আহ্লাদে) ওমা, ওমা, এই যে বাবা এয়েচে ! আমি বাবার সঙ্গে যাব।

উদর । কি রে তুই এখানে কেন ? একা এসেছিস নাকি ?

শিশু । (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণপূর্বক)
এই যে বাবা এয়েচে, এই যে বাবা এয়েচে, ও বাবা!
ও বাবা! আমি মার সঙ্গে এইচি, ঐ মা দাঁড়িয়ে আছে।
(হস্ত দ্বারা দর্শায়)

উদর । (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি! এমন যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর। লজ্জা নাই! ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না? এই চারিদিগে পুরুষ, এখানে আসা, দেক্‌বি একবার?

শিশু । বাবা, মা তোকে ডাক্‌তে এয়েচে।

উদর । আমাকে ডাকতে এসেছে কি, আর কাকে ডাক্‌তে এসেছে, তার নিশ্চয় কি?

সুমতি । (সভয়ে) ফলারের কথা বলতে এসেছি।

উদর । (সানন্দে) অঁা, কি বল্যি? নিকটে আয়, নিকটে আয়, এখানে কেহই নাই, এত লজ্জাই কি? ভাল তুইত আর নবধ্বাগমনের বৌ নোস্, (সুমতিকে নিকটে আনিয়া) কি বল দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস্ কি! নিমন্ত্রণ না অনিমন্ত্রণ?

সুমতি । অনিমন্তন্ন আবার কি?

উদর । তুই মেয়েমানুষ কি বুঝিবি। নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অধিক মজা, নিমন্ত্রণে পেটে হয়। অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে দুয়েতেই হয়।

সুমতি । তা এত আমি জানিনে; বাঁড়ুয্যের বাড়ি নিমন্তন্ন হয়েছে, সেথায় বে।

উদর । ঐ ও পাড়ায় কুলপালকের বাড়ি? ফলার কেমন রকম্?

সুমতি । (সাঙ্গভঙ্গে) ফলার আবার কেমন রকম্, কথা শুন্‌লে গা জ্বালা করে।

উদর । হা ক্ষেপি, কিছুই জানিস্‌নে! ফলার তিন প্রকার; উত্তম, মধ্যম, আর অধম। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শুনবি? শুনে রাখ, যদি কখন কাজে লাগে।

উত্তম ফলার

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।

ছকা আর শাক ভাজা মতিচুর বঁদে খাজা
ফলারের জোগাড় বড়ই ॥
নিঁখুতি জিলাপি গজা ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা ॥
খুরি পুরি ক্ষীর তায় চাহিলে অধিক পায়
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে দক্ষিণা পানের সাতে
উত্তম ফলার তাকে কই ॥

মধ্যম ফলার

সরু চিড়ে শুকো দই মত্তমান ফাকা খই
খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয় ॥

অধম ফলার

গুমো চিড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো খই
পেট ভরা যদি নাহি হয়।
রৌদ্‌রেতে মাথা ফাটে হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম ফলার তাকে কয় ॥
এই ত তিন প্রকার ফলার, তা সেথায় কোন প্রকার ?

সুমতি । তা আমি কি জানি ? আমি ত সেথায় যাই নাই।

উদর । পায় পায় যেতে পারিস্‌নে ? এবার অবধি যাইস্।

সুমতি । (সহাস্য মুখে) ভাল তাই হবে, এখন তুমি যাও, আর রঙ্গে কায নাই।

উদর । চল্যেম—দুর্গা দুর্গা।

শিশু । ও বাবা! আমি যাব।

উদর । (সক্রোধে) আঃ পেচু ডাকৃলি, দূর হ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি ফলার পেলাম, এই তার দফা রফা হলো।

সুমতি । ছেলেমানুষ, জ্ঞান কি ? তুমি ওকে সঙ্গে নে যাও।

উদর । হ্যাঃ, একেত সেই থুবড়ো মেয়েদ্দের বে, তায় আর এই অযাত্রা। তুই ওকে নে ঘরে যা।

শিশু । (সরোদনে) আঁা আঁা আঁা ওমা ! আমি যাব।

সুমতি । (ঈষৎ ক্রোধে) আঃ, নে যাও না কেন—ও কি তোমার ভাগ কেড়ে খাবে ? ছেলে মানুষ, কাঁদ্‌চে।

উদর । মর মাগি, ওকে নে গে কি হবে, ও কি ফলার কত্যে শিখেছে ? (শিশুর প্রতি) কেমন্‌রে, ফলার কত্যে পার্‌বি ?

শিশু । হা আমি পার্‌বো।

উদর । ভাল, কেমন পারবি, বল্‌ দেখি। কখানা পাত পার্তবি ?

শিশু । আমি একখানা পাত পাত্‌বো।

উদর । (সভ্রূভঙ্গে) একখানা পাত ? তবে খাবি বা কিসে, নিবে বা কিসে বল দেখি ?

শিশু । আমি সব খাব।

উদর । তবেই হলো, আজিও তুই কিছুই শিখ্‌লিনে।

সুমতি । আঃ, শিকিই কেন দেও না ? তুমি কি পেট থেকে পড়েই শিকেচ ? ছেলেমানুষ, কি জানে, এত তাড়না কর কেন।

উদর । আঃ মলো, এ মাগী বলে কি ? ফলার কি কেউ কারু শেখায় ? আমি আপনা হতেই শিখেছি ; কিন্তু ছেলেটা আমার তেমন হলো না ! হবে কি, তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম দে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠশালায় পাঠাইস্‌, তাতেই উচ্ছন্ন গেল। কালির আঁাক পাড়লে ধার কর্জ হয় জানিসনে ? আমারও ঐরূপ কিছুদিন হয়েছিল। মা বাপ আমাকে গুরু মহাশয়ের কাছে দশ বার দিন প্রায় পাঠিয়েছিল, তাতেই আমি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিলাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল, সেই মা বাপ অমনি অক্কা পেলে, আর আমায় পায় কে। তুই তেমনি এ ছেলেটার মাথা খেতে বসিছিস্‌, ওকে নষ্ট কর্‌বি ?—যা ইচ্ছে ! আমি ওরে নে যেতে পারিবো না।

শিশু । (সরোদনে) আমি যাব, আঁা আঁা।

সুমতি । ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও, খেয়ে আসবে।

উদর । ভালই খেতে পায় না—মন্দ সামগ্রী খেতে পাবে না কেন? তুই মাগি ভারি দুষ্ট। আমার অখ্যাত কচ্চিস্।

সুমতি, । তুমি একে নে যাও, আর রঙ্গে কায নাই।

উদর । কি আপদ! ওকে নে গে কি হবে? ওকি খেতে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমনরে তুই ফলার কত্যে শিখেছিস!

শিশু । (চক্ষুর জল মুছিয়া) হাঁ শিকিচি।

উদর । আচ্ছা, বল দেখি, কেমন শিখেছিস্? ফলার গে কি খাবি?

শিশু । বাবা? আমি পরমান্ন খাব।

উদর । দেখ্‌লি মাগি, দেখলি; ও বানর সন্তান—ওর কি বুদ্ধি আছে, ফলারে কি পরমান্ন থাকে? (শিশুর প্রতি) ওরে, লুচি, মতিচুর, সন্দেশ, দই, এই সকল আছে, এর মধ্যে আগে কি খাবি?

শিশু । আমি আগে দই খাব।

উদর । (শিশুকে চপেটাঘাত পূর্বক) মরে যা, এমন সন্তান থাকাচ্চেয়ে না থাকা ভাল! আগে দই খেলে কি আর কিছু খেতে পারে?

রোরুদ্যমান শিশুকে অভিমানে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে সুমতির প্রস্থান

যাক্ উৎপাত গেল, এখন আমি যাই (পথে গমন) কৈ কাহাকেও যে দেখি না, একলাই যাব? (অগ্রে দেখিয়া) এই যে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় আসিতেছেন।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে বহুবিবাহ-প্রথার নিন্দা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিবাহ প্রথাকে আঘাত করা হইয়াছে, তাহা বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের কন্যাবিক্রয়ের প্রথা। এই প্রথা কেবলমাত্র যে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাই নহে—উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর হিন্দু পরিবারেই তাহার প্রচলন ছিল। ইহা অবশ্য কোন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রামনারায়ণ তর্করত্নও ইহাকে কেবলমাত্র একটি কু-প্রথা বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত যে, 'কন্যা বাণিজ্যিকেরা পাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি রীতি চরিত্র কিছুই বিবেচনা করে না। যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি জরা জীর্ণ, ব্যধি শীর্ণ, বিবর্ণ বিরূপ, নির্গুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জন করে।' কিন্তু ইহার নিদর্শন যে সমাজে

অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, কিংবা ইহা কোন জটিল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কৌলীন্য প্রথার নিন্দা করিয়া তখনকার দিনে যে সমস্ত নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাই সমাজ সংস্কারমূলক নাটকের মধ্যে সর্বাধিক ছিল। এই কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে পণপ্রথাও জড়িত। সুতরাং কৌলীন্যের নিন্দাসূচক নাটকের মধ্যে পণপ্রথা বিষয়ক নাটকগুলিকেও গ্রহণ করা সঙ্গত, কিন্তু পণপ্রথা ক্রমে কুলীন সমাজ হইতে অন্যান্য সমাজেও বিস্তার লাভ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল, সেইজন্য তাহা স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য।

কৌলীন্য প্রথা যে কত ব্যাপক. আকার লাভ করিয়াছিল, তাহা সমসাময়িক পত্র পত্রিকার উক্তি হইতেও জানিতে পারা যায়। একটি সংবাদপত্রে উল্লেখিত হইয়াছে যে—

> 'পূর্ববঙ্গে বারজন কুলীন আছেন, তাঁহাদের সর্বসমেত ৬৫২টি বিবাহ। তন্মধ্যে একজনের ৮০টি, বাকি ১১ জনের ৫৭২টি। ইহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য, তাঁহার কেবলমাত্র ৪০টি পত্নী। সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন চূড়ামণির বয়স ৭০ বৎসর ও সর্ব কনিষ্ঠের বয়স ৪০ বৎসর।”

(অনুসন্ধান, ২৯শে মাঘ ১২৯৫)

এই প্রথা যে পূর্ববঙ্গেই এত ব্যাপক আকার লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে, পশ্চিমবঙ্গ হইতেও অনুরূপ বৃত্তান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বহুবিবাহকারী কুলীনদিগের সন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'বহুবিবাহ' নামক গ্রন্থে ইহাদের যে একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক কুলীন ৮০টি, ৬৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ভগবান চট্টোপাধ্যায় নামক কুলীন ৭১টি, ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তি ৬২টি, ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি ৫৬টি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৫০ জন ব্যক্তি গড়পড়তায় ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই ১৪৬৮টি বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে ঘটনার যে কোন অতিরঞ্জিত চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার উপায় নাই।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের চিত্রগুলি যে অতিরঞ্জিত নহে, বরং যথাযথ তাহা সমসাময়িক আরও বহু বিষয় হইতে জানিতে পারা যায়। এই বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রামনারায়ণের পূর্বেই তিনি অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ে সংস্কারের কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই বিষয়ক তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানির নাম 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার', দ্বিতীয় গ্রন্থখানিও এই নামেই প্রকাশিত হয়, তবে তাহাতে 'দ্বিতীয় প্রস্তাব' এই কথাগুলি যুক্ত ছিল।

বিদ্যাসাগর তাঁহার এই বিষয়ক প্রথম গ্রন্থখানিতে উল্লেখ করিয়াছেন, 'কুলীন ভগিনী এবং কুলীন ভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম নির্বাহ করিতে হয়। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রা গমন, এ উভয়ের অন্তবর্তী দীর্ঘকাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়াও, তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃভার্যাদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা সর্বদাই তাহাদের উপর খড়্গহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। উত্তর সাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীন মহিলা ও কুলীন দুহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখিয়াছেন, 'এরূপ প্রবাদ আছে যে কোন এক কুলীন মহাশয় একেবারে তাঁহার সন্তানের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া মহাবিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে, "ওরে বাপু, কেন এত ক্ষীণমান হইয়াছ? আমি তোমার উপনয়ন কালে জানিতে পারিয়াছিলাম।" যাহা হউক, কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকিতে যে এ'দেশের সতীত্বের অনেক হানি হইতেছে, তাহা এক প্রকার সকলেই জানেন।'

দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রামনারায়ণ তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে' অনুরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার পূর্বেই সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল, ঈশ্বর গুপ্তের এই উল্লেখ হইতেই তাহা জানিতে পারা যায়। সুতরাং রামনারায়ণ এই বিষয়েও কিছু অতিরঞ্জন করেন নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটক' রচনার এক

বৎসর পূর্বে 'সংবাদ ভাস্কর' নামক পত্রিকায়ও চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,

'এখনকার কুলচূড়ামণি যাহারা কৃষ্ণ বিষ্ণু প্রভৃতির সন্তান, তাঁহারা কেবল বিবাহ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা নাই। কেহ কেহ পঞ্চাশৎ, কেহ অশীতি, কেহ শত, কোন ব্যক্তি সার্ধশত, কিন্তু তিন শত ষষ্ঠী বিবাহের অধিক শ্রুত হয় নাই। উক্ত কুলগর্বিত মহাশয়দিগের বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট এই যে সপ্তম বর্ষ হইতে শমন সদন গমন পর্যন্ত সর্বদাই মুখ্যকাল। কন্যা বিবাহের কাল প্রসূতির উদর হইতে নির্গতাবধি অন্তিমকাল পর্যন্ত দম্পতীর মধ্যে ন্যূনাধিক্য বয়সে বিবাহের বাধা নাই, সপ্তম বর্ষীয় বালকের সহিত অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধার এবং ত্রয়োদশ দিবসের কন্যার সহিত নবতি বর্ষীয় প্রাচীনের অনায়াসে বিবাহ হইতেছে।······অনেকানেক বিবাহোপজীবী মহাশয়েরা কুলে দোষ হইবার আশঙ্কায় এ পথে কন্যাদিগের বিবাহ দেন না, তাহাকে যম্বরা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ যম তাহার বর। আরো অনেক কুলভি-মানী মহাশয়দিগের ধারণাবতী মতির ন্যূনতা প্রযুক্ত পরিচারকের হস্তে অখজিন স্বরূপ বিবাহের এক নির্দিষ্ট পত্র আছে। ভৃত্য সেই লিপি দৃষ্টে কোন স্থানে কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা বলিলে তদনুসারে শ্বশুরালয়ে গমন করেন।'

উদ্ধৃত 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'সংবাদ ভাস্করে'র বিবরণগুলি যদি আংশিকও সত্য হয়, তথাপি রামনারায়ণ তর্করত্নের বর্ণনার মধ্যে যে কোন অতিরঞ্জন দোষ ঘটিয়াছে, তাহা মনে করা যায় না।

'স্বকৃতভঙ্গ' কুলীনদিগের অনাচার কুলীনদিগের অপেক্ষাও ঘৃণ্য প্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছিল, সমসাময়িক একজন কবিও তাহাদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

যে জন স্বকৃত ভঙ্গ ভূমিতে না পড়ে অঙ্গ
শতেক দুশত যার নারী।
যেখানে যেখানে যায়, জামাই আদরে খায়
মুদ্রা লইবারে বাড়ে জারি॥
দু চারি বৎসর পরে যদি পতি পায় ঘরে—
তাহে হয় এরূপ ঘটন।
টাকা দেহ এই বুলি প্রায় হয় চুলাচুলি
দ্বন্দ্বে হয় রজনী বঞ্চন॥

ইথে কি সতীত্ব থাকে জাতিকুল কেবা রাখে
বিবাহ সে সংস্কার মাত্র।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী'তে 'কুলীন মহিলা বিলাপ' নামক একটি কবিতা পাওয়া যাইবে। ইহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনের বহুবিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ করেন, সেই উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। মার্জিত রুচিবোধের ভিতর দিয়া কবিতাটি রচিত হইলেও ইহাতেও কুলীন-কন্যার অন্তর্বেদনা এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করিয়া কুলীন নারী বলিতেছে—

'কি জানাব জননি গো হৃদয়ের ব্যথা!
দাসীর(ও) এহেন ভাগ্য না হয় সর্বথা।
কী ষোড়শী বালা কিংবা প্রবীণা রমণী
প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।
কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চোক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে।
কত পাপ স্রোত মাতা প্রবাহিত হয়,
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়।
হা নৃশংস অভিমান কৌলীন্য আশ্রিত!
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষস পালিত।
আমাদের যা হবার হয়েছে জননি—
কর রক্ষা এই ভিক্ষা এ' সব নন্দিনী।'

সুতরাং রামনারায়ণের বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত নহে, তাহা ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে।

বহুবিবাহ প্রথা যে কেবল মাত্র কৌলীন্য প্রথার সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল, তাহাই নহে, একদিক দিয়া কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের অনুকরণে অন্যান্য উচ্চবর্ণের মধ্যে যেমন কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি হইয়া তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহের দোষ প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই অন্যদিক দিয়া কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত ভাবেও সমাজে বহুবিবাহ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। কুলীন সমাজের বহুবিবাহের সঙ্গে কুলীনেতর সমাজের বহুবিবাহের মূল পার্থক্য,—কুলীন স্বামীদিগের যেমন পত্নীদিগের ভরণপোষণের কোন দায়িত্ব ছিল না, শেষোক্ত শ্রেণীর বহুবিবাহে তেমন ছিল না, সেখানে

সকল পত্নীকেই ভরণপোষণ করিবার দায়িত্ব বহুপত্নীক স্বামীই গ্রহণ করিতেন, নিজ গৃহে সকল স্ত্রীরই স্থান হইত। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এই শ্রেণীর বহুবিবাহের মূল অবলম্বন ছিল। ইহার মধ্যে একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইত। বহু পত্নী একই স্বামীকে আশ্রয় করিয়া একই গৃহে বাস করিবার ফলে দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন পত্নীর মধ্যে যে স্বাভাবিক ঈর্ষ্যামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হইত, তাহাতে অধিকাংশ পারিবারিক জীবনই বিষাক্ত হইয়া উঠিত। দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনের ফলে কুলীন পুরুষের বহুবিবাহ এবং কুলীন কন্যাদিগের এক পাত্রে বহু জনের বিবাহ দেওয়া যেমন সামাজিক দিক দিয়া অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই শ্রেণীর বহুবিবাহ তেমন ছিল না। ইহা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাকৃত ছিল, সুতরাং ইহার যথার্থ রূপটি নাটকের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া তাহার দোষ ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে, তাহা দ্বারা সামাজিক এবং পারিবারিক কল্যাণ সাধন যত সহজে সম্ভব ছিল, কুলীনের বহুবিবাহের দোষ-ত্রুটিমূলক নাটকের মধ্য দিয়া তাহা তত সহজ ছিল না। কৌলীন্য-নিঃসম্পর্কিত বহুবিবাহ প্রথার দোষ নির্দেশ করিয়াই এদেশে নাটক অধিক রচিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর বহুবিবাহ পৃথিবীর বহু প্রাচীন দেশেই প্রচলিত ছিল এবং এখনও বহু আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নানা কারণেই বিশেষ লক্ষ্য ছিল, সেই সকল সমাজের মধ্যেই বহুবিবাহ প্রথা সামাজিক প্রয়োজনেই একদিন উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা ভোগবিলাসী ব্যক্তিদিগের ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার কাযেই নিয়োজিত হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন যেমন কুলীনের বহুবিবাহের নিন্দা করিয়া তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই তিনি এই শ্রেণীর সাধারণ বহুবিবাহ প্রথার নিন্দাসূচক 'নব নাটক' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। তাহা ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয়। ইহাই বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক এবং পরবর্তী বহু নাটকেই ইহার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং নাটকখানি বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য—

রামনারায়ণের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'নব নাটক'ও তাঁহার পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকাল হইতেই নাট্যাভিনয়ের দিকে গভীর

অনুরাগ ছিল। তাঁহারা স্বগৃহেই একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই জোড়াসাঁকো নাট্যশালা নামে পরিচিত। এই নাট্যশালায় অভিনয় করিবার জন্য উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভূত হইলে, ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ বহুবিবাহ বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ইংরেজি সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তারপর রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই ভার দিয়া বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করেন। রামনারায়ণ 'নব নাটক' রচনা করিয়া দুইশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রামনারায়ণ নাটকখানি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রে তিনি এইভাবে গুণেন্দ্রনাথের উল্লেখ ও তাঁহার নাটকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন :

"মহাশয়! আপনকার এই অল্পবয়সে অনল্প দেশহিতৈষিতা বদান্যতা ও রসজ্ঞতাদি গুণগ্রাম সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সন্তোষ প্রকাশার্থ এই নব-নাটক স্বরূপ কুসুমমালা মহাশয়কে প্রদান করিলাম। ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কু প্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।"

নাট্যোল্লিখিত কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ—

প্রথমতঃ নান্দী ও অতঃপর নটী এবং সূত্রধার প্রবেশ করিয়া যথারীতি বিষয়বস্তুটির ইঙ্গিত দিয়া গেল, তারপর মূল কাহিনী আরম্ভ হইল। গবেশবাবু গ্রাম্য জমিদার, তাঁহার পত্নীর নাম সাবিত্রী, তাঁহাদের দুই পুত্র—সুবোধ ও সুশীল। গবেশবাবুর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে, তিনি তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বর্তমানেই বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার কয়েকজন স্তাবক এই বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। দুই একজন সমাজ-সংস্কারক ইহার বিরোধিতা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। গবেশবাবু চন্দ্রলেখা নাম্নী এক বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া গৃহে তুলিলেন। সাবিত্রী অতি সুশীলা, তিনি স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহ করাতে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু চন্দ্রলেখা তাঁহার ও তাঁহার দুইটি পুত্রের উপর অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। গবেশবাবুকে সে অল্পদিনেই সম্পূর্ণ বশ করিয়া লইল। স্বামীর সম্পত্তি নিজের নামে লিখাইয়া লইয়া প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও তাহার পুত্রদিগকে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিল। সাবিত্রীকে অন্তঃপুর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া তাঁহার নিমিত্ত বাহির আঙ্গিনায় এক গোলপাতার ঘর বাঁধিয়া

দিল। সাবিত্রী তাহাতেই আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মাতার এই দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধ দেশান্তরী হইল। সাবিত্রীর উপর চন্দ্রলেখার অত্যাচার ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার কেবল চক্ষুজল সার হইল। একদিকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য দুর্ভাবনা ও অন্যদিকে চন্দ্রলেখার অত্যাচার এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া সাবিত্রী আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোনদিন কোন দুঃখভোগে তাঁহার অভ্যাস ছিলনা। ক্রমে তাঁহার সকল অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন। নানা সাংসারিক দুশ্চিন্তায় গবেশবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, অল্পদিনের মধ্যে তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। মাতার সম্পর্কে এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সুবোধ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া মাতাপিতা উভয়েরই মৃত্যুসংবাদ পাইল। মাতার জন্য তাহার আক্ষেপের আর সীমা রহিল না। তারপর যখন শুনিতে পাইল, মাতা আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, তখন সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার এই মূর্ছা আর ভাঙ্গিল না।

রামনারায়ণের 'নব নাটক' রচনার পূর্বে দীনবন্ধুর প্রথম দুইখানি নাটক অর্থাৎ 'নীল-দর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের সব কয়খানি নাটকই প্রকাশিত হইরা গিয়াছে। 'নব নাটকে'র এক স্থলে (তৃতীয়াঙ্ক) রামনারায়ণ দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'র কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনার যে একটি ঐতিহাসিক মূল্য ছিল, 'নব নাটকের' তাহা নাই। বিশেষতঃ 'নব নাটক' রচনাকালীন রামনারায়ণের সম্মুখে তৎকালীন বাংলা নাট্য-সাহিত্য রচনার একটি আদর্শ বর্তমান ছিল—'নব নাটকে' যে তাহাই কতক অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান—নাট্য-কাহিনীর পরিণতি। 'নব নাটক' পূর্ণাঙ্গ বিষাদান্তক নাটক—কিন্তু ট্র্যাজিডি নহে। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক ও দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটক বিষাদান্তক করিয়া রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই নাটক দুইখানি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছিল। অতএব যদি বলা যায় যে, রামনারায়ণ তাঁহাদেরই আদর্শে তাঁহার 'নব নাটকের' কাহিনী সুস্পষ্টভাবে বিষাদান্তক করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ভুল হইবে না। এমন কি, একথাও

বলা যাইতে পারে যে, ইহার সঙ্গে 'নীল-দর্পণের' বিয়োগাত্মক পরিণতির কাহিনীগত অনেক সাদৃশ্য আছে। 'নব নাটকের' ভাষা 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহার শিক্ষিত চরিত্রের ব্যবহৃত সাধু ভাষা অনেকটা প্রাঞ্জল হইয়া আসিয়াছে এবং স্ত্রী ও অন্যান্য অশিক্ষিত চরিত্রের ভাষাও গ্রাম্যতামুক্ত হইয়া সাহিত্যিক পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছে। এই ভাষা মাইকেল কিংবা দীনবন্ধুর ভাষা নহে। ভাষা বিষয়ে রামনারায়ণের একটি বিশিষ্ট স্বকীয়তা ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের ভিতর দিয়া যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার আরও পরিণত রচনা 'নব নাটকের' ভিতর দিয়াও তেমনই প্রকাশ পাইয়াছে। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র ভাষা ক্রমপরিণতির ধারায় অগ্রসর হইয়া গিয়া 'নব নাটকের' মধ্যে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই ধারাটি রামনারায়ণের নিজস্ব সৃষ্টি—তাঁহার বিবিধ নাট্য ও গল্প রচনার মধ্য দিয়াই এই ধারাটি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। একথা সত্য যে, ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের রচনাসমূহ প্রচারিত হওয়ার ফলে বাংলা গদ্যের একটা বিশিষ্ট রূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, রামনারায়ণের ক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র এবং সেই স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে তাঁহার নিজস্ব বিষয়ের উপযোগী করিয়া রামনারায়ণ নিজেই তাঁহার ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইজন্যই এই বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক কোন গদ্য লেখকের প্রভাব তাঁহার উপর অনুভব করা যায় না। 'নব নাটকের' আর একটি প্রধান গুণ—ইহার মধ্যে কোথাও 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র মত পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত দীর্ঘ পদ্য ব্যবহৃত হয় নাই। মাত্র এক স্থলে সংক্ষিপ্ত একটি পদ্যের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নগণ্য। এই বিষয়ে যে তিনি দীনবন্ধুর নিকট ঋণী তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী'র মধ্যে সুদীর্ঘ পদ্য রচনার ব্যবহার আছে। এই বিষয়ে দীনবন্ধু যে রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' অনুকরণ করিয়াছেন, একথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহা 'নব নাটকের' একটি প্রধান গুণ। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রামনারায়ণেরই প্রাপ্য কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। কারণ ইতিপূর্বে প্রকাশিত মাইকেল মধুসূদনের কোন নাট্য রচনার মধ্যেই মিত্রাক্ষরে রচিত কোন পদ্য ব্যবহৃত হয় নাই। রামনারায়ণের 'নব নাটক' রচনায় তাহার প্রভাব কার্যকর হইয়া থাকিবে কিংবা রামনারায়ণ

তাঁহার নাট্য-ভাষার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে ইহার অনাবশ্যকতা নিজেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় নাটকের মধ্যে মাইকেল কর্তৃক মিত্রাক্ষর রচনা পরিত্যক্ত হইলেও তাঁহার প্রভাব দীনবন্ধুর প্রথম দিককার রচনাগুলির উপর কার্যকর হইতে পারে নাই। অতএব মাইকেলের নাট্য-ভাষার প্রভাব সমসাময়িক নাট্যকারদিগের মধ্যে কার্যকর হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে না। এমন কি, রামনারায়ণ মাইকেল ও দীনবন্ধুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তখন পর্যন্ত নান্দী ও প্রস্তাবনার অংশ তাঁহার 'নব নাটক' হইতেও পরিত্যাগ করেন নাই। 'নব নাটকের' মধ্যে কোন কোন স্থলে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণের' প্রভাব থাকিলেও ইহাতে মাইকেলের কোন নাট্য রচনার প্রভাব অনুভূত হয় না। অতএব 'নব নাটক' রচনার ভাষাগত সার্থকতার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রামনারায়ণেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়।

'নব নাটকের' মধ্যে রামনারায়ণ ইংরেজি নাটকের অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্গত করিয়া গর্ভাঙ্ক বা Scene ব্যবহার করিয়াছেন. 'কুলীন কুল সর্বস্ব'-নাটকে তাহা করেন নাই। এই বিষয়ে যে রামনারায়ণ মাইকেল ও দীনবন্ধুকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'কে একটি সমাজচিত্র বা সামাজিক নক্সা বলা হইলেও 'নব নাটক' নাটকের মর্যাদা লাভের অধিকারী। ইহার মধ্যে কোন কোন চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। দুই একটি এখানে আলোচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে।

প্রথমতঃ গ্রাম্য জমিদার গবেশবাবুর চরিত্র। ইহাকে নাটকের নায়ক বলা যাইতে পারে। তাঁহার মধ্যে বিলাসিতা-প্রিয় ও নিষ্কর্মা গ্রাম্য জমিদার-দিগের একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোষামোদকারী পরিবৃত হইয়া তিনি 'মূর্খের স্বর্গে' বাস করেন। নিতান্ত খেয়ালবশতঃই তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তা নাই, নিজে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কিছু করিতে পারেন না, সেইজন্য পরিণাম চিন্তা না করিয়াই তিনি এই কাজ করিয়া ফেলিলেন। অতএব এই কার্য নিতান্ত তাঁহার চরিত্রানুযায়ীই হইয়াছে। তারপর বিবাহ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই যখন ইহার বিষময় ফল বুঝিতে পারিলেন, তখন এই কার্যের জন্য তাঁহার আর অনুতাপের সীমা রহিল না। তাঁহার প্রথম পরিণীতা পত্নীর জন্য তাঁহার সহানুভূতি কোনদিন তিনি গোপন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে

তিনি ভয় করেন। তাঁহার মত ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের পক্ষে তাহাও নিতান্তই স্বাভাবিক। তিনি মনে মনে একথা বুঝেন 'স্ত্রৈণ হওয়া কাপুরুষের কর্ম' (৫ম অঙ্ক)। তিনি স্ত্রৈণ নহেন, তবে অবস্থাবিপাকে পড়িয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীকে তিনি ভয় করিয়া চলেন। এই ভয় হইতেই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার মধ্যে একটি রক্তমাংসের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়ীর ভিতর হইতে কান্নার শব্দ শুনিয়া তিনি প্রথমা স্ত্রীর বিপদ আশঙ্কা করিয়া অধীর হইয়া উঠেন। তিনি বলেন, 'চন্দ্রলেখা আমায় মাত্যে পাননি বল্যে সাবিত্রীকেই কি গে, মারলেন নাকি। আহা! তাহ'লে মাগী আর বাঁচবে না, একে পুত্রশোকে কাতর, অতি শীর্ণ হয়েছে।' (৫ম অঙ্ক)। এই বলিয়া তিনি অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাঁহার আচরণ ও তাঁহার চরিত্রানুযায়ী হইয়াছে। এই নাটকের মধ্যে গবেশবাবুর আদ্যোপান্ত একটি সুস্পষ্ট মানবিক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

তারপরই গবেশবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখার কথা উল্লেখ করিতে হয়। চন্দ্রলেখা বৃদ্ধ স্বামীর তরুণী ভার্যা। শুধু তাহাই নহে, চন্দ্রলেখার এক বর্ষিয়সী সতীন ও তাহার দুই বালক পুত্র আছে। যে সংসারের মেয়েরা বালিকা বয়সেই বারব্রতের ভিতর দিয়া 'সতীন কাটিয়া আলতা পরিতে' শিখে,চন্দ্রলেখা সেই সংসারেরই সন্তান। অতএব তাহার নিকট তাহার হৃভভাগিনী সতীন ও তাহার দুই পুত্রের উপর যে ব্যবহার করা সঙ্গত, সেই রকম ব্যবহারই পাইয়া থাকি। স্বামীর নিকট সে স্বাভাবিক প্রেম ও প্রীতি পাইতে পারে না —কারণ, তাহাদের মধ্যে বয়সের অনেক ব্যবধান। অতএব স্বামীর প্রতি তাহার কোন কর্তব্যবোধ নাই। বরং তাঁহার প্রতি তাহার আক্রোশ থাকিবার কথা। কারণ, সে বুদ্ধিমতী; সেইজন্যই সে বুঝিতে পারে যে, তাহার নারীজন্ম ব্যর্থ করিবার জন্য তাহার বৃদ্ধ স্বামীই দায়ী। তাহার কোন শিক্ষা বা সংস্কার নাই। অতএব এই অবস্থায়'সে স্বামীর প্রতি কি ব্যবহার করিতে পারে, তাহাও সহজেই অনুমেয়। রামনারায়ণ তাঁহার নাটকের মধ্যে চন্দ্রলেখার চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্যগুলি আনুপূর্বিক রক্ষা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ইহার অতিরিক্তও চন্দ্রলেখার যে একটি পরিচয় আছে, তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা সখীগণের সঙ্গে তাহার ব্যবহার। চপলা ও চন্দ্রকলা চন্দ্রলেখার সখী। ইহাদের সঙ্গে আচরণে চন্দ্রলেখা একেবারে

নূতন মানুষ—সে এখানে চঞ্চলা ও হাস্যময়ী আনন্দ-প্রতিমা। তাহার এই পরিচয়টি প্রকাশ করিয়া নাট্যকার নিজেও তাহার প্রতি তাহার অবস্থার জন্য পাঠকের সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন তাহাকে চপলা ও চন্দ্রকলার সঙ্গে দেখিতে পাই, তখন যথার্থই এই বলিয়া তাহার জন্য দুঃখ হয় সে, গবেশ-বাবু তাহার পক্ষে কতই না অনুপযুক্ত। চন্দ্রলেখার নারীজীবনের সকল কামনা-বাসনাই জাগ্রত আছে, কিন্তু গবেশবাবুর নিকট হইতে তাহার কিছুই পূর্ণ হইবার নহে। অতএব গবেশবাবুর প্রতি এইজন্য পাঠকেরও আক্রোশের অন্ত নাই। এই ভাবটি যে নাট্যকার সার্থক ভাবে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই ন্যট্যকারের একটি বিশিষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই, চন্দ্রলেখা যে বৃদ্ধ স্বামীকে প্রহার করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, তাহার স্বাভাবিকতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

গবেশবাবুর প্রথমা পত্নী সাবিত্রীর চরিত্রটিও সুন্দর পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি একথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে, ইহার উপর দীনবন্ধু রচিত 'নীল-দর্পণে'র সাবিত্রী চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, রামনারায়ণের 'নব নাটকের' প্রভাব তাঁহার পরবর্তী কোন কোন নাট্যকারের মধ্যে অনুভব করা যায়। দীনবন্ধু তাঁহার একটি পরবর্তী নাটকের একটি পূর্ণ দৃশ্যের জন্য রামনারায়ণের 'নব-নাটকের' নিকট ঋণী; তাহা তাঁহার 'জামাই বারিকের' একটি সুপরিচিত দৃশ্য। 'জামাই বারিকে' পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী যে দৃশ্যে একটি চোরকে ধরিয়া তাহাকেই নিজেদের স্বামী বিবেচনা করিয়া প্রহার করিতেছে, সেই দৃশ্যটি 'নবনাটক' তৃতীয় অঙ্কের চোরের কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া আনুপূর্বিক রচিত। শুধু ভিত্তি করিয়াই নহে, দীনবন্ধুর ভাষার মধ্যেও অনেক স্থলে রামনারায়ণের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদের' এই সুপরিচিত হাস্যরসাত্মক উক্তিটি রাম-নারায়ণের 'নব নাটক' হইতে গৃহীত, যেমন 'একে বাপ তার বয়সে বড়' ('গোড়ায় গলদ')।

'নব নাটকের' তৃতীয় অঙ্কে সুধীর বলিছেন—'একে বাপ তায় বয়সের বড়ো—ঠাকুরদাদা হন পরিহাস করিতে পারি।' এখানে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে রামনারায়ণের 'নব নাটক' জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালায় বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'উভয় সঙ্কট' নামব ক্ষুদ্র নাটিকাটিও যে অনুরূপ বিষয়-বস্তু লইয়াই রচিত, তাহা ইহার কাহিনীটি অনুসরণ কারণেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এক ব্যক্তি দুইটি বিবাহ করিয়াছেন। দুই স্ত্রী লইয়াই তিনি সংসারে বাস করিতেছেন। স্বামীকে সেবা করিয়া পরিতুষ্ট করিবার কার্যে দুই পত্নীর মধ্যে সর্বদাই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। দুই পত্নী পরস্পরের নিন্দা এবং কুৎসা গ্রামময় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। একদিন গয়লানী বাড়ীতে দুধ দিতে আসিয়াছে। ছোট বৌ বাড়ীতে অনুপস্থিত, সে পাড়ায় বাহির হইয়া গিয়াছে, তেঁতুল সংগ্রহ করিয়া স্বামীর জন্য রান্না করিয়া তাহাকে তুষ্ট করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। গয়লানীর নিকট বড়বৌ ছোট বৌয়ের চরিত্র সম্পর্কে অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল, বলিল সে স্বৈরিণী, স্বাধীন ভাবে গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। রন্ধন কালে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাত্রাই সর্বাপেক্ষা তুমুল হইয়া উঠিল। বড় বৌ নিজের ইচ্ছা মত কুটনা কুটিয়া রাখিয়াছে। স্বামীকে সাধ করিয়া নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইবে। তাহা হইলেই স্বামী তাহার প্রতি অধিকতর প্রসন্ন হইবে। কুটনা কাটিবার কাজ শেষ করিয়া বড় বৌ জল আনিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল, ইতি মধ্যে তেঁতুল হাতে করিয়া লইয়া ছোট বৌ আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল বড় বৌ-র কাটা কুটনা রান্নাঘরে পড়িয়া আছে, তৎক্ষণাৎ সে পদাঘাতে তরকারিগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিল। তারপর নিজের মত করিয়া রান্না চাপাইয়া দিয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। বড় বৌ ফিরিয়া আসিয়া নিজের কাটা তরকারির অবস্থা দেখিয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, তারপর ছোট বৌর চাপান হাঁড়ি নামাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ছোট বৌ ফিরিয়া আসিল, দুইজনে তুমুল কলহ আরম্ভ হইল। গতকল্য কর্তা একাদশীর উপবাস করিয়াছেন, আজ তাঁহার পারণের দিন। বাহির হইতে ঘুরিয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন দুই স্ত্রী তাহার নিকট পরস্পরের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে অভিযোগ করিতে লাগিল। কর্তা ক্ষুধার্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তিনি আহার করিতে চাহিলেন। কিন্তু আহারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই, উঠানে কাটা তরকারী গড়াইতেছে, রান্নাঘরে আধ সিদ্ধ ভাত হাঁড়িতে কাদা হইয়া আছে। অন্নের আশা পরিত্যাগ করিয়া কর্তা চিঁড়েমুড়ি খাইয়া সে দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে চাহিলেন। ছোট বৌ তাহাকে ছাতু খাইতে দিল, বড় বৌ চিঁড়ে আনিয়া দিয়া তাহা খাইতে আদেশ করিল। ছোট বৌ চিঁড়ার

এবং বড় বৌ ছাতুর নিন্দা করিতে লাগিল, কর্তাকে কিছুই খাইতে দিল না। আহারের আশা পরিত্যাগ করিয়া কর্তা এইবার বিশ্রামের প্রার্থনা জানাইলেন। অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় গিয়া শুইলেন, তখন তাঁহার গা টিপিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ছোট বৌ তাহার এক পাশে এবং বড় বৌ আর এক পাশে গিয়া বসিল। দুইজনে প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা দুই দিক হইতে তাঁহার গা টিপিতে লাগিল। ক্ষুধার্ত দেহে অবসন্ন কর্তা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহাদের গা টেপার বিরাম হয় না। এই অবস্থার মধ্য দিয়া কর্তার দৈনন্দিন জীবন কাটে।

এই নাটকখানির দুইটি সপত্নী চরিত্রই যে 'জামাই বারিক' নাটকের দুই সপত্নী বগী আবাগী ও বিন্দী পোড়ারমুখীর মূল, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। কর্তার চরিত্রও 'জামাই বারিকে'র পদ্মলোচন চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ। রামনারায়ণের নাটকগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই তাহাদের মধ্যে দীনবন্ধুর নাটকের মূল প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। বহু-বিবাহবিষয়ক অধিকাংশ নাটকই প্রধানতঃ রামনারায়ণের নাটকগুলি অনুকরণ করিয়াই লিখিত হইয়াছে।

এইবার দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' নাটকখানির বিষয় আলোচনা করা যায়। ইহাতে একাধারে কৌলীন্য অন্যদিকে সাধারণের বহুবিবাহ উভয়ের উপরই আক্রমণ আছে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই-বারিক' ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিক হয়। নাট্যকার ইহাকে একখানি প্রহসন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার উদ্দেশ্য হিসাবে এই দুইটি ইংরেজি পদ প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছেন,

"Of all the blessings on earth the best is a good wife;
A bad one is the bitterest curse of human life.'

উদ্ধৃত পদ দুইটির মধ্যে প্রথমটির অর্থাৎ 'good wife'-এর blessings-এর কোন বিবররণ এই প্রহসনের মধ্যে নাই, দ্বিতীয় পদটিরও আংশিক পরিচয় আছে, পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নাই। দ্বিতীয় পদটি হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা ট্র্যাজেডির বিষয়, প্রহসনের নহে; কিন্তু নাট্যকার এই ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তুটিকেই প্রহসনের কার্যে লাগাইয়াছেন। দীনবন্ধুর স্বাভাবিক হাস্যরসপ্রবণতার গুণে জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় নিতান্ত লঘু হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ফলে ইহার কতক-

গুলি ত্রুটিও অপরিহার্য হইয়া রহিয়াছে। প্রথমে 'জামাই বারিকে'র কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা যাইবে—

কেশবপুরের জমিদারের নাম বিজয়বল্লভ। তিনি তাঁহার কুলীন ঘরজামাই-দিগের বাসের জন্য বাহির বাড়ীতে একটি ব্যারাকের মত বড় ঘর করিয়া রাখিয়াছেন, জামাইরা সেখানেই থাকে। জামাই, ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নী-জামাই, নাৎ-জামাই, জামাইয়ের জামাই, সবাই একসঙ্গে সেখানে আছে। অন্তঃপুর হইতে যে রাত্রির জন্য যাহাদের নামে পাশ বাহির হয়, সে রাত্রির জন্য কেবল সেই সব জামাই অন্তঃপুরে যাইতে পায়। এই ব্যারাকের মধ্যে তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে। শ্বশুরান্নে পরিপুষ্ট জামাইগণ ব্যারাকে থাকিয়া কেহ সখীসংবাদ, কেহ পাঁচালীর ছড়া গাহিয়া, কেহ বা গাঁজা টিপিয়া সময় কাটাইয়া থাকেন। ঝি-চাকর তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে—শ্বশুর কিংবা শালা-সম্বন্ধীরা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকান না। ইহাই জামাই-বারিক। অভয়কুমার বিজয়বল্লভের ঘর-জামাই এবং এই জামাই-বারিকের জামাইদিগের একজন। কিন্তু 'অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়। অভয়ের পত্নীর নাম কামিনী —সে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। অভয়কে তাহার মনে ধরে নাই।' সে তাহাকে নিতান্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। একদিন কামিনী অভয়কে তাহার শয়নগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। অভিমানে অভয় নিজের বাড়ী চলিয়া গেল। বিজয়বল্লভ একটু সদাশয় ব্যক্তি, তিনি অভয়কে ফিরিয়া আসিবার জন্য বার বার তাহার বাড়ীতে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। বাড়ীতে অভয়ের কেহ নাই, তথাপি অভিমানবশতঃ সে শ্বশুরগৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না।

অভয়ের এক প্রতিবেশী বন্ধু ছিল—তাহার নাম পদ্মলোচন। পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী—বগলা ও বিন্দুবাসিনী। দুই সতীনে সর্বদা তুমুল কলহ বাধিয়া থাকিত। পদ্মলোচন ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, দুই স্ত্রীর নির্যাতনে তাহার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল। কিছুদিন ইতস্ততঃ করার পর অভয় পুনরায় জামাই-বারিকে গেল। অন্তঃপুরে যাইবার অনুমতি পাইয়া সে কামিনীর শয়ন-গৃহে গেল, সেই দিনই কামিনী তাহাকে অপমানিত করিল, এমন কি পদাঘাত করিতে চাহিল। ইহাতে দারুণ অপমান বোধ করিয়া অভয় ক্রোধে ও ঘৃণায় শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তারপর দুই স্ত্রী কর্তৃক নির্যাতিত প্রতিবেশী পদ্মলোচনকে সঙ্গে লইয়া উভয়েই বৈষ্ণব সাজিয়া একেবারে,

বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কামিনী কৃতকর্মের জন্য সুগভীর অনুতপ্ত হইল এবং তাহার প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ ময়রা-দম্পতীকে সঙ্গে করিয়া অভয়ের সন্ধান করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে অভয় ও কামিনীর পুনর্মিলন হইল, অভয় কামিনীকে ক্ষমা করিল। বিজয়বল্লভ তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং বৃন্দাবনে আসিলেন। পদ্মলোচন নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাহার দুই স্ত্রী ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ করিল, সমদুঃখ-ভাগিনী দুই সপত্নীর মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির সঞ্চার হইল। বৃন্দাবনে থাকিয়া পদ্মলোচন এই সংবাদ পাইল। তারপর সকলে মিলিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল।

হাস্যরস-সৃষ্টির দিক দিয়া দীনবন্ধুর এই রচনাখানি তাঁহার প্রহসন-গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে বলিতে হয়; কিন্তু তথাপি একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহা কতকগুলি অতিরঞ্জিত সামাজিক চিত্রে ভারাক্রান্ত। দীনবন্ধু এখানে বহুবিবাহ ও কৌলিন্য এই দুইটি সামাজিক প্রথাকেই একসঙ্গে আক্রমণ করিয়াছেন; বহুবিবাহের দোষত্রুটি দেখাইতে গিয়া তিনি রামনারায়ণের 'নব-নাটকের' কাহিনীর উপরই আরও একটু রঙ্ চড়াইয়া লইয়াছেন, কৌলীন্যের দোষত্রুটি দেখাইতে গিয়া তাঁহার নিজস্ব মৌলিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু দুইটি চিত্রই তাঁহার পরিকল্পনায় একটু অতিরঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'জামাই-বারিক' প্রহসন, 'নব-নাটকে'র মত বিয়োগান্তক সামাজিক নাটক নহে, সেইজন্য ইহার অতিরঞ্জন-দোষ তাঁহার রচনার মৌলিক ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

'জামাই-বারিক' প্রহসন হইলেও দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের মতই ইহাতেও নাট্যিক ঘটনার ক্রমবিকাশ ও চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কেবল মাত্র একটি সামাজিক চিত্র বা নক্সা নহে। কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার একটি গতি আছে, এই গতিবেগ দ্বারাই পাঠক অনায়াসে ইহার শেষ পর্যন্ত উপনীত হইতে পারেন।

'জামাই-বারিক' প্রহসনের নায়ক অভয়কুমার। তাহাকে কুলীন জামাইয়ের একটি Type বা ছাঁচ করিয়াই সৃষ্টি করা হয় নাই, তাহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রক্তমাংসের দেহাশ্রিত প্রাণের সুস্পষ্ট স্পন্দন অনুভব করা যায়,

তাহার এই প্রাণ-স্পন্দনের ভিতর দিয়াই তাহার স্বকীয় সত্তার নিজস্ব পরিচয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে জামাই-বারিকের জামাতাদিগের সঙ্গে একাকার হইয়া যায় নাই। সে কুলীনের জামাতা এই পরিচয়ই তাহার সর্বস্ব নয়; সে অভয়কুমার, তাহার একটি বিশিষ্ট পরিচয় আছে, জামাই-বারিকের আর কোন জামাতার সে পরিচয় নাই; সেই পরিচয়টিই দীনবন্ধু সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া অভয়কুমারকে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। বিজয়বল্লভ নিজেও বুঝিয়াছেন, 'অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়।' সে দরিদ্র, গৃহে তাহার কেহ নাই; সেইজন্য দায়ে পড়িয়া ঘর-জামাই হইতে হইয়াছে, কিন্তু সেইজন্য সে আত্মবিক্রয় করিয়া বসে নাই, তাহার আত্মাভিমান অত্যন্ত সজাগ, সেখানে কেহ তাহাকে আঘাত করিলে দরিদ্র হইয়াও সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। অভয়কুমারের এই বিশিষ্ট চারিত্রিক গুণটির উপরই নাট্যকার তাঁহার এই কাহিনী কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন—ইহাই কাহিনীর মূল। ঘরজামাইয়ের আত্মাভিমান থাকিলে যাহা হয়, এই কাহিনীতে সহজ ভাবে তাহাই হইয়াছে।

শ্বশুর বিজয়বল্লভ যেমন জানেন অভয় অভিমানী, স্ত্রী কামিনীও তাহা তেমনই জানে। অভিমান থাকা সত্ত্বেও শ্বশুর তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, কিন্তু স্ত্রী কামিনীর তাহা অসহ্য হয়—কারণ, অভয় অন্যদিক দিয়া অপদার্থ, বিদ্যা ধন সৌন্দর্য কিছুই নাই, থাকিবার মধ্যে এক অভিমানই আছে—ইহা অশিক্ষিতা ধনিদুহিতার পক্ষে স্বভাবতই অসহ্য। সেইজন্য সে তাহাকে তাহার এই অভিমানের উপরই বার বার আঘাত করিয়া তাহার উপর দিয়া এক নিষ্ঠুর আক্রোশ মিটাইয়া লয়। এই আক্রোশ না মিটাইয়াও যে তাহার অন্তরের জ্বালা জুড়ায় না, সেইজন্যই বার বার অভয়ের এই দুর্বলতার সুযোগটুকু লইতে ছাড়ে না। শীতের রাত্রি—অভয় ও কামিনী উভয়েই লেপ মুড়ি দিয়া শুকাইয়া আছে, ঘরের প্রদীপটা নিবু নিবু, এমন সময় সহসা কামিনী অভয়কে আদেশ করিল, 'প্রদীপটেয় তেল দাও।' অভয় বলিল, 'তুমি দাও।' কামিনী উত্তর দিল, 'আমি আরাম করে শুইচি, তুমি গিয়ে তেল দিয়ে এসো।' অভয় বলিল, 'আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্চি? তুমি গিয়ে তেল দাও।' কামিনীর বড় রাগ হইল, বলিল, 'আমার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দেব।' অভয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল এবং গদিতে ধপ্ ধপ্ করিয়া কয়েকবার লাথি মারিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। তারপর কামিনী পিছন

পিছন গিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। অভয় সারারাত্র বাহিরে কাটাইয়া পরদিন একেবারে নিজের দেশে চলিয়া গেল। ধনী শ্বশুরের গৃহে দরিদ্র কুলীন জামাতার এই শোচনীয় দাম্পত্য জীবনের চিত্রটি দীনবন্ধুর বর্ণনার গুণে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অভিমানাহত অভয় যে দৃঢ় পাদক্ষেপে গভীর রাত্রে কামিনীর কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—এই বর্ণনার গুণেই সেই পদধ্বনিটি পর্যন্ত যেন শুনিতে পাওয়া গেল।

কামিনী বুদ্ধিমতী, সে অভয়কে চিনিয়াছে; অতএব ভুল করিয়া যে সে অভয়কে আঘাত করে, তাহা নহে—তাহার নারীজীবনের ব্যর্থতার আক্রোশ মিটাইবার জন্যই সে ইচ্ছা করিয়াই অভয়কে আঘাত করে। আর দশজন ঘরজামাই যে রকম হয়, অভয় সেই রকম নহে বলিয়াও কামিনীর অভিযোগ। হাবার মা যখন বলিল যে, ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার পর অভয় 'দোর ধরে কাঁদতে লাগলে' তখন সে বলিল, 'দূর পোড়াকপাল, মিথ্যাবাদি, সে কাঁদবের ধন, আমাকে কত লাগ্‌ল। যদি কাঁদ্‌ত, আমি তখনই দোর খুলে দিতেম।' অতএব দেখা যাইতেছে, কামিনী অভয়ের কাছে যে খুব বেশী একটা কিছু চায়, তাহাও নয়; কারণ, আর দশজনের কুলীন স্বামী দেখিয়া তাহার এই সংস্কার হইয়াছে যে, ইহাদের কাছে আর বিশেষ কিই বা পাওয়া যাইতে পারে। তবে তাহার প্রতি স্বামীর একান্ত অনুরক্তিটুকু যে যথার্থই দাবি করিতে পারে; কারণ, দশজনের স্বামীর সে তাহা দেখে, কিন্তু অভয়ের চরিত্রের এমনই গুণ যে তাহার ভাগ্যে তাহাও জোটে না। কামিনীর দিক দিয়াও কি ইহা কম দুঃখের কথা? যাহা হউক, সে কথা আরও বিস্তৃত ভাবে পরে বলিব, এখন অভয়ের কথাই বলি।

এই একান্ত আত্মাভিমানী অভয়ের আর একটি বড় পরিচয় আছে—সে যথার্থই কামিনীকে ভালবাসে; তবে তাহার ভালবাসা সে আর দশজন স্ত্রৈণ স্বামীর মত কথায় ও কাজে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে না, এই মাত্র পার্থক্য। কামিনীর নিকট হইতে অভয় আঘাত পায়, কিন্তু তথাপি তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ অস্বীকার করিতে পারে না। অপমানের পরও যে সে কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর শ্বশুরের অনুরোধ পালন করিয়া পুনরায় তাহার গৃহে যায়, ইহা কি একান্তই তাহার গৃহে অন্নাভাবের জন্য? তাহা নহে। কারণ, এমন আত্মাভিমানী ব্যক্তি কেবলমাত্র অন্নের অভাবের জন্য অভিমান বিসর্জন দিতে পারে না, সে অনাহারে মরিতে পারে তথাপি

অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না। সেখানে আর একটি প্রবলতর আকর্ষণ আছে, তাহা কামিনীর প্রতি তাহার প্রকৃত ভালবাসা। তথাপি এই বলিয়া সে পুনরায় শ্বশুর-গৃহে যাইতে সম্মত হইল যে, 'এবারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি, তা হলে তার মুখে নাথি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।' তারপর দ্বিতীয় বার অপমানের পর সে যখন বৈষ্ণব সাজিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল, তখনও সেখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'আর একটা পরীক্ষা ক'রে দেখি; শ্বশুরবাড়ী যাই, যদি স্নেহমমতা করে, তবে সংসারধর্ম করি। কখন কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয়।' সে বৃন্দাবনে চলিয়া আসিয়া বৈরাগী সাজিতে পারে, কিন্তু কামিনীর আশা একেবারে ছাড়িতে পারে না, সে যে তাহার মত দরিদ্রের সর্বস্ব! সেইজন্য পদ্মলোচন যখন বলে, 'পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও', তাহার উত্তরেও হতভাগা এই বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, 'পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়েছিল।' ইহার অর্থ এই, শুধু পদাঘাত করিতে চাওয়ায় আর বিশেষ কিই বা হইয়াছে। রাগের ঝোঁকে প্রথমে কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিয়া এখন যেন তাহার জন্য এই বলিয়া অনুতাপ হইতেছে যে, এই বিষয়টা লোক-জানাজানি না হইলেই ভাল হইত। আত্মাভিমানের সঙ্গে পত্নীর প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রেমের সুকঠিন দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই অভয়ের আত্মপ্রকাশ হইয়াছে। ছদ্মবেশিনী বৈষ্ণবীর সঙ্গে যখন পদ্মলোচন অভয়কে কণ্ঠীবদল করিতে বলিল, তখনও অভয় ইতস্তত: করিতে লাগিল, 'আর একবার দেখলে হত।' সে এ কার্যে 'সম্পূর্ণ মত' দিতে পারে নাই, কামিনীর আশা সে যে একেবারে বিসর্জন দিতে পারে না। সে যখন কামিনীর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইল, তখনই কেবল দুই দিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া, গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া, দুই দিন উপবাসী থাকিয়া এই কণ্ঠীবদলে সম্মতি দিল। নতুবা সে কামিনীর কাছে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিয়াছিল। অতএব কামিনীর প্রতি তাহার ভালবাসা সে অন্তরের অন্তরে অস্বীকার করিতে পারে না।

অভয়কুমারের আত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল। সে যে জামাই-বারিকের আশ্রিত হইয়াও ইহার অন্যান্য জামাই হইতে স্বতন্ত্র, এই বিষয়ে সে সর্বদা অত্যন্ত সচেতন ছিল। বাহিরের দিক দিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য, কিছুই ছিল না, অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক দিয়া সে অন্যান্য জামাইয়ের মতই দরিদ্র ও মূর্খ, কিন্তু তথাপি কেন জানি না তাহার অন্তরে এই দুরপনেয় অভিমান স্থান

পাইয়াছিল যে, সে তাহাদের সঙ্গে বাস করিয়াও তাহাদের একজন নহে বলিয়াই মনে করিত; এইখানেই কামিনীর সঙ্গে তাহার বিরোধের সৃষ্টি হইত। অন্যান্য ভগ্নীরা তাহাদের স্বামীদিগের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করিত, কামিনীও তাহার স্বামীর সঙ্গে সেই প্রকারই ব্যবহার করিতে যাইত; কিন্তু অভয় তাহার প্রতিবাদ করিত বলিয়াই প্রথম হইতেই কামিনীর সহিত তাহার বিরোধ বাঁধিয়া যাইত। দ্বিতীয় বারে যখন অভয় কামিনীর নিকট গেল, তখন কামিনী অভয়কে বলিল—'টেবিলের উপর এক বোতল গোলাপ জল আছে, ওটা সব তোমার গায়ে ঢেলে দাও; আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগড়ে রগড়ে মাখ, তারপর আমার কাছে এস।' শুনিবামাত্র অভয় বলিল, 'আমি তা করব না।' কামিনী নজির দেখাইয়া বলিল, 'অন্য অন্য জামাইরা ত করে।' অভয় উত্তর দিল, 'তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান, তাই করে।' তারপর বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, 'ও কথাগুলি আমি ভালবাসি না, ওতে আমার অপমান বোধ হয়।' ইহার মধ্য দিয়া অভয়ের চরিত্রটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে জামাই-বারিকের আশ্রিত হইয়াও আত্মবোধ বিসর্জন দেয় নাই, জামাই-বারিকের অন্যান্য জামাইরা কি পদার্থ, তাহা সে বুঝে এবং নিজেকে কিছুতেই সে তাহাদের সঙ্গে এক করিয়া দেখিতে পারে না। অথচ কামিনী বুঝিতে পারে না, তাহার এই স্বাতন্ত্র্য কিসে? ইহা তাহার পক্ষে বুঝিবার কথাও নহে; কারণ, অভয়ের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ তাহার অন্তরের জিনিস, বাহিরে সে তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য দেখাইতে পারে না, বাহিরে সে সকল জামাইয়ের সঙ্গে একাকার হইয়া আছে। ইহার উপরই কামিনী ও অভয়ের দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজেডির অঙ্কুর উপ্ত হইয়াছিল—অবশ্য শেষ পর্যন্ত নাটকখানিকে মিলনান্তক করিতে গিয়া নাট্যকার এই অঙ্কুরটিকে আর পুষ্ট হইতে দেন নাই, উদ্গমেই মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। অভয়ের চরিত্রের মধ্যে এই প্রকার একটি বিরাট ট্র্যাজেডির উপাদান ছিল; মনে হয়, এই নাটকখানিকে প্রহসন না করিয়া ট্র্যাজেডিতে পরিণত করিতে পারিলে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদি যুগেই বহুবিবাহ বিষয়ের মধ্যেই আমরা একখানি উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি লাভ করিতাম। কিন্তু যথার্থ ট্র্যাজেডি রচনার শিল্পগুণ দীনবন্ধুর আয়ত্ত ছিল না; তাঁহার লেখনীতে কণ্ঠের হাস্যরোল অন্তরের মৌন বেদনা প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

তথাপি তাঁহার রচনায় হাসি এবং অশ্রুর দুইটি ধারা পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—একটি কলশব্দে মুখরিত হইয়া অপরটির মৌন নির্ঝরকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অভয় সম্বন্ধে আর একটি প্রধান কথা, সে দরিদ্র হইতে পারে, মূর্খ হইতে পারে, কিন্তু সে নীচ নহে। যাহার আত্মসম্মানবোধ আছে, সে কদাচ নিজেও নীচ আচরণ করিতে পারে না। কামিনী যখন অভয়কে বলিল, 'আজ তোমার একদিন, আর আমারি একদিন, খাটে উঠবে, আর ন-দিদির মত দূর করব,—নাতি মেরে দেব;' শুনিয়া অভয় বলিল,—'বটে—এতদূর।' কামিনী বলিল, 'চোখ রাঙ্গাচ্ছ? মারবে নাকি?' অভয় বলিল, 'গোঁয়ার হলে মাত্তেম।' সে গোঁয়ার নয়, এত নীচ আচরণ সে করিতে পারে না, সেই মুহূর্তেও অভয় এই চৈতন্যটুকু হারায় নাই। যে অবস্থায় লোক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতে পারে, সেই অবস্থায়ও অভয় আত্মবিস্মৃত হয় নাই। ইহা অভয়-চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। নাট্যকার তাহার চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্যটি আদ্যোপান্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অভয়ের আর একটি গুণ, সে মদ খায় না; তাহার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই লেখক তাহার এই গুণটির পরিচয় দিয়াছেন।

এইবার কামিনীর কথা বলিতে হয়। অভয়কে যেমন নাট্যকার সাধারণ কুলীন জামাতার বাঁধাধরা পরিচয় হইতে পৃথক্ করিয়া একটি অপরূপ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন, কামিনীকেও নাট্যকার তেমনই সাধারণ কুলীনকন্যা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। একটু সূক্ষ্মভাবে এই বিষয়টি বিচার না করিয়া দেখিলে অবশ্য তাহার এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয়টি উদ্ধার করা সহজ হইবে না। সেইজন্য বিষয়টি একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। কামিনী ধনী জমিদারের কন্যা; সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর একটু ইতিহাস আছে—তাহা কামিনীর মুখেই শুনিতে পাই, 'মেজো জামাই বড় মদ খেত, বাবা সেজন্য তাকে বাড়ী থেকে একদিন বা'র ক'রে দিয়েছিলেন, মেজদিদির দুচোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়তে লাগল; নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ ক'রে সমস্ত দিন কাঁদলেন... মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, "বাবা, আমায় একখানি ছোট বাড়ী ক'রে দেন, আমি ওরে নিয়ে সেখানে থাকি; চাকরে তারে অপমান করে, আমার প্রাণে সহ্য হয় না।" বাবা বল্লেন, "বিধবা মেয়ে হয়ে যেমন

বাপের বাড়ী থাকে, তুমি তেমনি থাক ; ভাব, সে মরে গিয়েছে।" পোড়া কপাল আর কি, বাপের মুখে কথা দেখ ; যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে, তখন সে মন্দ হক্, ছন্দ হক্, মাতাল হক্, গুলীখোর হক্, তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল। মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে…ব্যথা নিবারণ কল্লে, রাত্রি পোহালে সকালে দোর খুলে দেখি, মেজদিদি গলায় ক্ষুর দিয়ে মরে রয়েছে (১১২)।'

মনে রাখিতে হইবে, কামিনী এই দিদিরই সহোদরা এবং তাহার নিজের স্বামীর সঙ্গে আচরণের মধ্যে এই ঘটনারও যে একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব তাহার উপর ছিল, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহার মেজদিদি সম্পর্কে সে যে এই কথাটি বলিয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত—'যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে, তখন সে মন্দ হক্, ছন্দ হক্, মাতাল হক্, গুলীখোর হক্, তার কাছে তা'কে দেওয়াই ভাল।' যে বুদ্ধিটি বৃদ্ধ জমিদারের নাই, সেই বুদ্ধিটি তাহার যুবতী কন্যার আছে। তাহার এই উক্তিটি হইতেই তাহার চরিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার উপরই 'জামাই বারিকে'র কাহিনীর উপসংহারও নির্ভর করিয়াছে। এই ঘটনার দুইটি দিক আছে—স্বহস্তে মৃত্যু-দুঃখ বরণ করিবার দুঃসাহসিকতা ও প্রবল আত্মবোধ। কামিনীর চরিত্রের মধ্যেও এই দুইটি গুণেরই বীজ ছিল, তবে কামিনীর ইহার অতিরিক্ত আরও একটি গুণ ছিল—তাহা তাহার বুদ্ধি ; এই বুদ্ধি তাহার ভাবপ্রবণতাদ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না বলিয়াই সে মেজদিদির পথে অগ্রসর হইয়া না গিয়া জীবনে কল্যাণকর পরিণতির সন্ধান লাভ করিয়াছে।

কামিনীর সঙ্গে অভয়ের বিরোধ কোন জায়গায় তাহা অভয়ের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অভয়ের প্রতি কামিনীর প্রচ্ছন্ন ভালবাসা ছিল কি না, তাহার সূক্ষ্মতম আভাসটিও নাটকের মধ্য হইতে উদ্ধার করা কঠিন—এই ঔৎসুক্যটুকু (suspense) রক্ষা করিয়া লেখক তাঁহার রচনার নাট্যিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। অথচ একথা সত্য যে, তাহা যদি না করিতেন, তবে নাটকের পরিণতি অন্য রকম হইত। কামিনী যখন অভয়কে পদাঘাত করিয়া অপমান করিতে চাহিল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অভয় বলিল, 'কামিনি, আমি তোমার স্বামী ; কামিনি, আমি জন্মের মত যাই। তোমাকে একটা কথা

বলে যাই ; তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়া জল কখন পড়েনি, আজ পড়ল' (৩৷২)। পূর্বেই বলিয়াছি, অভয় কামিনীকে প্রকৃতই ভালবাসিত, সেইজন্য কামিনীর ব্যবহারে সে মর্মান্তিক আঘাত পাইল—এই কথাগুলি তাহার অন্তর মথিত করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—অতএব ইহা কামিনীরও অন্তর স্পর্শ করিল। কারণ, নাট্যকার কামিনীকে এখানে অহঙ্কারের এক হৃদয়হীন পুত্তলিকারূপেই সৃষ্টি করেন নাই, তাহাকে রক্তমাংসের দেহ দিয়া গড়িয়াছেন। সমসাময়িক অন্যান্য অনুরূপ সামাজিক নাটকের কুলীন-পত্নী-দিগের চরিত্রের সঙ্গে এখানেই কামিনীর মূল পার্থক্য। সেই জন্যই অভয়ের কথায় কামিনীর অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, 'আমার মাথা খাও, রাগ ক'রোনা, খাটে এস।' কিন্তু অভিমানী অভয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কামিনীর অহঙ্কার-দুর্গে ইতিপূর্বেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে, যে মুহূর্তে কামিনী অভয়ের অভিমানাহত মুখের দিকে তাকাইয়া অনুরোধের সুরে বলিয়াছে, 'আমার মাথা খাও, রাগ ক'রোনা' সেই মুহূর্তেই কামিনী আর সেই কামিনী নাই। কঠিন উত্তাপে লৌহপিণ্ড একবার গলিতে আরম্ভ করিলে তাহার গলন যেমন আর রোধ করা যায় না, কামিনীরও সেই রকম হইল; অভয়কে ঘিরিয়া তাহার যে একটি দুর্ভেদ্য বিদ্বেষদুর্গ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কবাট খুলিয়া গেল এবং বাহির হইতে সহস্র দুর্বলতা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল, এইবার বুঝি সমগ্র দুর্গ ধ্বসিয়া প'ড়িয়া যায়! কামিনীর এই ভাবটি নাট্যকার এই প্রকার কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন— 'কতবার অমন রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গের উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস) ঘুম ত হয় না, (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) আমি ত বিষম জ্বালায় পড়লেম,—"আজ পড়ল"—আমি ত আর রাখতে পারিনে, আমারও "আজ পড়ল" (রোদন), "তারা জামাই বারিকের জাম্বুবান"—"গোঁয়ার হ'লে মাত্তেম"—"আজ পড়ল।" ওমা, কি করি, বুক যে ফেটে যায় (৩৷২)।' কামিনীর কোন দিন চোখ দিয়া জল পড়ে নাই, আজ পড়িল—কামিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

কামিনী চাহিত, তাহার পিতৃগৃহাশ্রিত আর দশজন কুলীন জামাই তাহাদের পত্নীদিগের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে, অভয়ও তেমনি করুক; অভয়ের কিছু নাই, কিন্তু তাহার আত্মাভিমান কেন? অপদার্থের আত্মাভি-

মানের অর্থ কি? ইহাই ছিল কামিনীর সঙ্গে অভয়ের বিরোধের কারণ। কিন্তু নাট্যকার কৌশলে দেখাইয়াছেন যে, ইহার উপরই তাহাদের ভবিষ্যৎ স্থায়ী মিলনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; দুঃখের ভিতর দিয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহার স্থায়িত্ব থাকে—এই চির-পুরাতন কথাই নাট্যকার এখানে নূতন করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন। অভয়ের এই অভিমান যদি না থাকিত, তবে সেও জামাই-বারিকের জাম্বুবানদিগের একজন হইয়া থাকিত, কামিনীও একান্তভাবে তাহার স্বামীকে কোন দিন লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু যে দুঃখভোগের ভিতর দিয়া তাহাদের পুনর্মিলন সম্ভব হইল, তাহা উভয়ের জীবনেরই সকল গ্লানি দূর করিয়া দিয়া তাহাদের মিলনকে নিবিড়তম করিয়া দিল। 'জামাই-বারিক' প্রহসনের ইহাই মূল কথা।

ইহার পর পদ্মলোচনের কথা বলিতে হয়। পদ্মলোচন অভয়ের প্রতিবেশী ও বন্ধু, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র। অভয় যেমন ব্যক্তিত্বাভিমানী, পদ্মলোচন তেমনই ব্যক্তিত্বহীন—দুই সপত্নীর হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনের চরম লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। নিজে অগ্রসর হইয়া গিয়া কোন কাজ করিবার শক্তি তাহার নাই; এমন কি, দুই স্ত্রীর হাত হইতে পালাক্রমে মার খাইয়াও সে সকলই হজম করিয়া যাইতেছে, টু শব্দটিও করিতেছে না। তারপর অভয় যখন বৈষ্ণব সাজিয়া বৃন্দাবন চলিল, তখন পদ্মলোচন তাহার সঙ্গী হইল; ইহার পূর্ব পর্যন্ত সকল অত্যাচার যে নীরবে সহিয়া গিয়াছে, অভয়ের বৃন্দাবন যাওয়ার প্রয়োজন না হইলে আমরণই যে সে এই অত্যাচার সহ্য করিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই চরিত্রটির পরিকল্পনা দ্বারা একটি অপূর্ব নাট্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অভয়ের ব্যক্তিত্ব-সজাগ চরিত্রের পার্শ্বে পদ্মলোচনের এই ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রটি নাট্যিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়া উভয় চরিত্রই সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। দীনবন্ধু একখানি নাটকের ভিতর দিয়াই তৎকালীন প্রচলিত উভয় সামাজিক প্রথারই দোষ বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন, সেই হিসাবে ইহা একাধারে রামনারায়ণের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' ও 'নব-নাটক'—'জামাই-বারিকে'র বর্ণনায় কৌলীন্যের দোষ, ও পদ্মলোচনের দাম্পত্যজীবন-বর্ণনায় বহুবিবাহ-প্রথার নিন্দা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দীনবন্ধুর নাট্যরচনার কৃতিত্বের গুণে এই নাটকের মধ্যে কোন বিশিষ্ট সামাজিক প্রথা সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মতবাদ-প্রচার প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই। এখানে ঘটনা-প্রবাহের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ

রক্ষা পাইয়াছে, রামনারায়ণের নাটকে তাহা পায় নাই। ইহা 'নীল-দর্পণে'র না হইলেও 'জামাই-বারিকে'র একটি বিশিষ্ট গুণ বলিয়া অনুভূত হয়।

পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী—বগলা ও বিন্দুবাসিনী, বগলা জ্যেষ্ঠা ও বিন্দু কনিষ্ঠা। এই উভয়ের সপত্নী কোন্দলের যে রূঢ় ও বাস্তব চিত্র এই নাটকে দীনবন্ধু পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা বহুবিবাহপীড়িত এই সমাজের চির-কলঙ্ক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম-বর্ণিত চণ্ডীমঙ্গলে লহনা-খুল্লনার বিবাদের মধ্যেও অনুরূপ সপত্নী-কোন্দলের চিত্র পাওয়া যায়, দীনবন্ধুর চিত্রটি সেই ধারারই অনুবর্তন করিয়াছে, তাহার সঙ্গে রামনারায়ণ-রচিত 'নব-নাটকে'র অনুরূপ চিত্রটি আসিয়া যুক্ত হইয়া বগলা-বিন্দুর চিত্র দুইটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। 'নব-নাটকে' বর্ণিত আছে যে, বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া এক চোর দ্বিপত্নীক এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দুই স্ত্রী কর্তৃক তাহার কি লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল, তাহার এক জীবন্ত বর্ণনা দিয়াছে। দীনবন্ধু এই বর্ণনাটিকেই একটি নাট্যরূপ দিয়া এখানে গ্রহণ করিয়াছেন, 'নব-নাটকে'র দ্বিপত্নীক গৃহস্থই এখানে পদ্মলোচন ও তাহার দুই স্ত্রীই এখানে বগলা ও বিন্দু। কিন্তু স্ত্রী-কোন্দলের ভাষা দীনবন্ধুর যে রকম আয়ত্ত ছিল, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তেমন আর কাহারও ছিল না; অতএব এই দুই সপত্নীর জীবন-চিত্রের মধ্যে কোন রকম নূতনত্ব না থাকিলেও ইহাদের মুখে যে ভাষা শুনিতে পাই, তাহা আর কোথাও কোনদিন শুনিতে পাই নাই। পদ্ম-লোচন বলে, বিন্দু অর্থাৎ তাহার কনিষ্ঠা স্ত্রী আগে এ রকম ছিল না, বগলা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাই তাহাকে এই রকম করিয়া তুলিয়াছে; এবং বগলার শিক্ষার গুণে অল্প দিনেই বিন্দু প্রায় তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। পদ্মলোচনের সংসারে দুই স্ত্রী ছাড়া আব কেহ নাই; শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর, ননদ, পুত্রকন্যা ইহারা সংসারে থাকিলে সপত্নীদিগের রসনা ও আচরণ কতকটা সংযত থাকিবার কথা। কিন্তু নাট্যকার এই বিষয়ে দুই সপত্নীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন, বিশেষতঃ স্বামী পদ্মলোচন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, অতএব তাহার দিক হইতেও এই বিষয়ে কোনদিন কোন হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই।• তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে দুই অশিক্ষিতা নারী ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহার ফল যাহা দাঁড়াইল, তাহাতেই পদ্মলোচন গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার প্রত্যক্ষ

স্ত্রী-কোন্দলের ভাষা দীনবন্ধুর আয়ত্ত ছিল, সেই ভাষা তিনি বগলা ও বিন্দুর মুখে দিয়াছেন, সেইজন্যই এই ভাষা এত প্রত্যক্ষ ও জ্বালাময়ী বলিয়া বোধ হয়। এই ভাষার গুণেই সমগ্র নাটকখানির মধ্যে এই দুই নারীর কোন্দলের কোলাহল ছাড়া যেন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না; পদ্মলোচনের দক্ষিণ এবং বাম অঙ্গ যেমন দুই নারী ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল, পাঠকেরও দুইটি শ্রবণেন্দ্রিয় দুই নারী তেমনি অধিকার করিয়া লয়—একটি বগী আবাগী ও অপরটি বিন্দি পোড়ারমুখী। নাটক শেষ হইয়া গেলেও তাহাদের খর-রসনার জ্বালায় যেন পাঠকের দুইটি কর্ণই বহুক্ষণ পর্যন্ত জ্বলিতে থাকে। এই দুইটি সপত্নী-চরিত্রের মত এত জীবন্ত নারী-চরিত্র দীনবন্ধুর রচনায় খুব বেশি নাই।

'জামাই-বারিক' দীনবন্ধুর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। ইহাতে ভাষার দিক দিয়া যেমন একটা সমতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনই ইহার শিল্প-গুণেও অনেকটা পরিণতির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে যে দুই একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা অতি উচ্চ শিল্পগুণসম্মত। ইহার মধ্যে একস্থলে যে একটি নাট্যিক ঔৎসুক্য (dramatic suspense) সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চাঙ্গের বলিতে হইবে। অভয়ের দ্বিতীয়বার শ্বশুরগৃহ ত্যাগের পর পাঁচী ঝি যখন আসিয়া কামিনীকে বলিল যে, অভয় রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে তখন সে—

কামিনী। তবে আমাকে একখান ক্ষুর এনে দেও, আমি মেজদিদির মত করি—

পাঁচী। তুমি যাও কোথা?

কামিনী। মেজদিদির কাছে।

বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যে পরিবারের মেয়েদের মধ্যে অনুরূপ অবস্থায় আত্মঘাতিনী হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত আছে, সেই পরিবারেরই মেয়ে কামিনীকে এই অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়া নাট্যকার সুকৌশলে এখানে একটি অপূর্ব নাট্যিক ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিয়াছেন; যতক্ষণ পর্যন্ত বৃন্দাবনে দ্বিতীয় বৈষ্ণবীর মুখ হইতে অবগুণ্ঠন দূর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ঔৎসুক্যটি অটুট থাকিয়া যায়, তারপর এক অতি নিরাবিল আনন্দরসের ভিতর দিয়া পাঠকের মন হইতে এই শঙ্কিত ঔৎসুক্য দূর হইয়া যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'জামাই-বারিকে' উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির বীজ ছিল, কিন্তু

নাট্যকার তাহাকে অনুকূল অবস্থায় শিকড় গাড়িবার সুযোগ না দিয়া লঘুহাস্যের দমকা হাওয়ায় শূন্যে উড়াইয়া দিয়াছেন। দুই-এক স্থলে 'জামাই-বারিকে'র অতিরঞ্জিত চিত্র একটু পীড়াদায়ক হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির সার্থকতায় এই ত্রুটি দূর হইয়া গিয়াছে।

'জামাই বারিকে'র মধ্যে দীনবন্ধুর যে শিল্পগুণই প্রকাশ পাক না কেন, ইহার কাহিনীর কোন কোন অংশের জন্য ইনিও রামনারায়ণ তর্করত্নের কাছে ঋণী। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত দৃশ্যটি উল্লেখ করা যায়। 'জামাই বারিকে'র প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের যে দুই সপত্নী বিন্দুবাসিনী ও বগলার কলহের কথা উল্লেখ আছে, তাহা রচনার দিক দিয়া যত জীবন্তই হইয়া উঠুক না কেন, তাহা রামনারায়ণের 'নব নাটকের'ই একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনার নাট্যীকরণ মাত্র। অবশ্য ইহার মধ্যেদীনবন্ধুর মানবচরিত্রের সাধারণ অন্তর্দৃষ্টির এবং রামনারায়ণের 'উভয় সঙ্কট' নামক প্রহসনের একটি দৃশ্যের প্রভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। 'জামাই বারিকের' দৃশ্যটি এই :—

॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ॥

বেলডাঙা—পদ্মলোচনের দরদালান

(বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্দু। (স্বগত) আজ ভোর পর্য্যন্ত জেগে থাকব। অনেক রেতে বাড়ী আসেন, আর ছুঠ করে বগীর ঘরে যান। আজ যেমন আসবে, আপনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব,—বগী আবাগী ঘুমিয়েচে, শড়াগুড়ি আর পাচ্চিনে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি।

(প্রস্থান)

(বগলার প্রবেশ)

বগলা। বিন্দি পোড়াকপালী ঘুমিয়েচে। আজ যেমন আসবে, অমনি ঘরে নিয়ে যাব। একটু ফাঁক পায়, আর বিন্দী আবাগীর ঘরে ঢোকে। আবাগী কি চাল পোড়া খাওয়ালে, আমার বুক থেকে মিনষেরে যেন ছিঁড়ে নিলে। এখন ইচ্ছেয় ত আমার ঘরে যায় না, ধরে বেঁধে যত নে যেতে পারি।—আমি ঘরে গিয়ে বসি ; যাই আসবে, অমনি গলার আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব। (প্রস্থান)

(চোরের প্রবেশ)

চোর। এরা সব ঘুমিয়েছে, এই বেলা মাল সরাবার সময়। বড় ঘরে ঢুকি।

(বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্দু। (চোরের গলায় গামছা দিয়া ঝাঁটা মারতে মারতে) তবে রে মুখপোড়া ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও একদিন আমার ঘরে যেতে নাই; আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আর উনি টিপি টিপি বড় রাণীর ঘরে যান; বড় রাণীর দুদ বড মিষ্টি, ছোট রাণীর দুদে গোবরগন্ধ। মুখ ঢাকিস কেন? (নাসিকার উপর কিল) আর হয়েছে কি, তোকে তোর আজ আমার বিছানায় শুইয়ে ঘটীর বাড়ী মেরে মাথা ভেঙে দেব।

(বগলার প্রবেশ)

বগলা। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি, ও পোড়ার বাঁদর, বেদে চোর, যাচ্ছ কোথায়? এদিকে এস, আমিও তোর মাগ, আমাকেও বিয়ে করেচিস, ওকেও যেমন দেখিস, আমাকেও তেমনি দেখতে হয়, আমি ত তোর মায়ের পেটের বোন নয় যে, আমার বিছানায় শুলে তোমার সমন্বয় করতে হবে? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়। (পৃষ্ঠে কীল) আয় ড্যাকরা ঘরে আয় (কীল)

বিন্দু। আরে পোড়ার মুখ, কোথায় যাও, আজ তোমারে যমে ধরেছে, যমের হাত থেকে ছাড়াতে পারবে না। তবু যে যাস, হ্যাঁ-রা বেহায়া, বেইমান—(ঝাঁটা প্রহার) পোড়ার মুখে বাক্যি হরে গিয়েচে, মৌনবতী হয়েছেন। (নাসিকার উপর কীল)।

বগলা। ছোটরাণীর কীলগুলো বড় মিষ্টি, আমার কীলগুলো বড় তেত;—তাই ছোট রাণীর দিকে ঢলকে পড়েছে। পড়াচ্চি তোমাকে, বঁটী এনে তোমার নাক কেটে নিই।

(পদ্মলোচনের প্রবেশ)

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে; দু আবাগী কাটাকাটি করে মরচিস নাকি? মর, আপদ যাক। আমি বলি ঘুমিয়েছে, ঘুম কোথা, বুনো মহিষের যুদ্ধ বাদিয়েছে।

বগলা। বিন্দু। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে?

পদ্ম । তোরা ভাতার গড়িয়ে ঝগড়া কচ্চিস না কি ?

বগলা । এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, এমন ঝ্যাঁটা গুণো বৃথা গেল, এমন জোরের কিল গুণো বাজে খরচ হয়ে গেল।

পদ্ম । তুই ব্যাটা কেরে ?

বিন্দু । চোর চুরি করতে এয়েছে, টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্ছিলো, আমি বলি, তুমি যাচ্ছ, গলায় গামচা দিয়ে তাই মারতে লাগলেম, তারপর বগী এসে যোগ দিলে।

পদ্ম । ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েচ চুরি কত্তে ; বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, রা হারামজাদা। চল্ ব্যাটা চল, তোকে পুলিশে দেব।

চোর । মশাই গো পুলিশে দেবেন না, একদিনের মার বাঁচিয়ে দিলেম।

পদ্ম । তুই ব্যাটা চোর ত ?

চোর । আমি চোর, না তুমি চোর।

পদ্ম । আমি হলাম কিসে ?

চোর । তা নইলে রোজ সাত চোরের মার হজম কর কেমন করে ?

পদ্ম । একথা তুমি বলতে পার।

চোর । আমি বিশ বছর চুরি কচ্ছি, এমন বিপদে কখন পড়িনি ; বাপ! যেন চরকি ঘুরিয়ে দিলে, জানতেম, ভাল মানুষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম ; ও মা! কোথায় যাব, এনাদের হাত যেমন ফালপেটা হাতুড়ি।

পদ্ম । আচ্ছা বাবু, আমি নেমকহারামি কত্তে চাইনে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও।

চোর । এরা আর এক চোট নেবেন। (প্রস্থান)

তবে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রামনারায়ণ হইতে দীনবন্ধুর চিত্রটি অধিকতর সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

কুলীনের বহুবিবাহের নিন্দা করিয়া যেমন বহু সংখ্যক নাটক সে যুগে রচিত হইতেছিল, তেমনি কুলীনের বহুবিবাহ প্রথা সমর্থন করিয়াও দুই একজন কুলীন সন্তান দুই একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর একটি নাটকের নাম 'চরিত্রবান কুলীন', রচয়িতার নাম মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে গ্রন্থকার নিজে উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতামাতা বর্তমান থাকিতে তাঁহার ১৩টি বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহার চতুর্দশ পক্ষের বিবাহ বড় আশ্চর্যজনক, সে বিষয়ে পরে বলিব। সকল ভার্যাকেই তিনি তুল্যাংশে বস্ত্রাভরণ দিয়াছেন। ভার্যাগণের প্রয়োজন হইলে পাছে কাহাকেও কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় এ জন্য তাঁহাদের প্রত্যেককেই পাঁচশত করিয়া টাকা দিয়াছেন। ক্রিয়া উপলক্ষ্যে সীমন্তিনীগণ যখন সকলেই শ্বশুরালয়ে উপস্থিতা হন, তখন গঙ্গোপাধ্যায় অবসর মতে মধ্যে তারা ঘেরা চন্দ্রের ন্যায় স্ত্রী-মণ্ডলে পরিবেশিত হইয়া জ্ঞানচর্চা ও শাস্ত্রীয় কথায় সকলকে সন্তুষ্টা করেন, এবং রামায়ণ ও মহাভারতাদি পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন; এ জন্য কোন কোন সময় তাঁহার পত্নীগণ তাঁহাকে পাঠশালার গুরুমহাশয় বলিয়া সম্বোধন করেন। একদিন কনিষ্ঠা স্ত্রীর ঐরূপ সম্বোধনে তিনি পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, 'গুরু ত অনেক দিন হইয়াছি কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজন ভিন্ন আর কেহই ত আমাকে গুরু দক্ষিণা দিতে পারিলে না।' তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্যা কহিলেন, 'দক্ষিণা কি আর সকলেই হাতে হাতে দিয়া থাকে, আমাদের সর্ব জ্যেষ্ঠা যিনি তাঁহার দেওয়াতেই আমাদের সকলের দেওয়া হইয়াছে।' এই কথার ভাবার্থ এই যে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কেবল দুইটি পুত্র জন্মিয়াছে; প্রথম পুত্রটির নাম মনো'রঞ্জন ও দ্বিতীয়টির নাম অংশুমালী। এতদ্ভিন্ন আর কাহারও উদরে সন্তান কি সন্ততি কিছুই হয় নাই। বিধাতার ইচ্ছায় অন্য ত্রয়োদশ জনই বন্ধ্যা। স্ত্রীগণের মধ্যে কেহ লেখাপড়া জানেন না; কিন্তু উপযুক্ত স্বামী সহবাসে তাঁহারা সকলেই সুপবিত্রা ও বহুগুণ-সম্পন্না হইয়াছেন।"

কিন্তু বলাই বাহুল্য কুলীনদিগের এই প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা কোন দিক দিয়াই কার্যকরী হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে এই প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা যে তাঁহারা করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের প্রভাব যে কত সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার ৬০ বৎসর পরবর্তী কালে রচিত 'কুলীন-বামন'

নামক একখানি নাটক হইতেও জানিতে পারা যায়। ইহার রচয়িতার নাম কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৩১৩ সালে রচিত তাঁহার নাটকখানিতেও রামনারায়ণের অনুরূপ কাহিনীর উপসংহার করিয়াছেন। কৌলীন্যের প্রভাব তখন আর সমাজের মধ্যে ছিল না, তাহা বলা যায় না। যদি তাহাই হইত, তবে নাট্যকার ইহার উপসংহারে এই ভরত বাক্য ব্যবহার করিতেন না। ভরত বাক্যটি এই :—

নগেন। বিপদবারণ মধুসূদন আছেন। বিঘ্নহারি—হরি আছেন। বঙ্গবাসী, আজ এই বীভৎস ব্যাপার দর্শন ক'রে চক্ষু উন্মিলিত কর। আজ ঐ মুমূর্ষু বৃদ্ধের গলায়, কতকগুলি নিঃসহায় কুলনারীকে গাঁথা হইতেছিল, হিন্দুসমাজ, অধঃপতিত কুলীন সমাজ একবার জাগ। দেশের মঙ্গলে, সমাজের মঙ্গলে, আপন পরিজনের মঙ্গলের জন্য বলি, একবার জাগ। হায় বঙ্গবাসী, তোমরা আজ স্বদেশের উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছ, কিন্তু দেশের বক্ষের উপর, তোমাদের চক্ষের উপর, এই যে সব পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে, তার কি কোন প্রতীকার করবে না? কুলনারীগণের এক এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু বিন্দুতে একটি জ্বলন্ত নরক বঙ্গবাসীর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—সে নরক হ'তে তোমাদের কিছুতেই উদ্ধার নাই। তাই ভাইসব, আবার বলি, জাগ। আর্য সন্তান, আর্যের কার্য কর। একবার এই পৈশাচিক অভিনয় দেশ হতে বিদূরিত কর—দেশের কল্যাণ সাধন কর।"

তবে এ'কথা সত্য, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত কারণে এবং প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব বশতঃই কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আধুনিকতম হিন্দু বিবাহ আইন অর্থাৎ যাহার ফলে স্বামী কিংবা স্ত্রীর একাধিক পত্নী বা স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার আর যে লক্ষ্যই থাকুক, বহুবিবাহ তাহার লক্ষ্য ছিলনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিধবা-বিবাহ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সামাজিক আন্দোলন বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার সকল শক্তি এই আন্দোলনের উপর নিয়োগ করিবার ফলে ইহার সমর্থনকারিগণের মধ্যে যেমন এক বিশেষ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তেমনই রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার বিরোধিতা করিবার জন্য এই আন্দোলনের মধ্যে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া সেকালের বাঙ্গালী সমাজ যে ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, এমন আর কোন সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়াই সমাজ তাহা হয় নাই। সেই জন্য এই সম্পর্কে বাদানুবাদমূলক যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনিই শক্তিশালী।

কতকগুলি কারণে বিধবা-বিবাহ সমস্যা এ দেশের সমাজে বিশেষ জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। বাল্যবিবাহ ইহার একটি প্রধান কারণ। প্রকৃতপক্ষে এক বালবিধবার জীবনের করুণ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ অসম বিবাহ এবং বহু বিবাহও তাহার অন্যান্য কারণ। অর্থ কিংবা বংশের মর্যাদা দিয়া বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা গ্রহণ করিবার ফলেও সমাজে বিধবা-বিবাহ বিশেষ একটি সামাজিক সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সর্বোপরি কুলীনের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিবার ফলে এবং কুলীন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বয়স্কা বহুসংখ্যক পত্নীর বৈধব্যদশাও এই সমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের যুক্তি দেখাইয়া প্রবন্ধাকারে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে মত প্রচার করিতে লাগিলেন, প্রতিপক্ষ তাঁহার মতবাদ আক্রমণ করিয়া নূতন নূতন প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিল। তাহারই সূত্র ধরিয়া এই বিষয়ে নাটক রচনার ধারাও প্রবর্তিত হইল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত এই বিষয়ে একখানি

নাটকও রচিত হয় নাই। কারণ, তখন পর্যন্ত সমাজ বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, এমন যুগান্তকারী কোন আইন সমাজে প্রবর্তিত হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণান্তকর চেষ্টার ফলে যখন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল, তখন হইতেই এই সম্পর্কে নাটক রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম যে নাটকখানি রচিত হইল, তাহার বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখযোগ্য, তাহা উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবাবিবাহ' নাটক। নাটকখানি আজ দুষ্প্রাপ্য, এমন কি অপ্রাপ্য বলিলেও হয়, সেইজন্য এই গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত করা হইল। ইহা ১৮৫৬ সনে প্রকাশিত হয়। এই নাটকের একটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাহার রক্তমাংসের দেহের কামনা বাসনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বিধবার জীবনের যে সুগভীর বেদনাটির নাট্যকার সন্ধান দিয়েছেন, তাহার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র ইহা এই আন্দোলনের কার্যেই সহায়ক হইয়াছিল, তাহা নহে —সমাজের বাস্তব রূপটি তাহার মধ্য দিয়া ভাষা পাইয়াছিল। ইহার সংলাপের ভাষায় সমাজ এবং জীবন দর্শনের গভীরতায় ইহা যেমন বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ধারায় একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে, তেমনই এই দেশের সামাজিক জীবনের ইতিহাসেও একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী হইয়াছে। সেইজন্য ইহা একটু বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

এই নাটকের নায়িকার নাম সুলোচনা, সে যুবতী এবং বিধবা। বিধবা হইয়া অবধি পিতৃগৃহেই বাস করিতেছে। পিতার নাম কীর্তিরাম ঘোষ, তাহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী একদিন সুলোচনার নামে স্বামীর নিকট অভিযোগ করিলেন 'কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলুম, তা' একেবারে নেচে উট্‌লো। বয়েস কালে কেবল কি রঙ্গ নিয়েই থাকতে হয়।' সুলোচনা রঙ্গিণী, সুহাসিনী যুবতী, কিন্তু বিধবা। কীর্তিরাম রক্ষণশীল ব্যক্তি, সেইজন্য মেয়েদের নিকট বিধবা বিবাহ সম্পর্কে কোন আলোচনা করা অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। তিনি বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী। কিন্তু নানা সূত্র হইতে সুলোচনা বিধবা-বিবাহের সংবাদ পায়। একদিন গ্রামের নাপিতানি কামাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। নাপিতানীর নাম রসবতী।

(কীর্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর রসবতী নাপতেনীর প্রবেশ)

রসবতী। ওগো বেলা যে আর নাই, কতক্ষণ বসে রয়েছি, তোমাদের কি

কামাবারও বেলা হয় না, আমার কি আর কম্ম নেই তোমাদের কম্মেই বসে থাক্‌বো ?

সুলোচনা। কি লো রসবতী এলেছিস্ তোরে দেক্‌তে পেলুম তবু ভাল। কবে এসেছিলি তা বল্‌তেছিস আমাদের কম্মেই বসে থাকবি। যে নোক হয়েছে, নোকের জ্বরে আর চলতে পারিনে। সেদিন হোঁচট খেয়ে পাটা একেবারে গেছে। আয় ছাতের উপর তলায়, কাম্‌য়ে দিবি।

রসবতী। এসময়কার মেয়েদের পারা ভার। নোক কি গা এতই ভারি চলতে পার না। চল ছাতের উপরে চল।

(উভয়ের ছাতের উপর উত্থান)

সুলোচনা। (কামাইতে কামাইতে) হেঁলো রসবতী, তুই কি রেতে ঘুমুসনে, কামাতে কামাতে ঢুলতেছিস, কেন, বুড়ো বয়সে বুঝি নতুন কেড়েছিস ? সেকেলে মানষের ধ্যান বোঝাই ভার।

রসবতী। সে কি গো, তোমাকে যে কামানই দায়। বুড়ো মানুষ, তিন কাল গেছে এককালে ঠেকেছে, আমি আবার রেতে ঘুমুইনে। দিনের বেলা আপনার দুঃখে ঘুরে বেড়াই, রেতে কি আর জ্ঞান থাকে ? যেমন শুই অম্‌নি মরে থাকি।

সুলোচনা। তাই বলতেছিলুম, রেতের বেলায় তোর আর জ্ঞান থাকে না।

রসবতী। না, তোমাকে বেনে কথায় পারা দায়। এখন স্থির হয়ে কামাও, আর কথায় কাজ নাই।

সুলোচনা। (ক্ষণেক বিলম্বে) হেঁ লো রসবতী, ঐ বোসেদের বাড়ীর বারাণ্ডায় উটি কাদের ছেলে বসে আছে দেখ দেখি, আমাদের দিগে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আহা! রূপ তো নয় যেন সোনার থালখানি। ওকে চিনিস, ঐখানে রোজ বসে থাকে দেখতে পাই।

রসবতী। (বারান্দাভিমুখে) হেঁ গো ওঁকে চিনি, ওখানে আমি কাময়ে থাকি। উটি রামকান্ত বোসের ছেলে। ওগো ছেলেটির কথা-গুলি যে মিষ্টি, বসে শুনতে হয়, এমন কথা কখনও শুনি নাই।

সুলোচনা। ঐ দেখ, আমাদের দেখে হাসতেছে।

রসবতী। (ঐদিগে চাহিয়া) আহা! কি দাঁতগুলি, যেন মুক্তো সাজয়ে

রেখেছে। ধন্তি ওর মা, এমন ছেলে গর্ভে ধারণ করেছে। হাসতেছে বটে তো—তা আমাদের দেখে হাসতেছে বল কেন, তোমাকে দেখেই হাসতেছে—আমায় আর কি দেখে হাসবে।

সুলোচনা। তুই কত নেক্‌রাই জানিস। আমার সঙ্গে কি ওর আলাপ আছে, না পরিচে আছে—তা আমায় দেখে হাসবে। তুই ওদের বাড়ী আসিস্ যাস, তোর সঙ্গে বরং আলাপ থাকতে পারে। সে যা হোক এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই, যেন চাঁদ উঠছে।

রসবতী। ওর কি এম্‌নি রূপ গা, তুমি যে একেবারে গলে পড়লে? তোমার চোক্ যে আর কোন দিগে নাই।

সুলোচনা। তুই কি চোকের মাথা খেয়েছিস লো, রূপের কথা আবার জিজ্ঞেস করতেছিস, একবার ভালকরে দেখ দেখি।

রসবতী। (স্বাগত) আহা। ছেলেবেলা রাঁড হয়েছে, কখন তো অন্য পুরুষের মুখ দেখে নাই, অমন রূপ দেখে মন চঞ্চল হবে তো তার আশ্চর্য কি। আমরা, বুড়ো হয়েছি, আমাদেরি মন কেমন করে, ওতো কালকের মেয়ে, ওর দোষ কি। (প্রকাশ) তাইতো গা, তোমার কি এতই মনে লেগেছে।

সুলোচনা। দেখ্ দেখি এক ভাবে বসে আছে। এমন কখন দেখি নাই রসবতী।

কিবা অপরূপ রূপ আহা মরে যাই।
ও রূপের অনুরূপ কভু দেখি নাই॥
দেখ ওলো রসবতী কি কটাক্ষে চায়।
গৃহেতে থাকিতে আর অন্তর না চায়॥
কিবা দুটি ভুরু ভঙ্গি কিবা দুটি আঁখি।
ইচ্ছা হয় হৃদয়ের সঙ্গে গেঁথে রাখি॥
রজত লো কোথা আছে ও জ্যোতির কাছে।
মৃত্তিকাতে লুকাইল লজ্জা পায় পাছে॥
সুধাকর সম দেখ মুখ শশধর।
কলঙ্ক গোঁফের রেখা কিবা মনোহর॥
অমল কমল দেখ কমল দুখানি।
ও কাহার পতি তারে ধন্যা বলে মানি॥

ধন্য ধন্য সে নারীর তপস্যার বল।
দাসী হয়ে তার করি জীবন সফল ॥
উহারে হেরিয়া যেই গৃহে ফিরে যায়।
পাষাণ সমান বলি তাহার হৃদয় ॥
মুখ ছাঁদে ফাঁদিয়াছে কি কটাক্ষ ফাঁদ।
দিনরাত্র হেরিলেও না ফুরায় সাধ ॥
থাক বেনে কুল মানে কাজ নাই আর।
মন সাধে শোধি গিয়ে বিরহের ধার ॥

হে রে রসবতী, তুই তো ওদের বাড়ীতে আসিস যাইস, আমাদের দেখে হাসতেছে কেন জিজ্ঞাসা করতে পারিস? আমার মাথা খাস্ নাপতেনি জিজ্ঞাসা করিস।

রসবতী। (স্বগত) আমি একম্ম অনেক করেছি, তোমার অভিপ্রায় বুঝতে বাকি নাই। ভাল দেখা যাউক, ঝোপ বুঝে কোপ হয়েছে, এখন শেষ রক্ষা হলে হয়। আমি যেমন তত্ত্ব করি, অদৃষ্টক্রমে তেমনি মিলে গেছে। (প্রকাশ্য) তা আমার বলতে কি, আমি এখুনি জিজ্ঞাসা করতে পারি। ভাই আমার তো এক কম্ম নয়, আপনার দুঃখে দিনরাত ঘুরে বেড়াই, কোন্ কম্মই বা করবো। কাল মেয়েটা ও পাড়ায় নেমন্তন্ন গেছলো, কার হাতে বালা দেখে বাড়ী এসে আর সমস্ত রাত ঘুমুইনি। কি করবো মা, আপনি কাম্‌য়ে জুময়ে যা পাই তা খেতে কুলোয় না—কোন দিগ রাখবো—এ দিগ আনতে ওদিগ হয় না।

সুলোচনা। ওলো এত লোক থাকতে তোর মেয়ের কি বালা হবে না। আহা! ছেলে মানুষ, আব্দার করেছে, আমি বালা দেব তার একটা ভাবনা কি?

রসবতী। মা তোমার বই আমার আর কে আছে, তোমরা দেখে না তো দেবে কে। তবে আমি এখন যাই, বেলাটা গেছে।

সুলোচনা। মর্ মাগি যাই বলতে আছে—আসি বল। এখন যা বল্লুম মনে আছে তো, ওখানে যাবি দিব্বি করে যা।

রসবতী। সে কি গো আমি কি তোমাদের মত, আজ এক কথা বলি কাল

তা রয় না, একবার যা শুনলুম সে কথা কি আর ভুলি, যাব বৈকি কাল সব শুনতে পাবে।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মাবতী। কি গো তোর কি আর কামান ফুরায় না? সেই বেলা অবধি কামাচ্চিস—নাপতেনির সঙ্গে কি এত কথা কচ্চিস, আর কি কোন কম্ম নেই?

সুলোচনা। কারও সঙ্গে কি দুটো কথাও কইতে নাই, আমাদের কি আর বেঁচেও সাধ নাই, দুদণ্ড কথা কব তাও দোষ?

পদ্মাবতী। কথা বললে তুই মা এত রাগিস্‌ কেন, মা যদি দুটো কথা বলে তা কি শুনতে নেই? যাও মা এখন যাও আপনার কম্ম দেখগে।

সুলোচনা। না মা শুইগে বড অসুখ করেছে।

(সকলের প্রস্থান)

[(শয়নমন্দির) সুলোচনার প্রবেশ]

সুলোচনা। (একক শয্যায় শয়ন করিয়া) (স্বগত) হা! আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত আছি—অপরাহ্নে যাহা দেখিলাম সে স্বপ্ন কি সত্য (হস্তদ্বারা নয়ন মার্জনা করিয়া) না স্বপ্ন ইহা কোন ক্রমেই নহে সত্যই দেখিয়াছি। হা! স্বপ্ন ইহা অপেক্ষা উত্তম ছিল—চৈতন্য হইলে সমুদয় অলীক বোধ হইত, কিন্তু সত্য হইলে আর মনকে প্রবোধ দিবার উপায় নাই। আহা! কল্য রাত্রে এই সময়ে অন্তঃকরণ একরূপ ছিল অদ্য সেরূপ নাই। কল্য মন ভাবনারহিত নির্ম্মল আলোকময় ছিল অদ্য সে ভাবের বিপরীত অন্ধকারময় দেখিতেছি। হে সুখময় সময়। বুঝি অদ্যাবধি তোমার সহিত শেষ বিদায় লইলাম—বুঝি স্বচ্ছন্দ বা কেমন আর জানিব না নতুবা অগ্রেই আমার অন্তঃকরণ কেন নৈরাশ হইতেছে —সুখের সময়ে কেন দুঃখবোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, ভাবী দুঃখ আর ভাবিতে পারি না, এক্ষণে ভাবনাতেই যে এক সুখবোধ হয় তাহার রসাস্বাদন করি। (ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া) আহা! অদ্য যে অপরূপ রূপ দেখিলাম তাহা এখনও চক্ষের সম্মুখে বিরাজিত দেখিতেছি—আহা! দৃশ্যে তাহাকে যেরূপ সুন্দর

দেখিলাম অন্তঃকরণ কি তাহার সেইরূপ ? আমি যেমন তাহাকে চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় অহরহ ধ্যান করিতেছি, সে কি সেইভাবে কাল সম্বরণ করিতেছে ? আমি তাহার জন্য যেরূপ কাতর হইয়া নিরন্তর তাহারি চিন্তাতে মগ্ন আছি সে কি সেইরূপ করিতেছে ? কি আমাকে চকিতের ন্যায় দৃষ্টি করিয়া অমনি বিস্মৃত হওত অন্যান্য আমোদে মত্ত আছে—নিত্য যেরূপে থাকে সেইরূপে আছে। হা! এই হৃদয় বিদীর্ণকারী ভাবনাতেও কি এক অদ্ভুত সুখ বোধ হয়। হা! অদ্য এই অ র্ব শয্যা কেন শরশয্যা বোধ হইতেছে, নিদ্রা কেন চক্ষু হইতে পলায়ন করিয়াছে, কেবল ভাবিতে কেন ইচ্ছা হইতেছে।

কাহারে হেরিয়া মন হইলো গো উচাটন,
কার ভাব অন্তরে উদয়
এমন কেমনে হোল, হেরে মন হরে নিল
সামান্য তস্কর এতো নয়॥
আজি কি নূতন ভাব আবির্ভাব মনে।
সুখের মিলন কেন অসুখের সনে॥
শীতল সলিল কেন অনল সহিত।
এই চিত্ত পুলকিত পুনঃ চমকিত॥
ছিলাম একই ভাবে ভাবনা রহিত।
নির্মল সরস মন কামনা বর্জিত॥
সেরূপ বিরূপ হোল কিসের কারণ।
অমূল্য সন্তোষ কেবা করিল হরণ॥
প্রেমাঙ্কুরে কোথা হবে নব অনুরাগ।
একি দেখি পুষ্প আছে নাহি যে পরাগ॥
বসিলাম আজি বুঝি চিন্তা-সিন্ধুতীরে।
ভাবিলাম আজি বুঝি পরিতাপ নীরে॥
নতুবা নৈরাশ কেন উল্লাসেতে হয়।
আহ্লাদ হইবে কোথা বিষাদ উদয়॥

আর কত ভাবিব নিদ্রা যাই। (ক্ষণেক নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া) এই যে রজনী প্রভাত হইয়াছে, সূর্যদেব পূর্ব দিগ আলোকময় করিয়া ক্রমে ক্রমে

দৃষ্টি পথারূঢ় হইতেছেন, মন্দ মন্দ শীতল প্রভাত-সমীরণ-প্রবাহে শিশিরাবৃত পল্লবসমূহ হেলয়মান হইতেছে, প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কুসুমদল সদগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে, ভৃঙ্গদল মহানন্দে মকরন্দ পান করিতেছে, বিহঙ্গগণ নব প্রকাশিত দিবস দৃষ্টে সরসান্তঃকরণে সঙ্গীতালাপ দ্বারা চতুর্দিগে আনন্দ বিস্তার করিতেছে। যে দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিগেই আলোকময় দেখিতেছি, যেন সমুদয় পৃথিবী আনন্দধাম বোধ হইতেছে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ কেন অন্ত অন্ধকারময় দেখিতেছি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হা! স্মরণ হইতেছে স্বপ্নযোগে যেন এক অপূর্ব রূপবান পুরুষের সহিত শর্বরি সহবাস করিয়াছি। হা! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর প্রদান করিল—তাহাকে স্পর্শ করণার্থ হস্ত বিস্তার করিলাম, কোথায় পলায়ন করিল—অমনি চমকিত হইয়া জাগ্রত হইলাম—চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলাম—কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। হা! পুনরায় স্বপ্নযোগে তাহাকে দেখিবার জন্ম নিদ্রিত হইলাম, আমার প্রতি নির্দয় হইয়া কোথায় পলায়ন করিল আর দেখিতে পাইলাম না! আর ভাবিলে কি হইবে গাত্রোত্থান করি।

তারপর কীর্তিরাম ঘোষের বহির্বাটিতে গ্রহাচার্য পঞ্জিকা হস্তে প্রবেশ করিলে কীর্তিরামবাবু তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। গ্রহাচার্য তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। কীর্তিরামবাবু গ্রহাচার্যকে তাঁহার স্ত্রীর পেটের পীড়ার জন্ম গ্রহশান্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। কীর্তিরাম বাবুর স্ত্রী সন্তপ্রসূতা। গ্রহচার্য কীর্তিরামবাবুকে আশ্বাস দিয়া জানাইলেন যে, তিনি যে কেবল কুগ্রহের শান্তি করেন, তাহা নহে—গর্ভ-পরীক্ষাতেও তিনি দক্ষ। কীর্তিরামবাবু ইহা শুনিয়া গ্রহাচার্যকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রীকে দেখাইলেন। গ্রহাচার্য সন্তান পরীক্ষা করিতে গিয়া খনার বচন আওড়াইলেন—'বানের পৃষ্ঠে দিয়া বান, পেটের ছেলে টেনে আন্।' কীর্তিরামবাবুর স্ত্রী পদ্মাবতী ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। এমন সময় সুলোচনা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া গ্রহাচার্যকে তাহার হাত বাড়াইয়া দিয়া করকোষ্ঠি বিচার করিতে বলিল। গ্রহাচার্য গণিয়া বলিলেন 'মেয়েটির সব সুলক্ষণ দেখতেছি, কেবল একটা কুলক্ষণ আছে। কুলক্ষণের মধ্যে মেয়েটির সন্তানের স্থানটা ভাল নয়। একটি মাত্র সন্তান লিখতেছে কিন্তু তাহাও শেষ রক্ষা হবে না।' পদ্মাবতী ভয় পাইয়া বলিলেন, সে কি গো ঠাকুর কি বল্লেন্ সন্তান কি? গ্রহাচার্য সুলোচনার ফাঁড়া আছে বলিয়াও জানাইলেন। পদ্মাবতী বলিলেন, পোড়া কপাল আর কি! যেমন

কাল পড়েছে তেমনি গণকও হয়েছে। ইহার পর গ্রহাচার্য প্রস্থান করিল। পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল রসবতী রামকান্তবাবুর বাটিতে প্রবেশ করিল। মন্মথ রসবতীকে সুলোচনা সম্বন্ধে বহু কথা জিজ্ঞাসা বাদ করিল। এইদিকে সুলোচনা নিজের শয়ন মন্দিরে গিয়া ভাবিতে লাগিল।

[(শয়ন মন্দির) সুলোচনার প্রবেশ]

সুলোচনা। (স্বগত) নাপতেনী যে এখনও আসতেছে না, কারণ কি? বুঝি কি অমঙ্গল হয়েছে। হা আমি সেই গুণনিধির জন্য যেরূপ অস্থির ও উতলা হয়েছি, বোধ হয় আমার প্রতি তাহার সেরূপ ভাব হয় নাই। কি জন্যই বা হবে? কেবল চক্ষের দেখা বৈ তো নয়। রমণীর অন্তঃকরণ যেমন অল্পেই দ্রব হয় পুরুষের তো সেরূপ নয়। (পুনরায় ভাবিতে ভাবিতে) না কথায় বলে বিলম্বে কার্য সিদ্ধি, নাপতেনী কর্ম শেষ করেও আসতে পারে। দেখি এই ভৌতিক আশার কোথা শেষ হয়।

[রসবতীর প্রবেশ]

রসবতী । কোথা গো, গিন্নি কোথা, দিদিরা কোথা, কাকেও যে দেখতে পাইনে।

সুলোচনা। (স্বগত) ঐ এসেছে, কি ক'রে এসেছে এখনি শুনতে পাবো। (প্রকাশ) কি লো রসবতী, এই ঘরে আয়, কার তল্লাস করিস?

রসবতী । (হাসিতে হাসিতে) এই যে গো, তুমি যে এখানে একলা কোণের বৌটির মত বসে আছ?

সুলোচনা। তোকে দেখতে পেলুম তবু ভাল। কায পড়লেই কি মাগ্‌গি হেয়ে যেতে হয় লো? তোর দোষ নাই এ কর্মেরি দোষ।

রসবতী । সে কি গো, এত রাগ কেন? আমি তোমার ভিন্ন আর কি কারুর কর্মে গিছলুম। একি কালের ধর্ম? "যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর?" যে কর্মের জন্য পাঠিয়েছিলে তার একটা শেষ না করে কি আসা হয়?

সুলোচনা। নাপতেনী তুই কথায় সর্বস্ব দিস্, কাযে তত হয় না। তুই যে অবধি গিয়েছিস্ সেই অবধি যে কিরূপে আছি তা তোকে

কত বলবো। তোর আসা পথ চেয়ে আমি সেই অবধি বসে রয়েছি। এখন কাযের কথা কি বল দেখি।

রসবতী। না ভাই তোমাদের কথায় থাকাই কুকর্ম, একেবারে তিলকে তাল করে ফেল। কাল সহকারে ভালর চেষ্টা পেলেই আগে মন্দ ঘটে। আমি তোমার জন্যে এই অসমসাহসী কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি, প্রাণের ভয় করি নাই—মানের ভয় করি নাই—পরিণামে কি ঘটে তারও ভয় করি নাই, প্রাণপণে তোমার কর্ম সাধনে পণ করেছি, ভাই তার প্রতিফল আসবামাত্র যে মুখঝামটা দিলে তাতেই ঢের হয়েছে, এখন ছেড়ে দেও ভাই কেঁদে বাঁচি। [রসবতীর গমনোদ্যোগ]

সুলোচনা। (রসবতীর অঞ্চল ধরিয়া) মর মাগি, তামাসা বুঝিস নে? মনের জ্বালায় কে কি না বলে। আমার মাতার দিব্বি যাসনে। ঘাট হয়েছে, এখন কি ক'রে এসেছিস বল, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিসনে। কি ক্ষণে যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ভুলেও ভুলতে পারিনে।

কি ক্ষণে কেমন দিনে হইল মিলন।
দুঃসহ বিরহানল করিছে দহন॥
মহাবলে জলে অগ্নি জলে না জুড়ায়।
সেরূপ ভাবনা ঘৃত আহুতি বাড়ায়॥
অবলা ললনা সনে এ কোন ছলনা।
জ্বালার উপর জ্বালা কেন লো বল না॥
প্রণয় গভীর সিন্ধু নাহি পারাপার।
কলঙ্ক তরঙ্গ রঙ্গে করিছে বিহার॥
গঞ্জনা প্রবল বায়ু বহে নিরন্তর।
বিরহের চোরাবালি বড়ই দুষ্কর॥
বিধি যদি লিখে থাকে অধিনীর ঘটে।
জুড়াব জীবন গিয়া মিলনের তটে॥
এ যে ব্রতে ব্রতী আমি নহি তো কখন।
কভু নাহি জানিতাম বিরহ কেমন॥

আগে যদি জানিতাম প্রণয় এমন।
প্রথমেই করিতাম বন্ধন মোচন॥
মজিয়াছি সেইদিন ধরিয়াছি ফণী।
ভজিয়াছি যেইদিন সেই গুণমণি॥
রমণীর সঙ্গে কেন প্রবঞ্চনা আর।
মোচন কর গো মম বিরহ বিকার॥

নাপতেনী আর কথায় মন ভেজে না, যদি স্ত্রীহত্যা কত্তে বসে থাকিস্ তবে উঠে যা, মিছে যন্ত্রণা দেবার ফল কি?

রসবতী। (পুনরায় বসিয়া) ভাই তোমার যেমন জ্বালা আমারও তেমনি। আপনার দুঃখে ঘুরে বেড়াই, তাতে তোমার কর্ম্মে আহার নিদ্রা আর মনে নাই। ভাই যার হিতের জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌তেছি, সে যদি তা না বুঝে উল্‌টে রাগ করে, তবে মনটা কেমন হয়, তা তুমি বুঝে দেখ দেখি। সে যা হউক এখন স্থির হও, যে বিষয়ের জন্যে এত উতলা হয়েছ তার সব বলি শোন। সেদিন তোমার কাছ থেকে বোসদের বাড়ীতে গেলেম, তা বোন বলবো কি, ওদের বাড়ীতে আসি যাই বটে, সে ছেলেটিকে কাছে কখন দেখি নাই, সেদিন দেখে এক দণ্ড আমার মুখে কথা সরলো না। ভাই রূপের কথা কি বলবো, রং যেন দুদে আলতা ফেটে পড়তেছে, আর কি নাক, কি চোখ, কি চলন, কি চাউনি! এত যে বয়েস হয়েছে, এমন কখন দেখি নাই। আহা! হাসিটি এখনও মনে রয়েছে। পরে ভাই আমাকে এসেই জিজ্ঞাসা কল্লেন, কি খবর রে রসবতী? আমি বল্লেম খবর ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? এই কথা শুনে অমনি আমার কাছে এসে বললেন, কি কথা বল্, তা ভাই আমার কাছে যখন এলেন আমার গাটা শিউরে উঠলো।

সুলোচনা। দেখিস লো যেন ডাইনের হাতে পো সমর্পণ করা হয় না—এক কর্ম্মে গিয়ে যেন আর এক করিস্‌নে।

রসবতী। এ কালের মেয়েদের সঙ্গে কথা কহাই দায়। আমার কি আর বয়েস আছে, না ওরূপ চেষ্টা আছে। যদি থাকেই, তা

ভাই আমাদের কাছে কে আসবে? তোমরা যেমন রূপের গৌরবে যা মনে কর তাই কত্তে পার, আমাদের কি তা হবার যো আছে?

সুলোচনা। তা বল্লে কি হয় ভাই, যে পরিবেশন করে সে চোর হোলে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাঘাত হয়। তাই অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি, অদৃষ্টকে আর বিশ্বাস হয় না, এখন পথের কুটা গাছটাও শত্রু বোধ হয়, কি জানি যদি মরণকালে গঙ্গা দিগে পা করে বসিস্, যা হউক ভাই যেন ধর্ম্ম খাসনে।

রসবতী। (স্বগত) বড নাকি ধম্ম করতে বসেছি তা ধম্ম খাব না, ধম্ম থাকলে তো ধম্ম খাব। (প্রকাশ্যে) খাব ভাই আর ঠাটে কায নাই। ময়রার কি কখন সন্দেশ খেতে প্রবৃত্তি হয়? আমাদের কি আর কিছু সাধ আছে? কথায় বলে "আঁব ফুরালে আমশী, যৌবন ফুবালে কাঁন্দে বসি।" তা ভাই আমার কি আর সে কাল আছে? কেঁদে কোকৃয়ে কি এ সব কায হয়। দূর হোগ আর বাজে কথায় কাজ নাই, কাজের কথা বলি শোন। তার পর ভাই আমার আর কি কিছু বলতে ভরসা হয়, কি করি না বল্লেও নয়, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেম, হাঁগা বাবু একটা কথা বলি, বারাণ্ডায় উঠে সেদিন কি দেখতেছিলেন, পাড়ার মেয়েছেলে ছাতে উঠে, তা কি অমন করে চেয়ে থাকতে হয়? ভাই বল্লে না পেত্তায় যাবে, এই কথা শুনে বুঝি সব মনে পড়লো, অমনি চম্‌কে উঠে ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হেঁ রে রসবতী, তুই সেদিন যার কাছে বসে ছিলি সেটি কে—তার নাম কি—কাদের মেয়ে—সধবা না বিধবা? আমি বল্লেম এত কথা ভাই একেবারে জিজ্ঞাসা করলে, কোন কথার উত্তর দেব, এক একটা করে বলি। পরে ভাই তোমার কথা সব শুনে, এমনি উতলা হলেন যে তাঁকে স্থির করে রাখা ভার হোল। তুমি বা তাঁর জন্যে কত ভেবেছ—কত কেঁদেছ—তোমার জন্যে সে যে কি করতেছে, যদি একবার দেখ, তবে তোমার আর দুঃখ থাকবে না।

সুলোচনা। (সজল নয়নে) কি বল্লি নাপতেনী, আমার জন্যে তিনি কি

আমার মত কাতর হয়েছেন? এ যে আমি স্বপ্নেও জানতেম না। বিধাতা কি আমার প্রতি এত দিনের পর সদয় হলেন, এখন কি তাঁরে আমার বলে ভাবতে পারবো?

কি বলিলি রসবতী রসে টলে মন।
সে কি এত ভাবিতেছে আমারি কারণ॥
তার জন্য ভাবিয়াছি কাঁদিয়াছি কত।
সে কি সখী মম জন্য ভাবিতেছে তত॥

রসবতী তোরে আর কি বলবো, এখন যে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা না হতেছে সে পর্যন্ত যে কেমন করে বেঁচে থাকবো ভেবে স্থির করতে পারি না। দেখ ভাই, আগে একটা সন্দেহ ছিল যে কি জানি যার জন্য এত উতলা হয়েছি সে যদি অবহেলা করে। এখন তো আর সে সন্দেহ নাই। রসবতী তুই যদি কখনও ভালবেসে থাকিস তবে অবশ্যই জানিস যে যাকে ভালবাসে তাঁর অদর্শনে কত ক্লেশ হয়—তারপর শেষে কি হোল বল দেখি। তার সঙ্গে দেখা হবার কি উপায় স্থির করেছিস?

রসবতী। হেঁগা কথায় বলে ভবী ভোলবার নয়। তোমার যে তাই হয়েছে, যে সে কথা হউক আপনার কায ভোল না। তার সঙ্গে এখন সে রূপ দেখা হবার বিলম্ব আছে, আপাতত যদি কেবল দেখতে চাও ভাল করে দেখাতে পারি। আগে শুভদৃষ্টি হওয়া ভাল নয়?

সুলোচনা। তাঁরে দেখাবি বল্লি, কেমন করে বল দেখি?

রসবতী। কেন তোমাদের ছাতে চল, সেইখান থেকে দেখাবো। তিনি বারাণ্ডায় থাকবেন বলেছেন।

সুলোচনা। তবে চল, আগে চক্ষু সার্থক করি, পরে যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

[উভয়ের ছাতের উপর গমন]

সুলোচনা। (স্বগত) আহা! কি মনোহর সায়ংকাল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। দিবাকর পশ্চিম দিক রক্তিমাবর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অস্তাচলে গমনোদ্যোগী হইতেছেন, সুখময় মলয় মারুত মৃদু মৃদু শব্দে প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কুসুমদল ক্ষরিত তৃপ্তিকর সেই গন্ধ বহন করত চতুর্দিগ আমোদিত করিতেছে—ভ্রমর ভ্রমরী নব মুঞ্জরিত

বকুল পূর্ণ সুধা পানে উন্মত্ত হইয়া অসীম আনন্দ ভরে গুণ গুণ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে, নব মুঞ্জরিত সুশোভিত তরুবরোপরি পিকবর কি সুমধুর স্বরে কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে। হা! মলয় সমীরণ বুঝি আমার অবস্থা দর্শন করিয়া মৃদু ভাবে প্রাণকান্তের নিকট বার্তা বহন করিতেছে, পিকবর মধুকর বুঝি আমার মঙ্গল সাধন জন্য প্রাণেশ্বরের নিকট আব্দাজ করিতেছে, তরুশাখাগণ বুঝি আমার ভাবী শুভাদৃষ্ট দৃষ্টি করিয়া মহোল্লাসে নব পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে, সমুদয় স্বভাব সুপ্রসন্ন দেখিতেছি, দেখি আমার অদৃষ্টে কি ঘটে (প্রকাশ) রসবতী, এই তো এলেম —কৈ কি দেখাবি বল্লি যে।

রসবতী । ভাই স্থির হও, তোমার কি আর দেরি সয় না। এখনি বারাণ্ডায় উঠবেন, আমার সঙ্গে কথা আছে।

[(রামকান্ত বসুর বাটী) মন্মথ উপস্থিত]

মন্মথ । (আপন গৃহে একক বসিয়া) (স্বগত) আঃ কিছু আর ভাল লাগতেছে না কেন? আমার অন্তঃকরণ সর্বদাই সরস থাকে, আজ এমন ভিন্ন ভাবে দেখ্‌তেছি কেন? রসবতী নাপতেনী আমাকে যাহা বলিয়া গেল তাহা কি সত্য না প্রবঞ্চনা করে আমার মন বুঝে গেল। না তাহাই বা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে, আমি আপন চক্ষুকে কি রূপে অপ্রত্যয় করিব, সে দিবস যে অপরূপ রূপ দর্শন করিয়াছি তাহা জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইব না। একবার অবলোকন মাত্রে চিত্ত পটে সেই মনমোহিনীর চন্দ্রবদন চিত্রিত হইয়াছে—অন্তঃকরণ সেই মরাল-গমনা কমলাক্ষীর প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। রসবতী কহিল সে অতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে। হা! বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এমত রূপবতীর অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণা নির্দেশ করিলেন। অবলা রমণীর ইহকালে পতিসুখ সম্ভোগ হইল না। হা! নিষ্ঠুর দেশের কি দুর্নীতি! যৎকালীন বিবাহ হইল যৎকালীন আপন অদৃষ্ট যাবজ্জীবন জন্য এক জনের হস্তে সমর্পণ করিল, তৎকালীন বিবাহ কাহাকে বলে কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিল না—বিবাহ হইল এই মাত্র জানিয়া যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হা!

জগদীশ্বর কি ভারতরাজ্যের রমণীদিগের প্রতি এ'মত দয়াশূন্য হইয়াছেন? তাহাদিগের যন্ত্রণার কি আর শেষ হইবে না? ইদানীং অনেকে বিদ্যার গৌরব করেন—অনেকে সভ্যতার গৌরব করেন, কিন্তু তাঁহারা কি ভ্রমেও বিবেচনা করেন না যে তাঁহাদিগের দেশে অদ্যাবধি স্ত্রীহত্যার পাতক দূরীকৃত হইল না, তাঁহারা প্রকাশ্যে সভ্যতার গর্ব করেন, কিন্তু অন্তঃপুরে তাঁহাদিগের রমণীরা অত্যন্ত অসভ্য জাতির রমণীদিগের অপেক্ষাও হীনাবস্থায় কাল সংবরণ করে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যেন স্মরণ হইতেছে, রসবতী আমাকে বলিয়াছিল, বারান্দায় উঠিলে তাহাকে দেখিতে পাইব, এইক্ষণে একবার যাওয়া কর্তব্য, রসবতীর কথা সত্য কি মিথ্যা জানিতে পারিব।

(মন্মথের বারাণ্ডায় উত্থান)

[(কীর্তিরাম ঘোষের ছাত) সুলোচনা ও রসবতী উপস্থিত]

সুলোচনা। কৈ লো রসবতী, ক্রমে রজনী নিকট হোল, আকাশে তারাগণ প্রকাশ হতেছে, অন্ধকার হলে আর কি দেখ্‌বো? আকাশের তারাসমূহের সহিত আমার সেই নয়নতারা মিশ্রিত হলে আর কি দেখবো?

রসবতী। (স্বগত) তাইতো, এত বিলম্ব হতেছে কেন? আজ কোথা কাজটা পাকাপাকি করে রাখবো, এখন সকল ফাঁকাফাঁকী দেখতেছি। কথায় বলে—ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধান ভানা ঘটে, অভাগিনীর ভাগ্যে কি তেমন লাভ আছে? এই কর্ম আমার অদৃষ্ট হতেই সমাধা হবে না। এত পরিশ্রম বুঝি সমুদয় বিফল হোল। (প্রকাশ) দেখ ভাই পুরুষের মন রমণীর মত নয়, পুরুষ জাতি অতি নিষ্ঠুর, বুঝি আর কোন আমোদে মত্ত হয়ে আমাদের কথা বিস্মৃত হয়েছে। দেখ এখনও সময় আছে।

সুলোচনা। রসবতী, অন্তঃকরণ অস্থির হয়েচে, এক নিমেষ শেল সদৃশ গাত্রে বিদ্ধ হতেছে, আর বিলম্ব সয় না।

রসবতী। (বারাণ্ডাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) ঐ যেন কে এসেছে না—দেখ দেখি, বুঝি তিনিই হবেন। (পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া)

হাঁ গো তিনিই বটে, ভাই নিকটে এসো—উভয়ের মিলন করে দেই। আহা! দেখ দেখি কি অপূর্ব রূপ! আমরা অনাগমনে বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করতেছিলাম, এখন দেখ সপ্তাহ কাল বৃষ্টির পর, যেমন গগন মণ্ডলে প্রভাকর উদয় হইলে সমস্ত জীবের উল্লাসজনক হয়, তাদৃশ হয়েছে কি না? আহা! বল দেখি তোমার বদনকমল তদ্দৃষ্টে প্রফুল্লিত হয়েছে কি না?

সুলোচনা। (ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া) (স্বগত) আহা! কি আশ্চর্য রূপ! কি অনির্বচনীয় লাবণ্য! হে প্রাণকান্ত! অদ্য মনে মনে তোমাকে মন অর্পণ করিলাম; তুমি যদ্যপি আমার প্রতি সদয় থাক, তবে কলঙ্ক ভয় থাকিবে না—পরের কথায় শঙ্কিত হইব না, অদ্য সরল চিত্তে তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিলাম।

(প্রকাশ)

দেখ লো কেমন, রূপে সুচিকণ, মদনমোহন,
দাঁড়ায়ে ঐ।
উহার তুলনা, তুলনা তুলনা, ভূতলে বল না
অমন কৈ ॥

রসবতী। (সুলোচনার হস্ত ধরিয়া) সুলোচনা, আজ জীবন সার্থক কর, মনের সাধে ঐ নবীন নীরদে দর্শন কর।

লক্ষেক যোজন অন্তে থাকে লো তপন।
তথাপি পদ্মের কান্তা শাস্ত্রের লেখন ॥
সূর্যের আতপে হয় প্রফুল্ল পদ্মিনী।
কমল মুদিত হয় বিনা দিনমণি ॥

সুলোচনা, তুমি যার জন্য নিয়ত অস্থির চিত্তে কাল সম্বরণ করতেছিলে—যাহার অদর্শন রূপ প্রজ্জ্বলিত বিরহানল হৃদয় কানন দগ্ধ করতেছিল, এক্ষণে ঐ মনোহর মন্মথ রূপ দর্শন করিয়া মন্মথের গর্ব খর্ব কর—দর্শন রূপ শীতল সলিল সেচন দ্বারা প্রবল বিরহানল নির্বাণ কর।

সুলোচনা। রসবতী, প্রাণকান্তের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম, কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা যেমন অগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়,

একণে দর্শন আমার পক্ষে সেইরূপ হইল, এখন যাহাতে শেষ রক্ষা হয় তা কর।

রসবতী । ভাই সবুরে মেওয়া ফলে, স্থির হও, ক্রমে সব হবে। এখন ভাই যাই। সর আসি, আবার কাল আস্‌বো।

সুলোচনা। এসো ভাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

[দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ]

[(কীর্তিরাম ঘোষের বাটীর বহির্ভাগে পাঠশালা) গুরুমহাশয় ও ছাত্রগণ উপস্থিত]

গুরুমহাশয়। ওরে নিধে, বড় গল্‌পো মাচ্চিস, আমার কি চোক নাই? লেখ্‌ লেখ্‌ গল্‌পের ঢের সময় আছে।

রামকান্ত । (ছাত্র) গুরুমহাশয়, বড় পেচ্ছাব পেয়েছে।

গুরু মহাশয়। যা যা, অমনি কলকেটা নে যা, এক কলকে তামাক সেজে আনিস।

রামকান্ত । (পুনরাগমন করিয়া) গুরুমহাশয়, বাবা আমাকে সকাল সকাল বাড়ী যেতে বলে দেছেন।

গুরুমহাশয়। কেন রে সকাল সকাল যাবি ?

রামকান্ত । গুরুমহাশয়, দিদিকে আজ কনে দেখতে আসবে।

বলাই । (ছাত্র) ওগো গুরুমহাশয়, ওর সব মিছে কথা, ওর বোনের ও বছর বে হয়ে গেছে। আবার কনে দেখতে আসঁবে কি গুরুমহাশয় ?

গুরু মহাশয়। (সক্রোধে) হেঁ রে হারামজাদা, বাড়ী যাবার কি আর ওজর পেলি না ? এক বেতে সোজা করে দেব দেখবি ?

রামকান্ত । (ক্রন্দনাকুল হইয়া) ও গুরুমহাশয় কোন্‌ শালা মিছে কথা কচ্চে, আমি কি করবো গুরুমহাশয় বাবা যে বলেছেন দিদির বে হবে।

বলাই । গুরুমহাশয়, ওর শালার দিব্বিতে বিশ্বাস নাই। যে বোনের বে জাল করে তার একটা শালার দিব্বি কি ?

গুরুমহাশয়। তোর বোনের কি দুবার বে হবে রে রামকান্তে ?

রামকান্ত আমি কি করবো গুরুমহাশয়, বাবা বলেছেন সক্কলের বোনের দুবার বে হবে।

কানাই
বলাই } দেখছ দেখছ গুরু মহাশয়, আমাদের গাল দিচ্চে গুরু মহাশয়।

নিধিরাম। গুরুমহাশয়, তোমাকেও গাল দিলে।

গুরুমহাশয়। নিয়ায় তো রে বেত গাছাটা রামকান্তে বড় ঘড় বাড়য়েছে, ওকে ঘা কতক না দিলে হবে না (বেত্র লইয়া) হেঁ রে হারামজাদা এদিগে আয় তো, তোকে ভাল করে বে টা দেখাই।

রামকান্ত। (ক্রন্দন করিতে করিতে) দোহাই গুরুমহাশয়, আমি কিছু জানিনে। শালার দিব্বি শুনবে না তো কি দিব্বি করবো?

গুরুমহাশয়। আর তোর দিব্বিতে কায নাই। নেয়ায় তো রে ওকে ধরে।

(রামদাস বাবাজীর প্রবেশ)

রামদাস। কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা। হরি বোল! হরি বোল! কি গো গুরু মহাশয়, বড় যে আসর গরম দেখ্‌তেছি? ব্যাপারটা কি, ও ছেলেটি কাঁদতেছে কেন, ওটি কাদের ছেলে।

গুরুমহাশয়। আসতে আজ্ঞা হউক বাবাজী, অনেক দিবসের পর যে? এ ছেলেটি মাজের পাড়ার অদ্বৈত দত্তের ছেলে, ও বড় বজ্জাত, আমাকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ী যাবে, তা আর কোন ওজর না পেয়ে বল্লে কি "আমার ভগ্নীর বের কনে দেখতে আসবে" কিন্তু তার বিবাহ দুই বৎসর হোল হয়েছে, আবার বলে কি 'সক্কলের ভগ্নির দুবার বে হবে', শুনেছেন মহাশয় ওর কথা?

রামদাস। গুরু মহাশয় ওর দোষ নাই, অদ্বৈত দত্তের কন্যার বিবাহ যথার্থ বটে, কাল্পনিক নয়। তুমি কি জান না বিধবা-বিবাহের নূতন ব্যবস্থা প্রকাশ হয়েছে? সেই ব্যবস্থা অনুসারে এই বিবাহ হবে; কোন্নগরে পাত্র স্থির হয়েছে। আমি উহার সমুদয় বৃত্তান্ত জানি।

গুরু মহাশয়। (কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া) রাম রাম! একি! কথায় বলে যা বলে কর্ত্তব্যে তাই হোল। বাবাজী মেয়েটির বয়স কত?

রামদাস । মেয়েটি বুঝি ১৩ বৎসরের হবে। এখন তোমার পোড়রে ছেড়ে দেও। আজ কনে দেখতে আসবে বটে।

গুরুমহাশয়। যারে রামকান্তে—বাড়ী যা, কাল সকাল সকাল লিখতে আসিস্।

রামকান্ত । দেখ দেখি গুরু মহাশয়, কানাই আমাকে ঠাট্টা কর্‌ছে। বলে কি, তোর বোনের দুবার বে হোল। গুরু মহাশয় আর কারর বোনের দুই বে হবে না?

গুরু মহাশয়। যা যা বাড়ী যা, আর ঠাট্টা শুনে কাজ নাই।

(সকলের প্রস্থান)

[(কীর্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর) রসবতীর প্রবেশ। স্থলোচনা ও সুখময়ী উপস্থিত]

স্থলোচনা । এই যে রসবতী, নাম কত্তে কত্তে এসেছিস্, তুই অনেক দিন বাঁচবি লো। তোদের পাড়ার খবর কি বল্ দেখি।

রসবতী । আমাকে দেখলেই কেবল খবর জিজ্ঞাসা কর বইতো নয়, নাপতেনী যে কি খেয়ে খবর যোটায়, তা ত একবার ভুলেও ভাব না।

স্থলোচনা । (সুখময়ীকে সম্বোধন করিয়া) দেখ ভাই, কথায় বলে "কানু ছাড়া গান নাই"! নাপ্‌তেনীর কান্ ছাড়া কথা নাই। যে সে কথা কয় আপনার কায ভোলে না। পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করলুম, তাতে খাবার কথা আন্‌লে।

রসবতী । একটা কথাও কি বলতে নাই গা। পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা কর্‌ছেলে, একটা বড় রঙ্গের খবর আছে, আগে কি খাওয়াবে বল তবে বলি।

স্থলোচনা । (ব্যগ্র হইয়া) কি খবর বল না রসবতী? তোর কাছে রঙ্গের খবর বৈকি আর কিছু খবর থাকে? তুই নিজে রঙ্গের মানুষ, তোর কাছে অন্য খবর আসবে কেন? এখন বল্ দেখি কি খবর?

রসবতী । ও পাড়ার দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নের বে হবে, কাল কনে দেখে গেছে, এই পঁচিশে বে, তোমাদের সব নিতে আসবে।

স্থলোচনা । (আশ্চর্য হইয়া) প্রসন্নের বে! সে যে ও বৎসর রাঁড় হয়ে-

৮

ছেলো, এ বের বর পেলে কোথা ? রাঁড়ের বে যে সত্তি সত্তি হোল। (সুখময়ীকে সম্বোধন করিয়া) ভাই এ বে দেখতে হবে।

সুখময়ী। তাই আমাদের যেতে দিচ্চে; বের নাম শুনলে মারতে আসবে :

সুলোচনা। না যেতে দেয় লুকয়ে যাব। ভাই প্রসন্ন তো সামান্ত মেয়ে নয়। সে একেবারে সব গোল ঘুচুতে বসেছে, যা হুউক বে টা দেখতে হবে।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মাবতী। কার বে রে রসবতী ?

রসবতী। না মা তোমার আর সে বের কথা শুনে কাজ নাই। একটা নূতন রকমের বে হবে; সেই কথা দিদি ঠাকরুণদের পর্‌চে দিচ্ছিলুম।

পদ্মাবতী। বে আবার নূতন আর পুরাণ কিরে ? তুই কত রঙ্গই জানিস, কি রকম বল দেখি শুনি ? আমরা বুড়ো হয়েছি, এত ফের ফার বুঝতে পারি না।

রসবতী। সে বড় কৌতুকের বে মা ঠাকরুণ, মাজের পাড়ার দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নের বে হবে। প্রসন্ন কে তা বুঝতে পেরেছ ? অদ্বৈত দত্তের মেয়ে, তার দুই বৎসর হোল বে হয়েছিল, পরে সে বৎসর বিধবা হয়েছে। সেই মেয়েটির এই পঁচিশে বে হবে। এ বে রঙ্গের বে নয় ?

পদ্মাবতী। নাপতেনী, তুই বুড়ো মানুষ পেয়ে কি ঠাট্টা করতেছিস ? আমি কি এতই পাগল হয়েছি প্রসন্নেরও বে হবে তাই বিশ্বাস করবো ? আমার তো এখনও বাওয়াত্তুরে হয় নাই ?

রসবতী। মা ঠাকরুণ, তুমি কি ঠাট্টার যুগ্যি মানুষ, তা তোমাকে ঠাট্টা করলুম ? নূতন বিধেন হয়েছে, তা কি শোন নাই ? বিধবার যে বে হবে।

পদ্মাবতী। বল্লি কি রসবতী (নাসিকায় হস্ত প্রদান করিয়া) ও মা কোথা যাব ! অবাক কল্লি যে মা। বিধবার বের বিধান হয়েছে বলে কি সত্তি সত্তি বে হোল। প্রসন্ন মা কেমন, মেয়ে কেমন করে

বে করবে? কেমন করে সে ভাতারকে নিয়ে ঘরকন্না করবে? প্রসন্নের মাই বা কেমন? এ বের বর কে, তাকে কেমন করে জামাই বলবে? মাস কতক বই পড়ে কি এতই বুঝেছে? ও মা, একি লজ্জার কথা! এর কত্তে প্রসন্নকে কেন মেচো বাজারে ঘর করে দিলে না, তাও যে ভাল ছিল। সে যা হউক নাপতেনী, আমার মেয়েদের কাছে ও সব কথা পর্‌চে দিও না; একালের মেয়েদের চেনা ভার, কার মনে কি আছে কে বলতে পারে। প্রসন্ন মা সেদিনকার মেয়ে, আমাদের বাড়ীতে খেলাতে আসতো, মাস দুই চার বই পড়ে স্বচ্ছন্দে রাঁড মানুষ বে কত্তে চললো। এ বের ঘটকালি কোন পোড়ারমুখো করেছে, তার কি দড়ি কলশী যোটে নাই—এ বের পুরুত কোন হতভাগা, তার কি আর যজমান যোটে নাই?

রসবতী। তা কি মা ঘোড়া হোলে চাবুক হয় না? বে করবার মানুষ যুটলে কি ঘটকের জন্যে, না পুরুতের জন্যে কর্ম আটকে যায়? তা মা ঘটকের দোষ দিলে কি হবে।

পদ্মাবতী। সে কি লো! তুই যে ঘটকের কথায় রেগে উঠলি। তোর এ বেতে কিছু হাত আছে নাকি? এখন যে অনেক ঘটকী হয়েছে, তারা সব কর্ম করতে পারে। এ বের ঘটকালি লুকয়ে করলে তারে কি বলে জানিস? সেটা আর পষ্ট করে বলবো না।

সুলোচনা। (স্বগত) নাপতেনীর লুকয়ে ঘটকালি করাই অভ্যাস বটে, তা পষ্ট কর্‌বার যো পেয়েছে ছাড়বে কেন। (প্রকাশ) মা, তোমার নাপতেনীর সঙ্গে ঝগড়া করলে কি হবে? "কত্তার ইচ্ছা কর্ম, উলু বনে কেত্তন।" বে করবে একজন, দেবে একজন, মাঝে মাঝে ওরে দোষ দিলে কি হবে।

রসবতী। মা আমার দোষ কি? আমি কার বাড়ী না যাই, কার কর্ম না করি, আমাকে বর দেখে আসতে বল্লে, দেখে এলুম, আর বরকে কনে দেখালুম, তা মা দাই মুদ্দুই রাজি, কি করবে কাজী?

পদ্মাবতী। (সুলোচনার প্রতি) মা তোরা ওসব কথায় কান দিস নে,

আর আজ কত্তারে বলে তোদের সব বই কেড়ে নেবো। আমরা হলুম বুড়ো মানুষ—ছেলেগুলো এক এক রকম, কোন দিন কি করে বসবে? রসবতী, তুই মা ওসব কথা আমার বাড়ীতে পাড়িসনে, আমার ঘর এমন নয়, পুণ্যের ঘর, লোককে দশ কথা শুনুই বই শুনি না। এখন যাই।

(পদ্মাবতীর প্রস্থান)

সুখময়ী। কেমন ঠাকুর ঝি, আর বে দেখতে যাবে? দেখলে তো, মা বের নাম শুনে কি বল্লেন?

সুলোচনা। মা অমন বলে থাকেন। বলে কয়ে কি কোন কায হয়? তুই ভাই নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোকে বে দেখিয়ে আনবো। ও লো রসবতী, তুই তো বের ঘটকালি করলি, এখন আমাদের বেটা দেখবার ঘটকালি কর দেখি, তুই মনে কল্লে সব পারিস।

রসবতী। না দিদি, শুনলে তো, এ কথায় থেকে কি তোমাদের দোরটি খাব? তোমাদের বাড়ী আসি যাই সেটি কি বন্ধ করবে? বে দেখবার আশ্চর্য কি, তা কি হয় না? শেষ ভাই প্রকাশ হলে, তোমাদের আর কি হবে, মত্তে আমিই মরবো।

সুলোচনা। তুই যে কর্ম করিস তা আবার প্রকাশ হবে? মর মাগী বুঝতে পারিস্ না, একবারকার রোগী আরবারকার রোজা। বেটা দেখয়ে আন দেখি, শেষ কি কত্তে কি হবে কে বলতে পারে?

রসবতী। ভাই বে দেখাবার আশ্চর্য কি? বের দিন একটু অধিক রাত করে পালকি নিয়ে আসলে তোমরা দুজনে চুপি চুপি যেতে পার, তার একটা ভাবনা কি? কিন্তু ভাই দেখো, আমাকে যেন মজয়ো না, কেউ জানতে না পারে।

সুলোচনা। সেই কথাই ভাল। নাপতেনী তুই আছিস্ বলে আমরা বেঁচে আছি। বের রাতে তবে আসিস, আমরা দুজনে যাব, আর অমনি চলে আসবো। খিড়কী দোরে পাল্কি আনিস।

রসবতী। তাই হবে, এখন তবে যাই, বাড়ীতে কি হচ্চে দেখি গিয়ে।

(সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান)

[(অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর) রসবতীর প্রবেশ]

রসবতী । কৈ গো কনের মা, বে বাড়ী সব চুপচাপ দেখতেছি যে, উয্যুগ স্যুয্যুগ কৈ, এ কেমন বে গা ?

মোহিনী । কি লো রসবতী এসেছিস, তবু ভাল। বের আর উয্যুগ স্যুয্যুগ করবো কি বোন, এ বেতে কেউ তো আর আহ্লাদ আমোদ কত্তে আসবে না, তার কার জন্যে উয্যুগ করবো।

রসবতী । তাই বটে বুঝেছি, যেমন ফাঁকী দিয়ে নিকোড়ে জামাই পাবে, তেমনি সব কম্মই ফাঁকী দিয়ে সার্‌বে ? মেয়ের বে দিতে বসেছ, ফাঁকী দিলে কি হবে ?

মোহিনী । সে কি লো, আমার কি তেমনি মেয়ে তা ফাঁকী দিয়ে জামাই পাবে ? জামাই কি কেউ ফাঁকী দিয়ে আনে ? তোর নেই তা তুই কি বুঝবি। উয্যুগের কথা তো বল্লুম, এ বেতে কাকে নিয়ে উয্যুগ করবো, কে আসবে ?

রসবতী । বে বাড়ীতে আবার লোকের ভাবনা ? বল না, আমি পাড়া সুদ্ধ সব আনি। আমাকে আরও ও পাড়ার মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেলো, তা আমি না জিজ্ঞাসা করে বলতে পাল্লুম না। শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌লে তো হয় না। বল না কেন বেতে কিছু করবো না। এখন তো এমন বে হতেই চল্লো, তাই বলে কি কেউ ঘটাঘটি করবে না, না আহ্লাদ আমোদ করবে না ? তুমি নেমন্তন্ন করলে কে না আসবে ? যাদের বাড়ীতে না আসতে দেবে, তারা লুকয়েও আসবে।

মোহিনী । তবে তুই এসেছিস ভালই হয়েছে, কে কে আসবে বল দেখি ? শামীকে সঙ্গে দেই, নেমন্তন্ন করে আয়।

রসবতী । কেন উত্তর পাড়ার সিঙ্গিদের বাড়ীর হর আসবে, থাক আসবে, বামা আসবে, বামী আসবে, মেনকা আসবে, ঘোষেদের বাড়ীর ক্ষমা আসবে, সুলোচনা আসবে, ভাবিনী আসবে, বাঁড়ুয্যেদের কাদী আসবে, কত নাম করবো সব্বাই আসবে।

মোহিনী । তবে একটু দাঁড়া, শামীকে ডাকি। ও শামী ই-ই-ই (উত্তর পাইয়া) শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়।

শ্যামা । কেন মা, কি জন্যে ডাকচো আমি খেলা কত্তে কত্তে এসেছি, শীগগির বল, আমায় জন্যে সব বসে রয়েছে।

মোহিনী । মেয়েটা কেবল ধূলোয় ধূলোয় বেড়ায় (অঞ্চল দ্বারা গাত্র মার্জনা করিয়া) তোকে যে বের নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে, কাপড় পরে আয়, গয়না পর্‌য়ে দেই।

শ্যামা । ওমা কার বের নেমন্তন্ন মা ?

মোহিনী । শুনিস্ নে, তোর দিদির যে আজ বে হবে লো। কেমন রাঙা বর আসবে দেখিস্ দেখি।

শ্যামা । ও মা দিদির যে একবার বে হয়েছিলো আবার কি বে মা ? দিদির কি দুবার বে হবে ? যদি আমায় সব জিজ্ঞাসা করে তবে আমি কি বলবো মা !

মোহিনী । শুন্‌লি নাপ্‌তেনী মেয়েটা কেমন বজ্জাত, ওকে সব বুঝয়ে বলতে হবে, তবে ও নেমন্তন্ন করতে যাবে (শ্যামার প্রতি) তোর সে কথায় কায কি ? তোর দিদির য'বার বে হোগ না কেন, তোকে বল্লুম তুই নেমন্তন্ন কত্তে যা।

শ্যামা । মা দিদির যদি দুবার বে দিলি তবে আমারও দুবার বে দিতে হবে, আমি কখন দিদির কত্তে কম বে করবো না। কেন, দিদির দুবার বর আসবে, আমার বুঝি একবার ? তা হবে না মা।

মোহিনী । আঃ মর ছুঁড়ি, শত্তুরের গে দুবার বে হোগ, আলাই বালাই তোর কেন দুবার বে হবে ? তোর দিদির কপালে ছিল তাই হলো। এখন যা কাপড় পরে আয়।

(শ্যামার প্রস্থান)

মোহিনী । দেখলি নাপতেনী, এতটুকু মেয়ে ওর কথা শুন্‌লি, দুবার বে শুনে আশ্চর্য হয়েছে।

রসবতী । ভাই, দিন কতক পরে দেখতে পাবে, যদি নাপতেনী বেঁচে থাকে তবে অমন কত বে দেবে, প্রথম প্রথম একটা কায হলে এই রকম হয়, তারপর কি আর এ রকম থাকবে। এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির মেয়ে সাজিয়ে দেও, অনেক বেড়াতে হবে।

মোহিনী । কোথা গেলি লো শ্যামা, আয় আয়, বেলা হলো।

শ্যামা । এই যে মা এসেছি, এখন চুল বেঁধে দে আর গয়না পর্‌য়ে দে।

মোহিনী । বোস্ লো বোস্ (অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া) এই হয়েছে, এখন যা মা।

শ্যামা । মা দিদির এ বেতে কি গয়না দিবি মা, বল না ?

মোহিনী । তোর সে খবরে কাজ কি ? তুই যে কম্মে থাকিস সেই কম্মে যা আর পাকাম করে কায নাই।

শ্যামা । মা তুই আমাকে বলবিনে, তা দুবার বে দিস না দিস গয়না দুবার দিতে হবে।

মোহিনী । ভাল, তা তখন হবে, এখন যা তুই বড় বাচাল, কারুর সঙ্গে কোন কথা কোস্‌নে, নাপ্‌তেনী সব বলবে।

শ্যামা । তবে চল্লুম, আয় রে নাপতেনী আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

[(হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর) রসবতী ও শ্যামার প্রবেশ]

রসবতী । কৈ গো মেয়েরা কোথা গো ? কেউ যে খবর নেয় না।

কাদম্বিনী । কে লা রসবতী এসেছিস্, আয় আয়, এ মেয়েটি কার রে ? দিব্বি মেয়েটি যে। তবে রসবতী, অনেকদিন তোরে যে দেখি নে ?

রসবতী । আর বোন এক রকমে রাত—মর দিন কাটাই। আর আসতে পারিনে, তা দেখতে পাবে কেমন করে। আজ একটা কায পড়েছে, তাই মত্তে মত্তে এলুম। এ মেয়েটি কে তা চিনলে না ? এটি অদ্বৈত দত্তের ছোট মেয়ে।

কাদম্বিনী । আহা দিব্বি মেয়েটি যে রে ! এসো মা বসো বসো। (রসবতীর প্রতি) তোর তো কখন কায কামাই নাই, আজ কি কাযে পড়ে এলি বল দেখি ?

রসবতী । তোমরা কি শোন নাই গা, অদ্বৈত দত্তের বড় মেয়ে প্রসন্নের আজ বে, তোমাদের নেমন্তন্ন কত্তে এলেম, সব যেতে হবে, আমি যখন এসেছি—তখন কোন ওজর শুনবো না।

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনিতা সত্যভামার প্রবেশ)

সত্যভামা । কি গো রসবতী যে, কি খবর বাছা ?

রসবতী । এই মা তোমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন কত্তে এলেম,—ও পাড়ার দত্তেদের বাড়ী প্রসন্নের আজ বে ।

সত্যভামা । প্রসন্নের যে সে বছর বে হয়েছেল বাছা, আর বছর সে জামাইটি না গেছে ? আর কোন প্রসন্ন বাছা ?

রসবতী । না মা সেই প্রসন্ন— । তোমরা কি শোন নাই গা, ভট্‌চাযিদের ব্যবস্থা নিয়ে সব রাঁড়ের বে হচ্ছে ? এ মা সেই বে ।

সত্যভামা । ও মা সে কি গো । কোথা যাব মা ! রাঁড়ের বের ব্যবস্থা বেরয়েছে বলে কি সত্য সত্যি বে কত্তে হয় ?

রসবতী । মা স্থদু কি ব্যবস্থা বেরয়েছে ? রাঁড়ের বের আবার আইন হয়েছে।

সত্যভামা । বে হবে তার আবার আইন কি বাছা

রসবতী । তা শোন নাই মা ? এই যেমন কোম্পানির লোকে যাঁড় ধরে আর গাড়ীতে যোতে, তেমনি নাকি আর দিন কতক বই রাঁড় ধরবে আর বে দেবে ।

সত্যভামা । তোরা বাছা কেবল রঙ্গ নিয়ে আছিস্। প্রসন্নের বের কথা শুনে আমার হরি ভক্তি উড়ে গেছে । এ মেয়ে কেমন করে বে করবে, একি লজ্জার কথা । এ যে ঘোর কলি কাল পড়লো ।

ও মা ও মা কোথা যাব লাজে মরে যাই।
মোহিনীর হবে নাকি নূতন জামাই ।।
কেমনে এমন বিয়ে করিবে প্রসন্নি ।
ধন্য বটে মেয়ে তারে ধন্য বলে গণি ।।
কেমনে নূতন বরে বরিবেক মেয়ে ।
সত্য সত্য হলো তবে বিধবার বিয়ে ॥
ঘুচিল কি সকলের কলঙ্কের ভয় ।
ধর্ম কর্ম হলো লোপ অধর্মের জয় ॥
আমরা কুলীন ঘরে জন্মিয়াছি বটে ।
তবু ত এখন বুদ্ধি নাহি আসে ঘটে ॥
ঘরে বসে কি না করি কে দেখে কাহারে ।
গঙ্গা জলে ধোয়া মেয়ে আছে কার ঘরে ॥

ছ-মাস ন-মাস অন্তে কান্তে দেখা পাই।
উপলক্ষ আছে বলে ধর্ম রক্ষা তাই ॥

বিপদে পড়িলে ঘরে আসেন জামাই।
যেখানে যা করি দেই তাঁহারি দোহাই ॥

বুঝিবার ভুলে যদি বাড়াবাড়ি হয়।
অমুক যে ভাল নয় এই মাত্র কয় ॥

এ কি দেখি সর্বনাশ ত্রাস নাই মনে।
ধেড়ে মেয়ে সভা মাঝে আনিবে কেমনে ॥

এ বের ঘটক কেবা কেবা এর বর।
কি রূপে এ রূপ কাযে হইল তৎপর ॥

প্রসন্ন তো ছোট মেয়ে লজ্জা নাহি তার।
কি হবে মা ছেলে পিলে ঘরে আছে যার ॥

হাতে ছেলে কাঁকে ছেলে শুধাবে যখন।
ও মা ও মা কোথা তুমি করহ গমন ॥

কি করে প্রবোধ দিবে কি বলিবে তারে।
বলিবে কি যাই বাবা বাবা আনিবারে ॥

কি বলিয়া লোক মাঝে দেখাইবে মুখ।
বলিবে কি উথলিল পুরাতন সুখ ॥

কোথায় ছেলের হবে শ্রাদ্ধেতে উৎসাহ।
জননী চলিল তার করিতে বিবাহ ॥

কোথায় করিবে ছেলে বৃষ অন্বেষণ।
জননীর হলো বিয়ে ধনুর্ভঙ্গপণে ॥

উপস্থিত ঘোর কলি দোষ দিব কারে।
ডুবিল ভারত ভূমি পাপের সাগরে ॥

তোর কথা শুনে রসবতী, আমার গায়ে জ্বর এসেছে, এদের কেমন বুকের পাটা, স্বচ্ছন্দে রাঁড় মেয়ের বিয়ে দিতে চল্লো। নেমন্তন্ন কর্‌তে এসেছ বাছা তা যাব, আমরা কুলীনের মেয়ে কোথায় না যাই, আমরা সকলে যাব।

রসবতী । তোমরা যাবে না তো কে যাবে ? মা এখন তবে আমরা আসি, অনেক বাড়ী বেড়াতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

এই বিবাহের বিষয় লইয়া গ্রাম্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা হইতে লাগিল ; একজন ইহার বিরোধিতা করিতে লাগিল ; একালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থলোভে অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইল। দারিদ্র্য বশতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ মেরুদণ্ডহীন, সুতরাং বিবাহের অনুষ্ঠানে কোন বাধা হইল না।

[(অদৈত দত্তের অন্তঃপুর) স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুলোচনা, সুখময়ী ও রসবতীর প্রবেশ]

সুলোচনা। কৈ গো, কনের মা কোথা গো ? বে ফুরয়ে যাবে বলে শীগগি্র শীগ্গির এলেম, কৈ বর কোথা ?

মোহিনী এসো মা এসো। বর এখনও বাড়ীর ভিতর আসেন নাই, আমরা এই স্ত্রী আচারের উয্যুগ সুয্যুগ করতেছি।

সুলোচনা। কৈ গো পাড়ার আর সব কোথা ? (চতুর্দিগে দৃষ্টি করিয়া) এই যে সব এসেছেন। তবে থাক ভাল আছিস্, হর ভাল আছিস্, মেনকা ভাল আছিস্, কতদিনের পর ভাই তোদের সঙ্গে দেখা হলো।

থাক । আর ভাই ভাগ্গিস্ বে'টা হলো, তাই তোর সঙ্গে দেখাটাই হলো। সুলোচনা, তোর মা যে তোকে আসতে দিলে ? তোকে একদণ্ডের জন্যে চোকের আড হতে দেয় না, এই রাত্রে বিয়ে দেখতে কেমন করে বেরুয়ে এলি ?

সুলোচনা। (হাসিয়া) রেতে বেরয়ে এলেম তাই আশ্চর্য্য হলি, কত লোক যে দিনে বেরয়ে আসে, তার কি বল দেখি ? আজকাল আবার বেরোবার ভাবনা।

মোহিনী । আমার মা এখনও কোন কর্ম্ম হয় নাই, আমি যাই বর এলে তোমাদের ডেকে নিয়ে যাব।

(মোহিনীর প্রস্থান)

সুলোচনা। প্রসন্নের বর কত কথা জানে আজ দেখ্বো। ভাগ্গিশ্ এই বে দেখতে এসেছি বোন। তাই দুটো কথা কয়ে বাঁচবো।

থাক । সে দিগে ফাঁকি তা জানিস্? একি সেই বে পেলি? কনে এক দিগে পড়ে থাকবে, বর নিয়ে সমস্ত রাত আমোদ করবি? এ-বের বাসর ঘরে তিষ্ঠান ভার হবে, পালাবার পথ পাবি না।

সুলোচনা। তা তখন বুঝবো। বর তো প্রসন্নের চিরকালের লো, আমাদের আজ বৈ তো নয়। একবার এলে হয় তখন দেখিস্। এখন ভাই চল বাহিরে বর বসে আছে, ঐ দিগ্ দিয়ে দেখে আসি।

(স্ত্রীলোকদিগের বর দেখিতে গমন)

সুলোচনা। (স্বগত) আহা দিব্বি বরটি যে গা। ছেলেটি দেখে দুঃখ হচ্চে, এমন ছেলের কপালে এই বে ছিল। তা বে টা যেমন হোক বরের অদৃষ্টটা ভাল, একেবারে রাঁধা ভাত পেলে। প্রসন্নের অদৃষ্টটাও ভাল বলতে হবে, আমাদের মত চিরকালটা জ্বলে পুড়ে মর্তো সর্বনাশী একাদশীর ভার বইতো, সে সব দায় এড়ালো। আমাদের মত আলোচাল খেতে হবে না— চড়ুকির হাসির মত কেবল মুখে ধর্ম ধর্ম করে মরতে হবে না।

রসবতী । কি গো কেমন বর দেখলে?

সুলোচনা। এই যে নাপ্তেনী একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তোকে খুঁজতে ছিলুম। ঐ দেখ দেখি বরের পাশে উটি কে বসে রয়েছে, ওঁকে দেখে মনটা কেমন কচ্চে, যেমন কোথায় দেখেছি বোধ হচ্চে।

রসবতী । কি গো তুমি ওকে একেবারে চিনতে পারলে না। আমরা তো ভাল, খেলুম না ছুঁলুম না তবু ভুলতে পাল্লুম না, তুমি একেবারে সব ভুলে গেলে? এই ভাই ভালবাসা ভালবাসা কর, ভালবাসা থায় না পরে। আমরা তো বয়েস কালে ভাল ছিলুম গা, যাকে একবার ভালবাসতুম তাকে কি আর ভুল্‌তুম। লোকে বলে মেয়ে মানষের ভালবাসা আর পাখির বাসা, আছে তো আছে নেই তো নেই; ভাই, সেকথা তো মিল্লো, একবার ভাল করে দেখ দেখি।

সুলোচনা। মর্ মাগী, তোর মন জানবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলুম। দিন রাত যাকে মনে মনে দেখ্‌তেছি, তাকে কি আবার চিন্‌তে হয়। এখন বল্ দেখি, রসবতী, উনি কতক্ষণ থাকবেন?

রসবতী । তুমি যেমন ভুলেও রসবতীকে একবার ভাব না, রসবতী তোমার জন্যে দিনরাত ভেবে মরে। তুমি কেমন করে জানবে, এ বাড়ী যে মন্মথের মামার বাড়ী, এখনি জল খেতে এলে তোমার সঙ্গে নির্জনে দেখা হবে। ভাই এখন বুঝে দেখ দেখি, তোমাকে এত লুকয়ে চুরয়ে এখানে কেন আনলুম। বে কি কেউ কখন দেখি নাই, তাই তোমাকে বে দেখাতে আন্‌লুম? ভেবে দেখ দেখি ভাই, সে দিন কেমন হবে, যে দিন ঐ বর আর এই কনে, মনের সুখে এই রকমে বে দেবো? তখন ভয় থাকবে না —ভাবনা থাকবে না, মনের মত মন্মথকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করবে।

সুলোচনা। রসবতী, তুই আশায় আকাশের চাঁদ হাতে দিস্, তোর কথায় এতদিন বেঁচে আছি। বের কথা বল্‌তেছিলি, পোড়া দেশে কতকগুলীন লোক না মলে আর কতকগুলীন না হোলে, রাঁড়ের বে কি সর্বত্রে চলবে? এই একটা বে হচ্চে, দেখিস্ দেখি এর কত গোল হবে। এক কর্তা বল্‌বেন, ওর বাড়ীতে ভাত খাওয়া হবে না, আর এক কর্তা বল্‌বেন, এ বের পুরুত, বর যাত্রদের এক ঘরে করা উচিত। ভাই, এই সব বুড়ো বুড়ো কর্তারা একবার ভুলেও ভাবেন না যে, বিধবা হয়ে কত লোক কত কি কচ্চে। যারা কিছু না করে ধর্ম পথে আছে, তাদের ক্লেশটাও তো ভাব্‌তে হয়, তাদের বাঁচবার সাধ কি থাকে বল দেখি?

রসবতী । ভাই রাঁড়ের বে এখন গণ্ডা গণ্ডা হবে, যদি বেঁচে থাক আর থাকি তবে কত বে দেখাব।

সুলোচনা। সে যা হবার তা হবে, এখন বল দেখি উনি কখন বাড়ীর ভিতর আসবেন?

রসবতী । তুমি এখন স্ত্রী আচার দেখতে যাও, আমি সব ঠিক করে তোমাকে ডেকে আন্‌বো এখন।

সুলোচনা। সেই কথাই ভাল, আমাকে ভাই ডাকিস্। ঐ বর বাড়ীর ভিতর যাচ্ছে, আমরা স্ত্রী আচার দেখিগে।

[কামিনীগণের স্ত্রী আচার দেখিতে গমন]

হর । ঐ লো বর আস্‌ছে, থাক শাঁকটা বাজা, ওলো ভাবনী তোরা সব উলু দে।

ভাবিনী । আগে এই পিঁড়িখানা পেতে দেই। তুই ভাই হাই আমলা ঝাল্ ঝাড়া বাটা নে আয়, অমনি বরণ ডালা আর শ্রীটে আনিস্। (চতুর্দিগে নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ কনের মা কোথা, বর এলো গিন্নীর খবর নেই, এ কেমন গো?

হর । তুই যেমন চোকের মাথা খেয়েছিস্, ঐ যে মোহিনী এসেছে, আয় সব আয় বরণ কর্‌বার উয্‌যুগ করি। (বরকে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান করাইয়া) (স্বগত) আহ' দিব্বি ছেলেটি, মুখখানি যেন ছাঁচে তুলছে, প্রসন্নের কপালটা ভাল বল্‌তে হবে। (প্রকাশ) আয় গো মোহিনী আয়, তোর জামাই বরণ কর্‌সে (অন্যান্য কামিনীগণের প্রতি) তোরা ভাই ধুতরোর পিদ্দীমগুলো জ্বাল, চিতের কাটি একুশটা গুণে দিছিস্?

ভাবিনী ।- তোর আর গিন্নেপানা দেখে বাঁচিনে, আমরা কি কখন বে দেখিনে তা এ দিছিস্, ও এনেছিস, জিজ্ঞাসা কর্‌তেছিস্? এই সব এনে রেখেছি। তুই আগে তুক তাক্‌গুলো কর, এই কুলুপ নে (কর্ণে কর্ণে) এই মাকুটা নিয়ে বরকে একবার ভ্যা করা দিগি দেখি।

হর । (বরকে সম্বোধন করিয়া) ভাই, আজ ওজর কল্লে চলবে না। (মাকু দিয়া) এই হাতে দিলুম মাকু, ভ্যা করতো বাপু।

ইহার পর বাসর ঘরের এক জীবন্ত চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল, সুলোচনাও সমবয়স্কা সখীদিগের সঙ্গে হাস্যপরিহাসে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুলোচনা। এখন ক্রমে রাত শেষ হলো, তোমার একটি গান শোনবার জন্যে আমরা সব ব'সে র'য়েছি, আমাদের একটি গান শোনাও।

বর । তাই এতক্ষণ বলতে নাই? কি গান গাব বল দেখি, বল্ মা তারা গোছ, একটা রামপ্রসাদী গাব?

সুলোচনা। ও[illegible]মরা কি তোমার রামপ্রসাদী শোনবার জন্যে বসে [illegible]প্রসাদী গেয়ে ভিক্ষা করে, আমরা ঢের শুনেছি।

বর । তবে একটি সখী সম্বাদ গাই ?

সুলোচনা । কেন আমরা কি কখন কবী শুনি নাই ? তা তোমার কাছে সখী সম্বাদ শুন্‌বো ?

বর । তবে একটি রামমোহন রায়ের গীত গাই।

সুলোচনা । একি ধান ভানতে শিবের গীত ? বাসর ঘরে রামমোহন রায়ের গান ?

বর । তবে সব গোল ঘুচ্‌য়ে একটু হরি সঙ্কীর্তন করি ?

সুলোচনা । কেন, আমাদের তো অন্তিম কাল উপস্থিত হয় নাই, তা তুমি হরি সঙ্কীর্তন করবে ? হরি সঙ্কীর্তন শোনবার অনেক সময় আছে। যদি ভাই গাও তবে আর নেক্‌রায় কায নাই।

বর । তবে কি গান গাব, তোমরাই বল। একটি নিধু বাবুর টপ্‌পা গাই ?

সুলোচনা । দেখলো হর দেখ্‌, তবে নাকি বর রসিক নয় ? আমি তো বলেছিলেম, ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল আছে (বরের প্রতি) যাই, রাত শেষ হয়েছে। আমাদের সব এখনি বাড়ী যেতে হবে, একটি টপ্‌পা গাও শুনে যাই।

বর । (গীত) 'এখন রজনী আছে, বল কোথা যাবে রে প্রাণ। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোগ নিশি অবসান। অরুণ উদয় হবে, সুকমল প্রকাশিবে, কুমুদ মুদিত হবে, শশি যাবে নিজস্থান। এই তো গান গাইলেম, এখন তোমার ভাই একবার নাচ্‌তে হবে, না বল্লে শুনবো না।

হর । এইবার দেখা যাবে সুলোচনা, বড় বরের সঙ্গে লেগেছিলে, এখন নাচ দেখি, কেমন মেয়ে দেখি।

সুলোচনা । ওলো বুঝ্‌তে পাল্লিনে, সমস্তরাত জেগে বরের বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে, তা না হলে ভাল মানুষের মেয়েদের নাচতে বলেন ? এখন সকাল হলো বাড়ী যাই।

বর । তোম্‌রাই দেখগো হার কার হলো, আমাকে বোবা বল্‌তে ছিলেন, এখন পালায় কে দেখ।

সুলোচনা । (গমনোদ্যোগে গাত্রোত্থান করিয়া [redacted] তাদের বরের

জিত হয়েছে, ওঁর মাথায় জয়পত্র বেঁধে দিস্, আমরা এখন চল্লুম আয় লো রসবতী আয়, সুখময়ী আয়, বাড়ী যাই।

রসবতী । চল গো চল; পাল্‌কি বসে রয়েছে আর দেরি করে কায নাই। আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাব না, কাল দেখা হবে।

(সুলোচনা ও সুখময়ীর প্রস্থান)

এই বিধবা-বিবাহের ঘটনা লইয়া গ্রাম্য সমাজ নানা প্রকার কথাবার্তা চলিতে লাগিল। তারপর সমাজের যাঁহারা কর্তৃস্থানীয়, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর কিছু করিবার উপায় নাই, কিন্তু যাহাতে ভবিষ্যতে আর গ্রামে বিধবা-বিবাহ হইতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এমন সময় একদিন কীর্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুরে সুলোচনার শয়ন গৃহে রসবতী নাপ্‌তেনী আসিয়া প্রবেশ করিল।

রসবতী । কি গো, কাল রাত জেগে এখনও ঘুমুচ্চো গা? এত ঘুমের ঘোর কেন, কেউ কি কখনও রাত জাগে না?

সুলোচনা। রসবতী এসেছিস্ তোকে স্বপ্নে দেখতেছিলুম, তোর লো যেমন রাত জাগা অভ্যাস আছে; আমার তো আর তা নাই তুই অমন সাত দিন সাত রাত জেগে কাটাতে পারিস্।

রসবতী । এই ভাই তোমারও রাত জাগা অভ্যাস করে দিচ্চি তার একটা ভাবনা কি? আমাদের ভাই বাজে রাত জাগা, তোমার কাযের রাত জাগা হবে। এখন সেদিন মন্মথের সঙ্গে দেখা হয়ে নাপ্‌তেনীর কথা বিশ্বাস হয়েছে কিনা বল দেখি?

সুলোচনা। তোকে কোন কালে অবিশ্বাস করেছি লো? এখন তুই না হ'লে যে শেষে রক্ষা হয় না, বের উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা মাত্র হয়েছে, এখন তাঁর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হবার উপায় কি বল? দিন রাত কেবল তাঁর রূপ মনে জাগ্‌তেছে, কেবল তাঁরেই ধ্যান কর্‌তেছি।

রসবতী । আমি ভাই একটা উপায় ঠিক করেছি, তা অনায়াসে হতে পারে, তুমি এই ঘরে একা থাক জানালা দিয়ে স্বচ্ছন্দে মানুষ আসতে পারে। যদি তুমি সম্মত হও তবে আমি মন্মথবাবুকে

আজ রাত্রে তোমার ঘরে আনতে পারি। শেষ রাত্রে এই জানলা দিয়ে নেবে যাবেন, রাত্রে আর তোমার ঘরে কে আসবে ?

সুলোচনা। তোর এত বুদ্ধিও আসে ? আমাদের ভাই আসে না, জানলা দে আসবেন বলতেছিস্, উঠ্‌বেন কেমন করে ?

রসবতী। তোমার ভাই তা ভাবতে হবে না, তুমি কেবল ঘরের দোর বন্ধ করে শুয়ে থেকো, বাকি সব আমি করবো। আর ভাই আমি তোমার কাছে সর্বদা আসবো না, কি জানি কেউ যদি কিছু মনে করে। মাঝে মাঝে এসে সব বলে যাব।

সুলোচনা। তবে নাপ্‌তেনী আজ রেতে তাঁকে আনিস্, যেন দুকথা হয় না।

রসবতী। হ্যাঁ গো যখন বলে যাচ্ছি তখন কি দুই কথা হবে ? এখন চল্লেম। (রসবতীর প্রস্থান)

সুলোচনা। (ক্ষণেক বিলম্বে) (স্বগত) আঃ আজ এক এক নিমেষ বৎসর সদৃশ বোধ হইতেছে কেন ? দিবসের কি আজ শেষ হইবে না ? না সূর্যদেব আমার প্রতি নির্দয় হইয়া অস্তাচল বিস্মৃত হইয়াছেন, হা ! প্রাণ কান্তের নিমিত্ত প্রাণ অস্থির হয়েছে, তাঁহার দর্শন ভিন্ন সুস্থির হইবে না। আজ বিরহের ধার ভালরূপে পরিশোধ করিব,পোড়া কোকিল চিরকালটা পুড়্‌য়েছে, আজ প্রাণনাথকে বলে তারে ভাল করে শিখাব, চন্দ্রের কিরণ চিরকালটা বিষ বরিষণ করেছে, আজ তাকেও শিখাব, মলয় সমীরণ যত জ্বালাতন করেছে, আজ তিনি কেমন বিরহিণী জ্বালান, তাঁকে বুঝবো—

ভাসিলাম আজ আমি সুখের সাগরে।
প্রাণনাথ আসিবেন আমার মন্দিরে ॥
সেই পূর্ণ শশধর হইলে উদিত।
মানস কুমুদ সম হবে বিকসিত ॥
তাঁহারি দর্শন রূপ তপন কিরণ।
দুঃখ ময় অন্ধকার করিবে হরণ ॥
তাঁহারি বচন সুধা সুখে করি পান।
বিরহ পিপাসা হতে পাব পরিত্রাণ ॥

দিনরাত্র জ্বলিয়াছি বিরহ অনলে।
জুড়াব জীবন আজ মিলনের জলে ॥
কোকিল্ করেছ মোরে যত জ্বালাতন।
প্রাণেশ্বরে বলে তোরে শিখাব এখন ॥
জ্বলিয়াছি শশী তব বিষ বরিষণে ॥
জাননা সে প্রাণ নাথ জল সার জানে ॥
মলয় বাতাস তুমি হুতাশ বাড়াও।
আসিতেছে প্রাণকান্ত ক্ষণেক দাঁড়াও ॥
ভ্রমর ভাঙ্গিব তোর জারিজুরি আজ্।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসে যুবরাজ ॥
সন্মথ তুমি বা জান কতই সন্ধান।
মন্মথের হাতে আজ্ নাহি পরিত্রাণ ॥
দিয়াছ রমনী পেয়ে যতেক বেদনা।
পাইলে তাহার শাস্তি হইবে চেতনা ॥
তুমি হে বসন্ত জানি দুরন্ত নিতান্ত।
আসিতেছে প্রাণকান্ত তোমার কৃতান্ত ॥
নিষ্ঠুর কুসুম তোর বড়ই সৌরভ।
প্রাণনাথ আজ সব ভাঙ্গিবে গৌরব ॥
যন্ত্রনা দিয়াছ যত বুঝিব এখন।
মন্ত্রনা করিয়া নাথ করিবে শাসন ॥

(ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া) কখন বেশ ভূষার প্রতি মনোযোগ করি নাই, আজ কেন সে দিগে মন যাচ্চে। (দর্পণ লইয়া) চুলগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে রয়েছে, ভাল করে বাঁধ্‌তে হবে। (বিরক্ত হইয়া) আঃ কাল মত্তে রাত জাগ্‌তে গিছ্‌লুম, চোক দুটো রাঙ্গা জবাফুল হয়ে রয়েছে (সর্বাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া) বর্ণটা কেমন কালির মতন হয়েছে, মুখ শুকুয়ে গেছে। এ বেশ প্রাণনাথকে কেমন করে দেখাব,হাঃ ? ছেলেবেলা বিধবা হয়েছি, কখন তো চুলের দিগে ফিরে দেখিনে, কেবল পশুর মত খেয়েছি আর ঘুময়েছি, আজ আর্শিতে মুখ দেখে কেমন লজ্জা কচ্চে। যাহোক্ চুলটা বাঁধি, আর গাটা পুঁচি, আর চোকে একটু

গোলাপ জল দেব কি? তাই দেই, তবু চোকটা কিছু ফর্সা হবে। সকালে যদি শুনতুম তবে স্নান কর্‌তুম, তবু একটু ভাল দেখাতো। যাই এখন মার কাছে যাই, কাল যে দেখতে গিছলুম, জান্‌তে পেরেছেন কি না দেখিগে।

[সুলোচনার প্রস্থান]

[(অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর) মোহিনী ও হর এক গৃহে উপস্থিত]

হর । ভাই তোর তো এখন নূতন জামাই হলো, কত লোকে কত বলেছিলে, যে কেউ হাত দিয়ে রাখ্‌তে পাল্লে? আগে মনে করেছিলেম কেউ আসবে না, শেষে বের রাতে দেখি কিনা সক্কলেই এলো। ঐ পোড়ার মুখো ভট্‌চায্যিগুলো পযন্ত বিদেয় নে গেছে। আর ভাই কত লোক লুকয়ে এসেছেল জানিস্? ঘোষেদের বাড়ীর গিন্নি কেমন্ তা তো শুনেছিস্, তাঁর মেয়ে আর বৌ লুকয়ে এসে, সমস্ত রাত্ত কত আমোদ কর্‌লে।

মোহিনী । ভাই, কোন মেয়েটি ঘোষেদের বল্ দেখি? ঐ যার নাম সুলোচনা?

হর । হাঁ ভাই তোর কি মনে নাই, কাল্ বাসর ঘরে বরের সঙ্গে কত আমোদ কর্‌লে? সুলোচনা ভাই বড আমুদে মানুষ।

মোহিনী । ভাই যা বলিস্, যা কোস্, মেয়েটির রকম ভাল ঠেকেনা, কেমন উচক্কা উচক্কা বোধ হয়।

হর । তোর বোন্ কেমন কথা, সুলোচনার মত মেয়ে কার ঘরে কটা আছে? একদিন তোমার বাড়ীতে যে দেখ্‌তে এসেছেল, তাইতে তুমি তার রকম ভাল দেখলে না। ছেলেবেলা অমন রকম হয়ে পর্যন্ত কারর সঙ্গে মুখ তুলে কথা কয়না।

মোহিনী । আমার ভাই কারর কথা কার সঙ্গে বলা অভ্যাস নাই, তুই যদি আগে বল্লি তবে একটা কথা বলি, কাকেও বলিস্ নে। আমি ভাই দেখে অবাক্ হয়েছি।

হর । তুই কি থেকে থেকে স্বপ্নে দেখ্‌তেছিস্? দু-দণ্ডের মধ্যে এত কি দেখেছিস্ বুঝতে পারিনে।

মোহিনী । আগে শোন্ তার পরে আমায় দোষ দিস্। কাল ভাই তোরা

তো স্ত্রী আচার করে উপরে গেলি, আমি কন্যা যাত্র কত হয়েছে বাহিরের দিকে দেখতে গেলুম, তা বল্লে না পেত্তায় যাবি, ভাই ও পাশের ঘরে আমাদের মন্মথের সঙ্গে সুলোচনা কথা কচ্চে দেখ্‌লুম। আমি ভাই তাই দেখে দু-দণ্ড অবাক্ হয়ে রইলুম, একবার মনে কল্লুম মন্মথের সঙ্গে বুঝি কি সম্পর্ক আছে, তারপর ভাবলুম, তাই বা কেমন করে হবে, মন্মথ আমাদের ঘরের ছেলে, ওর সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে আমরা আর জান্‌তুমনা। এই কথা মনে কত্তে কত্তে, দেখি যে রসবতী নাপ্‌তেনী সেই ঘর থেকে বেরুয়ে এলো তখন সব বুঝলুম। তারপর ভাই আমি নাপ্‌তেনীকে দেখেও না দেখে আর এক দিগে চলে গেলুম। কে জানে মা, না দেখে শুনে কারব্ কোন কথা বল্লে পাপ হয়, এ আপ্‌নার চোকে দেখলুম তাই বল্লুম। ঐ যে নাপ্‌তেনী আসেন উনি একজন কম পাত্র নন্ ওঁর অসাধ্য কর্ম্ম নাই, ওঁর সঙ্গে যখন সুলোচনার এত মিলেছে, তখন ভেতরে একটা কিছু আছে তার আর সন্দেহ নাই।

হর। কে জানে বোন্, তোর কথা শুনে আমার হরি ভক্তি উড়ে গেছে। আমি জানতুম সুলোচনা বড ভাল মেয়ে, একটু বাচাল হোগ্, রীত চরিত্র ভাই ভাল শুনেছিলুম। কার মনে কি আছে তা কে বলতে পারে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ঐ জন্যে কাল্ সুলোচনাকে আর রসবতীকে অনেকক্ষণ দেখ্‌তে পাইনে, দুজনে বুঝি ঐ কায কর্‌তেছিল, যা হোগ বোন আমাদের ও কথায় কোন কথা কয়ে কাজ নাই।

মোহিনী। মন্মথ ঘরের ছেলে উরির জন্যে ভাবনা হয়, তা না হ'লে পরের জন্যে কে কোথায় ভাবে? আর সে ভাবনার ফল বা কি! ভাই এই জন্যে কর্তা বলেন যে, রাঁড়ের বের যে, ব্যবস্থা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। আর বাপ মাকে কোন যন্ত্রনা সইতে হবে না। এই দেখ দেখি সুলোচনা এমন ঘরের মেয়ে, যদি ভাল মন্দ কিছু ঘটে, তবে বাপ মার কি লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে? তাদের বেঁচে মরে থাকা হবে, এর কত্তে বে দেওয়া ভাল নয়? সে যা হোগ এখন সুলোচনার কথাটা শুনলি, যেন কোথাও গপ্প টপ্প

করিস্‌নে, একে তোমাদের বাড়ী লুকুয়ে এসেছিল, তাতে এসব কথা প্রকাশ হলে আমাদের সকলে লজ্জা দেবে। ভাই এত জানলে ওদের আনতে বারণ কত্তুম।

হর । তুই ভাই পাগল হয়েছিস্‌ এই কথা আমি আবার কাকেও বলবো, একি বলবার কথা। এখন আয় বর কনে পাঠাবার উয্‌যুগ দেখিগে (উভয়ের প্রস্থান)

[(কীর্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর) সুলোচনা ও সুখময়ী উপস্থিত]

সুখময়ী । ঠাকুরঝি আজ যে তোকে বড় ব্যস্ত দেখতেছি? যেন কত কর্মই না হাতে আছে। একবার কোথাও দুদণ্ড স্থির হয়ে বস্‌তেছিস্‌নে কারণ কি বল দেখি?

সুলোচনা। তুই কেবল সকলকে ব্যস্তই দেখিস বৈ তো নয়। আমার আর কি কর্ম আছে তা ব্যস্ত হব? কাল রাত জেগে ভাই বড অসুখ হয়েছে, যাই সকাল সকাল শুইগে। মায়ের খাবার দাবার সব রেখে এলুম।

সুখময়ী । (সুলোচনার বদন নিরীক্ষণ করিয়া) ইস্‌! ঠাকুরঝির যে আজ বড বাহার! চুল বাঁধা হয়েছে, টিপ্‌ পরা হয়েছে, (হাসিতে হাসিতে) আবার গায়ে কি একটু মাখা হয়েছে! আজ তোর এত ফুরতি কেন বল দেখি?

সুলোচনা। ও কথা আর বলিস্‌নে, আজ মানুষের কাছে বেরুতে লজ্জা কচ্চে। দিদিকে মাথাটা আঁচ্‌ড়ে দিতে বল্লুম, তা আঁচ্‌ড়াতে আঁচ্‌ড়াতে বল্লে, চুল বাঁধলে তোকে কেমন দেখায় কখনও দেখি নাই, আজ তোর চুল বেঁধে দেই, তা ভাই বারণ করতে করতে চুল বেঁধে দিলে, তারপর টিপ্‌ পর্‌য়ে দিলে। অনভ্যাসের ফোটা কপাল চড়চড় করতেছে!

সুখময়ী মা দেখতে পেলে এখুনি গাল দিয়ে ভূতছাড়া করবে। একেতো ও পাড়ায় রাঁড়ের বে হয়েছে শুনে কদিন আপনা আপনি কত বক্‌তেছেন তাতে তোর চুল বাঁধা টিপ্‌ পরা দেখলে কাকেও আস্ত রাখ্‌বেন না। কাল রেতে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিলুম

কর্তা বলতেছিলেন, বিধবার বের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে বটে কিন্তু দেশাচার বিরুদ্ধ, শুনতে লজ্জা করে ভাবতে লজ্জা করে, একর্ম কি ভদ্রলোকে কর্‌বে ?

সুলোচনা। অমন দেশাচারের মুখে আগুণ। শুনতে লজ্জা করে ভাবতে লজ্জা করে, এসব কথা বলা সহজ বটে কিন্তু যারা যন্ত্রনা সয় তারাই জানে এদেশে বিধবা হওয়া কত পাপের ভোগ। দাসী-বৃত্তি করে কাল কাটান ভাল, দিনান্তে অর্ধাশন ভাল, ভিক্ষা করে প্রাণ ধারণ করা ভাল এদেশে বিধবা হওয়া ভাল নয়। ভেবে দেখ দেখি আমাদের বেঁচে থাক্‌বার ফল কি ? পোড়া দেশের লোক এদিকে শাস্ত্র দেখায়, যে স্ত্রীলোকের স্বামী বই গতি নাই, কিন্তু যাদের স্বামী নাই তাদের যে কি গতি ভুলেও ভাবে না। কথায় কথায় ধর্ম দেখায়, ধর্ম যে কিসে থাকে, তা দেখে না। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিতে বলে। তা ভাই যে যা বলুক, আমাদের তো কিছু বলবার যো নাই, কথায় বলে বেঁধে মারে সয় ভাল, আমাদের তাই হয়েছে। এখন ভাই যাই, বড ঘুম পাচ্ছে শুইগে।

সুখময়ী। ঠাকুরঝি, ঘরে একলা ঘুমবার জন্যে কি চুল বাঁধ্‌লি, টিপ্ পর্‌লি, অমন বাহার নিতে কে বলেছিল ?

সুলোচনা। তোর আর রঙ্গ দেখে বাঁচিনে, যাই এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

সুলোচনা শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু নিদ্রা গেল না, মন্মথর জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রসবতীর নির্দেশ মত মন্মথ গভীর রাত্রে মুক্ত জানালা দিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল, বিদ্যা এবং সুন্দরের মত সুলোচনা এবং মন্মথর অবাধ মিলন এই ভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে সুলোচনার গর্ভের লক্ষণ দেখা দিল। পরিবারের সকলের মধ্যেই তাহা জানাজানি হইয়া গেল। মাতা পদ্মাবতী যখন পিতা কীর্তিরামকে আসিয়া এই সংবাদ দিলেন, তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন।

কীর্তিরাম। (শিরে করাঘাত করিয়া) হায় হায় একি সর্বনাশ। একি

অধর্মের ভোগ! কি উৎকট অধর্মে আমার সংসারে এই পাপ প্রবেশ করিল? বিধবা কন্যা গর্ব্ভবতী! এ লজ্জায় আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করতেছে। বিধবা বিবাহের স্বাপক্ষ ব্যক্তিগণ যা বলে বিবাদ করে, আমার সংসারে কি তাই ঘটলো? হা! আমার দলের গর্ব, জাতির গর্ব, মানের গর্ব, সমুদয় এককালীন খর্ব হলো? আমি কি জন্য এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, বিধাতা কি আমাকে এই দণ্ড দিবার জন্য এতকাল জীবিত রেখেছিলেন? হায়! পূর্ব জন্মে কত পাপ করেছিলেম, নতুবা আমার ঔরসজাত কন্যা আমাকে এত শাস্তি কেন দেবে। অভাগিনী আমাকে অগ্রে হত্যা করে কেন এ কর্মে প্রবত্ত হলো না? তা হলে আমাকে এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। হায় হায়! একথা প্রকাশ হলে, আমি কি রূপে লোকের সঙ্গে আলাপ করবো? আমার শত্রুপক্ষগণ সহজেই ছিদ্রানুসন্ধান করে, এখন তারা আহ্লাদে নৃত্য করবে, আর তাদের কি বলে নিরস্ত করবো? (ক্ষণেক ভাবিয়া) পদ্মাবতী, এখন এর উপায় কি বল? আমি জ্ঞান শূন্য হয়েছি, কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না।

পদ্মাবতী। মাথা মুণ্ডু আর বলবো কি, আমি কি কখন এ দায়ে ঠেকেছি, তা এর কি কত্তে হয় জান্‌বো? এর উপায় যা হয়ে থাকে তাই কত্তে হবে। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হায়! শত্তুরেও যেন এমন দায়ে না ঠেকে! এ কর্মের কর্মী আমার বাড়ীতে কে আসে, তা কারে বল্‌বো?

কীর্তিরাম। পদ্মাবতী, আমাকে বিষ দেও খেয়ে মরি। শেষ দশায় আমাকে কি এই কর্মে প্রবৃত্ত হতে হলো? ভ্রূণ হত্যা! যাহা শ্রবণ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যাহা যেখানে ঘটে সে স্থান পর্যন্ত পতিত হয়, যে সংসারে ঘটে সে সংসারের তরিতেই নরকগামী হয়, আমাকে জ্ঞানকৃত সেই উৎকট পাপের সাহায্য করতে হলো? পদ্মাবতী, আর আমাকে ও কথা বলো না, তোমরা যা জান কর, আমি ওর কিছু জানি না।

পদ্মাবতী। (সক্রোধে) কেন আমি বুঝি চোর দায়ে ধরা পড়েছি? তোমার

পাপ বোধ হলো, আমার আর পাপ না? এ সময়ে তুমি মহা ধার্মিক হলে, আর আমাকেই এই অধর্মের ভোগ ভুগ্‌তে হবে? বড় যে বিধবা বে নিবারণের জন্যে বাড়ীতে সভা কর, এখন কি হলো বল দেখি? আমরা মেয়ে মানুষ শাস্ত্রের কিছু বুঝি নে, কিন্তু এ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তেছি, যে ও পাড়ার প্রসন্নের মতো যদি মেয়েটার বে হতো, তা হলে তো আর এ দায় ঘটতো না, তা হলে তো আব এ পাপে থাকতে হতো না। বে দেওয়াটাই অধর্ম, আর এটা কি হলো বল দেখি? যাদের নে সভা কর, এখন তাদের কাছে কেমন করে মুখ দেখাবে? এর উপায় আমি সব করবো; তুমি কিছু করবে না তা হবে না। এ কর্মের শাস্তি দুজনকেই ভোগ করতে হবে। কি কত্তে হবে ভেঙ্গে বল, তবে আমি সেই মত করবো। আর এই বার নাকে-কানে খত দেও, বিধবা বের কথা পড়লে কোন কথা কবে না। এখন বুঝতে পাল্লুম যে বিধবাদের বে হলে, এ দেশের লোকের হাড় যুড়োয়, আর পরের দোষে পাপে ডুব্‌তে হয় না।

কীর্তিরাম। (স্বগতঃ) পদ্মাবতী স্ত্রীলোক হইয়া যাহা বলিল এখন নিতান্ত সঙ্গত বোধ হইতেছে। বিধবাদিগের বিবাহ হইলে তাহারাও এই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তাহাদিগের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনেরও তাহাদিগের জন্য বিপদগ্রস্থ হতে হয় না। (প্রকাশ) পদ্মাবতী, যখন এ বিষয় সমুদয় জানতে পেরে তার সদুপায় দেখ্‌তে পরামর্শ দিতেছি, তখন আর এতে লিপ্ত থাকার বাকী কি রইলো? এখন তুমি এ কর্মের উপযুক্ত কর্মী অনুসন্ধান কর। বিলম্বের অনেক দোষ।

পদ্মাবতী। ঐ পোড়ার মুখী নাপ্‌তেনী আছে, আর কাকেও তো দেখ্‌তে পাইনে। মনে করেছিলুম কালামুখীর দেখা পেলে মনের সাধে খেংরা পেটা করবো, তা গলায় কাঁটা বাদ্‌লে লোকে বেরালের পায় পড়ে, কি করবো, সে সর্বনাশী নইলে আমাদের এ দায় উদ্ধার হবে না। যে কর্মের যে ফল, তাকেই বলি আর কি কর্‌বো। সুলোচনা কি আমার তেমন মেয়ে, কারর সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইত না, নাপতেনী পোড়ার মুখী ঘন ঘন এসেই তো বাছার

আমার এমন দশা ঘটেয়েছে। আর কি আশ্চর্য! বাড়ী সুদ্ধ লোক কি কাণা হয়েছিলুম? কমেন্ দিয়ে কাকে নিয়াস্তো, কেউ কিছু জান্তে পারতো না? তা যিনি হোন এ ধর্মের ঘরে যিনি খোঁটা দিলেন, তাঁর বছর পার হবে না। যিনি আমাদের এই যন্ত্রণা দিলেন তিনি তার সমোচিত শাস্তি পাবেন। এখন আর বসে থাকলে কি হবে, পোড়ার মুখী কি কচ্চে দেখিগে। (পদ্মাবতীর প্রস্থান)

[(শয়ন মন্দির) সুলোচনার প্রবেশ]

সুলোচনা। (স্বগত) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? অবলা রমণীকে এত দুঃখ দিয়া, বাল্যকালাবধি বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করিয়াও কি সন্তুষ্ট হইলি না? পরিশেষে যে কলঙ্কের শেষ নাই, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাহাতেও মগ্ন করাইলি? হায় হায়! এই পৃথিবী মধ্যে আমার মত অভাগিনী কে আছে? আমার মত কলঙ্কিনী কে আছে? জন্মাবধি কখন সুখের সহিত মিলন হইল না, স্বচ্ছন্দতা কেমন কখনই জানিলাম না। নিষ্ঠুর অদৃষ্ট আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেও ক্ষতি ছিল না, এক্ষণে অসীম পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইলাম। হা! ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। জননী হইয়া আপন সন্তান হত্যা করিতে হইল? আমি যেখানে নিশ্বাস ক্ষেপ করিব সে বায়ু পর্যন্ত অপবিত্র হইবে, আমি যেখানে গমন করিব সে স্থান পর্যন্ত পতিত হইবে, আমি যাহার সহিত আলাপ করিব তিনিও পতিত হইবেন, আমাকে যিনি স্পর্শ করিবেন তিনিও পতিত হইবেন। হা! যে কুলে কখন কলঙ্ক ছিল না তাহাতে কলঙ্কার্পণ করিলাম! যে পিতা আমাকে চিরকাল যত্নপূর্বক প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি কলঙ্ক হ্রদে নিক্ষেপ করিলাম! যে জননী আমাকে কখন উচ্চ কথা কহেন নাই, যিনি আমার দুঃখে কত দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি চির দুঃখিনী করিলাম। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) এক্ষণে জীবন রাখা কর্তব্য কি এককালীন জীবনের সহিত সমুদয় যন্ত্রণার শেষ

করা উচিত? না আমার জীবনের ফল কি? আর কি সুখে জীবিত থাকিব? মৃত্যু চেষ্টাই শ্রেয়স্কর হইয়াছে। যেমন শ্রান্ত যুক্ত পথিক তৃষ্ণায় কাতর হইয়া নিকটবর্তী বৃক্ষছায়া দেখিলে সন্তুষ্ট হয়, মৃত্যু আমার তদ্রূপ বোধ হইতেছে। দেহ যাত্রায় বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে সমুদয় শ্রান্তি এককালীন দূর করণ জন্য মৃত্যু ভিন্ন আশ্রয়ের স্থান আর দেখিতেছি না। কিন্তু মৃত্যুর পর কি হইবে? হা ঐ চিন্তা কি ভয়ানক! ঐ চিন্তা না থাকিলে মৃত্যুতেও পরম সুখ অনুভব করিতে পারিতাম, হা! আমার মত পাপীয়সীর মৃত্যুতেও কি পরিত্রাণ আছে? (আপন গর্ভস্থিত সন্তানকে সম্বোধন করিয়া) হা নিরাশ্রয়ী নির্দোষী জীব। কি পাপে তুই এমত নিষ্ঠুর জননীর গর্ভে প্রেরিত হইয়াছিলি? যে তোকে রক্ষা করিবে সেই তোকে হনন করিতেছে? যে তোকে লালন পালন করিবে সেই তোর জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে? হা! আপন জীবন রক্ষা করিয়া যদি তোর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোর ওষ্ঠে মা মা ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করিতাম কিন্তু আমার মত অভাগিনীর অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে? নিষ্ঠুর বিধাতা আমাদিগকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। হা দুর্ভাগা সন্তান! অন্তঃকরণ এখনও এত নির্দয় হয় নাই যে তোর প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনি জীবিত থাকিব। এক্ষণে কি রূপে প্রাণ নষ্ট করি ইহাই স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। শুনিয়াছি হীরক দ্বারা প্রাণ নষ্ট হয়। (মন্মথের প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া) হা পরম শোভাকর আভরণ। তুমি এক্ষণে যাহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া আছ, ক্ষণকাল বিলম্বে তাহার প্রাণ নষ্ট করিবে। প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ তুমি যাহার দ্বারা অর্পিত হইয়াছিলে, সে স্বপ্নেও জানিত না যে তোমার দ্বারা তাহার প্রণয়িনীর প্রাণ নষ্ট হইবে। হা! তোমার প্রতি যে প্রণয় রক্ষা করণের ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেই প্রণয় দ্বারা এককালীন চির কালের জন্য বিচ্ছেদকে প্রাপ্ত হইল! হা! তুমি পিতার প্রদত্ত বস্তু হইয়া সন্তানের প্রাণ নষ্ট করিবে? হা!

আমার এবং আমার মৃত্যুর মধ্যে তুমি এখন এক ক্ষুদ্র ব্যবধান স্বরূপ হইয়া আছ, তোমাকে ভক্ষণ করিবামাত্র মৃত্যু হইবে। তোমাকে যেমন যত্নপূর্বক ধারণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ যথার্থ বন্ধুর কর্ম করিলে, তুমি না থাকিলে কে আমার জন্য বিষ আনয়ন করিত ? এই বিপদের সময় আমার মত অভাগিনীকে কে উপকার করিতে স্বীকার করিত ? (ক্ষণেক বিলম্বে) হে পরমেশ্বর ! জীবিতা-বস্থায় তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমার নিয়ম পদে পদে ভঙ্গ করিয়াছি, মৃত্যুর পর তোমার সম্মুখে কি রূপে দণ্ডায়মান হইব ? হা ! পূর্বে যে সকল পাপ করিয়াছি তাহার ক্ষমা আছে কিন্তু পরিশেষে আত্মঘাতী হইয়া পাপের ভার পরিপূর্ণ করিলাম। হে পরমেশ্বর ! এই উৎকট পাপের ক্ষমা কি সাহসে তোমার নিকট যাচ্ঞা করিব ? এই বিপদের সময় তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, তোমাকে উপহাস করা ভিন্ন নহে কিন্তু তুমি সর্বান্তর্যামী, সকলের অন্তঃকরণ দেখিতেছ, আপন প্রাণ নষ্ট করণ ভিন্ন এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে ? হা ! জননী দ্বারা সন্তান নষ্ট হওয়া কি ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র পাপ হইবে ? হা পরমেশ্বর ! যে দিবস তোমার নিয়ম প্রথম লঙ্ঘন করিয়াছি, সেই দিবস আমার দুর্ভাগ্যের আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণে উপায় বিহীন হইয়া আপন জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি। হা ! যদি আপন সন্তান রক্ষা করি তবে পিতামাতা মুখাবলোকন করিবেন না, আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে শারীরিক শাস্তি দিবে, আমার জন্য যাবজ্জীবন লজ্জিত হইবে, পরে আমাকে সংসার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, হয় আহারাভাবে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা জীবন ধারণ জন্য যাবজ্জীবন পাপে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবেক। হা পরমেশ্বর ! তুমি করুণা পূর্ণ হইয়া এদেশের রমণীদিগের প্রতি আর কত দিন দয়াশূন্য হইয়া থাকিবে ? আর কতদিন আশ্রয়হীনা অবলাদিগের বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করিবে ? হা ! যদি আমি পতি আশ্রয় পাইতাম তবে কি আমার অদৃষ্টে এ দুর্দশা ঘটিত ? সংসাররূপ বৃক্ষে নব মুঞ্জরিত শাখা স্বরূপ হইতাম, শুষ্ক পল্লবের ন্যায় এতদ্রূপ পতিত হইতাম

না, প্রিয়তমা ভার্য্যার ন্যায় পতিসেবা করিতাম, সন্তান সন্ততি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। হে জগদীশ্বর! দেশের এই দুর্নীতি রক্ষা করিতে যাঁহারা প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা কি আমাদের এই পাপের ভাগী হইবেন না? এক্ষণে আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, এখনই বিষভক্ষণ করি, জীবনের প্রতি যেরূপ ঘৃণা হইয়াছে এক নিমেষও জীবিত থাকিতে ইচ্ছা হয় না। (সুলোচনার বিষভক্ষণ)

(সুখময়ীর প্রবেশ)

সুখময়ী। ঠাকুরঝি একা বসে কি ভাবতেছিস্, সব কর্ম্ম শেষকরে এখন বুঝি ভাব্না হয়েছে? তার আর ভাবলে কি হবে? যা হবার তা হয়েছে, এখন এ দায় থেকে তো আগে উদ্ধার হ, তারপর ভাবিস্।

সুলোচনা। হঁা ভাই, সব কর্ম্ম শেষ করেছি বটে, এ দায় থেকে একেবারেই উদ্ধার হলেম, আর কাকেও আমার জন্যে দায়ে ঠেক্‌তে হবে না।

সুখময়ী। সে কি ঠাকুরঝি! অমন সব কথা বলতেছিস্ কেন? রাঁড মানুষের কি অমনতর হয় না? কত হচ্চে, আবার শেষ কেটেও যাচ্চে। (আশ্চর্য হইয়া) ওমা তুই অমন ঢুলতেছিস্ কেন? তোর চোক ঘুরতেছে, গা কাঁপ্‌তেছে, এর মধ্যে বসে বসে তোর কি হলো? এই বিছানার উপর উঠ।

সুলোচনা। (অতি মৃদু স্বরে) ভাই আমি বিষ খেয়েছি, আর অতি অল্প ক্ষণ বেঁচে থাক্‌বো। আমার যে দশা হয়েছে, এতে আমার মরাই উচিত। হায় হায়! আগে যদি তোর কথা শুনতেম, যদি তোর মত হতেম, তাহলে আমার এমন দশা কেন হবে? হায় হায়! তাহলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিতাম না। অন্য সুখ না হোগ্ বাপ মার সেবাতে একরূপ সুখে কাল কাটাতেম। হায় হায়! এখন সে দুঃখ করা নিষ্ফল, কুকর্ম্মের ভোগ কে খণ্ডন করতে পারে? আমি যেমন কর্ম্ম করেছি, বিধাতা আমার তেমনি শাস্তি দিলেন। ভাই, এখন একবার বাবাকে আর মাকে ডেকে দে, শেষ কালে তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা

করতেছে। যখন চিরকালের জন্যে চল্লুম, তখন আর তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে লজ্জা কি? আমি মলে তাঁদের লজ্জাও শেষ হবে।

সুখময়ী । ঠাকুরঝি, কেন তুই এমন কর্ম করলি? (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) ও মা আমাদের কি হলো!

সুলোচনা। আর আমার জন্যে বিলাপ করলে কি হবে? আমি বিলাপের উপযুক্ত পাত্রী নই। এখন আমার আর বিলম্ব নাই, তুই ভাই শীগ্‌গির মাকে ডেকে নিয়ায়, বোধ করি, আর একটু পরে চোকে দেখতে পাব না, আর বিলম্ব করিস্‌নে।

সুখময়ী । তাঁকে কি এই দেখতে ডেকে নে আস্‌বো? যাই, তিনি বুঝি কর্তার কাছে রয়েছেন, সেই-খান থেকে ডেকে নিয়াসি।

(সুখময়ীর প্রস্থান)

[রসবতীর প্রবেশ]

রসবতী । দিদি তুমি অমন করে রয়েছ কেন, তোমার কি ব্যামো হয়েছে? আহা! কথা কইতে পাচ্চ না যে?

সুলোচনা। রসবতী এসেছিস্‌? আমি মনে করেছিলেম তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি বিষ খেয়েছি, আর একটু গৌণে মরবো। আমার যা হয়েছে তা জানতে পেরেছিস্‌?

রসবতী । (স্বগত) সর্বনাশ! আমি না আসতে আস্‌তে এই কর্ম করেছে। হায়! আমি কেন মত্তে মন্মথের কাছে গেছলুম, তাইতে দেরি হয়ে এ বিপদ ঘটেচে। আমি এরকম অনেক দেখেছি কিন্তু এত দূর পর্যন্ত কখন দেখিনে। হায় হায়! আমি কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাব? (প্রকাশ) দিদি তুমি এ করেছ কি? এমন কি কারর হয় না? আমি যখন আছি তখন কি তোমার কোন বিপদ ঘটতো? আমাকে ডেকে পাঠাও নাই কেন? আমি এ দেখে গিয়ে মন্মথবাবুকে কি বল্‌বো?

সুলোচনা। রসবতী, যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ করলে কি হবে? এখন তো তার আর কোন উপায় নাই। মন্মথবাবুকে বলো, যে তিনি আমার জন্যে যেন তিলার্দ্ধ দুঃখ না করেন। আমার

সঙ্গে তাঁর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, এই বিবেচনায় যেন আমাকে এককালীন বিস্মৃত হন, আমাকে স্মরণ করে তাঁর মনকে যেন অপবিত্র না করেন। (ক্ষণেক ভাবিয়া) রসবতী, আমাকে সকলে সুন্দরী বলে, হায়! বিধাতা আমাকে কেন অত্যন্ত কুৎসিতা কর্‌লেন না, তা হলে তো আমার এ দুর্দশা হতো না।

[পদ্মাবতী ও কীর্তিরাম ঘোষ ও আর আর সমস্ত পরিবারের প্রবেশ]

পদ্মাবতী। (রসবতীকে দেখিয়া) (স্বগত) এই যে পোড়ারমুখী আমার সোণার সংসারে আগুণ দিয়ে এখন রঙ্গ দেখতে এসেছে। আর কোন সময় হলে হারামজাদীকে ভাল করে বুঝতুম, তার যার জন্যে এত গোল সেই একেবারে জন্মের মত চল্লো, আর এখন ওকে বল্লে কি হবে? (সুলোচনার হাত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা তুই একি করলি। আমি তোকে কি বলেছি? কে তোকে কি বলেছে? ওমা তুই আমায় ফেলে কোথা যাবি? ওমা আমি তোকে কবে উঁচু কথা বলেছি। তুই মা কি দোষে আমাদের সব ফেলে চল্লি?

সুলোচনা। (অতি মৃদুস্বরে) মা, আমার কথা বন্ধ হয়ে আসছে, আর চোকে দেখতে পাচ্চিনে। (হাত বিস্তার করিয়া) কৈ তুই কোথা মা? আমার বুকের ভেতর কেমন কচ্চে—বুকে হাত দে।

পদ্মাবতী। এই যে আমি মা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ও মা আর কেন অভাগিনীকে মা বলে ডাক্‌তেছিস? ও মা বিষ খেয়ে কি এখনও তোর মায়া আছে? ও মা তুই সকলকে কেমন করে ফাঁকি দিয়ে চল্লি? ও মা তোর চাঁদ মুখ আর না দেখে কেমন করে বেঁচে থাকবো? ওমা তুই কোথায় যাবি, আমায় সঙ্গে করে নে যা। (চতুর্দিগস্থ আর আর সকলকে সম্বোধন করিয়া) ওগো এর কি আর উপায় নাই? তোরা কাকেও ডাক না, এর কি চিকিৎসা নাই?

সুলোচনা। ওমা আর চিকিৎসায় কাজ নাই, আমি আর অল্পক্ষণ বেঁচে

থাকবো, আমার মত অভাগিনীর জন্যে কেন তুমি এত বিলাপ করতেছো? মা আমি মরে গেলে আমাকে ভুলে যেও। মা তোমার সব রইলো স্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম কর। মা আমি কি সুখে বেঁচে ছিলুম বল দেখি, তা আমার জন্যে তুমি দুঃখ করতেছ? আমার মরণ হলো, এখন হাড় যুড়ুলো। ও মা বাবা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হোল না।

পদ্মাবতী। এ যে তিনি এসেছেন, হায় হায়! তিনি যদি মানুষ হতেন তবে তোর মা এমন দশা কেন হবে? বিধবার বে হলো, সর্বনাশ হলো বলে দলাদলি করে বেড়য়েছেন, এমন করে সর্বনাশ হয়ে গেল।

কীর্তিরাম। অধর্মে পতিতা কন্যার মৃত্যুশয্যায় কৃতঘ্ন ভার্যা আপন স্বামীরে মিথ্যা নিন্দা করিতেছ? যে সম্পূর্ণ অপরাধী, তাহার পরিবর্তে আমাকে অপরাধী করিতেছ?

পদ্মাবতী। এখন তোমার মেয়ে মত্তে যাচ্ছে, আমাকে তুমি মুখ কত্তে বস্‌লে।

কীর্তিরাম। কন্যার মৃত্যু আপন কর্মদোষে উপস্থিত হইয়াছে। এমন কন্যার মৃত্যুতে দুঃখিত হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম।

সুলোচনা। পিতা আমার কর্মদোষেই আমি মর্‌তেছি তার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অন্তিমকালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

কীর্তিরাম। পরদার পাপের ক্ষমা নাই।

সুলোচনা। পিতা ক্ষমা কর।

কীর্তিরাম। আত্মঘাতীর ক্ষমা নাই।

সুলোচনা। পিতা আর সকলেই আমাকে ক্ষমা করেছেন, তুমি আমার প্রতি নির্দয় হয়ো না।

কীর্তিরাম। দুর্ভাগা সন্তান! যখন আমার নির্মলকুলে কলঙ্কার্পণ করিয়াছিলে তখন আমার প্রতি তোমার দয়া হইয়াছিল? যখন পরদারিক আমোদে উন্মত্তা ছিলে, তখন আমার ভবিষ্যৎ লজ্জা ও কলঙ্ক ভ্রমেও বিবেচনা করিয়াছিলে? এখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ?

সুলোচনা। পিতা তন্নিমিত্ত বিস্তর শাস্তি পেয়েছি—বিস্তর অনুতাপ করেছি।

কীর্তিরাম । হা দুশ্চারিণী! এক্ষণে তোমার পরকালের আশঙ্কা হইয়াছে, ইহাই তোমার অনুতাপ। তুমি একদিনের জন্য পূর্ব পাপের আক্ষেপ করিতেছ, আমি যতদিন জীবিত থাকিব তোমার জন্য কাহারও সহিত সাহসপূর্বক আলাপ করিতে পারিব না। হা! তোমার এক দিবসের আক্ষেপে এই সমুদয় পাপ বিমোচন হইবে? হা অভাগিনী! তোমার ইহকালে ক্ষমা নাই; তোমার পরকালে ক্ষমা নাই।

সুলোচনা । হা পরমেশ্বর। তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করলে? আমার পিতা আমাকে ক্ষমা করলেন না? পিতা এক্ষণে আক্ষেপ ও অনুতাপ ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে? হা! যাদের নিষ্কলঙ্ককুলে কলঙ্ক অর্পণ করলেম, যাদের অপরিসীম মনঃপীড়া দিলেম, মৃত্যুকালে তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করণ ভিন্ন আর কি উপায় আছে? বিবেচনা কর দেখি, বাল্যকালাবধি আমি কোন দিবস সুখী হয়েছি? পিতা আমার মত অভাগিনী এই ত্রিজগতে আর কে আছে?

কীর্তিরাম পাপীয়সী, এ দেশে কি আর বিধবা নাই? তুমিই সারা জীবন ক্লেশ পাইয়াছ, আর কেহ কি ক্লেশ পায় নাই? সকলেই কি তোমার মত পাপ পঙ্কে নিমগ্না হইয়াছে।

সুলোচনা । পিতা, সকলের কি সমান প্রবৃত্তি? সকলের কি সমান সহ্য-গুণ? যাদের স্বাভাবিক সু-প্রকৃতি তারা ধর্ম পথে আছে, যাদের মন আমার মত চঞ্চল তাদের এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হায়! আমার যদি পতি আশ্রয় থাকতো, তাহলে কি আমি এরূপ কুকর্মে রত হতেম? তা হলে কি আমাকে আত্মঘাতিনী হতে হতো, তাহলে তোমাকে কি কলঙ্ক—লোকলজ্জা ভোগ করতে হতো? (অত্যন্ত ক্লান্তা হইয়া) আঃ, আর কথা কইতে পারি না, বুঝি বাক্‌রোধ হলো। পিতা আমার অপরাধ মার্জনা কর।

পদ্মাবতী । তুমি পাষাণ দে মন বেঁধেছ? মেয়ের এত খেদেও কি তোমার দয়া হয় না?

কীর্তিরাম । (স্বগত) হা। শেষাবস্থায় আমার শাস্তির শেষ হইল! হা!

এখন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিধবা বিবাহের কর্তব্যতা প্রমাণ হইল। হা! সুলোচনার যদি বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে এ বিপদ কদাচ ঘটিত না, কিন্তু "নির্বাণদীপে কিম তৈল দানং" এক্ষণে আর কি উপায় আছে। হা। আমি বিধবা বিবাহের কত বিপক্ষতাচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আমাকে এই স্ত্রী হত্যা পাতকের অংশী হইতে হইল। হায় হায়। এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। (প্রকাশ) হা দুর্ভাগা সন্তান। তোর বিলাপে আমার ক্রোধ দূরে থাকুক, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, আমি তোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হা! আমি যদি ভ্রমান্ধ না লইয়া তোর বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে তোর এরূপ মৃত্যু কদাচ হইত না। হা! তোর মত কত দুর্ভাগা রমণী এইরূপে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। হা! স্বামী আশ্রয় পাইলে তোর মত কত অভাগিনী এইরূপ বিপদে পতিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত। (সুলোচনার শয্যায় বসিয়া) হে করুণানিধান সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর। এই দুর্ভাগা রমণীকে আমি যেমন আর ঘৃণা করিতে না পারিয়া ক্ষমা করিলাম, তুমি সেইরূপ ক্ষমা কর। তাহার পাপের সমোচিত শাস্তি দিয়াছ।

সুলোচনা। পিতা, এখন মৃত্যুতেও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ বোধ হবে। হে পরমেশ্বর! তুমি এখন আমাকে আর পরিত্যাগ করবে না, কারণ আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে ক্ষমা করলেন। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! যিনি আমার এই দুর্দশার কারণ, যাহারা এই কুকর্মে আমাকে কোনরূপে সাহায্য করিয়াছে, এই মৃত্যু শয্যায় সরলান্তঃকরণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। আমার দুর্ভাগ্যের কারণ আমি ভিন্ন আর কেহ নহে, হা! আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে অনায়াসেই তোমার নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারিতাম। তাহারা যদি আমার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়, আমিও তাহাদের পাপের কারণ হইয়াছি। (প্রকাশ) মা আর যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না কৈ, তোমার

হাত দেও, বাবা তোমার হাত দেও, দিদিরা তোমরা কোথা, তোমাদের হাত দেও। (সকলের হস্ত ধরিয়া) আমাকে শেষ বিদায় দেও, আমার অপরাধ মার্জনা কর, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করো, এক অভাগিনী তোমাদের সংসারে জন্মেছিল, পরে আপনার কর্ম দোষে অধর্মে পতিত হয়ে আত্ম-ঘাতিনী হয়েছে।

[সুলোচনার মৃত্যু ও সমস্ত পরিবারের আক্ষেপ]

এই ঘটনায় মন্মথ উন্মাদ হইয়া উন্মাদাগারে স্থান লাভ করেন। বাংলা নাটকে প্রথম উন্মাদ চরিত্রের পরিকল্পনা রূপে নাটকের এই শেষাংশটুকুও উল্লেখযোগ্য—

[(বাতুলাগার) চিকিৎসক উপস্থিত, শ্যামাচরণ মিত্রের প্রবেশ]

চিকিৎসক। আসুন মহাশয়, এখানে আপনার কি প্রয়োজন হইয়াছে?

শ্যামাচরণ। আমার একটী আত্মীয় এই স্থানে আছে, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি।

চিকিৎসক। (গাত্রোত্থান করিয়া) আসুন মহাশয়, এই দিগ্ দিয়া আসুন।

শ্যামাচরণ। (যাইতে যাইতে) মহাশয়, এই ঘরের দ্বার রুদ্ধ দেখিতেছি, অথচ ঘরের মধ্যে অত্যন্ত চিৎকার শব্দ হইতেছে কারণ কি?

চিকিৎসক। মহাশয়, যে সকল রোগীদিগের আরোগ্য হওনের সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে এই ঘরে রাখিয়াছি। এই সকল বাতুলদিগের বদ্ধ করিয়া না রাখিলে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করে। বায়ু রোগের কি রূপ আশ্চর্য গতি, আপনি চাক্ষুষ দেখুন। (দ্বার মোচন করিয়া) ইহার মধ্যে একজন বড় আশ্চর্য বাতুল আছে, সে সর্বদা একটি স্ত্রীলোকের নাম করে।

বাতুল। (উচ্চৈঃস্বরে) উ! উ! উ! উ! উ! উ! আমি চাঁদ ধরেছি! এই দেখ্ এই দেখ্!

বাতুল। হা! হা! হা! হা! হা! হা! আমার হাতে তারা আছে! তোরা কে কটা নিবি আয়!

বাতুল। ও! ও! ও! ও! ও! আগুন লেগে সব পুড়ে গেল, ধর ধর ধর! গেলুম গেলুম!

বাতুল। তোরা সব কে এখানে এলি, জানিস্‌নে আমি একবার খুন্

করেছি? সব খুন্ করবো। সুলোচনা! সুলোচনা! সুলোচনা! (হাস্য) হি! হি! হি! হি!

শ্যামাচরণ। (আশ্চর্য হইয়া) মহাশয়, এ পাগলটী কে? কত দিবস এখানে আছে?

চিকিৎসক। ঐ পাগলের কথা মহাশয়কে বলিতেছিলাম, সর্বদা ঐ স্ত্রীলোকের নাম করে। প্রায় এক বৎসর আমার নিকট আছে, শুনিয়াছি কাহাকে খুন্ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে রাজাজ্ঞায় এই বাতুলাগারে বদ্ধ আছে। আপনি ওকে যদি ভাল রূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই দিগে আসুন।

শ্যামাচরণ। (উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া) (স্বগত) কি আশ্চর্য! এ যে রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথ দেখিতেছি। হা! এই খেদ জনক ঘটনায় কত লোকের সর্বনাশ হইল। ইস্! আমার শরীর কম্পান্বিত হইতেছে, এস্থানে আর অধিক কাল অবস্থান করিতে পারি না। অদ্য আমার রোগী দেখা হইল না, এক্ষণে বাটী গমন করা কর্তব্য। (প্রকাশ) মহাশয় দ্বার রুদ্ধ করুন, আমার দেখা হইয়াছে।

চিকিৎসক। (দ্বার রুদ্ধ করিয়া) আপনি আর কোন রোগী দেখিবেন? আসুন।

শ্যামাচরণ। না মহাশয়, আজ বাটী যাই, আর এক দিবস আসিব। (স্বগত) হে সর্ব সৃষ্টি-কর্তা সর্ব শাসন কর্তা পরমেশ্বর। তুমি সময়ে সময়ে এই পৃথিবীতেই পাপীদিগের প্রতি তোমার অপরিসীম ক্রোধ প্রকাশ কর, তাহাদিগের পাপের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর। (শ্যামাচরণ মিত্রের প্রস্থান)

কোন সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক ধারা অনুসরণ করিয়া যে মন্মথর উন্মাদ পরিচয় এখানে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—সে যুগের সামাজিক নাটকে পাপীর শাস্তি নির্দেশ করা বিষয়ে যে দায়িত্ব ছিল, এই দৃশ্যে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। সেই জন্য নাটকের এই শেষাংশ নিতান্ত বক্তৃতাধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ নাটকে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের প্রভাব অনুভব করিতে পারা গেলেও এ কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে ইহার মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তখন পর্যন্ত নাটক ব্যতীত সাহিত্যের আর কোনও রূপ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। নাটকের মধ্যে ইতি-পূর্বে কেবলমাত্র তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে চরিত্র সৃষ্টির যে প্রথম প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তাহাতে এই প্রয়াস সবে মাত্র উন্মেষ লাভ করিলেও কোন দিক দিয়া পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু 'বিধবা-বিবাহে'র নায়িকা সুলোচনা চরিত্র পূর্ণাঙ্গ নাটকীয় চরিত্র রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে 'বিধবা-বিবাহ'ই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মৌলিক বিয়োগান্তক নাটক। ইতিপূর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটকে যে বিয়োগান্তক কাহিনী নিতান্ত শিথিল ভাবে অনুসরণ করিয়া নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার কাহিনী যেমন মৌলিক নহে —জনশ্রুতি জাত মাত্র, তেমনই ইহাতে দৃঢ়বদ্ধ কোন নাটকীয় কাহিনীও নাই। ইতিপূর্বে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের যে পরিণতিই নির্দেশ করা হউক না কেন, তাহাকেও বিয়োগান্তক নাটক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না। যে প্রকারেরই হউক, একটি বিবাহ বা মিলন দ্বারাই তাহার কাহিনীর পরিসমাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু 'বিধবা বিবাহ' নাটক তেমন নহে। ইহার প্রথম হইতেই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে একটি বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাহিনী রচিত হইয়াছে। বরং ইহার পরিণামে এমন একটি দুরতিক্রম্য অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাতে ইহা কেবলমাত্র বিয়োগান্তক নাটক বলিয়াই গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, ইহাকে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ট্র্যাজিডি বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে যুগের বাংলার পারিবারিক এবং গার্হস্থ্য রূপ ইহার মধ্য দিয়া যত জীবন্ত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কোন নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করিয়াই ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার সূত্রপাত হইলেও, প্রত্যক্ষভাবে সেক্সপীয়রের নাটকের কোন চিত্র কিংবা চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহাই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক। ইহার মধ্যে যে একটি উন্মাদ চরিত্র আছে, তাহা সেক্সপীয়রের উন্মাদ চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত সৃষ্টি। ইতিপূর্বে সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ হইলেও সেক্সপীয়রের চরিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জীবন হইতে নাটকীয় উপকরণ

সন্ধান করিবার প্রয়াস দেখা যায় নাই, ইহাতেই তাহার প্রথম সার্থক প্রয়াস দেখা যায়।

'বিধবা-বিবাহ' নাটকের নায়িকা সুলোচনা, খল চরিত্র রসবতী, ইহার নায়ক চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিতে না পারিলেও মন্মথকেই নায়ক বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। ইহার পদ্মাবতী চরিত্রটিও বাস্তব; সুখময়ী, কীর্তিরাম এমন কি ক্ষুদ্র পাঠশালার চিত্রটিও জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হইবে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগে অর্থাৎ প্রধানতঃ দীনবন্ধু পর্যন্ত এই নাটকখানি যে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উপর কি সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সে যুগের নাটকগুলি যাঁহারা গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

চরিত্রের বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই সুলোচনার কথা উল্লেখ করিতে হয়। সুলোচনাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রচিত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত চরিত্র, ইহার পূর্বে কাব্যেই হউক, কথাসাহিত্যেই হউক, কিংবা নাটকেই হউক, এমন পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের সৃষ্টি হয় নাই। সুলোচনা বাংলা সাহিত্যে রোহিণী, কুন্দনন্দিনী, বিনোদিনী কিরণময়ীর অগ্রজা। আমরা যদি তাহাকে ভুলিয়া যাই, তবে কোন পথ ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে যে ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। সেইজন্য তাহার বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করি।

সুলোচনা বালবিধবা, সে বিধবা হইয়া অবধিই পিতৃগৃহে বাস করিতেছে, বিবাহিত জীবনের কোন স্মৃতি কিংবা সংস্কার তাহার মধ্যে অবশিষ্ট নাই। যৌবনের উচ্ছলতায় তাহার প্রাণ ভরিয়া জোয়ার আসিয়াছে, এমন সময় বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হইল। জননী পদ্মাবতী একদিন সুলোচনার নামে স্বামী কীর্তিরামের নিকট অভিযোগ করিয়া বলিলেন, 'কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলুম, তা একেবারে নেচে উট্‌লো। বয়েস কালে কেবল কি রঙ্গ নিয়েই থাকতে হয়।' ভরা যৌবনে সুলোচনা কেবল রঙ্গ লইয়া আছে। কীর্তিরাম বিধবা-বিবাহের ঘোর বিরোধী, ইহার বিষয় কানে শোনাও পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন, মাতা পদ্মাবতী সম্মানিত পরিবারের গৃহিণী, তিনিও কুলের মান মর্যাদা রক্ষার জন্য যত সজাগ, কন্যার হৃদয়ের সুখ দুঃখের অনুভূতি সম্পর্কে তত সজাগ নহেন; সুতরাং বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই পরিবারের জীবনে এই বিষয়ে কোন চিন্তা প্রবেশ করিল না। কিন্তু বিধবা

বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে এ কথা শুনিয়া সুলোচনার মন যে একবারে নাচিয়া উঠিল, ইহার সুগভীর অর্থ তাহার জনক-জননী বুঝিতে না পারিলেও সুলোচনার জীবনে ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হইয়া উঠিল। পদ্মাবতীর কথাতেই সুলোচনার চরিত্রটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বয়স কালে সে রঙ্গ লইয়া আছে, মায়ের মুখের এই পরিচয়ই তাহার চরিত্রের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে; এই অবস্থায় বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে শুনিয়াছে, অর্থাৎ তাহার অবাঞ্ছিত বৈধব্য জীবন হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সেই রঙ্গ আরও শতগুণ হইয়া তাহার সমস্ত দেহে ও মনে উল্লাসের বান ডাকিয়া আনিল। তাহার বৈধব্য জীবনের করুণ ছায়াতল দিয়া তাহার প্রাণপূর্ণ উল্লসিত জীবনের যৌবন রথ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিয়া গিয়াছে। তারপর গতির বেগে পিচ্ছল কর্দমাক্ত পথ হইতে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পথিপার্শ্বের কণ্টকশয্যা আশ্রয় করিয়াছে। সদা প্রফুল্ল প্রাণপূর্ণ একটি জীবন নিয়তির নির্মম বিধানে, সমাজের হৃদয়হীন আচরণে যে কি ভাবে শুকাইয়া গেল, সুগভীর সহানুভূতির ভিতর দিয়া নাট্যকার তাহা এখানে প্রকাশ করিয়াছেন।

সুলোচনার মৃত্যুদৃশ্য এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা এত বাস্তব এবং করুণ করিয়া কেহই চিত্রিত করিতে পারেন নাই। এমন কি, কোন মৃত্যু দৃশ্যই ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয় নাই। দীনবন্ধু তাহার 'নীলদর্পণ' নাটকে মৃত্যু দৃশ্যের পরিকল্পনার প্রেরণা যে কোথায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ইহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে পদ্মাবতী মুমূর্ষু কন্যাসন্তানের মৃত্যু শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা অপেক্ষা বিধবা কন্যার বিবাহ দিলে ভাল হইত; দীনবন্ধুর রেবতী ক্ষেত্রমণির মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তেমনই বলিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা তাহার কন্যার সাহেবের সঙ্গে থাকাই ভাল ছিল। ইহাতে যেন তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'চপলা চিত্তচাপল্য' নামক নাটক রচিত হয়। ইহার নায়িকার নাম চপলা, সে বাল-বিধবা। পিতৃগৃহে বাস করিয়া বিধবার নিয়ম পালন করিয়া চলিতে শিক্ষা করে, কিন্তু পারে না। পুরাণ পাঠ শুনিতে গিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারে না, চারু নামক একটি যুবকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার মধ্যে

সে কোন আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজিয়া পায় না, বাস্তব জীবনের রসই তাহার মধ্যে সে অনুভব করিয়া বেদনায় কাতর হয়। চারু ও চপলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। পরস্পর বিবাহের আর কোন বাধা থাকে না।

শিমুয়েল পীরবক্স নামক একজন খ্রীষ্টান ধর্মান্তরিত মুসলমান, হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহ অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করেন। ইহা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নাটকখানির নাম 'বিধবা-বিরহ'। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে একজন ব্রাহ্মণের আদেশে তাঁহারই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু লইয়া ইহা রচিত। ইহাও বিধবা-বিবাহের সমর্থক রচনা।

এতদ্ব্যতীতও বিধবা-বিবাহের পক্ষে এবং বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে সে যুগে আরও অনেক প্রহসন রচিত হয়। কিন্তু বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করিয়া বাংলা নাটক রচনার মধ্য যুগে যে একখানি শক্তিশালী নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহাই গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'শাস্তি কি শান্তি'। নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর জীবনের ভিতর দিয়াই বৈধব্য জীবনের শান্তি আসিতে পারে, বিধবার পুনর্বিবাহের ভিতর দিয়াও নহে, কিংবা তাহার অসংযমের ভিতর দিয়াও নহে। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র এই নাটকের মধ্য দিয়াই তাঁহার নিজস্ব এই মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আদিবাসী সমাজে পরিণত বয়সে বিবাহ (adult marriage) প্রথাই প্রচলিত, বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। নর-নারীর মধ্যে পরস্পর মিলনের আকাঙ্ক্ষা কেবল যৌবনেই সম্ভব, তাহার পূর্বে সম্ভব নহে বলিয়াই বাল্যবিবাহ সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করে নাই, বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দায়ে পড়িয়া কোন কোন সময় তাহার আবির্ভাব হইয়াছে এবং সাময়িক ভাবে সেই প্রয়োজন দূর হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগের বাংলার সমাজেও বাল্যবিবাহ-প্রথা সমাজের একটি বিশেষ অবস্থা হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই অবস্থায় অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই তাহা দূর হইয়া গিয়াছে। কোন আইন প্রণয়ন দ্বারা যেমন তাহা দূর হইতে পারে নাই, তেমনই এই বিষয়ে কোন নাটক কিংবা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও তাহা সম্ভব হয় নাই। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া মধ্যযুগের বাংলার সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত আলোচনায় এখানে আবশ্যক নাই। সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই একটি কথা জানিয়া রাখা যাইতে পারে মাত্র।

কৌলীন্য প্রথা উচ্চতর হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের জন্য কতকটা দায়ী হইলেও নিম্নশ্রেণীর সমাজের মধ্যেও যে এই প্রথা অত্যন্ত ব্যাপক আকার লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। সেই কারণ, কতকটা অর্থনৈতিক, কতকটা সামাজিক। কিন্তু ইহাদের মূলে একটি প্রধান কারণ, এ'দেশে তুর্কী আক্রমণ; ইহার ফলে একদিক দিয়া যেমন হিন্দুর পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তার অভাব ঘটিয়াছিল—শিশুকন্যাকে বিবাহ দিয়া প্রত্যেক পরিবারই দায়মুক্ত হইতে চাহিয়াছে, তেমনই আর একদিক দিয়া ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে হিন্দু সমাজে বিবাহযোগ্য কন্যার অভাব বশতঃ কন্যা বিক্রয় প্রথার (marriage by purchase) উদ্ভব হইয়াছিল, মধ্যযুগের সমাজে উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা উদ্ভবের মূল কারণ ইহাই বলিয়া মনে হয়।

হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে কন্যার ঋতুকালের পূর্বেই বিবাহদান অর্থাৎ গৌরীদান পুণ্য গার্হস্থ্য কর্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এ কথা সত্য, তথাপি মধ্যযুগের পূর্বে হিন্দু সমাজেও যে এই প্রথা ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে নাই, নানাসূত্র হইতেই তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজে মধ্যযুগের কোন কারণই বর্তমান ছিল না, তথাপি এই প্রথা তখন একটি দেশাচারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কেবল মাত্র তাহারই অনুবর্তন করিয়া তখন ইহা সমাজে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে বুদ্ধিবাদ বা যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা দ্বারাই এই প্রথার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছিল, বাল্যবিবাহ বিষয়ক সে' যুগের কয়েকখানি নাটকের মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক আন্দোলনের ভিতর দিয়াই সে'যুগে এই বিষয় সম্পর্কে সমাজ সর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ফলে সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় এই বিষয়ে তুমুল আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। এমন কি, এই আন্দোলনকে মুখ্যভাবে রূপ দিবার জন্য 'বাল্যবিবাহ' নামেই একটি পত্রিকা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাল্যবিবাহের নিন্দা করিয়া যে সকল নাটক ও প্রহসন সে'যুগে রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ শ্রীমানি রচিত 'বাল্যোদ্বিবাহ নাটক' খানি উল্লেখ-যোগ্য। ইহা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা এই বিষয়ে সে যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক নাটক বলিয়া ইহার বিস্তৃত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই বিষয়টির গুরুত্ব এবং এই বিষয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রস্তাবনা

সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্রধার। আহা! এই সভার কি মনোহর শোভা! বৈদেহীর বিবাহোপলক্ষে জনকরাজ ভবনে ত্রিভুবনের সম্রাট একত্র হইলেও, বোধ করি এরূপ দর্শন চমৎকার ও চিত্ত প্রফুল্লকর হয় নাই, দেখিতেছি, নাগরীয় বহু গুণে গণ্য ধন্য ও বদান্য প্রভৃতি প্রভূত গুণশালী এবং ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মারা এই সভায় অধিষ্ঠান হইয়াছেন; অতএব

এই মহোদয়গণের মনোরঞ্জন নিমিত্ত আমাকে কোন নূতন বিষয়ের অভিনয় করিতে হইল। কিন্তু এই সময়ে একবার প্রাণেশ্বরী প্রেয়সীকে সম্বোধন করা উপযুক্ত বোধ হইতেছে। (নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে! আমার নিকটে বারেক আগমন করিয়া আমার চিত্তচকোরকে প্রফুল্ল কর, যেহেতুক্ তোমার নিমিষ অদর্শন বাণ আমার যুগসম মহাশেল বোধ হয়। প্রিয়ে সত্বর আইস।

[নটীর প্রবেশ]

নটী । আর্যপুত্র! এই সমাজ মাঝে আমাকে আহ্বানের অভিপ্রায় কি? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?

সূত্র । প্রিয়ে। আমি ইচ্ছা করিয়াছি, এই সমাজে অভিনব বাল্যোদ্বাহ নামক নাটকের অভিনয় কার্য সম্পাদন করিয়া সভাস্থ মহাত্মাদিগের মনোরঞ্জন করিব; আর এই প্রত্যাশা কখন বিফল হইবার নহে, যেহেতুক্, প্রথমতঃ তোমার অসাধারণ রূপ গৌরব সৌরভে সকলেই পুলকিত হইয়াছেন, অপর তোমার মুখচন্দ্র বিনির্গত সুধাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলে যে সজ্জনের মনোরঞ্জন হইবে ইহাতে আশ্চর্য কি? দেখ কোকিল কুৎসিত হইয়াও কেবল স্বরমাত্র দ্বারা আদৃত হয়, এবং শিখীকুলে কর্কশ ধ্বনি করিয়াও কেবলমাত্র রূপের গৌরবে জগদ্বিখ্যাত হয়, কিন্তু তুমি কিন্নর নিন্দিত স্বর ও রতি নিন্দিত রূপের অধিকারিণী হইয়াও, কি বিবেচক ব্যক্তিগণের প্রশংসা লাভ করিতে অযোগ্যা? অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, স্বকার্য-সাধনে যত্নবতী হও যেহেতুক্ সভাস্থ মহাশয়েরা তোমার কাঞ্চন তুল্য রূপেতে রসায়ন রূপ গুণের অপেক্ষায় শুদ্ধ চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে।

নটী । নাথ! তোমার আজ্ঞা অলংঘনীয়; বিশেষতঃ যে স্থলে আমার কিঞ্চিৎ পরিশ্রম বলেই এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আশা পূর্ণ হইতে পারে, ও যেস্থলে আমার গুণময়ের চিত্তবিনোদন হইবেই হইবে, সে স্থলে মহাশয়ের আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালিতব্য। —বলিয়া গীতারম্ভ।

গেল হে গেল হে বঙ্গ, কি আর দেখিছ রঙ্গ,
দেহ হলো ভঙ্গ সবাকার ॥ ১ ॥
না হোতে যৌবনকাল, সত্বরেতে গ্রাসে কাল, হায় ২
কাল চমৎকার ॥ ২ ॥
তেজহীন বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মেতে নাহি প্রবৃত্তি, কীর্তি
বৃত্তি সব ভ্রষ্ট করে ॥ ৩ ॥
ভূমিষ্ঠ হোলে কুমার, বিবাহ সম্বন্ধ তার, সর্বা—
গ্রেতে সার বুঝি করে ॥ ৪ ॥
কে কোথা শুনেছে বাপ, কচি ছেলে ছেলের বাপ,
অঙ্গ কাঁপে বাপ্ দেখে শুনে ॥ ৫ ॥
কোথা হে জগৎপতি, করহ দেশের গতি, অগতির
গতি নিজগুণে ॥ ৬ ॥

সূত্র । আহা! প্রিয়ে সাতিশয় উত্তম ও মধুর হইয়াছে (নেপথ্যে) কে ও? একটা মেয়ের বোলেতে সাধুবাদ দিতেছে—উহারাই দেশের কালস্বরূপ—হা ঈশ্বর!

সূত্র । প্রিয়ে! ঐ শ্রবণ কর, আমাদের আভাসমাত্র পাইয়া অভিনয় করণার্থে কে এই রঙ্গভূমিতে বুঝি আগমন করিতেছে, তবে এস্থলে আমাদের আর অবস্থান করা উচিত নহে, আইস আমরা গমন করি।

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম সন্ধিস্থল।

রঙ্গভূমি। অন্তঃপুর

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়া । আর সয়না, আজ তো আসুন্, যা মনে আছে তা কর্বো—আহা! বাছা আমার ন বচরের হোলো গো, তবু তিনি কি একবারও সে সব কথা মুখে আনেন্, আপনার কাযেই ব্যস্ত থাকেন; আজ আমারো এই পণ, আমি খাব না, উঠব না কিছু কর্বোনা—দেখি এতেও কি হয়—না হোলে গলায় দড়ি দেবো সেও ভাল তবু অমন ভাতারের—

[মালিনীর প্রবেশ]

মালিনী। কি গো ছোটগিন্নী! আজ্ যে কোন তাড়া দেখিনে, কত্তা বুঝি বেরোবেন না?—কেন গা মুখখানি স্থখিয়ে গেছে, কিছু অস্থখ্ করেছে নাকি?

মায়া। না অস্থখ এমন নয়—তবে কিনা আমার একটী ছেলে—তা তোকেই বা বোল্‌তে কি? শক্রর মুখে ছাই দে বাছা আমার মাথা ঝাডা দিয়ে উঠেচে, তা তাজ্জন্যে কি কিছু চেষ্টা পেতে হয়, না কেবল ইস্কুলে গিয়েছিলি? পড়া কেমন হলো? এম্নি রকম জিজ্ঞাসা কল্যেই ছেলে পিলের আদর হয়? আহা! কি আমার আদর গো! মালীবৌ জলে মলেম, আর সয় না।

মালিনী। কেন ছোট কত্তা তো দেখতে পাই ছেলেটীকে খুব্ ভালবাসে— আর শক্রর মুকে ছাই দিয়ে তোমাদেরই বা অভাব কিসের? ঐ একটী কানা চকের কুটো আহা! বেঁচে থাক্ কিসের দুঃখ।

মায়া। আঃ! সে দুঃখ নয়, ছোট কত্তাই মাগ্ ছেলেকে খেতে পত্তে দেয়, আর কেউ দেয় না?

মালিনী। তবে তুমি আবার কি বোল্‌চ? আমি যে ভাল বুঝ্‌তে পারলেম্ না।

মায়া। বলি এও কি আবার বোঝাতে হয়? নেকা আর কি!

মালিনী। হাঁ! তা বটে। এখনকার মেয়েদের যে কথা কবার ধাঁচা, কাযে কাযেই নেকা হতে হয়।

মায়া। না লো তা নয়, রাগ করিস্‌নে, বলি এই গোপাল আমার গেল বসেকে নয়ে পা দেছে তা কত্তাকে এর কতদিন আগে থেকে বোল্‌চি, ওগো আমার বড় সাদ আমি বোর মুখ দেক্‌বো, কবে মরে যাব তা হোলে মনের সাদ্ মনেই থাক্‌বে। তা ভাই এমন মানুষ যদি আর ভূ-ভারতে থাকে, কেবল বলে, হবে এই নয়ে পড়েছে বৈতো নয়, এতই কি? হবে না তো কি আর রবে? তা মালী বৌ আমি কি আর মোলে হবে।

মালিনী। হাঁ এতে দুঃখ হয় বটে; এবার ছোট কত্তাকে দেখ্‌তে পেলেই বোল্‌বো, যে তুমি কেমন গা, ছেলের বে দিতে কি হবে না? কত পড়া ছড়াদের হোয়ে গেলো, তোমার আবার এমন রকম?—

[প্রতিবাসিনী বৃদ্ধার প্রবেশ]

(দেখিয়া) কি গো ঠান্‌দিদি! অনেক্‌কালের পর দেখা যে! আজ কার মুখ দেখেছিলেম।

বৃদ্ধা । তাইতো লো মালী বৌ! তুই আর আমাদের ওদিকে যাস্‌ টাস্‌নি কেন? তখন যে দুবেলা যেতিস্‌।

মালিনী। আর দিদি পোড়া পেটের জ্বালায় যে দুদণ্ড কোথা যাব, দুটো কথা কব, তার যো কি, তখন এক কাল্‌ই গেছে।

বৃদ্ধা । গোপালের মা যে কিছু কথা বোলচে না? আচ্ছা তোর বেটাতো শত্রু মুখে ছাই দে ডাগর ডোগর হোচ্চ্যে, তা তার বের সময় কি হবে? বৌ পাবি কোথা? তখন তোর ছেলেকে এই গোদা পায়ের সেবা কত্তে হবে।

মায়া । ওমা সেই আশীর্বাদই কর যে তোমার পা দুখানির সেবা করে আমার গোপালের বৌ ঘরে আসুক।

বৃদ্ধা । হাঁ আস্‌বে বৈকি! কেন গোপালের বাপ তার কি আজো উয্‌যুগ কোচ্চো না?

মায়া ।
তাই যদি হবে মাগো দুঃখ কিসে আর।
গোষ্পদ হইত জ্ঞান মহা পারাবার ॥
এত দিনে দেখিতাম পুত্র বধূ মুখ।
হইত উদয় মনে কত মত সুখ ॥
অমুকের শাশুড়ী বলে লোকেতে ডাকিত।
লোমাঞ্চ হইয়া দেহ পুলকে পূরিত ॥
কি বিধি লিখেছে বিধি ভাগ্যেতে আমার।
পতি করে বিপরীত একি চমৎকার ॥
না জানে নিশিতে শশী যেমন আকাশে।
সর্ব শ্রেষ্ঠ বধূ বিধু তেমনি আবাসে ॥
নারী হৈয়া শিখাইব কত আর বলোনা।
ধিক্‌ ২ শত ধিক্‌ হায় কি যন্ত্রণা ॥

আর আমার কিছু ভাল লাগে না, তোমরা সব ঈশ্বরের কাছে এই মানাও যে আমি মরি, তা হোলে সব ঘুচে যায়।

বৃদ্ধা । আহা! অমন কথা বলিস্‌নে, গোপালের বাপের তো বে দিতে মত আছে, সে দিনে যে ওদের বাড়ি ঐ কথা হোচ্ছিল।

মায়া । কি বোল্‌ছিল?. হাঁ গা?

বৃদ্ধা । এই বোল্‌ছিল, যে আমারও ছেলেটীর এট্টী দেখেশুনে বে না দিলেই নয়, কেননা তার সমজুটিদের প্রায় সকলেরই হোয়ে গেল তা আমার এ বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল হচ্যে না।

মায়া । ওগো অমনধারা রোজই বোলে থাকে, কাযেতে তো কিছু দেক্‌তে পাই নে।

মালিনী। কথায় হোতে হোতেই কাযে হয় গো, এত উতলা হইও না, ভাল করে বুঝিয়ে বোল তা হোলেই হবে, আর আমরাও এবার থেকে দেখা হোলেই কেবল ঐ কথাই বোল্‌বো।

মায়া । আর তোমরাই বা বোলে কর্বে কি? বলে যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়সীর ঘুম নাই, আমি বোলে বোলে বিরক্ত হোয়েচি তবু যদি মন ভিজলো আপনার মতেই মত্, সেকি কারো কথা শোনে?

বৃদ্ধা । না গো ছোট বৌ তুই দুঃখ করিস্‌নে, আমি সত্তি বোল্‌চি গোপালের বাপ্ এ কম্ম না করে আর থাক্‌তে পার্‌বে না, পাঁচ জনে নিন্দে কর্বে যে, আর এই ঘরের মধ্যে গণ্ডগোল এতেও কি কেউ চুপ করে থাক্‌তে পারে?

মালিনী। তা নয় তো কি? আর তাঁর মত্‌ও আছে তবে কিনা কম্মটা একেবারে কত্তে হবে ভাল ঘরটী দেখে, মেয়েটী ভাল দেখে না কল্যে লোকের কাছে লজ্জা পেতে হবে যে।

বৃদ্ধা । হুঁ। ২ এই জন্যেই বিলম্ব! তা নলে গোপালের বাপ্ তো তেমন মানুষ নয়, সদাশিব বল্যেই হয়।

মালিনী। তা আবার একবার করে বোল্‌চ, এ পাড়ায় আর ওমন আচে? যাও ভাই ছোট গিন্নী আপনার কায কম্ম দেখগে; ফুল ফুট্‌লেই ও আর কেউ ধরে রাখ্‌তে পারবে না;—ঠান্‌দিদি (বৃদ্ধার প্রতি) যাবে কি? আমি যাই এখন্‌কার মতন, অনেক কম্ম আছে।

বৃদ্ধা । হাঁ চল্ আমিও যাই, গোপালের মা! যা মা যা, আর ভাবিস্‌নে আমি আশীর্বাদ কোচ্চি গোপালের দুটী হাত শীগ্‌গির এক হোক।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় সন্ধিস্থল

রঙ্গভূমি। জলাশয় নিকটস্থ নিভৃত পথ।

[রামমণির প্রবেশ]

রাম । আয় লো চলে আয়, বেলা হোলো! এর পর আমায় গে আবার কন্ম কায কত্তে হবে, তোদের মতন না যে বোসে বোসে খাব!

[রঙ্গিনীর প্রবেশ]

রঙ্গিনী। আমি অমন তোমার মতন চল্‌তে পারিনে, খুব যা হউক, এমন হন্‌ ২ করে চলেচেন তবু আশ মেটে না।

রামমণি। আলো নলিনী, উনি আবার চোল্‌তে গেলে পোল্যেন্‌, অমন বয়েসে আমরা কত পাহাড় পার হোয়েছি, এই এখান্‌ থেকে ওখানে যাবেন তা আবার কত ঢং দেখ।

রঙ্গিনী। মা সে কেলে লোকের খুবে দণ্ডবাং। কি হাড় শক্ত! আমরা কেবল মাংস পিণ্ডি।

রামমণি। আমরা তো তোদের মত ছেলেবেলা ভাতার নিয়ে শুতে শিখিনি, পোনের যোল বচরের না হলে সে কেমন তা জানতেমুই না, তোদের এই বয়েসে ছেলে হোলো মাগো! কলিকালই বটে, আয় এখন চল! ঐ দেখ ওদিকে কে আস্‌চে!

রঙ্গিনী। ও ঐ মালী বৌ নাইতে আস্‌চে?

[মালিনী নিকটবর্তিনী হইয়া] কি গো তোমরা যে এখন কাপড়-চোপড়্‌ কাচনি বেলা কি হয় নি?

রঙ্গিনী। বলি, আপনি কি সকাল ২ আস্‌চেন।

মালিনী। আমাদের কি, দুঃখি কাঙ্গালি লোক, কায কন্ম না সারা হোলে কি আস্তে পারি? আরো ঐ তোমাদের ছোট গিন্নীদের বাড়ি গিয়ে কত রকম্‌ কথায় বাত্তারায় কমেন দে বেলা হোয়ে পল্যো।

রঙ্গিনী। এত কিসের কথা লো? ছোট গিন্নী কি কচ্যে? কখন এলি?

মালিনী। সেখান থেকে এই খানিকক্ষণ আস্‌চি, ছোট গিন্নীর যে আজ রাগ।

রঙ্গিনী। কেন তোর উপর নাকি?

মালিনী। না বোন আমি তো কারো কখন মন্দ করিনে; দিন আনি দিন খাই, যেমন মানুষ তেমনি থাকি, আমার উপর কেন?

রঙ্গিনী। তবে কার উপর?

মালিনী। যার উপর কর্ত্তে পারে, কর্ত্তার উপর আবার কি ?

রঙ্গিনী। কেন কেন! বল না কিছু জানিস্ ?

মালিনী। কেন আবার ? তার ছেলে শত্রুমুখে ছাই দে এট্টু দেখ্‌তে শুন্‌তে হোয়েচে, তা তার বে দেবার নামও করে না, সে বোল্যেও গা করে না, যেন পরের ছেলে আর কি ?

রঙ্গিনী। এই জন্যে না আর কিছু ?

মালিনী। না আর কিছুই না।

রঙ্গিনী। তা এর আবার রাগ কিসের ? ও বাড়ির ছোট্‌-ঠাকুর তো সে দিনে বোলছেল,যে গোপালের বের জন্যে একটী ভাল মেয়ে দেখতে হবে, তা ছোট বোর কি এট্টু দেরি সয় না, বুঝি 'উঠ ছুঁড়ি তোর বে' এমন কোল্যে কি হবে, কেমন গো বলনা ? (রাসমণির প্রতি)

রাসমণি। কে জানে বাবু, এখনকার মেয়ে ছেলেকে যে চেনে সে পাতের চেনে, অমনি ফুল না ঝর্‌তে বে ২ করে পাগল হোয়ে বেড়ায় ; ঐ গোপালের বাপ্‌তো এই সেদিনকার ছোঁড়া, হদ্দ গণ্ডা ছয়েক বয়েস হয় কি না, আর ছুঁড়িরো ঐ এগার বচরে ছেলে হয়, কিসেরি বা বয়েস্ বাঁচি যদি আরো কত দেখ্‌বো।

রঙ্গিনী। আঃ মরণ! এখনো দেখবার সাদ আছে ; কি বোল্যেম কি বুঝলেন্, তাই বলে বুঝি থুব্‌ড়ো করে করে বে দিতে হবে ? বলি ছোট কর্ত্তার মত আছে বে দেবার তা আর কি এট্টু বিলম্ব সয়না, তাই বোল্‌চি উনি আপনার মতন্ই বুঝলেন, 'বলে তোর মাথায় কি না পুড়িয়ে খাব' ঠিক এরো তাই।

মালিনী। (হাস্য করিয়া) না (তা নয় ২) এখন সব ঘরে ঐ রকম হোচ্যে, আর ছোট বোর বা কিসের অভাব তা তার কি সাদ হয় না ?

রঙ্গিনী। সাদ আবার হয় না ভাই বল ? ওর কি ছেলে নাই মেয়ে নাই যা বলে তাই সাজে,—যাক্ ও কথা যাক্, তারপর মালী বৌ কি হোলো ?

মালিনী। তারপর আমরা কত বুঝিয়ে পড়িয়ে এলেম, তাই এখন কায কর্ম্ম দেক্‌তে শুন্‌তে গেল, এখন বোন কি কোচ্যে তা কেমন করে বোল্‌বো যা হোক্ পরে শুন্‌তে পাবে।

রাসমণি। নে বাপু নে! আর ভাল লাগে না, নাবি? কাপড় কাচ্‌বি। না সমস্ত বেলাই ঐ মিচে ২ বোক্‌বি? চত মালী-বৌ এখন ঘাটে চ এর পর ঢের কথা হবে।

মালিনী। হাঁ মা চল অনেক বেলাও হোয়েছে।

[সকলের সরোবরাভিমুখে গমন]

তৃতীয় সন্ধিস্থল।

রঙ্গভূমি। রাজপথ।

[বলহীন ধনাঢ্যের প্রবেশ]

বলহীন। (স্বগত) কর্মটাও উচিত বটে। অবলা জাতি যদিও বিদ্যাহীনা, তথাচ অনেক স্থলে প্রখরবুদ্ধি প্রভাবে সুপরামর্শ প্রদানে সমর্থা। সন্তানটীর তো ত্বরায় বিবাহ না দেওয়া অযৌক্তিক বোধ হোচ্যে, যেহেতুক্‌ মমাপেক্ষা বহুগুণে ধনহীন ব্যক্তিরাও স্ব২ সন্তান সন্ততি-গণের সাতিশয় অল্প বয়সেই পরিণয় সংস্কার সমপন্ন করিতে যত্নবান হয়; অপর এই দেশের এই প্রথা, দেশাচারানুযাইক্‌ কার্য করিলে ধর্ম বৃদ্ধি হয়, ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) না—আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই, একবার ঘটক মহাশয়কে ডাকান উচিত হোচ্যে; কই? কেই বা যায়—কাহাকেও যে দেখি নে!

[রামার প্রবেশ]

এই যে রামা! ওরে একবার ঘটক মহাশয়ের কাছে যা দেখি।

রামা। কি সে কৈল? ঘোটক আঁড়িতে আস্তবড় কো যাই মা?

বলহীন। দুর মূর্খ ঘোড়া কেন রে! এই এখান থেকে গিয়ে বরাবর সেই ময়দার দোকানের কাছে সেই একটা ছোট বাড়ি আছে কিনা? তার দক্ষিণে সেই তর্কালঙ্কার আছেন জানিস্‌? তাঁর কাছে যা।

রামা। আপঁড়ি কৌঁড বকুচ? মুতো এই লক্ষ মড়িচি সব আঁড়ি দেইচি।

বলহীন। কি পাপ! বেটা কোথাকার মেড়া! ওরে সেই ময়দার দোকানের কাছে সেই বামন ঠাকুর থাকে চিনিস্‌নে?

রামা। তাঃ রামো!! সেই আপঁডি কুও, সেতো মুজ্ঝাঁড়ি।

বলহীন। তবে তাঁকেই ডেকে আন বুঝেছিস্‌ তো?

রামা । বুঝি মি না কাঁই কি ? সে বাঁমড় ঠাকুরকো ডাকি আঁড়িমি ? যেবে তাকু দখা না মিড়িবো ?

বলহীন। দেখা না পাস্ তাঁর বাড়িতে বলে আসিস্ যে তিনি বাড়ি এলে আমাদের বাড়ি যেন আসেন্ বুঝেছিস্ তো ?

রামা । হাঁ—তবে মু যাউচি।

বলহীন। হাঁ বড বিলম্ব করিস্‌নে ?

[রামার প্রস্থান]

[ধনহীন মহোদাশয়ের প্রবেশ]

ধনহীন । কি মহাশয় রামাকে কোথায় পাঠালেন ?

বলহীন। কি হে এসো ২। এই একবার ঘটক মহাশয়কে কিছু প্রয়োজন আছে তন্নিমিত্ত ডাক্‌তে পাঠালেম্।

ধনহীন । প্রয়োজনটা কি ? পুত্রের বিবাহ নাকি ?

বলহীন। মানস্ তো করেছি এখন 'বিধাতার ভবিতব্য',

ধনহীন । (স্বগত) হা ঈশ্বর ! (প্রকাশে) তবে আপনকার পুত্রটীর অধিক তো বয়োক্রম হয় নাই, কিছুকাল বিলম্ব করে কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করালে কি ভাল হোত না ?

বললীন। হাঁ, বয়োক্রম হয় নাই বটে, কিন্তু বিবাহ দেবার ক্ষতি কি ? আচ্ছা, স্মরণ কর দেখি, তোমার কত বৎসর বয়োক্রম হোলে বিবাহ হোয়েছিল ? এবং আমারও উত্তমরূপে মনে হোচ্ছে, যখন আমি গুরুমহাশয়ের নিকট তালপত্রে লিখি, তখন আমার পিতা অতি সমারোহকারে আমার বিবাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন করেছিলেন ; আর, লেখা পড়াব বিষয় যা বোল্‌চ তা কপালে না থাকলে কখনই হয় না, যথা, 'পূর্বজন্মার্জিতা বিদ্যা: পূর্ব জন্মার্জিতং ধনং', অতএব বিবাহ কিছু বিদ্যাকে ও ধনকে লোপ করে তার এরূপ শক্তি নাই, তবে অল্প বয়সে বিবাহ দেবার ক্ষতি কি ?

ধনহীন । হাঁ বটে, কিন্তু কপালের উপর নির্ভর করে থাকা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ম নহে ; পিতামাতার উচিত সন্তানদিগকে এমন কোন স্পর্ধা না দেয়। যদ্দ্বারা তাহাদের উত্তর কালে অনিষ্ট উৎপন্ন হোতে পারে (স্বগত) আহা ! পৈতৃক বিষয়ের মদেতে অদ্যাপিও ইনি বাল্যোদ্বাহের দোষ অনুভব করেন নাই ; হা ঈশ্বর ! অস্মদ

দেশীয় এই দোষাকর দেশাচারের ক্ষমতা কি উত্তর ২ বৃদ্ধিই হবে? যাহা হউক, আপনার ইচ্ছাই বলবতী।

[রামার সহিত স্বার্থপর ঘটকের প্রবেশ]

বলহীন। এই যে ঘটক মহাশয়। শারীরিক কুশল তো?

ঘটক। আর বাপু তোমরা সব প্রতিবাসী তোমাদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল—আপনকার পুত্রটী ভাল আছে তো?

বলহীন। তা কুশল বটে, কিন্তু আপনি তো জ্ঞাত আছেন, তার এক উদরের দোষ কয়েক বৎসরাবধি জন্মেছে, তা সেটাও কিয়দ্দিবস কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হোয়েছে।

ঘটক। (স্বগত) হা রাম। মনে করেছিলেম বুঝি বলহীন পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্বে, তা তো সকলই স্থির হলো, তার যখন পীড়া হয়েছে তখন তো 'সে গুড়ে বালি', পণ্ডশ্রমই হলো; হায়! হায়! (প্রকাশ্যে) কি বল্যেন বৃদ্ধি হয়েছে? তা আমি আশীর্বাদ কচ্যি অচিরাৎ আরোগ্য লাভ কর্বে, তন্নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হবেন না।

বলহীন। আজ্ঞা না, সে পীড়া কোন ভয়াবহ নহে, পাণ দুই ঔষধীতে উপশম হোতে পারে।

ঘটক। তবে! আমাকে ডাকার অভিপ্রায়?

বলহীন। অভিপ্রায় এই যে সেই পুত্রটীর বিবাহ হোলেই সুখী হওয়া যায়; তা আপনকার উপরই ভার, আপনি যা বিবেচনা করেন, তাই কর্ত্তব্য।

ঘটক। কন্যা স্থির করাই না আমার ভার? আপনি একবার মুখ হোতে বাক্যটা নিঃসৃত কল্যেন এখন চান তো গণ্ডা ২ মেয়ে, এই বাটিতে আনিয়ে বিবাহ দিতে পারি।

বলহীন। আপনি ঘটক চূড়ামণি এ বিষয় মহাশয়ের পক্ষে আশ্চর্ব কি? তবে কিনা কিঞ্চিৎ সম্পন্ন ব্যক্তির কন্যা হয়, আর দেখ্‌তে শুনতেও কিছু ভাল হয়।

ঘটক। মহাশয়! আমি তেমন ঘটক নয়, বিশেষতঃ আপনারা প্রতিবাসী তা এ বিষয়ে আমি যা কর্বো তা কি আর দেখতে শুন্‌তে হবে।

এখন আসুন রাস্তার উপর এ সকল কথা কওয়া উপযুক্ত নয়, আপনকার বাটির মধ্যে প্রবেশ করি।

বলহীন। ক্ষতি কি? উচিত বটে। (ধনহীনের প্রতি) তুমিও এসো হে! কথাটা স্থির করা যাক্।

ধনহীন। আজ্ঞা, না আমার কিছু প্রয়োজন আছে; ঘটক মহাশয় আছেন, সকলি উত্তম হবে, আমার থাক্‌বার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, অতএব আপনারাই গমন করুন।

[বলহীনের বাটিতে ঘটক ও বলহীনের প্রবেশ]

ধনহীন। (স্বগত) হা! ভগবান্ বিধাতা! ঐ বাল্যবিবাহরূপ অধর্ম প্রবাহকে উত্তেজনা কর্তে যেন আর আমার বংশাবলিতেও কেহ উদ্যত হয় না, হায়, হায়, কি পাপ! কি দুঃখ! আমি অজ্ঞানাবস্থায় পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হোয়ে কি ক্লেশই না অনুভব করিতেছি? সংসার ভরণ পোষণার্থে দিবানিশি কেবল অন্নচিন্তায় যাপন করিতেছি, লোকালয়ে বিবিধ কারণবশতঃ অপমানিত হইতেছি, ক্ষুধার্ত্ত সন্তানগণের চিত্তভেদী রব সকল প্রতিক্ষণ কর্ণগোচর করিয়া আপনাকে শত ২ ধিক্কার দিতেছি, ভার্যার ম্লান বদন দণ্ডে২ অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণকে প্রজ্বলিত অনল শিখায় নিক্ষেপ করিতেছি এবং অপক্ক বীর্যে সন্তান উৎপাদন করিয়া পুত্রশোকে হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছি। আহা! হা! কি যন্ত্রণা হায়২ !!

বলহীন কেন খাবে পুত্রটীর মাথা।
বুঝাইলে বুঝেনাক হিতকর কথা ॥
না জানি কোন উপদেব চড়ি তব স্কন্ধ।
চক্ষু ঢাকিয়ে তোমায় করিয়াছে অন্ধ ॥
নতুবা জানিতে তুমি স্বয়ং বলহীন।
শৈশব বিবাহে হইয়াছ বলহীন ॥
কালের কবল গ্রাসে পড়িবে হে কবে।
পুত্রকে কেবল কেন দুঃখে ভাসাইবে ॥
মৃত্যুকালে রোগী যেমন ঔষধি না খায়।
দেখিতেছি তোমার হোয়েছে তদ্রূপায় ॥

তোমারই কি দোষ বল কালের এ দোষ।
প্রতিকূলে কহিলে সকলে করে রোষ ॥
খরবেগে দেশাচার স্রোত চলিয়াছে।
তৃণবৎ হোয়ে তারে বাধা দেওয়া মিছে ॥
হায় হায়! সব যায় রক্ষ ভগবান।
নষ্ট কর এ তরঙ্গে মারি অগ্নিবাণ ॥

(কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনান্তর) যাই! ঈশ্বরের মনে যাহা আছে, তাহাই হবে ; বৃথা আক্ষেপ কর্লে আর হবে কি ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম সন্ধিস্থল।

রঙ্গভূমি। অন্তঃপুর।

চতুরার প্রবেশ

চতুরা। কোথা গো! তোম্‌রা সব কোথায়? একে আজ বেলা গেছে, তবু তো—কই? কাকেও যে দেখিনি ; কেউ বুঝি আজ কামাবে না?

[রঙ্গিনীর প্রবেশ]

রঙ্গিনী। কি লো নাপ্‌তে বৌ যে! এসেছিস্, তবু ভাল, আমি আরো এই তোজ্জন্যে বোসে২ কাপড় কাচ্‌তে যাচ্ছিলেম।

চতুরা। কই, আর এঁরা সব কোথায়? তোমায় যে একাই দেখ্‌চি।

[ভাবিনীর প্রবেশ]

(দেখিয়া) ঐ যে দিদিঠাকুরুণ আসচে, বড় বৌ ঠাকরুণ কোথায়?

ভাবিনী। বড় বোর অসুখ কোরেছে, সে বুঝি আজ্ আর কাপড় কাচ্‌বে না, —হাঁ লা তোর যে আজ এত বেলা গেল, তুই কোথা গিয়েছিলি?

চতুরা। না দিদি, আমি আর যাব কোথায়? পাড়ায় কামাতে আসি তাই যার কত হোয়ে যায়। এই আজ বেলা গেছে, আজ যে কত হবে তা আর কি বোল্‌ব।

রঙ্গিনী। কি? হবে কি আবার! হাঁ (ভাবিনার প্রতি) ঠাকুরঝি। নাপ্‌তে বৌ বলে কি ভাই?

চতুরা । বোল্‌বো আবার কি ! তোমরা এই বাড়িতে বোসে থাক বৈত নয়, কোথায় যেতেও হয় না, কিছুই না, তবু তোমাদের কর্ত্তাদের মনের কথা কে বোল্‌তে পারে? আমাদেরও এই সোমত্ত বয়েস, আমরা পথে যাই ঘাটে যাই ,কোথায় না যাই? তা গরিব বোলে কি আমাদের আর আব্‌রু নাই? কিন্তু আমিও তেমন মেয়ে নই, তবু পুরুষের মন বুঝ্‌বে কেন? কিছু না কিছু একখানা ভেবে বোসে থাকে।

রঙ্গিনী । হাঁ লো চতুরা! তবে তোর্ তো আজ্ বেলা গেছে, তবে আজ হবে কি?

চতুরা । হবে আর কি? রাম রাবণের যুদ্ধ হবে।

ভাবিনী। আঁ! কি বল্লি যুদ্ধ হবে? হা! হা! হা! শেষ জিত কার ভাই?

চতুরা । শেষ জিত্ তো আমাদেরি ; ও আবার বোল্‌বো কি, যত বলুক্ যত করুক্ কোন রকমে দুফোটা চকে জল আন্তে পাল্যেই হয়, তবেই জল দেক্‌লেই জল, আর যেন সে নয়।

রঙ্গিনী । আহা নাপ্‌তে বৌ! তুই কি গুণই জানিস্? আমাদের ঠাকুরঝিকে যদি শিকাস্ তাহলে আমাদের ঠাকুর জামাই খুব্ জব্দ হয়,—ঠাকুরঝির ওম্‌নি গোলাম হোয়ে থাকে।

ভাবিনী। যা লো যা, আর তোর নেক্‌াম কত্তে হবে না। হাঁ লা চতুরা! তুই ও বাড়ির ছোট বোর কথা কিছু জানিস? সেথা কি গিয়েছিলি?

চতুরা । ও দিদি সেইখানেই তো গে এত বেলা গেল, তা না হোলে আর আমি কোথা যাই, তোমরাতো আমাকে জান?

ভাবিনী । না (তা নয় ২) তুই ছোট গিন্নীর কি ২ সব বল্‌না শুনি, আহা ও সব কথা শুন্‌তেও ভাল লাগে!

চতুরা । শুন্‌বে আর কি? ছোট বৌ নাকি সেদিন খায় নি কিছু না, তারপর গোপালের বাপ কত সেদে পেড়ে কিচুতে কিচু না পেরে, শেষ নাকাল হোয়ে নাকি ঘটক ডেকে তাকে কনে দেক্‌তে পাঠ্ইয়েচে? তবে তার রাগের ক্ষান্ত হোয়েছিল, নৈলে কার সাদ্দি যে তাকে খাওয়ায়। বাবা এমন মেয়ে দেখিনি !!

রঙ্গিনী। তা নয়তো কি, এসব মেয়েতে বোল্‌তে পারে, আমাকে আকাশের চাঁদ ধরে দাও, ছেলেরো বাড়া, যখন যেটা ধর্ব্বে তখনি সেইটী দিতেই হবে, 'এতে বুড়ই মরুক আর চেক্‌ড়াই ছিঁড়ুক' বাবা খুব মেয়ে যা হউক ?

ভাবিনী। কেন্ লা! এত বেস্ করেছে এমন না কল্যে কি হয়? হয় ২ করে অমন কত কাল কেটে যায়, তোর কি এক বচরের ছেলে বৈত নয়? এখনকার মতন নিশ্চিন্তি হোয়ে বোসে আচিস্, যদি একটু বড় হোতো, তবে দেখা যেত (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত) যার ব্যথা সেই জানে, পরে কি জানবে!

রঙ্গিনী। ও ভাই ঠাকুরঝি! আমি কি বল্লুম ভাই? আমি কি ছেলের বে দেওয়া ভাল নয় বোল্‌চি? তবে কিনা যখন জানিস্ হবেই, তখন এতটা করা ভাল নয়—কেমন ভাই চতুরা?

চতুরা। তা না তো কি,—যাক্ এখন্ ওসব কথা যাক্ তোমরা এখন কেউ কামাবে জোমাবে না গপ্‌পে গপ্‌পেই যাবে? আজ আমার কোন কাযই হোলো না।

রঙ্গিনী। চতুরা আয় তবে ছাতে যাই! এখানটা আর নোঙ্গরা কর্ব্বো না, (ভাবিনীর প্রতি) ঠাকুরঝি এসো না গো! ভাবিনী। যাচ্চি। তোরা এগো না।

[রঙ্গিনী ও চতুরার প্রস্থান]

(স্বগত) আহা! বিধাতা আমার প্রতি কবে মুখ তুলে চাইবেন? ভুবন আমার একলা বেড়ায়, আহা! সঙ্গে ২ যদি বৌটী বেড়াতো তা হোলে কি শোভাই হোতো, হায়! আমার ভাগ্যে কি সে দিন আস্‌বে, যে আমি সে সুখ চোকে দেখ্‌বো ;—

কোথায় বিধাতা আমার হও অনুকূল।
ভুবনের বিবাহের ফুটাইয়ে ফুল ॥
ভাসাও আমারে প্রভু সুখ পারাবারে।
পুত্রবধু বিনে সার নাহি ত্রিসংসারে ॥
নাহি চাহি পরিচ্ছদ কিম্বা ধনজন।
নাহি চাহি দাস দাসী রজত কাঞ্চন ॥

বিষয় বিভবে মন নাহি প্রয়োজন।
প্রার্থনা কেবল মাত্র পুত্রবধূ ধন॥
যে ধন দর্শনে মনের তমো রাশি হরে।
যেই তমো রবি সোম নাহি নষ্ট করে॥
সুন্দর ছাঁচেতে হোলে বধূ মুখ ঢালা।
সে মুখ দেখিলে নিভে অন্তরের জ্বালা॥
রোগ কষ্ট যন্ত্রণা সকলই অন্তঃর্ধান।
একবার যদি করে সেই মুখ ধ্যান॥
অতএব ভগবান—

নেপথ্যে। কই গো? ভুবনের মা! আয়না গো, তোর কি আজ হবে না নাকি?

ভাবিনী। (স্বগত) ওই যা। কথায় কথায় ভুলে গেচি, মনেও ছিল না যে নাপ্‌তে বৌ এসেচে, যাই! আবার ওরা কি মনে কোর্বে। (পুনর্বার নেপথ্যে) ও ঠাকুরঝি! বলি শুস্তে কি পাও নি?

ভাবিনী। যাই লো যাই। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় সন্ধিস্থল।

রঙ্গভূমি। বলহীনের বাটী।

স্বার্থপর ঘটক ও বুদ্ধিহীন মতিচ্ছন্নের প্রবেশ।

ঘটক। এই তো আসা গেল্, কৈ? কাহাকেও যে দেখ্‌তে পাই না—ওরে রামা কোথায় রে!

[বলহীনের প্রবেশ]

বলহীন। এই যে ঘটক মহাশয়! আসতে আজ্ঞা হউক, এই স্থলে (আসনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) উপবেশন করুন,—মহাশয় (বুদ্ধিহীনের প্রতি) আসন গ্রহণ করুন।

[সকলের উপবেশন]

ঘটক। মহাশয়! (বলহীনের প্রতি) আমার কিরূপ ক্ষমতা সেটা বিবেচনা কর্ব্বেন। আপনার বাটি হোতে সেদিন প্রায় বহির্গত হোয়েই, অম্‌নি এক প্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করত অজস্র পরিশ্রম কোরে একেবারে ধনে মানে কুলে শীলে সর্বগুণে গুণাকর

এবং প্রভাকর তুল্য নিষ্কলঙ্ক ও তেজবান এই যে কুলীন সন্তান ইহাকেই আনয়ন কোরেছি—অপর ইহার কন্যাটীও পরমাসুন্দরী ও সর্বসুলক্ষণা, অধিক বলা বাহুল্য একেবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী বোল্যেই হয়—তা বাপু হে, হবেই না বা কেন? 'যদ্যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ, যেমন তুমি ইনিও তদ্রূপ, সমানে সমানেই মিলে—উত্তম অধমে মিল কদাচ সম্ভবে না; যা হউক বড় সুখি হওয়া গেল।

বুদ্ধিহীন। (বলহীনের প্রতি) মহাশয়ের নাম তো জগদ্বিখ্যাত, ঘটক মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ মাত্রেই মহানন্দে মগ্ন হোয়েছিলাম, এক্ষণে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতে যে কত সন্তোষ অনুভব কল্যেম্ তাহা বর্ণণাতীত।

বলহীন। অমন কথা বোলবেন না, মহাশয়ের স্বর্গতুল্য উচ্চমান, আমার পরম ভাগ্য যে মহাশয়ের সহিত কৌটম্বক হোল। তবে ঘটক মহাশয়! কন্যাটির বয়ক্রম কত হবে?

ঘটক। মহাশয়, আমি কি আপনকার পুত্রকে কখন দেখি নাই, যে উপযুক্ত পাত্রী স্থির কর্তে আমি অক্ষম? বাপু হে, এই ঘটকালি আমাদের পুরুষানুক্রমে কোরে আসতেছে, আমি যে কর্মে হস্তার্পণ কোর্বো তাহা অবশ্যই সর্বোতোভাবে সুন্দর ও দোষহীন হবেই, বিপরীত হওয়া অসম্ভব; আমরা কিছু নূতন ঘটক নই, যে কি কর্তে কি কোর্বো;—কন্যাটি এই গত ফাল্গুনে অষ্টম বর্ষ প্রাপ্তা হোয়েছে—কেমন (বুদ্ধিহীনের প্রতি) মহাশয় এই নয়।

বুদ্ধিহীন। হাঁ ঐ বটে। ঘটক মহাশয়! একবার জামাতাটীকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হোচ্যে—হোলেই সর্বপ্রকারে সুখী হওয়া যায়।

ঘটক। মহাশয় (বুদ্ধিহীনের প্রতি) তার কোন সন্দেহ নাই; যেমন লক্ষ্মী তেম্‌নি নারায়ণ—তবে দেখ্‌বেন তায় ক্ষতি কি?

বলহীন। আজ্ঞা দেখাটাও উচিত হোচ্চে—(নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) অরে কে আছিস রে! একবার গোপালকে বাহিরে নেয়ায় তো?

[কিয়ৎক্ষণ পরে গোপালের প্রবেশ]

ঘটক। এসো ভাই এসো—(বুদ্ধিহীনের প্রতি) মহাশয় দেখলেন্ আহা! তোমার কন্যার উপযুক্তই বটে।

বলহীন। বাবা! গোপলে! এই আমার কাছে বৈসহ—

[গোপালের উপবেশন]

বুদ্ধিহীন। বাপু, তোমার নাম কি ?

[গোপালের মৌনাবলম্বন]

ঘটক। বল না লজ্জা কি বল—

বলহীন। নাম জিজ্ঞাসা কোচ্যেন, নাম বল।

গোপাল। আমার নাম শ্রীগোপাল চন্দ্র ধনাঢ্য।

বুদ্ধিহীন। তোমার ঠাকুরের নাম কি ?

ঘটক। তোমার বাপের নাম বল।

গোপাল। শ্রীবলহীন ধনাঢ্য।

বুদ্ধিহীন। তুমি কোথায় পড় ?

গোপাল। আমি বাঙ্গালা ইস্কুলে পড়ি ?

বুদ্ধিহীন। কি পুস্তক পাঠ কর ?

ঘটক। কি বোই পড় বল ?

গোপাল। (হস্তস্থিত দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় উত্তোলন করিয়া) এই—এই বোই পড়ি।

বুদ্ধিহীন। কই একটু পড় দেখি ?

ঘটক। পড়না হে ভাই ! পড় ?

গোপাল। (পুস্তক খুলিয়া) পড়বো ? সরকারদের একটি ছেলে আছে। তার নাম রাখাল। রাখা—লের ব-য়স সাত বচ্ছর। ঘো-ষাল-দের—

ঘটক। বাহা! বেশ পড়েছ ভাই। মহাশয়! (বুদ্ধিহীনের প্রতি) বালকটীর যে স্মারকশক্তি তা আপনাকে কি জানাব—আমি অহর্নিশি দেখছি কি না, যখন যাহা একবার মাত্র শ্রবণ করে, তাহা আর কস্মিনকালেও বিস্মৃত হয় না, আর আমার বলা বাহুল্য, অন্যান্য বালক অমন বয়েসে প্রায় অপরিচিত ব্যক্তির নিকট বাক্য নিঃসৃত করিতেও সক্ষম হয় না ; এরূপ আমি অনেক প্রত্যক্ষ দেখেছি।

বলহীন। আর ঘটক মহাশয়ও জ্ঞাতো আছেন, গোপাল, পাড়ার কোন বালকের সহিত আলাপ করে না, অনর্থক খেলাতে সময় নষ্ট করে না, কেবল আপনার পুস্তক লয়েই পাঠ কোরে থাকে ; আর—

বুদ্ধিহীন। হাঁ, আমিও দেখিতেছি বালকটী বড় শান্ত ধীর এবং নম্র ও বিদ্যানুরাগীও বটে, অতএব আমারও ইচ্ছা যে ইহাকেই কন্যা সম্প্রদান কোরে জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ঘটক। তবে লগ্নপত্র নির্ধার্য কোর্লেই তো ভাল হয়। কারণ, শুভকার্যে অনেক বিঘ্ন হোতে পারে; তাই বলি, 'শুভস্য শীঘ্রং' আর বিলম্বে ফল কি?

বলহীন। হাঁ, মহাশয় উচিৎ বোলেচেন্। কিন্তু মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত, এক্ষণকার কর্ম নয়;—বৈবাহিক মহাশয়। অদ্য এস্থানে অবস্থান কোর্লে আমি চরিতার্থ হই—অদ্য আমার এ বাটী পবিত্র হোলো আমার এমত আশা ছিল যে মহাশয়ের—

বুদ্ধিহীন। ইহার আর উপ্‌রোধ কি মহাশয়। আজ্ তো আমার সুপ্রভাত বোল্‌তে হবে—যেহেতু বেহানীর হস্ত প্রস্তুত আহারীয় দ্রব্য অদ্য ভোজন কোর্বো, আহা! জীবনের একপ্রকার সুখের শেষ বোল্যেই হয়—ঘটক মহাশয়! তবে আর বিলম্বে কায্ কি? আপনি বাটীতে মধ্যাহ্নের চেষ্টা দেখুন গে? আমার তো পোহাবারো, আমি চল্যেম।

ঘটক। দাঁড়াও হে বাপু, তোমার যে আর দেরি সয় না, বলে, 'সেধো ভাত খাবি? না হাত্ ধোবো কোথায়'? তোমার যে তাই দেখতে পাই।

(গাত্রোত্থান)

বুদ্ধিহীন। যা হোক্ ঘটক্ মহাশয়! যেন সায়ং কালে আগমন হয়।

ঘটক। তা আর বোল্‌তে হবে না, অবশ্যই আস্‌বো (স্বগত) এক্ষণে সফল তো হোয়েছে পরিশ্রমটা বৃথা হয় নাই; হুঁ, কেমন 'ঝোপ বুঝে কোপ, মেরেছি; বলহীনের ছেলেটা তো মৃত বোল্যেই হয়, ওঁর আবার বিবাহ! তা আমাদের কি? "প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল বিচারণা," আহার পেলে ছাড়্‌বো কেন?

বলহীন। ঘটক মহাশয়। কি ভাবচেন?

ঘটক। আঁ আঁ না—আ—আ—বলি বেলাও অধিক হোয়েছে, আমি এক্ষণকার মত আসি।

বলহীন। হাঁ! তবে আসুন। মহাশয়! (বুদ্ধিহীনের প্রতি) গাত্রোত্থান করুন?

(ঘটকের প্রস্থান)

বুদ্ধিহীন। আজ্ঞা হাঁ, চলুন (বলিয়া গাত্রোত্থান) (বলহীন তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান)!

গোপাল। (নেপথ্যে) বাবা, বাড়ি ভিতরে এসো।

(গোপালের প্রস্থান)

তৃতীয় সন্ধিস্থল।

রঙ্গভূমি। রাজপথ

ধনহীন মহদাশয় ও বিদ্যাহীন দাম্ভিকের প্রবেশ।

বিদ্যাহীন। কি হে কোথায়? দাঁড়াও এট্টু; আপনার মনেই যে চোলেছো?

ধনহীন। আর ভাই আপনার দুঃখেই মরি, যাব আর কোথায়? এদিগ্ ওদিগ্ ঘুরেই বেড়াই—বন্ধু বান্ধবের সহিত যে দুদণ্ড কথা কব, তারও অবকাশ পাইনে।

বিদ্যাহীন। এতই তোমার্ কিসের কায হে? যে একটা কথা কইতেও সাবকাশ নাই?

ধনহীন। ও হে কায থাক্‌লে ভাবনা কি? কায্ নাই বোলেই তো ভাবি।

বিদ্যাহীন। কেন হে! এত ঠাট্টা কেন?

ধনহীন। না ভাই বিদ্রূপ করি নাই—অন্ন কষ্টে প্রাণ যাচ্যে ইহাতে কি আর রহস্য সাজে?

বিদ্যাহীন। আরে যাও বোঝা গেছে—কেবল পুঁজি করার চেষ্টা বৈত নয়, তা হবে না কেন? আমাদের দেখ দেখি? আয় তো নাই, কেবল পৈতৃক কিছু পাওয়া গেছ্‌লো তাই তো ক্রমে খরচ কোচ্যি, আর প্রায় তারও অর্দ্ধেকের শেষ হোয়ে গেছে—অথচ ব্যয়-কর্তে কিছু কুণ্ঠিত দেখতে পাও? কপালে যা আছে তা হবেই হবে, তাই জন্যে, মত্যে হবে বোলে কে কোথায় খায় না? আমোদ করে না? হুঁ! পরিশ্রম কোরে টাকা আনেন, তা আবার ব্যয় কর্তে মায়া! ছি! অমন কোর না?

ধনহীন। মায়া কিসের? যা উপার্জন করি, সকলই সংসার নির্ব্বাহার্থে প্রদান করি, তথাচ এমন দিবস নাই যে, সংসারের কোন দ্রব্যের অভাব

হোলো না, হা—কা—ইত্যাদি রব শ্রবণে নিরন্তর প্রবেশ হবেই হবে ; আয়ের অধিক ব্যয় হোলেই যে কষ্ট উৎপন্ন হয়, তা যাদৃশ ব্যক্তিরাই অবগত আছেন, তা আর বলবো কি ভাই ?

বিদ্যাহীন। তোমার আবার আয়ের অধিক ব্যয় কিসের হে! তুমি তো ছেলে-গুলকে থুবড়ো কোরে রেখেছ, তাদের বে থার কথা মুখেও আন না !—

ধনহীন। ভাই! সন্তানগণের বিবাহের কথা আর বোলো না—আপনিই অল্প বয়সে বিবাহ করে যে সুখ ভোগ কর্তেছি, তা আবার পিতা হোয়ে আপনার স্নেহাস্পদ পুত্রগণকে কি ঐ দুঃসহ যন্ত্রণা হ্রদে নিক্ষেপ কোর্বো ?

বিদ্যাহীন। অল্প বয়সে বিবাহ দিলেই কি দুঃখ ভোগ কর্তে হয় হে? তোমার তো বুদ্ধি অতি চমৎকার। আমি যে দিয়েচি, আমার সন্তানেরা বড় ক্লেশ পাচ্যে। আর তুমি তো দাওনি,—তোমার সন্তানেরা সুখেই আছে? ছি! ছি! এ কথাগুল আর মুখে এন না, লোকে শুন্‌লে বোল্‌বে কি।

ধনহীন। লোকে যা বলে বলুক আমি তো কখনই ও কার্য কর্বো না—কোন রকমে কিছু ২ বিদ্যা শিক্ষা করাতে পাল্যেই আমার কার্য আমি কোরে যাই—তারপর তাদের বিবাহ হয় হবে, না হয় না হবে।

বিদ্যাহীন। (উচ্চ হাস্য করিয়া) তোমার কথায় আর আমি হাসি রাখতে পারিনে। ভারতভূমি জন্মগ্রহণ করে বিদ্যাটাকেই তুমি সার বুঝেছ : আর তুমি যে বিদ্যা ২ কর সেটাই বা কি? খানকতক বই পড়া বৈত নয়, তা সেগুল পড়েই বা হয় কি। তুমিও তো মেলা কতকগুল পড়েছ—তোমারই হোলো কি? কোন ফল তো তার দেখতে পাইনে—আচ্ছা যদি কিছু তুমি জান, বল দেখি। শোনা যাক্।

ধনহীন। ফল আর বোলব কি। শুনতে চাহ তবে শোন।

বিদ্যারূপ তরু দানে কল্পতরু,
কে পারে বর্ণিতে তায়।
যত ধরে ফল সকলই সুফল
কুফল নাহিক তায়॥

যে পায় সে ফল সেই তো সকল
করে আপনার দেহ।
বিনা তার ফল সকলি বিফল
বিশ্বাস করে না কেহ॥
ধর্মমোক্ষ ফল আর যত ফল
যাহাতে মানব ধন্য।
সেই সব ফল বিদ্যা গাছ ফল
সুধারূপে তাহা গণ্য॥
বিষয়ে কি ফল, ভক্ষণে সে ফল,
পরমার্থ ফল পায়।
ইহ-কাল ফল, জানিয়া বিফল,
সকলদিগেতে ধায়॥
সন্তোষাদি ফল, ভূতলের ফল
তাহাও উহাতে ফলে।
* ফলে সর্বফল ফলেঃ কোন ফল,
যত্ন বিনা নাহি ফলে॥

ভাই হে বিদ্যার ফল্ তোমায় আর কি দেখাব? ইহার ফল অসংখ্য—সকলই বিদ্যার ফল।

বিদ্যাহীন। তবে মোচা ফলটাও কি বিদ্যা গাছের ফল?

ধনহীন। পরিহাস করো না?

বিদ্যাহীন। পরিহাস আবার কি? তোমারই কথা প্রমাণে আমি বোল্‌চি—আর বিদ্যা না শিখেও তো অনেক ফল পাওয়া যায়, তবে—

ধনহীন। বিদ্যা না শিক্ষা করে কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না—

বিদ্যাহীন। কেন ভাই মোচাটাই যেন ফলের মধ্যে গণ্য নয়, সশা কলা আঁর কাঁঠাল ইত্যাদি রকমও তো অনেক পাওয়া যায়?

ধনহীন। মহাশয়, আর কায নাই অনেক হোয়েছে।

বিদ্যাহীন। অনেক কেমন কোরে হোলো গোটা কতক বই তো আমি নাম করিনে।

ধনহীন। (বিরক্ত হইয়া) হাঁ!, আপনি কিছু ক্ষান্ত হউন। আমি অনব-

ধানতা প্রযুক্তই বলেছিলাম যে কোন উত্তম ফল বিদ্যা শিক্ষা না করিলে প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ।

বিদ্যাহীন। এখন পথে এসো। বিদ্যাশিক্ষা—বিদ্যাশিক্ষা আবার কি। অনর্থক কতকগুলোন বোকে ২ মাথা ধরান বৈত নয়—ঐ জন্যেই তো ও-গুলকে শিখতে যত্ন পাইনে।

ধনহীন। (স্বাগত) হা বিধাতঃ, এ দুঃখের উপর আবার একি কণ্টক! কি করি, এ মূর্খ কি বোল্‌তে কি বোল্‌বে; না, আর কোন কথায় কায নাই; এক্ষণে এ মহাত্মা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কেবল উহার মতের প্রতি পোষকতাই উপায়, নচেৎ অপমানিত হইতে হবে। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আপনি যা বোল্যেন তাহাই যথার্থ, আমি ভ্রম বশতই কেবল পূর্বোক্ত প্রকার অনর্থক কতকগুল বকেছিলাম; এক্ষণে আমি আসি, আমার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে।

বিদ্যাহীন। ওহে কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার তো বিদ্যার বিষয়ে যে ভ্রমটা ছিল, সেটা গেল; এক্ষণে বাল্য-বিবাহের যে কত সুখ, সেটাও তোমায় জানাতে ইচ্ছা হোচ্চে—বল দেখি, ছেলে বেলা বিবাহ হোলে কত আরাম পাওয়া যায়।

ধনহীন। আপনিই বলুন। আমি তো বিশেষ রূপে সে বিষয়ে জানিনে।

বিদ্যাহীন। তবে আমার মুখেই শোন—

ছেলে বেলা বিয়ে হোলে হয় বড় মজা।
শ্বাশুড়ী তুলিয়া দেয় খায় খাজা গজা॥
আদর করিয়া বড় শালী লয় কোলে।
বড় বড় মাছ খায় ঝালে আর ঝোলে॥
কত মত কথা শেখে নানা রঙ্গ রস।
যাহাতে করিবে পরে রমণীরে বশ॥
ঠারে ঠারে কনেটির মুখ পানে চায়।
আধো আধো হাসি দেখে নয়ন যুড়ায়॥
সহিতে না হয় কভু পাঠশালের ক্লেশ।
খায় দায় বেড়ায় বালিশে মেরে ঠেস্॥
ঘুম পাড়াইতে আসে কত কুলনারী।
রতিশাস্ত্র শিখাইতে বসে সারি সারি॥

কোমল কামিনী কর গাত্রেতে বুলায়।
কি কহিব স্মরণেতে দুঃখ দূরে যায়॥
তাই বলি এ অপেক্ষা সুখ কিবা আছে।
করো না ইহার নিন্দা লোকে নিন্দে পাছে॥

শুনলে! যা সংক্ষেপে বল্যেম্—বিস্তারিত রূপে বলা আমি তো আমি, সদাশিব্ পাঁচমুখে পারেন না?

ধনহীন। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত) আহা! আর বিস্তারে প্রয়োজন নাই, যাহা বোল্যেন তাহাতেই যথেষ্ট হোয়েছে; কিন্তু আমি এক্ষণে আসি, আর বিলম্ব কোর্ত্তে পারি না, অন্য এক দিবস বাহুল্য বর্ণনা শোনা যাবে।

[বলিয়া প্রস্থান]

বিদ্যাহীন। (স্বগত) বেটা মেড়া, বোধাবোধ মাত্রই নাই, ওর যে লোকে কি জন্যেই প্রশংসা করে, তা তো বুঝে উঠা ভার, বোধ করি কোন রকম কামাক্ষার বিদ্যা সাধ্বি বেটার আসে, নতুবা সকলকেই কেমন কোরে বশ কোরেছে—কিন্তু যাকে যা করুক, এ শর্ম্মাকে হটান কিছু কড়াটাক্ বেটাকে ঘোল বলিয়ে তবে ছেড়েছি—হুঁ (ঈষদ্ হাস্য করিয়া) যাই, এখন একবার বলহীনের বাড়ি, তার ছেলের বে নাকি এর মধ্যে হবে আর আমাকেও ডেকে পাঠ্ইয়েছিল—

(প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম সন্ধিস্থল

রঙ্গভূমি। উদ্যান

সরলা ও রঙ্গিনীর প্রবেশ।

সরলা। এই তো ভাই এলেম, এখন আয় দেখি বাগানটা বেড়াই—আ। কেমন সব ফুল ফুটেছে দেখ, সাদা২ ফুলগুলিন যেমন সব আকাশের তারার মতন চারিদিগে রয়েছে।

রঙ্গিনী । দেখো বড়দিদি, যেমন তোমার নয়ন তারা ছুটে যায় না। তা হলে এর মধ্যে থেকে খুঁজে পাওয়া ভার হবে।

সরলা । কেন ভাই, তোর অত বড দুষ্ট তারা থাকৃতে কি আমারটা আর পাওয়া যাবে না? তোমার ঐ চকে কত চোক্ দেখ, আর আমার বেলাই কি দেখতে পাবে না? তা পারে কেন ভাই, এ যে মেয়ে মান্সের চোক।

রঙ্গিনী । (উচ্চ হাস্য করিয়া) ও বড়দিদি, এই যে তবে নাকি কিছু জান না?

সরলা । না ভাই, আমি আর জানি কি—তুমি ডালে২ বেড়াও, আমিও তোমার দেখাদেখি পাতায় পাতায় বেডাতে শিক্‌চি—

রঙ্গিনী । ও ভাই আঁব পাতা, আকন্দ পাতা, না লোকের চোকের পাতা, কোন পাতা ভাই?

সরলা । নে তোর সঙ্গে আর পারিনে, যে পাতায় হউক, এখন—(দূরেতে ভাবিনী ও মায়াকে দেখিয়া) ঐ দেখ ওখানে কে২ আসচে—(কিঞ্চিৎ পরে) ঠাকুর ঝি বুঝি, আবার সঙ্গে উটি কে?

রঙ্গিনী । ও যে ও বাড়ির ছোট গিন্নী—চিন্তে পার না নাকি?—ওমা এই বয়েসেই চোক গেল, এর পরে কি করে কাকে চিন্‌বে গো?

সরলা । কাকে আবার চিন্‌বো কি? আপনার মানুষ চিন্‌তে পাল্যেই হোলো।

(মায়া ও ভাবিনী নিকটবর্তী হইয়া)

ভাবিনী । ওলো বড বৌ ও ভাই ছোট বৌ তোরা এখানে কিবা কোচ্চিস্, এই দেখ আমি বরের মা সঙ্গে ভাব কোরে কাম গুচিয়ে রাখলেম;—ছেলের বে দেবে এসময় ভাব রাখা ভাল নয়?

সরলা । হাঁ ঠাকুর ঝি! তুমিই কাযের লোক, আমরা কি কোচ্চিই বটে—আয় ভাই রঙ্গিনী আমরাও এই বেলা ঠাকুরঝির সঙ্গে যোগাড দিই, আর যদি কিছু না হয় নেমন্তন্নটাও তো পটবে।

মায়া । আর ভাই আমায় যেমন সাধ্যি, অবিশ্যি তেমন কোরে সেবা কোরবো:—তোমাদের নিয়ে যে আমোদ কোর্বো এতো ভাগ্যের বিষয়।

ভাবিনী। ওলো ছোট গিন্নীর এখন প্রাণ খোলা, বেটার বে দিতে বোসেচে, যা বোল্‌বি-তাই শুনবে, নিমন্তন্ন কি ছার ;—

রঙ্গিনী। নেমন্তন্ন যদি ছার ঠাকুরঝি! তবে সারটা কি ঘরের মানুষটী নাকি? ভাই গোপালের মা ঠাকুরঝিকে দিন কতকের মত ছেড়ে দিও, আর যদি তুমি না পার আমিই নয় আপনারটী দেবো—

ভাবিনী। দুর হ তোদের বুঝি অমন ধারা হোয়ে থাকে, কথার শ্রী দেখ।

সরলা। ঠাকুরঝি রাগ করো না।

রঙ্গিনী। ও বড় দিদি ওকি রাগ, তুমি ঠাওরালে ও তা নয়, ও কি শুন্‌বে? ঐ যে বলে,

অন্তরেতে আছে সাধ প্রকাশেতে কত বাদ,
জানে পাছে অন্য কোন জনে।
জল আনিবারে যাই কভু নাহি ফিরে চাই
চলে যাই আপনারি মনে॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম সন্ধিস্থল

রঙ্গভূমি। বলহীনের বহিবাটী

(বলহীনের প্রবেশ)

আর ভাল লাগে না, ছেলের নিমিত্ত যে কি কর্বো কিছুই ভেবে স্থির কোর্তে পাচ্চি না, ক্রমে ব্যায়রামটা যেন বৃদ্ধিই হোচ্যে—কি করি? (কিয়ৎক্ষণ পর) এখন রামা ফির্‌লে হয়, দেখি না রায় মহাশয় কি বলেন, তারপর যা কর্তব্য তাহাই করা যাবে—আ হা! গুরু পার কর—

(বিদ্যাহীনের প্রবেশ)

(বলহীন দৃষ্টি করিয়া) কে ও বিদ্যাহীন ভায়া যে ক দিবস দেখিনে যে?

বিদ্যাহীন। (স্বগত) নিশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া বোধ করি আর দেখ্‌তে পাবে না (প্রকাশে) আর ভাই, এট্টু কর্মের ঝন্‌ঝটে কদিন আস্তে পারিনে—কৃষ্ণরাম পুরে আমার যে জায়গা খানা ছিল তা আপনি জানেন তো?

বলহীন । হাঁ আমি আর জানি না, কত দিবস যাওয়া আসা হোয়েছে। সেই যে গত বৎসর তোমার সঙ্গেই গিয়েছিলেম, তা, তার হোয়েছে কি?

বিদ্যাহীন । হাঁ সেইখানি বিক্রী করা গিয়েছে।

বলহীন । কি বোল্য বিক্রয় করেছ? আহা! তার যে পুষ্করণীটি ছিল অমন জল তো আর দেখি নে বোল্যেই হয়।

বিদ্যাহীন । (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর ভাল জল আর ভাল মাটি বোল্যেই বা হবে কি? পেটের জন্যেই সকল কোর্ত্তে হয়;—মাস দুই তিন পূর্ব্বে লজ্জাহীনের বেটা যা করেছে তাও তো জানেন? আর বিষয়ই বা কত, কলসীর জল নিতে নিতে অবশ্যই শেষ হয়; না থাকলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায় তা আমরা কোন ছার?

বলহীন । হাঁ! যথার্থ বটে। আর তোমার কি অশুভগ্রহ দেখ দেখি চোর বেটা তৎক্ষণাৎ ধরাও পড়লো কিন্তু তোমার যত কিছু ছিল, তার রতি মাত্রও পাওয়া গেল না আহা! বেটা পাহারাওয়ালার তাড়াতে সাধু হবার আশয়ে সমস্তগুলিন দীঘিতে নিক্ষেপ কোর্ল্লে—মনে কোর্ল্লে এই হলেই রাজদণ্ড হতে মুক্ত হব; এটা জানে না যে, গায়ে বিষ্ঠা লেপন কোর্ল্লে যম ছাড়বার নয়।"

বিদ্যাহীন । (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) গেলেন তেমনি মানের মাথা খেয়ে—আর তার স্ত্রীও তেমনি সতী লক্ষ্মী, এদিগে উনিও গেলেন ওরও আর ওদিগে বিলম্ব সইলো না, তখনি বালাখানার বারাণ্ডায় বাহার দিলেন;—ঈশ্বর কি নাই? পাপের ভোগ ভোগ কোর্ত্তে হবেই হবে।

(রামার প্রবেশ)

বলহীন । (রামার প্রতি) কিরে গিয়ে ছিলি? একেবারে সঙ্গে কোরে আনলি নে কেন? তিনি বোল্যেন কি?

রামা । সে কৈল্ল তু যা মু উচ্ছিঁড় যাউচি।

বলহীন । দূর হ। আবার কোথায় বেরিয়ে পড়বে তাহলে একেবারে সমস্ত দিনের মতন আর দেখা পাওয়া ভার।

রামা । না সে সব আগেই ঝিঁয়াড়ে আসিব।

বিদ্যাহীন । মহাশয়! কাকে ডাক্তে পাঠিয়ে ছিলেন ?

বলহীন । হাঁ ঐ রায় মহাশয়কে। ছেলেটার উদরের পীড়া বৃদ্ধি হোয়েছে, আর এবারে ব্যায়রামটা কিছু শক্ত—

বিদ্যাহীন। আহা সেদিনে বিবাহ হলো, বলেন্ কি!

বলহীন । হোলে হবে কি বল? ওর যে জন্মাবধি কেমন ঐ রোগটা হোয়েছে—তা এক দিবসও প্রায় ভাল রূপে যায় না, উত্তম রূপে খাবে বেড়াবে তা ওর অদৃষ্টে নাই—কত সাবধান করে রাখি, তত্রাপি কোন মতেই কিছু হয় না।

* * *

বলহীন । না ভাই আরো কয়েক দিবস বিবাহের গোলমালে ও রাত্র জাগরণে বরং বৃদ্ধিই হোয়েছে ;—আমার হে ভাই এ সাংঘাতিক পীড়া—এ আমার সঙ্গে যাবে,—যক্ষ্মা কস্মিন কালেও কাহারো আরোগ্য হয় নাই। কি রে (রামার প্রতি) কি বল্যে কবিরাজ মহাশয় কি এখনই আস্‌বেন ?

রামা । হাঁ এমতি তো কৈল।

বলহীন । আচ্ছা তুই তবে বাড়ির ভিতর যা, বোলে আয় যে তিনি আস্‌চেন।

(রামার প্রস্থান)

বিদ্যাহীন। আপনারও মুখশ্রী বিবর্ণ হোয়েছে, শরীরও অতি জীর্ণ হোয়েছে, তা আপনিও কোন কোন রকম ঔষধী সেবন করুন না ?

বলহীন । আর ভাই ঔষধী বহু প্রকার সেবন করা হোয়েছে ইংরাজী হকীমী ও বাঙ্গালা কোন রকমেই তো কিছু হয় নাই; বাঙ্গালার এক্ষণে এক শেষ আছে—কবিরাজ মহাশয় বোল্যেন সর্বাঙ্গ সুন্দর রস এক পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করালে ফল দর্শাতে পারে, তা আমি তো সেই মতানুসারে তাঁহাকে পূর্ণমাত্রা প্রস্তুত কোর্ত্তে বলেছি; এখন দেখা যাক্ কি হয়? অদৃষ্টই মূল হে ভাই—

বিদ্যাহীন। (স্বগত) যা! মনে করেছিলেম যে আমি অবিদ্যমানে আমার ছেলেগুলির বলহীন তত্ত্বাবধারণ কোর্বে, তা অদৃষ্টক্রমে দেখ্‌চি

উনিও প্রায় সর সর হোয়েছেন, তা এখন কি করি? তাদের কপালে যা আছে তাহাই হবে।

(বৈদ্যরাজের প্রবেশ)

বলহীন । আসিতে আজ্ঞা হউক রায় মহাশয়। আসুন এই আসনে উপবেশন করুন।

বৈদ্য । (উপবেশন করিয়া) তবে আপনার নিমিত্ত তো সে ঔষধী প্রস্তুত করা হোয়েছে, একটা উত্তম দিন স্থির করে সেবন কোর্বেন্।—এক্ষণে ডাক্‌বার প্রয়োজন, কাহারও কিছুতো হয় নাই?

বলহীন । আর মহাশয় আমার সন্তানটীর ব্যায়রামটা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে ;—

বৈদ্য । কার গোপালের? তাই তো ছেলেটার রোগ আর বিশেষ রূপে আরোগ্য হচ্যে না (স্বগত) যে স্বয়ং চিররোগী তার পুত্র কি কখন বলিষ্ঠ হইতে পারে, জীর্ণ বীজেতে কোন ক্রমেই উত্তম শস্য উৎপাদন করে না ;—এখন আপনিই প্রায় দক্ষিণ দ্বারের নিকটবর্ত্তী হয়েছে তার সর্বাঙ্গ সুন্দর রস—ওতো কেবল দক্ষিণার বিষয়, না হলে আমাদের চলে কই। যা হউক্ বলহীন্‌কে পুত্র শোকটা না পেতে হলেই কিছু সুখী হওয়া যায়। (প্রকাশে) তবে চলুন একবার দেখে আসা যাক্।

বলহীন । আজ্ঞা হাঁ চলুন। ভাই (বিদ্যাহীনের প্রতি) কিয়ৎকাল অবস্থান কর আমি ত্বরায় আস্‌চি।

(বলহীন ও বৈদ্যের গাত্রোত্থান)

বিদ্যাহীন । না মহাশয়! আমার কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে অতএব আমি বিদায় হই।

বলহীন । আচ্ছা তবে সময়ানুসারে সাক্ষাৎ কোরো?

(বলহীনের ও বৈদ্যের প্রস্থান।)

বিদ্যাহীন। (স্বগত) হায় আমার কি দুঃখ! আমি বড় মানুষের সন্তান আমার কত মান ; কত সুখেই ছিলেম ; কত সম্ভ্রম—আহা সে সকল এখন কোথায়? রে কাল? তুই কিনা কর্ত্তে সমর্থ? রাজ্যের রাজাও নষ্ট কর্ত্তে পারিস্, অক্ষয় কীর্ত্তিকলা-

পেরও লোপ করিস্ এবং মহাসুখের সলিলেও বিষ নিক্ষেপ
করে সেইস্থলের প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিস—আহা! * * *

আহা! অল্পকাল মধ্যে আমার কি দুর্দশা না ঘট্‌লো? বিষয় আশয় যাহা ছিল প্রায় তার সকলই শেষ্ হলো—কোন কর্ম্মের ক্ষমতা নাই, যে তাই অবলম্বন করে সংসার পোষণ করি। হায় হায়। আমার দুটি সন্তান, তাদেরও লেখা পড়া শিখাইতে যত্ন করি নাই; যে, কালে তাহারাও সুখে কাল কাটাইবে,—ধনহীন! যথার্থ বলিয়াছিলে, ধনমদে তোমার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, অতএব তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হা ঈশ্বর! কেনই বা আমি আমার পুত্রগণের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়েছিলাম? পরে তাহাদের দশা কি হবে এই মাত্র স্মরণ হলে আমার প্রাণ দেহের মধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করে না; আহা তাহারা কি লজ্জাহীনের পথ অবলম্বন কর্বে? না বিবাগী হয়ে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া জীবন যাপন কর্বে? জগদীশ! সেদিন যেন আমাকে আর দেখিতে না হয়; দয়া করে এই মহাপাপিকে এই দুঃখ সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ কর—আমার আর জীবিত থাকিতে বাসনা নাই। মৃত্যু! আহা। তুমি আমার কি উপকারী, কি আদরেই তোমাকে সম্বোধন করিতেছি—তুমি ভিন্ন এই পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই, যাহার আশ্রয় এই দুর্ভাগ্য অবলম্বন করিতে পারে, যাহার নিকট নির্বিঘ্নে গমন করিতে পারি ও যাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে। (কিয়ৎপরে) আহা! একে তো কত মহাপাপই করিয়াছি; বিশ্বকর্তার কত নিয়মই ভঙ্গ করিয়াছি; ...হায় ২ যাহার কারণ ইহকালে এই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি এবং পরকালে যাহার নিমিত্ত ঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে;—কিন্তু তার কোন প্রতিকার না করে আবার এই মহাভয়ানক আত্মনাশা পাপে লিপ্ত হইতে হইল। জগদীশ! আমার কোন রকমে নিষ্কৃতি নাই, উঃ! পাপাত্মাদের এই শাস্তি মরণ ইচ্ছা করিয়াও সুখ লাভ দূরে থাক প্রত্যুত ভয়কেই সম্মুখে দেখা যায়; কিন্তু যাহা হউক বেঁচেই বা করি কি? অপমান, লজ্জা, নিন্দা, অন্নকষ্ট এই সমস্তগুলিন্ যেন আমায় তাড়না করিতেছে, অতএব আর বিলম্ব করা অনাবশ্যক বাটীতে গমন করাযাক্।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় সন্ধিস্থল।

রঙ্গভূমি। রাজপথ।

ধনহীনের প্রবেশ।

ধনহীন। (স্বগত) না হবে কেন? জানাই তো আছে, দুর্বল চিররোগীর সন্তান, যার জন্মাবধি পীড়া—আবার পীড়াটাও সাধারণ নয়, অনেক চিকিৎসকে বলে গেছেন ঐ রোগই উহার সাংঘাতিক; তবে ঔষধাদির গুণে যত দিবস জীবিত থাকে, আহা বলহীন কি মূর্খ! আবার সেই পুত্রের বিবাহ দিলেন—হায় হায় হায়! এদেশের—

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। কি মহাশয় কোথায় চলেছেন?

ধনহীন। কিহে ভাই সুধীর যে! ভাল আছ তো?

সুধীর। আচ্ছা হাঁ চলেছেন্ কোথায়?

ধনহীন। এই একবার বলহীনের পুত্রের অত্যন্ত ব্যায়রাম তাই দেখতে যাওয়া যাচ্যে।

সুধীর। তবে চলুন আমিও যাই, কল্য শুনেছিলাম বটে যে অত্যন্ত ব্যায়ারাম;—হা জগদীশ! অবলা কন্যাটীকে সুপ্রসন্ন হও।

ধনহীন। ভাই ঈশ্বরের নিয়ম লংঘন কল্যেই তার ফলাফল ভোগ কর্তে হয়ই হয়; জগত স্রষ্টার নিয়ম পরিবর্তন হইবার নহে;—বলহীনের পুত্র রক্ষা পায় সকলেরই ইচ্ছা এবং আমিও প্রার্থনা করি যে তোমার ইচ্ছা ফলবতী হউক।

(বৈদ্যের প্রবেশ)

(ধনহীন বৈদ্যকে দেখিয়া) রায় মহাশয় বল্‌তে পারেন্ বলহীনের পুত্রটি কিরূপ আছে?

বৈদ্য। হাঁ! ব্যায়ারাম বড় শক্ত রক্ষা পাওয়া ভার—কাল ইংরেজ ডাক্তার আনিয়েছিল তা শিবের অসাধ্য যা তিনি তার কর্বেন কি?

ধনহীন। হাঁ তা বটে। আচ্ছা, মহাশয় তবে গৃহে যান আমরাও সেই স্থলেই গমন কচ্চি।

বৈদ্য। হাঁ যান, আমিও এই হয়ে আসচি।

(বলিয়া বৈদ্যের প্রস্থান)

ধনহীন। ভাই সুধীর! স্বয়ং চিররোগী হয়ে বিবাহ করা কি অল্প অধর্ম—এবং জানিয়া শুনিয়া আপনার পীড়িত পুত্রের পাণি সংযোজন করান কি সাধারণ অপকর্ম? হায় ৩!

সুধীর। মহাশয় ওকথা আর বোলবেন না; আমি উহার পুত্রের বিবাহের পূর্বে ঐ আভাসে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলাম পরে বলহীন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আমাকে বালক, অজ্ঞান ও ভট্টাচার্য নানাপ্রকার কটূক্তি কল্যেন—তা—

ধনহীন। হা বলহীন! দেশাচার তোমাকে একেবারে অন্ধ করিয়াছে—শূকরের ন্যায় সুরম্য পুষ্পোদ্যান ত্যাগ করিয়া কদর্য কর্দম বিশিষ্ট স্থলে বাস করিতেছ—সৎপথ সম্মুখে প্রদর্শিত হইলেও কুসংস্কারাবৃত হইয়া কুপথেই গমন কর; ভাই সুধীর! একি সাধারণ ক্ষোভের বিষয়! আহা! দেখ দেখি, বুদ্ধিহীন প্রকৃত বুদ্ধিহীন হইয়া আপনার ঔরসজাত পরম স্নেহাস্পদ কোমল কুমারীকে এতাদৃশ অল্পায়ুঃ অভাগ্য পাত্রকে সম্প্রদান কর্লে হা বুদ্ধিহীন! হা বলহীন!

সুধীর। মহাশয়ের আর ও বিষয়ে বৃথা বিলাপ—

[অকস্মাৎ নেপথ্যে]

হা নাথ! আমি কি অভাগিনী, আমি তোমায় দেখে সকল দুঃখ পাসরিতাম—হায় ২! কি হলো—ওগো কে কোথায়? ওগো এঁকে কি আর রক্ষা করা যায় না?

সুধীর। মহাশয় এই না বিদ্যাহীনের বাটী? অকস্মাৎ ইহার মধ্যে ক্রন্দন ধ্বনি কেন? কাহারও তো কিছু—

ধনহীন। তাই তো—প্রাতঃকালে বিদ্যাহীনকে বলহীনের বাটী হতে আস্তে দেখেছিলাম, কাহারও কিছু হলে অবশ্যই তার সম্বাদ পাওয়া যেতো—

[পুনর্বার নেপথ্যে]

(ওগো তোমরা এস গো) হায় ২—আহা! কেহই নাই? হা আমি অভাগিনী! হে নাথ! তুমি কেন এমন কল্যে হায় ২!

ধনহীন। তাই তো পুনশ্চ ক্রন্দনের রোল—ব্যাপারটা কি? চলনা একবার দেখে আসা যাক্ (উভয়ের গমনোদ্যোগ) (ইত্যবসরে বিদ্যাহীনের স্ত্রীর বিলাপ করিতে করিতে প্রবেশ)

হায় ২ ! ছেলেগুলো গেল কোথা ? হা নাথ ! কেহই যে নাই, ওমা আমি কোথা যাব ? কাকে ডাক্‌বো ? ওগো এখন বেঁচে আছেন—ও মা—আ—আ—গো—মা—আ—আ—

সুধীর । মা তোমার কি হয়েছে ? কি নিমিত্ত এত বিলাপ কর্চ্ছো ?

সরলা । ও বাছা ! ও বাবা ! ওগো তিনি এখনো বেঁচে আছেন । আমার কেউ নাই তোমরা রক্ষা কর (ধনহীনের চরণে পড়িয়া) ওগো তোমরা উপায় কর নইলে আমি মরি, ও-মা—আ—গো—ও—ও—

ধনহীন । কি হয়েছে ভালরূপে বলনা, অত উতলা হলে চল্‌বে কেন ?

সরলা । ওমা—ওগো—ওগো—তিনি বিষ খেয়েছেন—তা তোমরা রক্ষা কর—তিনি এখন বেঁচে আছেন ওগো এই বেলা—উঃ । ও—ও—মা—আ—গো—ও—ও—

সুধীর । বিদ্যাহীন (ধনহীনের প্রতি) তো বিষ ভক্ষণ করেছে ; হায় ! ২ মহাশয় ! এখনও তিনি জীবিত আছেন, শুন্‌চি—অতএব আমি সত্বরে একজন ডাক্তার ডাক্‌তে যাই আর মহাশয় ইঁহাকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করুন, রাজপথে গণ্ডগোল করা ভাল নয় ।

* * * *

তৃতীয় সান্ধিস্থল ।

রঙ্গভূমি । বলহীনের অন্তঃপুর ।

পটোত্তলনান্তর ।

(মায়াবতী, বৃদ্ধা, অম্বিকা, অবলা, ও আর আর স্ত্রীগণ এবং মৃতপ্রায় গোপাল)

মায়া । হায় ! হায় । হাঁ গা ডাক্তার কি বলে গেলে ! আহা ! বাছা কি আমার বাঁচ্‌লোনা—হায় ২ ! ওমা আমার কি—ই—ই—হ—অ—অ—বে—এ—

বৃদ্ধা । ওগো চুপ্‌ কর্‌ চুপ্‌ কর্‌ ; কাঁদ্‌লে ছেলের ত্রাশ হবে, ভেকা-চেকা লাগবে ;—ডাক ! মা কালীকে ডাক্‌ মা দুর্গাকে ডাক্‌ ! ভয় কি তারাই মুখ রাখবেন ।

মায়া । হে মা দুর্গা ! হে মা কালী ! মাগো ! আমি যোড়া পাঁঠা দেব

—হে ! হে মা সব দেবতা ! মাগো আমি তোমাদের সকলের কাছে বুক্ চিরে রক্ত দেব, ষোড়শোপচারে পূজা দেব, মাগো তোমরা আমার গোপালকে আমায় ভিক্ষা দাও (গোপালের হিক্কা দেখিয়া) 'ওমা ছেলে কেন ওমন করে গো ! ওগো তোমরা সব দেখ গো ! হায়, হলো কি ? ওমা !—বাবা গোপাল ! ও বাবা কেন ওমন কর বাবা ? ও বাবা ! জল খাবে বাবা ? ও বাবা বাবা ! ওগো দেখগো, ওগো ওর বাপ্‌কে ডাক্ গো ! এসে একবার দেখুক ! ওমা ওমন কেন করে গো ? বাবা—আ—আ —গোপা—আ—ল, ও বাবা আহা হা !

অম্বিকা । বিধিরে ! তোর এ কেমন বিধি ? বাবা গোপাল আমার অবলাকে কোথায় ভাসালে বাবা ! ও বাবা সে যে আমার কিছু জানেনা বাবা ! ও বাবা একবার তার মুখ পানে চেয়ে দেখ। হায় ও ! (বক্ষঃস্থলে করাঘাত। অতঃপর গোপালকে মৃত নিশ্চয় জানিয়া সকলের ক্রন্দন।)

(বুদ্ধিহীন ও রামার স্কন্ধে হস্তদ্বয় প্রদান করিয়া চলৎশক্তি রহিত বলহীনের প্রবেশ।)

বলহীন । (অতি মৃদুস্বরে) গোপাল ! বাছা রে কই বাবা ?

বৃদ্ধা । আর তোমার গোপাল—গোপাল কি আর আছে ?

(সকলের পুনঃ ক্রন্দন)

বলহীন । (কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে) আহা ! গোপাল কি নাই ? সকলি এই কপালের দোষ—হা অল্পায়ুঃ সন্তান ! আহা ! তোর সেদিন বিবাহ দিলাম, ভেবেছিলাম তোকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হব। আহা সে আশা আশামাত্র ! উঃ কি অলক্ষণ যুক্তা কন্যাটাকেই ঘরে এনেছিলাম যে দুমাস কালও গেল না, আসিবামাত্রেই অমনি সংসার তিলক স্নেহাস্পদ পুত্রটীকে গ্রাস কোল্যে ;—ঘটক বেটা কি দুর্দান্ত রাক্ষসীর সহিত আমার প্রিয় বালকের সম্বন্ধ ঘটালে। আহা হা ! বাবা গোপাল তোর শোক ঐ হতভাগ্যাকে দেখে বিস্মৃত হতে পারবো না—বাবা (বলিতে ২ কাশীর উত্তম হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হওত মোহপ্রাপ্তি ও পরে প্রাণত্যাগ)

(সকল স্ত্রীগণে) ওমা (একি সর্বনাশ) ২ বিপদের উপর বিপদ ! হায় ৩ !—

মায়া । হা নাথ ! একি হলো ? আমায় ফেলে গেলে কোথা ?—তোমার গোপালকে কি এত ভালবাস ?—হায় ৩ ! আমি চির দুঃখিনী —হে নাথ একবার কথা কও ! হা আমি মন্দাভাগিনী রাক্ষসী, নাথ আমিই তোমায় খেলেম—মা আমায় কেন পেটে ধারণ কোরেছিলি—এ আমি কি করে সহ্য কোর্বো হায় ২ ! (বলিয়া ক্রন্দন ।)

* * * *

(মায়াবতীকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

* * * *

বুদ্ধিহীন । আমিও গেলেম—আমার ঐ একমাত্র কন্যা উহার মুখ নিরন্তর দর্শন করিয়া কেবল প্রজ্জলিত মনানলেই দগ্ধ হবো ;—আবার ঐ নির্দোষী বালিকাকে বলহীন যে দুর্বাক্য প্রয়োগ করেছে তা কস্মিন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না—আহা ! বাছা অবলা তুই কি রাক্ষসী ?—আহা ! আর সহ্য হয় না ; আ হা ! হা ! তুই যে কত দুঃখ সহ্য কর্বি তা অন্যে কি জানে ?

(ধনহীনের প্রতি) মহাশয় ! বাল্য-বিবাহ যেন আর এই পৃথিবীতে কেহই না করে, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন ;— এক্ষণে আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে এই বিষময়ী প্রথা নৃঘাতকী রূপে এই ভারতভূমে অবতীর্ণা হইয়া ইহাকে একেবারে ছারখার করিতেছে ;—কত কত প্রাণীর কত প্রকারে কতবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, কত ২ অবলা কুলবালারা দারুণ দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, কত কত কামিনীরা কুলে জলাঞ্জলি দিতেছে, কত কত যুবা পুরুষ সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া আত্মঘাতী হইতেছে, কত কত ভদ্র সন্তানেরাও অতি ঘৃণাস্কর ও লজ্জাকর চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে এবং কত কত মহাপুরুষেরা জরা ও রোগগ্রস্ত হইয়া হীনবল পিণ্ডের ন্যায় সন্তান সকল উৎপাদন করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতেছে ; এই সকল পাপ প্রবাহের

বাল্য-বিবাহই প্রধান প্রস্রবণ; ইহাকে না সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত করিলে দেশের মঙ্গল নাই এবং আপনারও মঙ্গল নাই, প্রতিবাসীর মঙ্গল নাই, আপনার পরিবারের মঙ্গল নাই এবং আপনারও মঙ্গল নাই। অতএব এই বঙ্গ দেশীয় বন্ধুগণ তোমরা আর কতকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে? একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই পরম শত্রুকে আক্রমণ করত ইহার শিরশ্ছেদ কর তাহলেই তোমাদের মাতৃভূমির অনেক উপকার হইবে ও কালে তোমরা বীর্যবান হইয়া পরাধীন শৃঙ্খল ভগ্ন করত মহা সুখে সঞ্চরণ করিবে এবং পরমেশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়া কত অনির্বচনীয় আনন্দই উপভোগ করিবে—

ধনহীন । আহা! সে দিনের সূর্য শীঘ্র সমাগত হইক—হা ঈশ্বর! এই ভারতভূমির উপর করুণা বারি বর্ষণ করিয়া এই প্রজ্জলিত অনল শিখাকে নির্বাণ কর; অবলা কুলবালাগণের গতি বিধান কর; কুসংস্কারের কেশাকর্ষণ করিয়া পৃথিবী হইতে নির্বাসিত কর এবং দেশীয় বন্ধুগণের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বাল্যোদ্বাহ নিবন্ধন দুঃসহ দুর্গতিকে দূর করত এই দয়াশূন্য দেশের শ্রীসাধন কর। ভাই সুধীর! এক্ষণে চল ইহাদিগের গতির উদ্যোগ দেখা যাক্।

সুধীর । আজ্ঞা চলুন, আর বৃথা বিলম্বে প্রয়োজন কি? (মৃতগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

পট প্রক্ষেপণ

নেপথ্যে ক্রন্দনরোল।

———

কনসেণ্ট বিল

ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ পাদে আসিয়া এই "কনসেণ্ট বিল" পাস হয়। এই 'বিলে' বাল্য বিবাহকে পরিপূর্ণ ভাবে অসমর্থন করা না হইলেও, বিবাহিত কন্যার স্বামী গৃহে সহবাস করিবার বয়স নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই 'বিলের' বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে এক তুমুল আন্দোলনের

সৃষ্টি হইয়াছিল। এই আন্দোলন ছিল মূলতঃ সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রথাগত। ইহার মধ্য দিয়া বাল্য বিবাহের পোষকতায় ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে কন্যা অতি অল্প বয়সে প্রাপ্ত বয়স্কা হইয়া পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে বিবাহকাল নির্ধারণ বা সহবাস সম্মতির জন্যে আইনের সৃষ্টি হইলে নাকি জাতিপাতের আশঙ্কা আছে। কেবল মাত্র জাতিনাশের ভয়ই নয়, 'কনসেণ্ট বিল' একদা আমাদের সমাজের সর্বস্তরেই আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১২৯৭ সালের 'চিত্রদর্শন' পত্রিকায় বলা হইয়াছে—

"সার এড্ড্ স্কোবলের কল্যাণে আমরা যে নূতন বিধি পাইয়াছি তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতার জানিতে বাকি নাই। বিল যে কি বস্তু, এতদিন তাহা কেবল আধুনিক শিক্ষিত দলের মস্তিষ্কেই আলোড়িত করিতেছিল, এখন কিন্তু উহা অন্দর মহলেও প্রবেশ করিল।"

আন্দোলনের বর্ণনা দিতে গিয়া উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছেন—

"সহবাস সম্মতি আইন লইয়া দেশময় ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। কলিকাতায় এরূপ আন্দোলন হইয়াছিল যে, ধর্মের জন্য, আইনের জন্য কখনও যে এত লোক একত্রিত হয় নাই, ইহা সর্ববাদী সম্মত। কলিকাতায়—এমনকি সমগ্র ভারতের ইতিহাসেও ইহা হল অতি অভুতপূর্ব ঘটনা।......আমরা ১৪ই ফাল্গুন বুধবার কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে মহা লোকারণ্য, যে অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিব না। ...হিন্দু মুসলমান, উত্তর পশ্চিমবাসী, মাড়োয়ারী, মারহাট্টা, পাঞ্জাবী, মৈথিলী উৎকলবাসী এত জাতির লোক ধর্ম লোপ ভয়ে ভীত হইয়া মহাক্ষেত্রে মহা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন।" শুধু গড়ের মাঠের বক্তৃতা নয়, কালীঘাটের কালী মন্দিরে বিভিন্ন প্রদেশের ধর্মভীরু হিন্দু এসে যাগযজ্ঞ কীর্তন শুরু করিয়া দেয়। তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া 'চিত্রদর্শন' বলিয়াছেন—

"ঠিক হইয়াই গেল. আগামী বৃহস্পতিবার আইন পাশ হইবে। এই সময়ে হিন্দুগণ কাতর হইয়া জয় জননী মঙ্গলময়ী কালীর আরাধনার জন্য কালীঘাটে উপনীত হইয়াছিলেন। সেদিন কালীঘাটে যেন সত্যযুগের আবির্ভাব। এই উপলক্ষ্যে গড়ের মাঠে ও কালীঘাটে কিরূপ লোকারণ্য হইয়াছিল, তাহা বলিতে ইংলিসম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, ডেলিনিউস্ প্রভৃতি পত্র সম্পাদকগণ সকলকেই একান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।"

সম্মতি সঙ্কট

অমৃতলাল বসু—১৮৯১ খৃঃ

কাহিনীর সারাংশ

সমাজ ধর্মের সকল ধর্মের মূল বিবাহধর্ম। মর্ত্যে বিদেশী রাজার অন্যায় বিধি সেই পবিত্র ধর্ম কলঙ্কিত করিতে উদ্যত। নারদের মুখনিঃসৃত এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কৈলাশে দুর্গা বিচলিত হইয়া উঠেন এবং স্বয়ং মহাদেবও সতীত্বের অবমাননার কথা শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন এবং ত্রিশূল লইয়া ধ্বংস করিতে উদ্যত হন এবং পরে দুর্গা তাঁহাকে শান্ত করেন।

মর্ত্যে 'কনসেণ্ট বিল' পাস হইয়াছে। মানিকের পুত্র তিলক ইংরেজী স্কুলে পড়িয়া বাবু হইয়াছে। সে প্রত্যহ 'মিরর' কাগজ পড়ে। পিতাকে সে ইংরেজী সংবাদ পত্র হইতে আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিবার পর পিতার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কারণ তিনি বৌবাজারের বাড়ী বিক্রয় করিয়া এগারো বছরে হিমির বিবাহ দিয়াছেন। বারো বৎসর না হইলে কনের গৃহে বর যাইতে পারিবেনা। পুনর্বিবাহ দিয়া জামাইকে গৃহে আনিবার জন্য বেয়াইবাড়ী হইতে তাগাদা আসিতেছে, কিন্তু ঠিক এই সময়েই এই আইন।

মানিকের খেদ। 'এসব হলো কি ! টেকস্ নিচ্ছিস, নে বাবা, আমাদের ঘরের ভেতর কি হচ্ছে—মেয়ে, ছেলে—এ সবে বাবু কোম্পানির হাত কেন।'

মানিকের স্ত্রী রাসমণিও এইসব শুনিয়া অবাক হয় :

'পুনর্বে হ'লে জামাই ঘরে শোবে না ত কি তিন ছেলের মা হ'লে শোবে ! আবার আইন করেছেন বারো বছর, তিলক জানে না ঐ যে আমার তেরো বছরে হয়েছিলো।'

রামলাল আসিয়া তাহার দুঃখের কথা জানায়। তাহার কন্যা এগারো বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে সিকদার বাগানের দে বাড়ীর একটা ছেলে পাইয়াছিলেন, বাড়ী বাঁধা দিয়া হাজার চারেক টাকাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আইনের কথা শুনিয়া আজ নাকি ছেলের পিতা বলিয়া

পাঠাইয়াছে যে বিবাহ হইবে না। তাই রামলালের খেদ, এতদিন কোম্পানী আর যা তা করুন, এতদিন আমাদের ধর্মে হাত দেন নাই। আর আজ সেই ধর্ম কলঙ্কিত হইতে চলিল।

মাণিকের পুত্র তিলক টাকার লোভ দেখাইয়া স্মৃতিরত্ন বাদে আর সকলকেই 'কনসেণ্ট বিলের' পক্ষে মত দিবার জন্য হাত করিয়া লইলেও, মাণিক কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিমির পুন-বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। মাণিকের জামাই রাধাকিশোর শ্বশুর বাড়ী আসিবার পথে এক পাহারাওয়ালাকে সাক্ষী লইয়া আসে এই সর্তে যে সে নিজে মেঝেতে শুইয়া পাহারাওয়ালাকে বিছানায় শুইতে দেবে।

এদিকে রাজবিধির প্রতিবাদে সার্বভৌম অনশন আরম্ভ করিলেন। তিলক সার্বভৌম মহাশয়ের অনশন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে দলে টানিবার জন্য প্রথমে ৬ টাকা ও পরে ১০ টাকা পর্যন্ত ঘুষের প্রলোভন দেখায়, কিন্তু সার্বভৌম তাহাতে বিচলিত না হইয়া হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু স্ত্রীর সতীত্বের মহিমা বর্ণনা করিতে থাকেন এবং বলেন—"আম যেমন ১৫ই জৈষ্ঠ থেকে পাকে না; তেমনি মেয়ের যৌবন আসবারও কোন বয়সের নিয়ম নাই।" তখন তিলক যুক্তি উপস্থিত করে যে অল্প বয়সের সন্তান বুদ্ধিমান হয় না। সার্বভৌম এমন বহু মহাপুরুষের নিদর্শন দেন যাঁহারা অল্প বয়সেরই সন্তান এবং এই প্রসঙ্গে তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন :—

"হিন্দু সন্তান সাবধান হও। বাঁধ ভেঙে ঘরের দ্বারে বাণ এনো না। ঐ যে গর্ভধানের বিধি হচ্ছে বড় সর্বনাশ হবে, বালিকার বিবাহ বন্ধ হবে, হিন্দু কুলকামিনীর যে পবিত্র বন্ধন রয়েছে—তা ছিন্ন হবে, সাবধান!"

হিন্দু ধর্ম ডুবিয়া যায় দেখিয়া সনাতন ধর্ম প্রেমিক লোকেরা কালীঘাটের মন্দিরে দেবীর সামনে প্রার্থনা করে—যাহা দ্বারা হিন্দুধর্ম রক্ষা পায়, 'কনসেণ্ট বিল' আসিয়া হিন্দু নারীর সতীত্ব যেন নাশ না করে।

এই সম্মতি আইনের ফলে যে সামাজিক দলাদলি ও ব্যক্তিগত আক্রোশ পূর্ণ করিবার সুযোগ সমাজে বাড়িয়াই গিয়াছিল তাহাই নির্দেশ করিয়া শ্রীহরেন্দ্র নাথ মিত্র ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'আইন বিভ্রাট' নামে একটি নাটক রচনা করেন। ইহার বিষয় বস্তু এই :—

নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন জমিদার। তিনি তাঁহার প্রতিবেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সর্বদা শত্রুতা সাধন করিবার

সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন। এমন সময় 'সম্মতি আইন' বিধিবদ্ধ হইল। ভূপতির পুত্র বিবাহ করিয়া সম্মতি আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তিনি আদালতে নালিশ করিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের একজন আচার্য তাঁহার এই কার্যে সহযোগিতা করিবার ফলে এই আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধে ভূপতি এবং তাহার পুত্র উভয়েরই জেল হইল। বহু দিনের শত্রুতা সাধন করিবার অভিপ্রায় এই ভাবে নরেন্দ্র নাথ 'সম্মতি আইনের' সুযোগে সিদ্ধ করিতে সার্থক হন।

চতুর্থ অধ্যায়

অসম বিবাহ

বিবাহ বয়সের দিক দিয়া বর এবং কন্যার মধ্যে অসমতা কিংবা অসঙ্গত পার্থক্য দাম্পত্য এবং পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার উদ্ভব করিয়া থাকে এবং তাহা কোন কোন সময় বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি করে। সাধারণ ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যাহারা শারীরিক দিক দিয়া দাম্পত্য জীবন ভোগ করিবার পক্ষে পরস্পর সমর্থ বা সক্ষম তাহাদের মধ্যেই পরস্পর বিবাহ বন্ধন সঙ্গত এবং প্রায় সর্বত্র তাহাই হইয়া থাকে। বিবাহ যোগ্যা বর কিংবা কন্যার বয়স সম্পর্কে যদিও সুস্পষ্ট কোন শাস্ত্রীয় কিংবা আচারগত নির্দেশ স্বীকার করিয়া কোন দেশের সমাজই চলিতে পারে না, তথাপি এই বিষয়ে সাধারণ যে একটি নীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে, তার ব্যতিক্রম হইলেই সমাজের নিকট যেমন তাহা বিসদৃশ হয়, তেমনই দাম্পত্য জীবনেও নানা বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিবাহিত জীবনের যেমন একটি শারীর দিক আছে, তেমনই একটি মানসিক দিকও আছে, যেখানে বয়সের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশি, সেখানে শারীরিক কারণে যেমন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি সম্ভব নহে, তেমনই মানসিক দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতে পারে না। দাম্পত্য এবং পারিবারিক জীবনে ইহাই অসন্তোষের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের সাধারণতঃ হিন্দু সমাজে শারীর-বিজ্ঞান সম্মতভাবেই পুরুষের বয়স স্ত্রী হইতে কিছু বেশি হইয়া থাকে, তবে তাহা কত পর্যন্ত বেশি হইতে পারে কিংবা উভয়ের বয়সের মধ্যে কি পর্যন্ত ব্যবধান হইতে পারে, তাহার কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নাই। নানা অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক কারণে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই এই বয়সের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই তাহা দ্বারা সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ব্যক্তি জীবনের মধ্যেও নানা অসন্তোষের সৃষ্টি করে। হিন্দু সমাজের জন্য এই বিষয়ে মনুসংহিতায় একটি বিধান দেওয়া আছে যে,

'ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বর॥ ৯.৯৪

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের যুবক মনোমত দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে, চব্বিশ বৎসরের যুবক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু যদি ধর্মহানির আশঙ্কা থাকে, তবে সত্বরও বিবাহ করিতে পারে। কুল্লুক ভট্ট ইহার টীকা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'কন্যার এই বয়ঃক্রম নির্ধারণ এই বচনের তাৎপর্য নহে ; কিন্তু বরের বয়ঃক্রমের প্রায় তিনভাগের একভাগ কন্যার বয়ঃক্রম হওয়াই নিয়ম। কেহ কেহ দ্বাদশবার্ষিকী শব্দে 'দ্বাদশবর্ষ প্রবৃত্তা' বলিয়া মনে করিয়া লিখিয়াছেন, 'দ্বাদশ শব্দে "গর্ভদ্বাদশ" তাহা হইলে দশ বৎসর দুই মাস মাত্র বয়স্কাই 'দ্বাদশ বর্ষিকী' শব্দের অর্থ। ইহাই কন্যা বিবাহের চরমকাল বলিয়া জানিবে।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মনুর এই নির্দেশ আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীরাও সমর্থন করিয়া থাকেন। পুরুষ বেশি বয়সে বিবাহ করিলে পুত্র সন্তান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা বেশি, ইহাই আধুনিক জীব-বৈজ্ঞানিক-দিগের অভিমত। পুত্রলাভই হিন্দু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য, সুতরাং মনুর নির্দেশের মধ্যে ভারতীয় সমাজ-জীবনের মূল অদর্শটিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মনুর নিকট ধর্মরক্ষাই সকল আচারের লক্ষ্য, এখানেও তাহাই লক্ষ্য। কেবলমাত্র হিন্দু সমাজ নহে, হিন্দু সমাজের বহির্ভূত অংশেও, ভারতীয় নানা আদিম সমাজের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যেও পরিণত বয়সেই বিবাহ (adult marriage) প্রচলিত থাকিবার ফলে, তাহাতেও বর এবং কন্যার বয়সের প্রায় সমতাই থাকে, বিশেষ কোন পার্থক্যই থাকে না। তবে কোন কোন আদিবাসী সমাজে যে ইহার সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহাতে পুরুষের বয়স বেশি না হইয়া বরং স্ত্রীর বয়স কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও প্রতিক্রিয়া অনেক সময় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া থাকে ; কারণ, তাহা জীব-বিজ্ঞান অনুযায়ী একান্ত অসমর্থন-যোগ্য। কোরাপুট জিলার বোণ্ডা উপজাতির মধ্যে প্রায়ই স্ত্রীর বয়স পুরুষ অপেক্ষা বেশি হইয়া থাকে ; ইহাতে অল্পায়ু রুগ্ন এবং হীনবীর্য যে সন্তানের উৎপত্তি হইতেছে, তাহাতে এই উপজাতি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইবার পথে। তবে এই অবস্থা স্বাভাবিক সমাজ-জীবনের অবস্থা নহে ; অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা কারণের চাপে পড়িয়া কোন কোন সময় কোন কোন উপজাতিকে যখন এই প্রথা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তাহাকে ধ্বংসের পথ হইতে আর কেহই উদ্ধার করিতে পারে না। তবে ইহার দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে। অষ্ট্রেলিয়ার উপজাতির মধ্যে যে গোষ্ঠীর

দলপতি (chief) সে সমাজের মধ্য হইতে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে, তাহার ফলে সে সাধারণতঃ নিজের পৌত্রীকে বিবাহ করিবার অধিকার লাভ করে। অর্থাৎ ঠাকুর দাদার সঙ্গে নাৎনীর বিবাহ হয়। মানব-সমাজের ইতিহাসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের দিক দিয়া ব্যবধান ইহার বেশি আর কিছু হইতে পারে না; তবে এই শ্রেণীর দলপতিগণ বহুপত্নীক হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার জন্য তাহাদের পৌত্রীদিগের সহজ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে অন্তরায়ই সৃষ্টি হউক, নিজেদের দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে কোন অপূর্ণতা থাকে না; কারণ, পৌত্রী ব্যতীতও তাহারা নিজেদের সমবয়স্কা পত্নীও বিবাহ করিবার সুযোগ পায়; আমাদের দেশে বিবাহে বর-কন্যার বয়সের পার্থক্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ স্বীকার না করিবার জন্য এই বিষয়ে যে যথেচ্ছাচারিতা দেখা দিয়াছিল, পিতামহ-পৌত্রীর বিবাহের তুলনায়ও তাহা অনেক সময় নিন্দনীয় হইয়া উঠিত। এই সকল নিদর্শন সমাজের দৃষ্টি কখনও এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

অর্থনৈতিক কারণ এবং কৌলীন্যপ্রথা উভয়ই আমাদের দেশের সমাজে অসমবিবাহের জন্য দায়ী। অর্থনৈতিক কারণের দুইটি দিক—একটি অর্থশালী ব্যক্তি কন্যার পিতার দরিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থ দ্বারা বিপত্নীক জীবনেই হউক, কিংবা নিজস্ব বিলাস বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই হোক্, এক কিংবা একাধিক স্ত্রী বর্তমানেই অল্পবয়স্কা কন্যা বিবাহ করে। আর অন্য দিক দিয়া যে সকল সমাজে কন্যা-বিক্রয়-প্রথা (marriage by purchase) প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে জীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবার পূর্বে বিবাহ করিতে সক্ষম হয় না বলিয়া তাহাদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতে থাকে; তারপর সে যখন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বিবাহ করিবার উদ্যোগ করে, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে তাহার বয়সের তুলনায় অনেক অল্প-বয়স্কা কন্যা বিবাহ করিবার প্রয়োজন হয়। যদিও মনুসংহিতায় কন্যা-বিক্রয়ীর নানা নিন্দা করা হইয়াছে, তথাপি কেবলমাত্র নিম্নতম সমাজেই কেন, অনেক উচ্চ শ্রেণীর সমাজেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে এই প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। নিম্ন শ্রেণীর সমাজে তাহার ব্যাপক প্রচলন থাকিলেও তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধবাবিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ পূর্ব হইতেই প্রচালিত ছিল,

বিধবাবস্থায়ই হউক কিংবা দাম্পত্য জীবনে কোন অসন্তোষ দেখা দিলে বৃদ্ধ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের বয়সোচিত স্বামী গ্রহণে কোন বাধা ছিল না; সে ক্ষেত্রে কন্যাপণ নগণ্য ছিল বলিয়া নিম্নশ্রেণীর বিত্তহীন সমাজে এই শ্রেণীর বিবাহই অধিক প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সমাজের মধ্যেই এই বিষয় লইয়া এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার সমাধানের কোন উপায় ছিল না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কৌলীন্য প্রথাও অসমবিবাহ সমস্যাটিকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। এই অনুযায়ী বর-কন্যার বয়সের তারতম্য বিচার করিয়া বিবাহ দিবার কোন উপায় ছিল না; কুল সেখানে একমাত্র লক্ষ্য ছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে' উল্লেখিত হইয়াছে যে, জননী যখন ষাট বৎসর বয়স্ক এক কুলীন বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়া সে সংবাদ যুবতী কন্যাকে শুনাইলেন, তখন কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, 'তুইত মা কুলরক্ষা করলি, কিন্তু আমার ধর্ম রক্ষা করবে কে?' এই কথার গূঢ় তাৎপর্য জননী বুঝিতে পারিয়া অসহায় ভাবে নিজের মাথা নত করিলেন, কিন্তু ইহার কোন জবাব দিতে পারিলেন না। অর্থাৎ কৌলীন্য প্রথায় একমাত্র কুলই লক্ষ্য ছিল, কুল রক্ষা পাইলেই ধর্ম রক্ষা পাইল, ইহাই বিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু নারী জীবনের যে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত কামনা তাহার নারী ধর্ম রক্ষার মধ্যেও জড়িত হইয়া থাকে, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। সেইজন্য ইহার যে পরিণাম অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই সমাজকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কৌলীন্য প্রথা প্রভাবিত সমাজে পণ-প্রথাও অসম বিবাহের জন্য দায়ী; তাহার ফলে দরিদ্র পিতাকে বাধ্য হইয়াই অসম বয়স্ক বৃদ্ধ, দোজ, তেজ কিংবা তাহারও বেশি বয়স্ক বরের নিকট নিজের কন্যাকে সমর্পণ করিতে হইত। অর্থনৈতিক কারণে দরিদ্র পিতা বয়স্কা কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে যতই অক্ষম হইতেন, ততই অল্পবয়সে তিনি সহজ লভ্য বৃদ্ধ পাত্রের নিকট কন্যাকে বিবাহ দিতে বাধ্য হইতেন। ইহাতে কামনা বাসনার অচারিতার্থতাহেতু যুবতী কন্যার মনে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া থাকিত, তাহাই পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে মধ্যে মধ্যে অগ্নি উদ্গীরণ করিত।

সেইজন্য আমাদের দেশে স্বামীর বয়সাধিক্যও দেব মর্যাদা দিয়া ভূষিত করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা যায়। এই দেশের কন্যা মাত্রেরই পতির আদর্শ

মৃত্যুঞ্জয় শিব, তাহার বয়সের আদি নাই, অন্ত নাই, কুমারী বয়স হইতেই কন্তারা শিব পূজা করিয়া তাহাদের দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ইহা লক্ষ্য করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করা কোনদিনই সম্ভব হয় নাই। ধর্মভাব-ভারাক্রান্ত মধ্যযুগের সমাজেও নারীদিগের পতিনিন্দার যে বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবলমাত্র গতানুগতিক বিষয়ই ছিল না, ইহার মর্মমূলে বাস্তব নারীজীবনের সুগভীর বেদনার ভাবও প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে বৃদ্ধ বরের সঙ্গে কিশোরী উমার বিবাহের সম্পর্কটিকেও এই ভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে বরের বার্ধক্য এবং দারিদ্র্য উভয়কেই সমান ভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে—

আহা মরি ওমা উমা সোনার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গে বেড়ি বুড়ার দশন॥
উমার বদন চাঁদে পরকাশে রাকা।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ি গোঁপ পাকা॥
কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাথে অঙ্গে বুড়া একি অলক্ষণ॥—ইত্যাদি

মধ্যযুগের সমগ্র মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে নারীদিগের পতি নিন্দার যে বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়, নারীর অসম বিবাহ-জাত অসন্তোষের পরিচয় তাহা হইতে জীবন্ত ভাবে আর কোথাও পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে একটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

এক যুবতী বলে সই মোর করম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে নাঞিগো দুঃখিনী মোর পারা।
কোলের কাছে থাকিতে সদাই হই হারা॥
আর যুবতী বলে পতির বর্জিত দশন।
শাক সুপ ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন॥

দড় ব্যঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি।
মারয়ে পীড়ার বাড়ি দ্বারে বসে কান্দি॥
আর যুবতী বলে, সই, মোর গোদাপতি।
কোঁয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি॥
ভাদ্র মাসের পাঁকুই বড়ই দুরবার।
গোদে তেল দিয়া কত তুলিব জ্বাকার॥
আর যুবতী বলে সই মোর স্বামী কালা।
আনের সংসার সুখ আমার বিষম জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কথা কই দিনে পতির সনে।
রাত্র হৈলে নিদ্রা যাই গরুড় শয়নে॥
আইয়োর মিশালে বুড়ী নানা কাচ কাচে।
পাক তেলে চুল পেকেই বয়স কোথা গেছে॥
পো এর হয়্যাছে পো নাতির হয়্যাছে ঝি।
স্থবির হয়্যাছে তনু বয়স বটে কি॥
রূপে-গুণে সুন্দরী নাতিন ভাল আছে।
এমন বরে বিয়া দিয়া রাখি আপন কাছে॥

বাংলার লোক-সাহিত্যেও এই ভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাহাতে যে 'খুড়ো দিলে বুড়ো বর' এই এক শ্রেণীর ছড়া আছে (দ্রষ্টব্য: আশুতোষ ভটাচার্য, 'বাংলার লোক-সাহিত্য' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৩, পৃ: ৪৩৯-৪৪৬) তাহার মধ্য দিয়াও বাংলার নারী সমাজের এই মর্মবেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে। একটি মাত্র এই বিষয়ক ছড়া এখানে উদ্ধৃত করা যায়।

উলু উলু মাদারের ফুল,
বর আস্‌চে কত দূর ?
বর আস্‌চে বাখ্‌না পাড়া।
বরের মাথায় চাঁপা ফুল॥
কনের মাথায় টাকা।
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে,
গোঁপ দাড়িটা পাকা॥
চোক থাক তার মা বাপ,
চোখ থাক তার খুড়ো,

এমন বরে বিয়ে দিয়েছে,
তামাক-খেকো বুড়ো।
তামাক খেকো বুড়োটা কলা-আড়িকে যায়,
যে কলাটা মর্তমান সেই কলাটা খায়॥—বর্ধমান

বুড়ো বরের জন্য কেহ বা কন্যার কপালকেই দায়ী করিয়া বলে, 'তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি', আবার কেহ বা খুড়াকে দায়ী করিয়া তাহাকে নির্মম অভিশাপে জর্জরিত করে—

খুড়া দিলে বুড়া বর,
যা খুড়া তুই পড়ে মর॥

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ-জীবনের এই অসন্তোষ নাটক ও প্রহসন রচনার মধ্য দিয়াও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই বিষয়ক নাটক কিংবা প্রহসনের মধ্যে সর্বপ্রথম যাহা রচিত হইয়াছিল, তাহাই দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। ইহা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিধবা-বিবাহের মত বিশিষ্ট সাময়িক উত্তেজনামূলক নাটক রচনার ধারা স্তিমিত হইয়া যাইবার পর সমাজের সাধারণ দোষ ত্রুটি লইয়া নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়; তখন হইতেই কন্যাদায়, পণ-প্রথা, কিংবা সামাজিক ব্যভিচার ইত্যাদি বিষয় নাট্যকারদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তেই ইহার প্রথম সূচনা দেখা দিয়াছিল। ইতিপূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁর মধ্যে এই বিষয়টির আভাস মাত্র থাকিলেও পরিপূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কারণ, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মধ্যে বৃদ্ধের ব্যভিচার প্রবৃত্তির কথা থাকিলেও বিবাহের কথা নাই, তবে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র মধ্যেই সর্বপ্রথম বৃদ্ধের বিবাহ-সাধের কথা প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাতে বৃদ্ধের বিবাহিত জীবনের বিড়ম্বনার কথা নাই। বৃদ্ধের বিবাহ-সাধের বিষয় লইয়া কৌতুক করা একদিন গ্রাম্য জীবনের নিতান্ত সাধারণ বিষয় ছিল, দীনবন্ধুর নাটকখানি তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও নিজস্ব প্রতিভা গুণে দীনবন্ধু ইহার মধ্যে শাশ্বত জীবন ধর্ম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দীনবন্ধুর প্রতিভার এমনই গুণ ছিল যে, বাস্তব জীবনের যে কোন বিষয় তিনি অবলম্বন করিতেন, তাহাই তাহার স্পর্শ লাভ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তেও তাহাই হইয়াছে। একটি আপাত কৌতুককর বিষয়ও যে

অনুভূতির গুণে সুগভীর করুণ রসাশ্রিত হইয়া উঠিতে পারে, এই প্রহসনখানি তাহার প্রমাণ। কারণ, বৃদ্ধের বিবাহ-সাধের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে যে কৌতুককর বিষয়ই থাকুক না কেন, ইহার গভীরতম তলদেশে একটি সুগভীর বেদনার সুর প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা বৃদ্ধের অতৃপ্ত জীবন-লালসা। দীনবন্ধু তাহার নাটকের মধ্য দিয়া কেবলমাত্র বিবাহবাতিক-গ্রস্ত কোন বৃদ্ধের কপট বিবাহের আয়োজন করিয়া তাহাকে হাস্যকর করিয়াই তুলেন নাই, তিনি বৃদ্ধের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াই তাহার জীবনের অতৃপ্ত বাসনাকে রূপ দিয়াছেন। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভা আর কাহারও ছিল না বলিয়া পরবর্তী নাট্যকারদিগের মধ্যে সকলই কেবলমাত্র বহির্মুখী কৌতুকের দিকটিই অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে তাহার অধিকাংশই নাটক না হইয়া প্রহসন হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে দীনবন্ধু বৃদ্ধের বিবাহ-সাধের কথাই বলিয়াছেন, তাহার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, তাহা তাঁহার কাহিনীর অন্তর্ভূক্তও নহে। কি ভাবে যে গ্রাম-বালকদিগের চক্রান্তে এক বৃদ্ধের বিবাহের আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল এবং বিবাহ অভিলাষী বৃদ্ধকে তাহার জন্য নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল, ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ক সর্বপ্রথম নাটক হিসাবে ইহার কয়েকটি দৃশ্য এখানে উদ্ধৃত করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। তথাপি ইহার সহিত মধুসূদন রচিত 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র কতকটা সাদৃশ্যও অনুভব করা যাইবে। দীনবন্ধু রচিত ইহাই প্রথম প্রহসন, সুতরাং ইহাতে পূর্ববর্তী প্রহসনকারের আদর্শ অনুসরণ করিবার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির ভিতর দিয়া ইহার কাহিনী অনুসরণ করা যাইবে।

বৃদ্ধ বয়সে রাজীবলোচন বিপত্নীক, তিনি বিত্তশালী ব্রাহ্মণ; কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ, তাই গ্রামের লোক সর্বদা তাহাকে অপদস্থ করিবার উপায় সন্ধান করিয়া থাকে। একদিন নসিরাম ও রতা নাপতের মধ্যে এই প্রকার আলোচনার ভিতর দিয়া কাহিনীর সূত্রপাত হইল—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নসিরাম এবং রতা নাপ্‌তের প্রবেশ

নসি । বুড়ো ব্যাটা বিশ্বনিন্দুক।

রতা । কেশব বাবুকে সকলেই ভাল বলে, কেবল বুড়ো ব্যাটা গালাগালি দেয়। বলে কলেজে পড়ে যখন জলপানি পেয়েচে তখন ওর আর জাত কি ?

নসি । মাতার উপর শকুনি উড়চে, তবু দলাদলি কত্তে ছাড়ে না। আর বৎসর বাগান বেচে দলাদলি করেছিল ; স্কুলে একটি পয়সা দিতে হলে বলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোথা হতে টাকা দেব ?

রতা । চক্রবর্ত্তীরে ওর জামাইয়ের বাড়ীতে বগ্‌নো দেই নি বলে তাদের বাড়ী খেতে গেল না, ওদের পাড়ার কাকেও যেতে দিলে না, দু-শ লোকের ভাত পচালে।

নসি । ওর জামাইয়ের বাড়ী হলো ভিন্ গাঁয়, তাকে বগ্‌নো দেবে কেন ? তাকে দিতে গেলে আর এক-শ লোককে দিতে হয়।

রতা । কেশব বাবুর বাপ যদি ঘোষদের রক্ষা না কত্তেন তবে ব্যাটা তাদের জাত মেরেচিলো।

নসি । যথার্থ কথা বল্‌তে কি, রাজীব মুখুয্যে না মলে দেশের নিস্তার নাই। ভুবনের মামাদের এক বৎসর একঘরে করে রেখেচে। তাদের অপরাধ তো ভারি—কালী ঘোষের ছেলে ক্রিস্‌চান হতে গিয়ে ফিরে এসেছিল, তা কালী ঘোষের জাত না মেরে তারে সমাজভুক্ত করে রেখেচে।

রতা । কাল ব্যাটার ভারি নাকাল করিচি—দশ গণ্ডা কাগের ডিমের শাঁস ওর মাতায় ঢেলে দিইচি।

নসি । কখন ?

রতা । কাল প্রাতঃস্নান করে নামাবলিখানি গায় দিয়ে যেমন বাড়ী ঢুক্‌বে, আমি ওদের পাঁচিলের উপর থেকে এক হাঁড়ি শাঁস ঢেলে দিয়ে পালিয়েছিলেম ; ব্যাটা আবার নেয়ে মরে। কত গালাগালি দিলে কিন্তু আমায় দেখ্‌তে পাই নি।

নসি । ভুবন বড় মজা করেচে—বুড়ো ধুতি নামাবলি রেখে স্নান কচ্ছেছিল, এই সময়ে পাঁটার নাড়িভুঁড়ি নামাবলিতে বেঁধে রেখে পালিয়েছিল। বুড়ো নামাবলি গায় দিতে গিয়ে কেঁদে মরে, বল্যে এ রতা নাপ্‌তে করে গিয়েচে।

রতা । ব্যাটার আমার উপর ভারি রাগ। যে কিছু করুক আমারে দোষে, বলে নাপ্‌তের ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে বিপরীত ফল ঘটে।

ভুবনমোহনের প্রবেশ

ভুব । ওহে ইনিস্পেক্‌টার বাবু এসেচেন, কাল আমাদের পরীক্ষা হবে।

নসি । আমাদের পুরাণো পড়া সব দেখা আছে।

ভুব । আমি বিশেষ মনোনিবেশ ক'রে পড়াগুলিন দেখ্‌বো।

রতা । দেখ ভাই, পণ্ডিত মহাশয় আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করেন, আমরা যদি ভাল পরীক্ষা না দিতে পারি তবে তিনি বড় দুঃখিত হবেন।

ভুব । রাজীব মুখুয্যে ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে দেখে বড় রাগ করেচে, বল্যে এই ক্রিস্‌চান ব্যাটা এয়েচে।

নসি । ব্যাটা ইনিস্পেক্‌টার বাবুর উপর এত চট্‌লো কেন?

রতা । ইনিস্পেক্‌টার বাবুর সহিত এক দিন বিধবাবিবাহ উপলক্ষে তর্ক হয়েছিল, তাতে অনেক বিচারের পর ইনিস্পেক্‌টার বাবু বলেছিলেন, "আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্বার দারপরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েছেন, অতএব আপনার পোনের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন।" ব্যাটার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, গলাবাজিতে যা কত্তে পারে; আর মুখখানি মেচোহাটা, ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে যা না বলবের তাই বল্যে।

নসি । আমি সেখানে থাক্‌লে বুড়োর গলায় জয়ঢ্যাম্‌টেমি বেঁধে দিতেম।

রতা । যদি পরমেশ্বরের কৃপায় কাল পরীক্ষা ভাল দিতে পারি, তবে বুড়োরি এক দিন আর আমারি এক দিন।

ভুব । ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে সন্তুষ্ট কত্তে না পারলে কোন তামাসা ভাল লাগ্‌বে না।

নসি । কলিকাতায় ছাত্রেরা পরীক্ষার পর বিল্‌বর্টের বাজি দেয়, আমরা পরীক্ষার পর রাজীব মুখুয্যের বাজি দেব।

ভুব । সে সাপটা আছে তো?

রতা । সব আছে, পরীক্ষাটি শেষ হোক্ না।

নসি । কি সাপ?

রতা । সোনার সাপ।

নসি । তাতে হবে কি।

রতা । দুটি বাবলার কাঁটা আর একটি সোনার সাপে বুড়োর সর্বনাশ কর্‌বো—যে রতার কথা সইতে পারে না, সেই রতার চড় খাবে আরো বল্‌বে লাগে না। লোকে জানে, বাবা যে সর্পের মন্ত্র জান্‌তেন তা মরবের সময় আমায় দিয়ে গিয়েচেন বুড়োরে সাপে কাম্‌ড়ালে কাজেই আমায় ডাক্‌বে,—আমি চপেটাঘাতে নির্বিষ করবো।

গোপালের প্রবেশ

গোপা । বড় মজা হয়েচে, রাজীব মুখুয্যের খ্যাপান উঠেচে—

রতা । কি খ্যাপান?

গোপ । "পেঁচোর মা" বল্যেই ব্যাটা তাড়িয়ে কামড়াতে আসে।

নসি । কেন?

গোপা । পেঁচোর মা বুড়োর মেয়ের সঙ্গে কথা কইতেছিল, বুড়ো ঘরে ভাত খাচ্ছিল, কথায় কথায় পেঁচোর মা রামমণিকে বল্যে, তোমার বাপের চেয়ে আমার বয়স কম, বুড়ো ওমনি তেলে বেগুনে জলে উঠলো, ভাতগুলিন পেঁচোর মার গায় ফেলে দিলে, আর এঁটো হাতে মাগীর পিটে চাপড় মাত্তে লাগলো, মায়েশের রথের লোক জমে গেল। বুড়ো বল্‌তে নাগ্‌লো "দেখ দেখি আমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে বেটী এখন কি না বলে আমি ওর অপেক্ষা বড়, আমি যখন পাঠশালে লিখি তখন বেটীকে ঐরূপ দেখিচি।"

নসি । কোন্ পেঁচোর মা?

গোপা । রাম্‌জি ডোমের মাগ—রাম্‌জি মরে গিয়েচে, মাগী একা আছে, কেউ নাই, কেবল একটি ধাড়ী শূকর নিয়ে থাকে।

রতা । দুজনেরি বয়স এক হবে।

গোপা । যদি কেহ বলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পেঁচোর মার বয়স কম, বুড়ো ওমনি গালে মুখে চড়ায় আর তাড়িয়ে কামড়াতে আসে ; এখন অধিক বল্‌তে হয় না ; শুধু পেঁচোর মা বল্যেই হয়।

নেপথ্যে । বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর ॥

রাজীব মুখোপাধ্যায় এবং দশ জন বালকের প্রবেশ

রাজী । যম নিদ্রাগত আছেন, এত বালক মর্‌চে তোমাদের মরণ হয় না —কি বল্‌বো দৌড়াতে পারি নে, তা নইলে একটি একটি ধরি আর খাই।

বালকগণ। বুড়ো বামনা বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর ॥
বুড়ো বামনা বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর ॥

নসি । যা সব স্কুলে যা, বেলা হয়েচে, ইনিস্পেক্‌টার বাবু এয়েচেন সকালে সকালে স্কুলে যা।

(বালকদের প্রস্থান)

মহাশয়ের অদ্য স্নানে অধিক বেলা হয়েচে, নানান্ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন।

রাজী । আমাকে পাগল করেচে।

নসি । অতি অন্যায়, আপনি বিজ্ঞ, গ্রামের মস্তক, আপনার সহিত তামাসা করা অতি অনুচিত। মহাশয়ের গৃহ শূন্য হওয়াতে সকলেই দুঃখিত।

রাজী । তুমি বাবু আমার বাগানে যেও, তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়্‌তে দেব।

রতা । যে মেয়েটি স্থির হয়েচে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁদ পর্য্যন্ত হবে।

রাজী । কোন মেয়েটি ?

রতা । আজ্ঞা—ঐ পেঁচোর মা।

রাজী । দূর ব্যাটা পাজী গর্ভস্রাব, যমের ভ্রম—ভাঁড় হাতে করগে, তোর লেখা পড়া কাজ কি। দেখি তোর কাকা জমিগুলো কেমন করে

খায়, রাজীব এমন ঠক্ নয় এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটের ঘুঘু চরাবে। পাজি—আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়।

(সরোষে রাজীবের প্রস্থান)

নসি । বেশ ভৈয়ের হয়েচে।

গোপা । বিয়ের নামে নেচে ওঠে—কনক বাবুর বাগানের কাছে ওর চার বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি ছিল ; রায় মহাশয় সেই জমি কয়েকখানার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন তবু দিলে না, রামমণি কত উপরোধ করলে কিছুতেই শুনলে না ; তার পর রতা শিখায়ে দিলে, বিয়ের সম্বন্ধ করে দেব স্বীকার করুন জমি অমনি দেবে। রায় মহাশয় তাই করে জমি হস্তগত করেচেন কিন্তু তার উচিত মূল্যের অধিক দিয়াছেন।

রতা । এখন বড় মজা যাচ্ছে—বেটা দু বেলা লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চে বিয়ের কি হলো। কনক বাবু আমায় বলেচেন একটা গোলমাল করে ব্রাহ্মণের ভ্রম ভঙ্গ করে দাওগে। আমি কি কর্‌বো কোন উদ্দেশ পাচ্চি নে।

ভুব । বাবা যে দুঃখিত হন, তা নইলে ওর পানের ডিবের ভিতর আমি কেঁচো পূরে রাখতে পারি।

রতা । তোমাদের কারো কিছু ক’ত্তে হবে না, একা রতা ওর মাতা খাবে।

(সকলের প্রস্থান)

রামমণি রাজীবলোচনের কন্যা, তাহার অনেক বয়স, অথচ বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, বরং তাহার বিবাহের কথা চিন্তা না করিয়া নিজের বিবাহের কল্পনায় মাতিয়া আছেন, রামমণিকে দেখিলে তিনি জ্বলিয়া উঠেন—কিন্তু সংসারের সকল ভার তাহার ওপর, বৃদ্ধ পিতার সেবা যত্নেও তাহার কিছুমাত্র আলস্য নাই। একদিন তাহাকে ডাকিয়া রাজীব নিজের বিবাহের কথা পাড়িলেন।

রামমণির প্রবেশ

রাম । আমায় আবার ডাক্‌চো কেন ? যে গাল দিয়েছ, তাতে কি মন ওটে নি ?

রাজী । না মা তোমাকে কি আমি গাল দিতে পারি ! তোমার জন্যে সংসারে মাথা দিয়ে রইচি—তবে একটা কথা বল্‌ছিলাম কি—

আমি যদি আবার বিয়ে করি তোমার যে নূতন মা হবে, তাকে তুমি মা বলে ডাক্‌বে কি না?

রাম । তোমার বিয়েও যেমন হবে, আমিও তেমনি মা বলে ডাক্‌বো। বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে হয়েছেন—রাতদিন বিয়ে বিয়ে করে মর্চ্চেন।

রাজী । কি কথায় কি জবাব। ভাল মুখে একটা কথা বল্লেম, উনি আমার গায় এক হাতা আগুন ফেলে দিলেন। এখন স্পষ্ট করে বল, আমি যারে বিয়ে করবো তুমি তাকে মা বল্‌বে কি না?

রাম । আমি আঁশবঁটি দিয়ে তার নাক কেটে দিব, আর তারে পেত্নী বলে ডাক্‌বো।

রাজী । তোর ভাল চিহ্ন নয়, আমাকে রাগাচ্ছিস, আপনার মরবার পথ কচ্ছিস্। আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বি কি না বল্?

রাম । বলবো না। কখনো বলবো না! তোমার যা খুসি তাই করো।

রাজী । বল্‌বি নে—

রাম । না।

রাজী । বল্‌বি নে—

রাম । না।

রাজী । তোর বাপ যে সে বল্‌বে! বেরো বেটী এখান থেকে—মাকে মা বলবেন না। হাজার বার বল্‌বি। তুই তো তুই, তোর বাপ্ যে সে বল্‌বে।

(রামমণির বেগে প্রস্থান)

ঘট । এ তো ভারি সর্ব্বনাশ দেখচি।

রাজী । না বাবা—এতে ভয় পেয়ো না। ব্রাহ্মণী বাড়ী আসুক আমি যেমন করে পারি মা বলিয়ে দেব।

ঘট । তোমার মেয়েকে আমার আর এক ভয় আছে।

রাজী । আর কি ভয়?

ঘট । উনি যে ব্যাপিকা উনি অনেক ভাংচি দেবেন; উনি বলবেন মিছে সম্বন্ধ, মিছে বিয়ে, বাজারের বেশ্যা ধরে কন্যে সাজিয়ে দেবে।

রাজী । আমি কোনো কথা শুন্‌বো না।

ঘট । বৃদ্ধ লোককে লয়ে লোকে এমন কৌতুকবিয়ে দিয়ে থাকে এবং

পাঁচটা দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে—আমার ভাবনা হচ্চে পাছে আপান আপনার তনয়ার বাক্‌পটুতায় আমাকে সেইরূপ বিবাহের ঘটক বিবেচনা করেন—কেবল কনক বাবুর অনুরোধে আমার এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া।

রাজী। ঘটক মহাশয়, আমি কচি খোকা নই যে কারো পরামর্শে ভুল্‌বো, বিশেষ স্ত্রীলোকের কথায় আমি কখন কান দিই না, আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যদি রতা বেটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন আমি তাও গ্রহণ করবো—পাজী ব্যাটা, নচ্ছার বেটা, ছোট লোকের ছেলের কখন লেখা পড়া হয়?

ঘট। বিয়ে না করেন নাই করবেন, গালাগালি দেন কেন!

(গাত্রোত্থান)

রাজী। ঘটক মহাশয় তোমারে না, তোমারে না, আমার মাথা খাও ঘটক বাবা (পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক) তুমি রাগ কর না, আমি রতা নাপ্‌তেকে বলিচি।

ঘট। তবু ভাল (উপবেশন) নাম ধরে গাল দিলে এ ভ্রম হতে পাত্তো না।

রাজী। রতা নাপ্‌তে পাজী, রতা নাপ্‌তে ছোট লোক; ঘটকরাজ অতি ভদ্র, ঘটক মহাশয় অতি সজ্জন, ঘটক বাবা বড় লোক।

ঘট। রতা বড় নষ্ট বটে?

রাজী। ব্যাটার নাম কাল্যে আমার গা জলে, আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম তবে এত দিন কীচক বধ কত্তেম, ব্যাটা আমার পরম শত্রু।

ঘট। গ্রামের ভিতর আর কেউ আপনার মন্দ কচ্চে?

রাজী। আর এক মাগী—ঘটকরাজ আমারে মাপ কত্তে হবে, আমি তার নাম কত্তে পারবো না।

ঘট। আমাকে আপনার অবিশ্বাস কি?

রাজী। বাবা আমাকে এইটি মাপ কত্তে হবে।

ঘট। ভদ্রলোকের মেয়ে?

রাজী। মহাভারত, মহাভারত—ডোম, বুড়ো, কালো পেত্নী।

ঘট। আপনি সম্বন্ধের কথা কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না, বউ ঘরে

এনে তবে সম্বন্ধের কথা প্রকাশ ; আপনি এক শত টাকা স্থির করে রাখ্‌বেন।

রাজী। আমার দুই শত টাকা মজুত আছে।

ঘট। আপনার বাড়ীতে কোন উদ্যোগ কত্তে হবে না, আপনি শনিবারে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাবেন, রবিবারের প্রাতে গৃহিণী লয়ে গৃহে প্রবেশ করবেন। কন্যাকর্ত্তারা মেয়ে নিয়ে দক্ষিণপাড়ায় রতন মজুমদারের বাগানে থাক্‌বেন, কনক বাবু ঐ বাগান তাঁদের জন্য ভাড়া করেচেন।

রাজী। গোলমালের প্রয়োজন কি, সকল কাজ চুপি চুপি ভাল, আমার পায় পায় শত্রু।

ঘট। আমি আজ যাই।

রাজী। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ঘট। বলুন না ?—সকল বিষয়ের মীমাংসা করে যাওয়া উচিত।

রাজী। এমন কিছু নয়—মেয়েটির বর্ণটি কেমন ?

ঘট। তরুণ তপন আভা বরণের ভাতি,
কাঁচাসোনা চাঁপা ফুল খেয়েচেন নাতি !
হেরে আভা, মনোলোভা, যোগীর মন টলে,
খেসারির ডাল যেন বাঁধা মলমলে।
নাসিকার শোভা হেরে চঞ্চল নয়ন,
ঈষৎ অরুণ লাজে হয়েছে বরণ,
সরমে হেলিয়ে দোঁহে করিতে বিহিত
কানাকানি কানে কানে কানের সহিত।
অধরে ধরে না সুধা সতত সরস,
ভিজেছে শিশিরে যেন নব তামরস।
গোলাপি বরণ পীন পয়োধরদ্বয়—
বিকচ কদম্ব শোভা যাতে পরাজয়—
বিরাজে বক্ষের মাঝে নিজ গরিমায়,
স্থানাভাবে ঠেকাঠেকি সদা গায় গায় ;
তাতে কিন্তু উরজের অঙ্গ না বিদরে,
কমলে কমলে লেগে কবে দাগ ধরে ?

গঠিত বিমল কুচ কোমলতা সারে,
নরম নিরেট তাই দেখ একেবারে।
চিকণ বসনে কুচ রেখেচে ঢাকিয়ে,
কাম যেন তাঁবু গেড়ে আছে বার দিয়ে।

রাজী। "কুচ হতে উচ্চ কেশরী মধ্যখান"—না হয় নি—
"কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে,
কাঁদে রে কলঙ্কিচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"—
না মহাশয়, ভুলে গিয়েচি—তা এরূপ হয়ে থাকে, কালেজের জলপানিওয়ালারাও ঘটকের কাছে চম্‌কে যায়।

ঘট। "কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ডরে দাড়িম্ব বিদরে॥"

রাজী। আপনি শাশুড়ীর কাছে সেরেস্থুরে নেবেন, বল্‌বেন এ কবিতাটি আমি বলিচি।

ঘট। শিকারী বিডালের গোঁপ দেখ্‌লে চেনা যায়—আপনি যে রসিক তা আমি এক "মৌমাচি খোঁচাতেই" জান্‌তে পেরেচি।

রাজী। "চাকের মধু মিষ্টি কি হইত,
মৌমাছি খোঁচা না যদি রইত।"
ঘটক মহাশয় ইটি আমার আপনার রচন।

ঘট। বলেন কি?

রাজী। আজ্ঞা হাঁ।

ঘট। আপনি চম্পকলতার যোগ্য তরু, রাজযোটক হয়েচে।

রাজী। আপনি রাত্রে অন্ন আহার করে থাকেন?

ঘট। আজ্ঞা, আমার দক্ষিণপাড়ায় যাওনের প্রয়োজন আছে, আমি কনক বাবুর ওখানে আহার করবো—কোন কথা প্রকাশ না হয়, কনক বাবু এর ভিতরে আছেন কেউ না জান্‌তে পারে।

(প্রস্থান)

রাজা। আমার পরম সৌভাগ্য,—আমার রাবণের পুরী ধু ধু কচ্চে, কামিনীর আগমনে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, (তাকিয়ার উপর চিত হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া) আহা! কি অপরূপ রূপ,—সোনার বর্ণ,—মোটাসোটা—দ্বিতীয়ে বিয়ে হয়েচে—(নিদ্রা)

নেপথ্যে। এই বেলা ফুটিয়ে দে, আমি সাপ ফেলবো এখন। (রাজীবের অঙ্গুলির গলিতে-জানালা হইতে কাঁটা কুটাইয়া দেওন।)

রাজী। বাবা রে গিচি—(অঙ্গে সোলার সাপ পতন) খেয়ে ফেলেচে—(নেপথ্যে সাপ টানিয়া লওন) এত বড় সাপ কখন দেখি নি (চিত হইয়া ভুমিতে পতন) একেবারে খেয়ে ফেলেচে, করিয়েচে বিয়ে, ও রামমণি, ও রামমণি, ও রামমণি, ওরে আবাগের বেটী ঝট্ করে আয়, জ্বলে মলাম মা রে—কেউটে সাপে কামড়েচে, একেবারে মরিচি, শিগ্‌গির আয়, আমার গা অবশ হয়েচে, আমার কপালে সুখ নাই, আমি একদিন তার মুখ দেখে মরতেম সেও যে ছিল ভাল—

রামমণির প্রবেশ

আঙ্গুলের গলিতে কেউটে সাপে কাম্‌ড়েচে।

রাম। ও মা তাই তো, রক্ত পড়্‌চে যে, ও মা আমি কোথায় যাবো, ও মা বাবা বই আর যে আমার কেউ নাই—

রাজী। লোক ডাক্ জ্বলে মলেম, আহা! সর্পাঘাতে মরণ হলো। (দরজায় আঘাত)

রাম। ওগো তোমরা এস গো—(দ্বার উন্মোচন) আমার বাবার কাটি ঘা হয়েচে।

দুই জন প্রতিবাসীর প্রবেশ

প্রথম। তাই তো, খুব দাঁত বসেচে—

দ্বিতীয়। সাপ দেখেছিলেন ?

রাজী। অজগর কেউটে—আমার হাতে কাম্‌ড়ালে আমি দেখ্‌তে পেলেম, তার পর হা করে গলা কাম্‌ড়াতে এল, লাফিয়ে এসে নিচেয় পড়লেম।

প্রথম। রামমণি, দৌড়ে তোদের কুয়ার দড়াগাছটা আন্। (রামমণির প্রস্থান)

(দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি দৌড়ে রতা নাপ্‌তেকে ডেকে আন, তার বাপ মরণকালে তার সাপের মন্ত্র রতাকে দিয়ে গিয়েচে, সে মন্ত্র অব্যর্থসন্ধান। (দ্বিতীয়ের প্রস্থান)

রামমণির দড়া লয়ে পুনঃপ্রবেশ

রাম । ওগো নাপ্‌তেদের ছেলেকে ডাক গো, সে বড় মন্ত্র জানে গো—

প্রথম । দড়াগাছটা দাও (দড়া দিয়া হস্ত বন্ধন)।

রাম । (রাজীবের হস্তে চিমটি কেটে) লাগে ?

রাজী । আবার কাটো দেখি, (পুনর্বার চিমটি কাটন) কোই কিছুই লাগে না ॥

রাম । তবেই সর্বনাশ হয়েছে, আমার পোড়া কপাল পুড়েচে।

রাজী । আর কেউ মন্ত্র জানে না ?

প্রথম । রতার বাপের মন্ত্র সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, সে মন্ত্র মরবের সময় আর কারো দ্যায় নি, কেবল রতাকে দিয়ে গিয়েচে।

রাজী । এমন সাপ আমি কখন দেখি নি—আমার দৌহিত্রকে আস্তে পাঠাও, আমার গা ঢুলচে, আমার বোধ হচ্চে বিষ মাতায় উঠেছে—আহা ! কেবল প্রেমের অঙ্কুর হয়েছিল ; রামমণি তোরে বলবো না ভেবেছিলাম, আমার সম্বন্ধের স্থিরতা হয়েছিল, রবিবারে বউ ঘরে আসে ; আহা ! মরি কি আক্ষেপ, লক্ষ্মী এমন ঘরে আসবেন কেন ?

রাম । আবার কে বুঝি টাকাগুলো ফাঁকি দিয়ে নেবে—

রাজী । না ! যে নিতো তা আমি জানি—অন্তিম কালে তোমার সঙ্গে কলহ করবো না, তুমি একটু গঙ্গাজল এনে আমার মুখে দাও, আমার চক বুঁজে আস্‌চে—

রাম । বাবা ! তোমারে যে কত মন্দ বলিচি, বাবা ! তোমারে ছেড়ে থাকবো কেমন করে—

রতা নাপ্‌তে, নসিরাম, ভুবনমোহন এবং প্রতিবাসীর প্রবেশ

রাজী । বাবা রতন, তুমি শাপভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

রতা । (*দংশন অবলোকন করিয়া*) *জাত সাপের দাঁত—*

রাতে কাটে জাত সাপ
রাখ্‌তে নারে ওঝার বাপ ॥

তবে বন্ধনটা সময়-মত হয়েচে ইতে কিছু ভরসা হচ্চে—একগাছ মুড়ো খ্যাংরা আনুন। (রামমণির প্রস্থান)

আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসচে?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে, আমি যেন মদ খেইচি।

রতা। যম বুঝি ছাড়েন না।

মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রামমণির পুনঃপ্রবেশ

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে পারি। (আপনার হস্তে ফুঁ দিয়া রাজীবের পৃষ্ঠে তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। রতন লাগে বুঝি—বড লাগে না।

রতা। তবে সংখ্যা বৃদ্ধি কত্তে হলো (সাত চপেটাঘাত)।

রাজী। লাগে যেন।

রতা। ঠিক্ করে বলো—যেন বিষ থাক্‌তে লাগে বলে সর্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক্ মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জ্বলে গেল—(প্রতিবাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন, আমি আপনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্চি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুবনকে বলো।

রতা। ভুবন তোমার হাত দাও তো। (ভুবনের হস্তে ফুঁ দেওন) মার।

ভুবন। (স্বগত) আমাদের ভাত পচিয়েচ, আমাদের একঘরে করেচ—(প্রকাশে) ক চড় মাত্তে হবে?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—তিন—চার—পাঁ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক্, তবে সাতটা হোক্।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগ্‌চে?

রাজী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও তার উপরে মাচ্চে, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চি নে।

তারপর রতা নাপ্‌তেকে কনে সাজাইয়া এক কপট বিবাহের আয়োজন করা হইয়াছে, কপট বিবাহের অন্যান্য অনুষ্ঠান শেষ হইলে বাসর ঘরে বর বধূকে আনিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার বর্ণনাটি একদিক দিয়া যেমন করুণ, তেমনই অন্য দিক দিয়া সরস।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বাগানের আটচালার অপর এক কাম্‌রা

বাসরঘর

রতা নাপ্‌তে কনের বেশে আসীন, কেশব এবং
ভুবনের নারীবেশে প্রবেশ

ভুব। রতন এই বেলা ভাল করে বস্‌, ব্যাটা আসচে।

কেশ। যে ছোঁড়া জুটিয়েচিস্‌ গোল করে ফ্যালবে এখন।

রত। না হে ওরা সব খুব চতুর, এতক্ষণ দেখ্‌লে ত কেমন উলু দিলে শাঁক বাজালে।

কেশ। ও ছোঁড়া কে, যে বুড়োর মাথায় এক কল্‌সী গোবর-গোলা ঢেলে দিলে ?

রতা। ও ছোঁড়া আমাদের স্কুলে পড়ে, ওকে একদিন বুড়ো ব্যাটা মার খাইয়েছিল তাইতে ওর রাগ ছিল, গোবর-গোলা মাথায় ঢেলে দিয়েচে।

ভুব। আমি ব্যাটার গা ধুয়ে দিইচি—ব্যাটা রাগ করি নি, বলে বিয়ের দিন এমন আমোদ করে থাকে।

নেপথ্যে। এইঘরে বাসর হয়েচে।

কেশ। রতন! ঘোমটা দাও হে।

রাজীবের বরবেশে এবং নসিরাম আর পাঁচ জন বালকের
নারীবেশে প্রবেশ

নসি। বসো ভাই কনের কাছে বসো।

রাজী। (উপবেশনানন্তর) আমার মনে বড় ক্লেশ হয়েছে—শাশুড়ী ঠাকুরুণ, উনি স্ত্রীর মা, আমারো মা, আমাকে দেখে মরা কান্না কাঁদ্‌লেন।

কেশ। যার ভাই এইটি কোলের মেয়ে, তাইতে একটু কাঁদ্লেন। তা ভাই তুমিও ত বুঝ্তে পার, সকলেরি ইচ্ছে মেয়ে অল্পবয়সী বরে পড়ে। সে কথায় আর আজ কি, তুমি এখন যার পেটের সন্তানের চাইতেও আপন। তিনি বল্‌চেন উনি বেঁচে থাকুন। আমার চম্পক পাঁচ দিন মাচ ভাত থাক্।

নসি। একবার দাঁড়াও ত ভাই জোঁকা দিই তোমার কত দূর পর্যন্ত হয়। (রতা-এবং রাজীবের একত্রে দণ্ডায়ন)

কেশ। দিব্বি ানি বসো। (উভয়ের উপবেশন)

রাজী। আমার শরীর পবিত্র হলো, চিত্ত প্রফুল্ল হলো, আমার সার্থক জন্ম, এমন নারীরত্ন লাভ কল্যেম। আমি পাঁজি দেখেছিলেম, এই মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, তা ফল্লো।

ভুব। ও মা সে কি গো, তুমি কি ভ্যাড়া, বিয়ান ভ্যাড়া বিয়ে কল্যে না কি?

রাজী। আমি ভ্যাড়া ছিলেম না তোমরা বানালে।

কেশ। ঘটক যা বলেছিল সত্যি রে, খুব রসিক।

ভুব। বাসরঘর রসের বৃন্দাবন, যার মনে যা লাগে তিনি তা কর।

নসি। যোলো শ গোপিনী একা মাধব।

রাজী। "কাল বলে কাল মাধব গ্যাছে,
সে কালের আর কদিন আছে।"

প্রথম বালক। বা রসিক, কানমলা খাও দেখি। (সজোরে কান মলন)

রাজী। উঃ বাবা। (সজোরে কান মলন) লাগে মা—(সজোরে কান মলন) মেরে ফেল্‌লে—(নাক মলন) দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি।

সকলে। ও মা এ কি।

ভুব। রামমণি কে গো? কানমলা খেয়ে এত চেঁচানি, ছি, ছি, ছি, এমন বর, এই তোমার রসিকতা।

রাজী। কান দিয়ে যে রস গড়িয়ে পড়ে, না চেঁচিয়ে করি কি।

ভুব। কামিনী-কোমল কর কিবা কানমলা,
নলিনীর মূল কিবা নবনীর দলা।

রাজী। আমি কৌতুক করে চেঁচিয়েচি।

ভুব । বটে, তবে তোমাকে নবনী খাওয়াই । (কান মলন)

রাজী । উঃ উঃ বেশ রূপসি । (কান মলন) মলুন, বেশ, সুন্দরীর হাত কি কোমল !

ভুব । না, রসিক বটে ।

কেশ । একটি গান কর দেখি ।

রাজী । তোমরা মেয়েমানুষ, বাইনাচ কর আমি শুনি ।

দ্বিতীয় বালক । নাচ শোনে না দেখে ?

রাজী । নাচ শোনাও যায়, দেখাও যায় । তুমি নাচো আমি চক্ বুজে তোমার মলের ঠুন ঠুন শব্দ শুনি ।

ভুব । আগে তুমি একটি গাও তার পর আমি নাচ্‌বো ।

কেশ । সে কি ভাই, আমোদ-আহ্লাদ না কল্যে মা কি ভাববেন ; তুমিই যেন দোজবরে, তাঁর চাঁপা ত দোজবরে নয় ; গান কর, নাচো, তামাসা ঠাট্টা কর, রসের কথা কও ।

রাজী । শাশুড়ী ঠাকুরুণ গান বুঝি বড় ভাল বাসেন ? আচ্ছা বেশ গাচ্চি । (চিন্তা করিয়া) আমি ভাই গান ভাল জানি না, কবিতা বলি ।

ভুব । কবিতা বিয়ানের সঙ্গে ব'লো, আমরা তোমায় একদিন পেইচি, একটি গান শুনে মজে থাকি ।

রাজী । আমার ব্রাহ্মণী কি তোমার বিয়ান ?

ভুব । ওগো হ্যাঁ গো, বিয়ানের বিয়ে না হতে জামাই হয়েছে । তোমার ক্লেশ পেতে হবে না, তৈরি ঘর ।

রাজী । বিয়ানের কথাগুলিন বড় মিষ্টি, যেন নলেন গুড় । বিয়ানের নামটি কি ?

কেশ । তোমার বিয়ানের নাম চন্দ্রমুখী ।

রাজী । হ্যাঁ বিয়ান, তোমার নাম চন্দ্রমুখী ?

ভুব । আমার কি চন্দ্রমুখ আছে, তা আমার নাম চন্দ্রমুখী হবে ?

রাজী । বিয়ান, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার বাড়ী চলো, তিন জনে বউ বউ খেলা কর্‌বো ।

ভুব । খোঁড়া ভাতার বুড়ো ব্যাই,
কোন দিকে সুখ নাই ।

নাসি। দুঃখের কথা বল্‌বো কি, ওর ভাতার ওকে খুব ভাল বাসে, বয়স অল্প, কিন্তু খোঁড়া।

রাজী। তবে হয়েদয়ে বিয়ানের একটি পুরো ভাতার হবে। আমার পা নেবেন, ব্যায়ের বয়স নেবেন, তা হলেই পাতয়ে পাঁচ কিল।

কেশ। তোরা বাজে কতায় রাত কাটালি—গাও না ভাই, গীতের কথা ভুলে গেলে।

রাজী। আমি একটা ন্যাডা নেড়ীর গান গাই—

মন মজ রে হরিপদে,

মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুল না মন আমোদ মদে।

দারা সুত পরিজনে, ও মন, ভেবে দেখ মনে মনে,

কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরিচরণ তরি বিপদে।

নসি। আহা! কি মধুর গান, আমার ইচ্ছে করে এখনি কুঞ্জবনে গিয়ে রাধিকা রাজা হই।

রাজী। অনেক রাত্রি হয়েচে, আমার ঘুম আস্‌চে।

তৃতীয় বালক। বাসরঘরে ঘুমুলে মাগভাতারে বনে না।

নসি। না ভাই, তোমায় আমরা ঘুমুতে দেব না। আমরা কি তোমার যুগ্যি নই? আমি কত ব'লে করে মিন্‌সেরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলেম, আমি আজ সমস্ত রাত জাগ্‌বো।

রাজী। আমার রাত জাগ্‌লে পেটে ব্যথা ধরে।

ভুব। ওলো না লো, ব্যাই একবার বিয়ানের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ কর্‌বেন, তাই আমাদের ছলে বিদায় দিচ্চেন।

কেশ। ভালই ত, চল আমরা যাই, চাঁপা ত আর ছেলেমানুষটি নয়।

ভুব। বিয়ান নবীন যুবতী, ষাট বছরের একটি ভাতার না হয়ে কুড়ি বৎসরের তিনটি হলে বিয়ানের মনের মত হতো।

কেশ। (রাজীবের নিকট গিয়া) তা ভাই তুমি এখন চাঁপাকে নিয়ে আমোদ কর, আমরা যাই, দেখ ভাই ছেলেমানুষ শান্ত করে রেখ—

নসি। ঠাকুঝি গে মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্চিস্‌, দেখিস্‌ যেন কাম্‌ড়ে ন্যায় না।

ভুব। কাম্‌ড়ালে ক্ষেতি কি? বোনাইভাতারী ত গাল নয়, শালী পো'নর আনা মাগ।

কেশ। তুই যেমন ব্যাইভাতারী তাই ও কথা বল্‌চিস্‌—আয় লো আমরা যাই।

(রাজীব এবং রতা নাপ্‌তে ব্যতীত সকলের প্রস্থান ; দ্বার রোধ)

রাজী। সুন্দরি, সুন্দরি, তুমি আমার অন্ধের নড়ী, আমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো, আমার শুক্‌নো তরুর কচি পাতা ; তুমি আমার এক ঘড়া টাকা, তুমি আমার গঙ্গামণ্ডল। তোমার গোলামকে একবার মুখখান দেখাও, আমার স্বর্গলাভ হক্‌।

রতা। (অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া)

ক্ষণকাল ক্ষম নাথ অধীনী তোমার,
গাঁটা দিয়ে দেখে সবে দম্পতি বিহার।
এখনি যাইবে ওরা নিজ নিজ ঘরে,
রসে লীলা কর পরে বিয়ের বাসরে।

রাজী। আমি দেখে আসি কেহ আছে কি না, (চারিদিকে অবলোকন) প্রাণকান্তা ! জনপ্রাণী এখানে নাই।

রতা। ভাল ভাল প্রাণনাথ আমি একবার,
দেখি উঁকি মারে কি না পাশে জানালার।

(চারি দিকে অবলোকন এবং উভয়ের উপবেশন)

রাজী। কাছে এস, আমি একবার তোমার হাতখানি ধরি।

রতা। কাছে কিম্বা দূরে থাকি উভয় সমান,
যত দিন নাহি পাই অন্তরেতে স্থান।

রাজী। প্রেয়সি ! আমি বিচ্ছেদ-আগুনে দগ্ধ হতেছিলেম, তুমি আমার দগ্ধ অঙ্গ মুখের অমৃত দিয়ে শীতল করলে। আমি যে জ্বালা পেয়েচি তা আমিই জানি, রামমণিও জানে না, গৌরমণিও জানে না—এরা তোমার সতীনঝি, তোমাকে খুব যত্ন করবে, তা নইলে তোমার ঘর তোমার দোর তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে।

রতা শুনিয়াছি তারা নাকি কাণ্টা অতিশয়,
পরম পবিত্র বাপে কটু কথা কয়।
যোড় হাতে তব দাসী এই ভিক্ষা চায়,
পরবশ তারা যেন না করে আমায়।

রাজী। তুমি যে আমার বুকপোরা ধন, আমি কারো ছুঁতে দেব ? কাল

পাল্কি হতে আপনি তুলে নিয়ে যাব, রামমণিকে আপনি মুখ দেখাব, তার পর ঘরে গিয়েই দে দোর। আমার যা আছে সব তোমার (কোমর হইতে চাবি খুলিয়া) এই নাও চাবি তোমার কাছে থাক। (চাবি দান)

রতা। পিতা পরলোক গেলে জননীর সনে,
হা বাবা হা বাবা বলে কাঁদি দুই জনে।
বাবার বিয়োগ শোক ভুলিলাম আজ,
মিলেচে গুণের পতি নব যুবরাজ।

রাজী। বিধুমুখি! তুমি আমায় আনন্দসাগরে সাঁতার শেখাবে—আহা আহা কি মধুর বচন! প্রেয়সি! আমায় বুড়ো বলে ঘৃণা করো না!

রতা। প্রবীণ কি দীন হয় কিবা কদাকার,
ভকতিভাজন ভর্তা অবশ্য ভার্যার।

রাজী। সুন্দরি, আমাকে তোমার ভক্তি হয়?

রতা। দেবতা সমান পতি সাধনের ধন,
হৃদয়মন্দিরে রাখি করিয়ে যতন।
(রাজীবের চরণ ধারণ)

রাজী। সোনার চাঁদ তুমি আমায় স্বর্গে তুল্যে, আমি আর বাড়ী যাব না, এইখানে পড়ে থাক্‌বো। বিধুবদনি, একটা ছড়া বলো।

রতা। মাথার উপর ধরি পতির বচন,
বলিব ললিত ছড়া শুন হে মদন।
কনক কিশোরী, পিরিতের পরি,
রসের লহরী, বসে আলো করি,
নিকুঞ্জ বন,
মন উচাটন, মুদিত নয়ন,
ভাবে মনে মন, কোথায় সে ধন,
বংশীবদন।

রাজী। আহা মরি এমন মধুর বচন কখন শুনি নি, সুন্দরীর মুখ যেন অমৃতের ছড়া দিচ্চে! আহা! প্রেয়সি বিচ্ছেদজ্বালা এমনি বটে, পুরুষেরা বিচ্ছেদ-বাঁটুল খেয়ে ঘুরে মাটিতে পড়ে, হনুমান যেমন ভরতের বাঁটুল খেয়ে গন্ধমাদন মাথায় করে ঘুরে পড়েছিল। মেয়ে

পুরুষের সমান জ্বালা, পুরুষে চেঁচামেচি করে, মেয়েরা গুমরে গুমরে মরে।

রতা। অনঙ্গ অঙ্গনা অঙ্গ বিনা পরশনে,
প্রহারে প্রসূন বাণ বিরহিণী মনে ;
কামিনী বিরহ বাণী আনে না অধরে,
বিরলে বিকল মন মনসিজ শরে,
লাবণ্য বিষণ্ণ নয় বিদরে অন্তর,
কীটক কুলায় যথা রসাল ভিতর।

রাজী। আহা আহা এমন মেয়ে ত কখন দেখি নি, আমার কপালে এত সুখ ছিল, এত দিন পরে জান্‌লেম, বুড়ো বিটী আমার মঙ্গলের জন্যে মরেচে, "বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে"। প্রেয়সি! তুমি আমার গালে একবার হাত দাও।

রতা। বয়সে বালিকা বটে কাজে খাট নই,
প্রাণপতি গাল দুটি করে করি লই।
(রাজীবের কপোল ধারণ)

রাজী। আহা, আহা, মরি, মরি, কার মুখ দেখেছিলেম—আজ সকালে রতা শালার মুখ দেখেছিলাম—পাজী ব্যাটার মুখ দেখে এমন রত্নলাভ কল্যেম—সুন্দরি আমি একবার তোমার গা দেখ্‌বো।

রতা। আমি তব কেনা দাসী পদ অভরণ,
মম কলেবর নাথ তব নিজ ধন,
(বাম হস্ত দর্শায়ন)

রাজী। আহা কি দেখ্‌লেম, মরে যাই, রূপের বালাই লয়ে—
তড়িত তাড়িত বর্ণে তড়াগজ মুখ,
উল্‌টা কড়া সম যোড়া কুচ যোড়ে বুক,

রতা। কবিতা কানাই তুমি রসের গামলা,
ছলনা কর না মোরে দেখিয়ে অবলা।

রাজী। পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ ॥
পঙ্কজ মৃণাল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে ॥

চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

রতা। কবিতার কোমলতা ভাবের ভঙ্গিমা,
কি বলিব কত ভাল নাহি পরিসীমা।
খাটিল ঘটক বাণী ভাগ্যে অধীনীর,
বুড় বর বটে কিন্তু দুধ মরে ক্ষীর।

রাজী। সুন্দরি, আমার ঘুম গিয়েচে, রাত আমার দিন বোধ হচ্যে—প্রেয়সি! তুমি এক বার আমার কাছে এস, তোমারে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি।

রতা। কথার সময় নয় রসময় আজ,
এখনি আসিবে তব শ্যালকী শ্যালাজ।

রাজী। কারো আস্‌তে দেব না, তুমি উতলা হও কেন, এস, এস, এস না—এই এস (অঞ্চল ধরিয়া টানন)।

রতা। রসরাজ কি কাজ সলাজ মরি!
মম অঞ্চল ছাড় দু পায় ধরি।
ক্ষম জীবন যৌবন হীন বলে,
ভ্রমরা কি বসে কলিকা কমলে;
নব পীন পয়োধর পাব যবে,
রস সাগর নাগর শান্ত হবে।
রহ মানস রঞ্জন ধৈর্য ধরে,
সুখ নূতন নূতন লাভ পরে।
(যাইতে অগ্রসর)

রাজী। সুন্দরি, এখন রাত অধিক হয় নি—তুমি ঘর হতে গেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, যদি যাও আমি তোমার জেলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব, ব'স যেও না (হস্ত ধরিয়া টানন)।

রতা। হাতেতে বেদনা বড় ছাড় না ছাড় না,
বিবাহ বাসরে নহে বিহিত তাড়না।

নিশি অবসান প্রাণ গেল শশধর ;
দম্পতি অরাতি রবি গগন উপর।
যাই যাই বেলা হলো হাত ছাড় বঁধু,
দিনে কি কামিনী কান্তে দিতে পারে মধু ?

রাজী। প্রেয়সি! বুড় বামুনের কথা রাখ, যেও না, প্রেয়সি, তোমার পরকালে ভাল হবে—তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমারে আর পাগল ক'র না। আমি রত্নবেদি হই, তুমি জয় জগন্নাথ হয়ে চড়ে ব'স।

রতা নাপ্‌তের পদদ্বয় ধরিয়া শয়ন

রতা। অকল্যাণ অকস্মাৎ হেরে হাসি পায়,
বাপের বয়সি পতি পড়িলেন পায়।

(জানালার নিকটে নসিরামের আগমন)

নসি। এ কি ভাই ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে পেলে কি তুই হাতে খেতে হয় ? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে মিষ্টি লাগে না। (নসিরামের প্রস্থান)

রতা। ছি ছি ভাই, কি বালাই, লাজে মরে যাই,
বিয়ের কনের কাজ দেখিল সবাই।

(কিয়দ্দূর গমন)

রাজী। বাপ্‌ধন আমার চল্যে। আমারে মেরে চল্যে, ব্রহ্মহত্যা হলো—যেও না সুন্দরি, যেও না।

রতা। রাত পুইয়েচে, কাক কোকিল ডাক্‌চে।

(রতা নাপ্‌তের প্রস্থান)

ইহার মধ্যে কেবলমাত্র কৌতুকরসের পরিবর্তে আরও একটি রস প্রকাশ পাইয়াছে, কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার 'দীনবন্ধু' সম্পর্কিত প্রবন্ধে এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ইহার মধ্য দিয়াও দীনবন্ধুর সুগভীর জীবনদৃষ্টি যে কি ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'কৌতুকরসের মাত্রা চড়াইতে চড়াইতে গিয়াই করুণরসে উত্তীর্ণ হইতে হয়—উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কেবল মাত্রাগত পার্থক্য, বিষয়গত পার্থক্য কিছু নহে।' এই দৃশ্যটির মধ্যে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধের বিবাহ-সাধের মধ্যে জীবন তৃষ্ণার অপূর্ণতার একটু বেদনাবোধ আছে, তাহা একটি সুগভীর

জীবনসত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তাহাই অন্য এক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দীনবন্ধুর এই নাটকখানির মধ্য দিয়া তাহাই একটি কৌতুক রসাশ্রিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র শেষ দৃশ্যে দেখা গেল, রাজীবলোচন বধূসহ গৃহে ফিরিয়াছেন, কনের মুখ হইতে ঘোমটা খুলিতেই দেখা গেল, সে পাড়ার ডুম্‌নী পাগ্‌লী পেঁচোর মা; ইহার নাম করিলেই রাজীবলোচন ক্ষেপিয়া যাইত। দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। বর্ণনার গুণে দৃশ্যটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠান

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ

রাম। ভগবতী এমন দয়া করবেন, বাবার বিয়ে মিছে বিয়ে হবে।

গৌর। যথার্থ বিয়ে হয় চারা কি, তিনি আমাদের মা হবেন না আমরাই তাঁর মা হবো, মেয়ের মত যত্ন করবো, খাওয়াব, মাখাব, তাতে কি হবে, যুবতীর যে পরমসুখ তা তো দিতে পারবো না, স্বামীর সুখ কখনই হবে না, বাবা তো বেঁচে মরা।

রাজীবের প্রবেশ

রাজী। ও মা রামমণি, ও মা, তোমার মা এনিচি বরণ করে নাও।

রাম। সত্যি সত্যি আমাদের কপালে আগুন লেগেচে, পোড়া কপাল পুড়েছে, বুড়ো বাপের বিয়ে হয়েচে!

রাজী। আবাগের বেটী আমাকে চিরদিন জ্বালালে, আমি ভালমুখে ডাকলেম, উনি কান্না আরম্ভ করলেন, ওঁর ভাতার এখনি মলো।

রাম। কই আনো দেখি—আর বাপ হয়ে অমন কথাগুলো বলো না—কনে কোথায়?

রাজী। বন্ধু বাবার কাছে।

গৌর। বন্ধু বাবা কে?

রাজী। ঘটককে তোমাদের মা বন্ধু বাবা বলেন, আমিও বন্ধু বাবা বলি, তিনি আমার শ্বশুরের বন্ধু—বন্ধু বাবা! বন্ধু বাবা! নিয়ে এস।

কনের হাত ধ'রে ঘটকের প্রবেশ

গৌর। দেখি মেয়েটির মুখ কেমন।

ঘটক। জামাই বাবু ছুঁতে দিবেন না।

রাম। (ঘটকের প্রতি) আঁটকুড়ির ব্যাটা, সর্বনেশে, আমার মত তোর মেগের হাত হক্—কোথা থেকে এসে বুড়ো বয়সে বাবার বিয়ে দিলে—তুই যেমন সর্বনাশ কল্লি এমনি সর্বনাশ তোর হবে—

ঘটক। বাছা মিছে মিছি গাল দাও কেন, বউয়ের মুখ দেখ, সব দুঃখ যাবে, পুত্রশোক নিবারণ হবে। (হাস্যবদনে ঘটকের প্রস্থান)

রাজী। তুই বিটী ধর্ম্মের ষাঁড়, এত ঝকড়া কত্তে পারিস, তোর বাবার বন্ধু বাবা, গুরুলোক, প্রণাম না করে গাল দিলি, আ পাড়াকুঁদুলি—ঘরের দোর খুলে দে, আমি ব্রাহ্মণীকে ঘরে তুলি।

গৌর। আচ্ছা আমরা ছুঁতে চাই নে তুমিই একবার মুখটো দেখাও।

পাঁচ জন শিশু এবং গ্রামস্থ কতিপয় লোকের প্রবেশ

শিশুগণ। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।
বুড়ো বাম্‌না বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।

রাজী। দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ গর্ত্তস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই দ্যাখ্ (কনের অবগুণ্ঠন মোচন)।

গৌর। ও মা এ যে সত্যি পেঁচোর মা, ও মা কি ঘৃণা, কোথায় যাব—মাগীর গায় গহনা দেখ, যেন সোনার বেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ, আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি স্বপন দেখলেম, আমায় ছলনা কল্যে—আহা! আহা! কেন এমন স্বর্গ মিথ্যা হলো—ও লক্ষ্মীছাড়া বিটী পেঁচোর মা, তুই কেন কনে হলি—সে যে আমার ডোইয়ে কলাগাছে জলভরা মেয়ে—মরে যাই, মরে যাই, মরে যাই, (ভূমিতে পতন) কনক রায় নির্বংশ হক, কনক রায়ের সর্বনাশ হক—

পেঁচোর মা। কান্তি নেগ্‌লে ক্যান, তোমার ছ্যালে কোলে কর। (কাপড়ের ভিতর হইতে অলঙ্কারে ভূষিত শূকরের ছানা রাজীবের গাত্রে ফেলন)।

রাজী। আঁটকুড়ীর মেয়ে, পেতনি, শূয়োরখাগি, শূয়োরের বাচ্ছা আমার গায় দিলি ক্যান? শূয়োরের বাচ্ছা ঐ রামী রাঁড়ীর গায় দে।

(শূকরের ছানা রামমণির গাত্রে ফেলিয়া রাজীবের প্রস্থান)

রাম। কি পোড়া কপাল, কি ঘৃণা, শূয়োরের ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুন, চিলুতে গিয়ে শোও—খুব হয়েচে, আমি তো তাই বলি, কনকবাবু বুদ্ধিমান্, তিনি কি বুড়ো বরের বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা। (শূয়োরের বাচ্ছা কোলে লয়ে) বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার কোলে গিইলে বাবা—কোলে নেলে না, আগ্ করে ফেলে দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে।

গৌর। পেঁচোর মা তোর বিয়ে হলো কোথায়?

পেঁচোর মা। মোর স্বপোন কি মিত্যে। তোমার বাবা মোর হাত ধরে আন্‌লে।

রাম। তোকে নিয়ে গিয়েছিল কে?

পেঁচোর মা। নরলোকে পরির মেয়েদের চিন্তি পারে?

গৌর। পরির মেয়ে কোথা পেলি?

পেঁচোর মা। ঝুজ্‌কো ব্যালাডায় আত আছে কি নেই, মুই শোরের ছানাডা নিয়ে শুয়ে অইচি, দুটো পরির মেয়ে বল্যে পেঁচোর মা তোর স্বপোন ফলেচে, আজ তোর বিয়ে হবে, মুই এই ছানাডারে বড় ভালবাসি, এডারে সাতে করে গ্যালাম, কত মেয়ে কত্তি পারি নে, মোরে গয়না পরালে, এডারে গয়না পরালে, পালকিতে তুলে দেলে, বলে দেলে কতা কস্ নে, মুখ দেখানো হলি কতা কস্।

রাম। বাবার গায় শূয়োরের বাচ্ছা দিলি ক্যান?

পেঁচোর মা। তানারা বলে দিয়েলো, শোরের ছানা কোলে দিলি তোরে

খুব ভালো বাস্‌বে, ভাতার বশ করা কত ওষুধ জানি, শোরের ছানা গায় দেওয়া নতুন শেক্‌লাম।

রতা নাপ্‌তের প্রবেশ

ইনিত্তি মোরে পর্‌তম বলেলো মোর কপাল ফিরেচে।

রতা। (রামমণির প্রতি) ওগো বাছা তোমাকে তোমার বাপ একটি পয়সা দেয় না যে ব্রত নিয়ম কর, এই পঞ্চাশটি টাকা তোমরা দুই বনে নাও, আর চাবিটি তোমার বাবাকে দিও, তিনি কাল রেতে আহ্লাদে চাবি দিয়ে ফেলেছিলেন।

রাম। গৌর টাকা রাখ আমি দৌড়ে একটা ডুব দিয়ে আসি, শূয়োরের ছানা ছুঁইচি। (প্রস্থান)

পেঁচোর মা। ভাই ছুঁয়ে নাতি চায়! ও মা মুই কনে যাব।

গৌর। দাও আমার কাছে টাকা চাবি দাও—আহা, বুড়ো মানুষকে কেউ তো মারি ধরি নি।

রতা। মার্‌বে কে?

গৌর। বেশ হয়েছে, মিছে বিয়ে হলো আমরা টাকা পেলুম। (প্রস্থান)

পেঁচোর মা। বড় মেয়ে গেল, ছোট মেয়ে গেল, মোরে ঘরে তোলে কেডা, মোর বামুন ভাতার কনে গেল?

প্রথম শিশু। দূর বিটী ডুম্‌নি।

পেঁচোর মা। বুড়োর বেতে বাম্‌নি হইচি, মুই অ্যাকন ডুম্‌নি বাম্‌নি।

রতা। ওলো ডুম্‌নি বাম্‌নি, আমার সঙ্গে আয়, তোর হারাধন খুঁজে দিইগে। (সকলের প্রস্থান)

এই নাটকটি একটু বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, ইহাই পরবর্তী কালে এই বিষয়ক সকল নাটক রচনারই আদর্শ হইয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই নাটকখানির মধ্য দিয়া দীনবন্ধুর যে প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, পরবর্তী এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে আর তাহা দেখা যায় না। দীনবন্ধুর রচনার গুণে রাজীব, রতা, রামমণি ইত্যাদি চরিত্র এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, দীনবন্ধুর অনুবর্তিগণ চিত্র রচনা করিলেও সেই চিত্রগুলিকে কোন দিক দিয়াই এই প্রকার জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

কড়েয়া নিবাসী আমিরুদ্দি প্রণীত 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' নামক প্রহসন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গরাণহাটা হইতে প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন ইহার রচয়িতার নাম খজিমদ্দি। এই প্রহসনটির বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যায় যে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাই শুধু যে অর্থের লোভে অসমবিবাহের অনুষ্ঠানে মত দিয়া থাকে তাই নয়, অন্যান্য আত্মীয় পরিজনেরও ইহাতে সম্মতি বড় কম থাকে না। বিবাহে যে মেয়েদের কোন ভূমিকা থাকে, একথা সেদিনের মেয়েরাও বুঝিতে চাহিত না, বরং এই ক্ষেত্রে মেয়েদের উদ্যোগ দেখা যায়। সংক্ষেপে ইহার কাহিনীটি নিম্নরূপ :—

মৃত্যুপথগামী এক বৃদ্ধের হঠাৎ বিবাহ বাসনা জাগে। প্রচুর বিষয় সম্পত্তির অধিকারী বিপত্নীক এই বৃদ্ধ তাঁহার বেয়াই মশাইকে তাঁহার মনের কথা জানাইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর আর বেশী দেরী নাই, মৃত্যুকালে তাঁহার মুখে জল দিবার কেহই নাই সুতরাং এখন তাঁহার বিবাহ করা উচিত। সেই বেয়াই তাঁহার স্ত্রীকে কথাটি জানাইলেন; বেয়ান তখন নিজেই বেয়াইয়ের কাছে আসেন। বিয়ে-পাগল বৃদ্ধ যুক্তি দেখান যে, অপরপারে যাইবার আর বয়স নাই—সুতরাং বিবাহ করাটা আরো সহজ। তিনি বেয়ানকে গহনা দিবার লোভ দেখাইয়া পাত্রী সন্ধান করিতে বলিলেন। অলংকারের লোভে বেয়ান সেই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সহিত এক ষোড়শী সুন্দরী কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ দিলেন। সৌদামিনী জানিত, বিবাহ করার অর্থ বিধবা হওয়া। কিন্তু তাহার ক্রন্দন এক হাজার সোনার মোহরের ঝন্‌ঝনানিতে চাপা পড়িয়া যায়।...বুড়া কিন্তু অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও সৌদামিনীর দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না—সে সর্বাঙ্গে কাপড় ঢাকিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকিত। কিছুদিন পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হয় এবং এক ব্যবসায়ীর পুত্রের সহিত সৌদামিনী ভ্রষ্টা হইল।

১৮৭৩ সনে ঢাকা হইতে 'সাধের বিয়ে' নামক একটি নাটক প্রকাশিত হয়। ইহার রচয়িতার নাম ফেলু নারায়ণ শীল। এই প্রহসনটির মধ্যেও ৬০-৬৫ বৎসর বৃদ্ধের সহিত এক কিশোরীর বিবাহের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, ইহার উদ্যোক্তা একজন বিধবা নারী এবং ইহার সম্পর্কে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মেয়েরাও যেন সহজভাবেই ইহাকে মানিয়া লইতে পারিয়াছে—সেই দৃশ্য দেখি বাসরঘরে, যেখানে অন্যান্য মেয়েরা আপন আপন স্বামীর ত্রুটি বর্ণনা করিতেছে। অসমবিবাহের আরো উদাহরণ দেখি ইহাতে; বয়স্ক কন্যার

সহিত শিশু পুত্রের বিবাহও যে সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাও এই প্রহসনটিতে দেখা যায়। তাহা ছাড়া নিম্নস্তরের রসিকতা, সামাজিক সম্বন্ধও যে কত ঘৃণ্য ছিল, ইহাতে তাহারও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। প্রহসনটির সমাপ্তিতে কোন পরিণতির লক্ষণ নাই—যেন একটি খণ্ড চিত্র। সমাজে বৃদ্ধের বিবাহ করার পিছনে শুধু যৌনবিকার ছিল কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। ইহার কাহিনী সংক্ষেপে এই প্রকার—

বৃদ্ধ নীলকণ্ঠবাবুর বিধবা বোন চম্পক, ৬০।৬৫ বৎসর বয়সে ভায়ের বিবাহ দিয়া তাঁহার সংসার স্থিতি করিতে বাসনা করেন। বৃদ্ধের, বলা বাহুল্য, কোন অমত ছিল না। বিবাহ বাসরে নীলকণ্ঠবাবু শালীদের সম্মুখেই, 'ধন আমার, লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, কোলে এস' বলিয়া কিশোরী স্ত্রী উমাকে কোলে বসাইবার জন্য আহ্বান করেন। সকলের আদেশে উমাকে তাহাই করিতে হয়। কনের মা আসিয়া বরকনেকে কোলে নেন। বর বাসরে গানও শোনান। গানের পর শালী যামিনী ও সৌদামিনী তাহাদের বালক-স্বামী রাতে কিরূপ শিশুসুলভ ব্যবহার করে, তাহা বর্ণনা করিয়া আক্ষেপ করে। নীলকণ্ঠবাবু পরে কনেকে একা পাইয়া নানান ঢঙের কথা বলেন এবং আদরের নামে ন্যাকামি জুড়িয়া দেন—বৃদ্ধের উচ্ছ্বাসের মুখে কিশোরী ঘুমাইবার বায়না ধরে এবং দুইজনে শুইতে যায়।

১৮৭৪ সনে একজন অজ্ঞাত নামা লেখকের রচিত 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' নামে একখানি নাটক রচিত হয়। ইহার কাহিনী—মণিরামপুরের বৃদ্ধ জমিদার রাজীব গাঙ্গুলী তরুণী হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করিয়া নিতান্ত স্ত্রী-বশগ হইয়া পড়িয়াছে। সে স্ত্রীকে মাথার মণি, পরমপূজ্য দেবতা ইত্যাদি বলিয়া মনে করে। প্রতিবেশী রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাহাকে বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করিয়া বলে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ তাহার উচিত কার্য হয় নাই। ইহাতে রাজীব চটিয়া গিয়া যুক্তি দিয়া বলে 'অন্তে জল-পিণ্ডের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন, সেজন্য বিবাহ করা উচিত।' মনুসংহিতা হইতে সে প্রমাণ করে যে, তাহার বিবাহ করা অন্যায় হয় নাই। বিদ্যাসাগর-বিরোধী তর্ক-বাচস্পতিও যে তাহাকে সমর্থন করেন—ইহাও সে জানাইয়া দেয়।

রাজীব বিত্তশালী ব্যক্তি; কিন্তু স্ত্রীর জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিলেও কোন সৎকার্যে সে এক পয়সাও ব্যয় করে না। দুইপাতা ইংরেজী পড়িয়া ছেলেরা হিন্দু ধর্মকে পদদলিত করিতেছে বলিয়া সে স্বগ্রামে স্কুল স্থাপনের

প্রস্তাবের বিরোধী ; এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকও তাঁহার প্রত্যাশিত সাহায্য না পাইয়া ফিরিয়া যান।

রামকান্ত রাজীবের এই ধরনের বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। সে রাজীবকে ইঙ্গিতে বুঝায় যে,তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা, গ্রামের তুইজন যুবকের সাহায্যে অন্তঃপুরে, গুপ্তভাবে তাহার পাপ অভীষ্ট সিদ্ধ করে। ইহাতে রাজীব প্রথমে বিশ্বাস করে না; সে প্রমাণ করিতে চায় যে, তাহার স্ত্রী সতী-সাধ্বী ; তারপর রামকান্তের তীক্ষ্ণ মন্তব্যে সে চটিয়া গিয়া জমিদারী মেজাজ দেখাইয়া বলে, 'কোন্ শালা এ অপকলঙ্ক রটালে ?' আমি তাকে দেখবো, সে রাজীব গাঙ্গুলীকে চেনে না, জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ।' এ অপকলঙ্কের কথা রাষ্ট্র হইলে নিজেরই ক্ষতি—এই কথা রামকান্ত তাহাকে বুঝাইলে রাজীব তখনকার মত নিরস্ত হইলেও, দাসী ফুলমণিকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। প্রেয়সীর ভালমন্দ ঝি-বেটী হইতেই হইয়াছে—ইহাই তাহার বিশ্বাস।

রাজীব ফুলমণিকে রাগের মাথায় গালি দিয়া আবার মেঠাই খাইতে পয়সা দিব বলিয়া স্বীকার করে। পাছে হেমাঙ্গিনীকে সে এই কথা বলিয়া দেয়—এই তাহার ভয়।

এদিকে গ্রাম্যযুবক, প্রিয়নাথের সঙ্গে হেমাঙ্গিনী অন্তঃপুরে প্রেমালাপ করিতে থাকে! অন্য এক গ্রাম্য যুবক শ্যামাপদর সঙ্গেও হেমাঙ্গিনী ভ্রষ্টা। সে প্রিয়নাথেরই বন্ধু এবং গায়ক। প্রিয়নাথের অনুরোধে হেমাঙ্গিনী ধূমপান করে, প্রিয়নাথ ব্রাণ্ডির প্রশংসা করিলে হেমাঙ্গিনী ব্রাণ্ডি সম্বন্ধে আগ্রহ পোষণ করে। ইত্যবসরে হঠাৎ রাজীবের পদশব্দ ভাসিয়া আসিলে হেমাঙ্গিনী প্রিয়নাথকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া রাজীবের কাছে তাহার ছেলেবেলাকার সই বলিয়া পরিচয় দেয়। রাজীব তাহার 'বাড়ন্ত' গড়ন দেখিয়া ঘোমটা খুলিতে যায় ও অপদস্থ হয়। অবশেষে সইকে হেমাঙ্গিনী বাহিরে আসিয়া নিরাপদে ছাড়িয়া দেয়।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া রাজীব হেমাঙ্গিনীকে জানায় যে,লোকের বিশ্বাস হেমাঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসে না। হেমাঙ্গিনী ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটি করিয়া বলে যে, সে বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। রাজীব হেমাঙ্গিনীর কান্নাকাটিতে অপ্রতিভ হইয়া স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়া শপথ করে যে, সে আর হেমাঙ্গিনীকে কিছু বলিবে না। রাজীব রতন চুড় দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে হেমাঙ্গিনীর কান্না বন্ধ হয়।

রাজীব প্রজাদের তদারকে গিয়া অর্থ আদায় করিয়া আসিবে—অতএব

তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে হেমাঙ্গিনী প্রিয়নাথবাবুকে লইয়া সারারাত আমোদ-আহ্লাদ করিবে—এই সংবাদ রামকান্ত ফুলমণির নিকট হইতে পায়। ফুলমণিরও রামকান্তের উপর দুর্বলতা আছে; রামকান্তও ফুলমণির গৃহে আসুক, ইহা ফুলমণি চায়। রামকান্ত হেমাঙ্গিনীর সম্পর্কে আরও একটা কথা শোনে। যে কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে রাজীব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল হেমাঙ্গিনী রাজীবের অনুপস্থিতির সুযোগে তাহাকে বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়া, একশত টাকার বিনিময়ে পাপ অভীষ্ট পূরণ করিবার জন্য তাহার সঙ্গে রাত্রিবাস করিতে প্রস্তাব দিল—ইহাতে ঐ ভদ্রলোক ভয়ে আর রাজীবের গৃহে যান নাই।

রাজীব যাহাতে স্বচক্ষে স্ত্রীর কাণ্ড সব দেখে, রামকান্ত তাহার ব্যবস্থা করিল। রাজীবকে সে সমস্ত খুলিয়া বলিল। রাজীব প্রজাদের তদারকে যাওয়া স্থগিত রাখিয়া পরিচিত দারোগা কনষ্টেবলকেও খবর দিয়া আনায়।

নির্দিষ্ট সময়ে প্রিয়নাথ ও শ্যামাপদ আসে। ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে। হেমাঙ্গিনী ব্রাণ্ডি পান করিয়া বমি করিয়া ফেলে। হেমাঙ্গিনীর মাদকতা সুরু হইলে, সে প্রিয়নাথের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়ে। হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে প্রিয়নাথের রসালাপের মধ্য দিয়া স্থির হয় যে, প্রিয়নাথ হেমাঙ্গিনীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করিবে। হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে প্রিয়নাথের এই প্রেমালাপের অবসরে, দারোগারা নাটকীয় ভাবে প্রবেশ করিলে হেমাঙ্গিনী শ্যামাপদকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিয়া বীরদর্পে কন্‌ষ্টেবলদের নিকট অন্তঃপুরে ঢুকিবার কৈফিয়ৎ চায়।

কন্‌ষ্টেবল জানায় যে, তাহারা চোর ধরিতে আসিয়াছে। হেমাঙ্গিনী চোটপাট করে, প্রিয়নাথ কন্‌ষ্টেবলকে কামড়াইয়া দেয়। এমন সময় রাজীব প্রবেশ করিলে হেমাঙ্গিনী তাহাকে নগ্নভাষায় গালাগালি দেয়। রাজীব আম্‌তা আম্‌তা করিয়া দারোগাকে অনুরোধ করে, স্ত্রীকে কিছু না বলিতে। হেমাঙ্গিনী দারোগাদের জানায় যে, তাহার ঘরের লোক দুইটিকে তাহার স্বামী চেনে। রাজীব যেই বলে যে, সে ইহাদের চেনে না, অমনি হেমাঙ্গিনী রাজীবকে 'কালামুখো' 'সপুরীখেগো' বলিয়া গালাগালি করে। শেষে হেমাঙ্গিনী দারোগার কাছে পরিচয় দিল, শ্যামাপদ তাহার গুরুপুত্র এবং প্রিয়নাথ তাহার ভিক্ষাপুত্র। ইহা শুনিয়া স্ত্রৈণ রাজীব কাঁদিতে কাঁদিতে হেমাঙ্গিনীর পদতলে পড়িয়া বলে—'প্রেয়সী—তোর মনে কি এই ছিল। আমি

কি দোষ করেছি—রে—আমি কি তো—মা—র তেজ্যপু—।' পদতলেই রাজীব মূর্চ্ছা যায়। ওদিকে দারোগা শ্যামাপদ ও প্রিয়নাথকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার রচিত 'রামের বিয়ে' প্রহসন কলিকাতা হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এই প্রহসনটির মধ্যেও একটি বিয়ে-পাগল বৃদ্ধের দেখা পাই, যাহাকে লইয়া পাড়ার ছেলেরা নানারূপ তামাসা করিয়া থাকে—শেষে তাহাকে হাজতবাস করিতে হয়। বিবাহের আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে যে বৃদ্ধ-মনকে বিকৃত করিয়া তোলে, এই প্রহসনটি তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাকেই বৃদ্ধ বয়সের যৌন বিকৃতি বলা চলে। ইহার কাহিনীটি এই প্রকার—

বৃদ্ধ রামতারণ মুখোপাধ্যায় বিয়ে পাগলা। পাড়ার ছেলেরা একজন ঘটককে তাহার নিকট পাঠায়। সে নানারূপ মনোমুগ্ধকর চিত্র আঁকে কনে সম্বন্ধে—বৃদ্ধ আহ্লাদে অস্থির হইয়া ওঠে। একজন রাস্তার কাপড়ওয়ালাকে কনের মামাশ্বশুর সাজাইয়া আনা হয়। তাহার সম্মুখে রামতারণ নিজের গুণকীর্তন করে সে—'কুলীন এবং বরোজ গোত্র (ভরদ্বাজ)' সে 'বি—এ—বে পর্য্যন্ত আই রিডিং'। তারপর সে বক্তৃতা করার ক্ষমতা দেখায়। বিবাহের দিন স্থির হয়। রামতারণ পতিতালয়েও যাইত, তাহাও লেখক নির্দেশ করিয়াছেন। রামতারণ বিবাহের আনন্দে মশগুল হইয়া থাকিত দিবা স্বপ্ন দেখিত—কনের রূপ কল্পনা করিয়া কত স্বপ্ন রচনা করিত।—বিবাহের দিন এক ভাড়া বাড়ীতে পাড়ার যুবকেরা হাজির হয়। একটি যুবক কনে সাজিয়া আসে। এই সময় ছদ্মবেশী মামাশ্বশুর গোলোযোগ পাকাইয়া তোলেন—রামতারণ প্রতারক;—সে 'পিরিলি' হইয়া কুলীন মেয়েকে বিবাহ করিতে আসিয়াছে। পুলিশ আসে; পরে বিচারে তাহার তিনমাস জেল হয়—সে প্রতারণা করিয়াছে। এইভাবে তাহাকে জব্দ করিয়া পাড়ার যুবকেরা আনন্দ পায়। 'পিরিলি' নামে নীচ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান যে কুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের যোগ্য নয়, এই প্রহসনটিতে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'অযোগ্য পরিণয়' কলিকাতা হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

অযোগ্য বিবাহের দুইটি দিককে কেন্দ্র করিয়া একটি রচনা—একটি বৃদ্ধের

তরুণী বিবাহ, অন্যটি যুবতীর শিশু বিবাহ। লেখক এই বিষবৃক্ষ দুইটি উন্মূলিত করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। সরকারের সমর্থন লাভের ইচ্ছাও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই প্রকার—

নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মারা যাইবার তিনমাস না-হইতেই, আবার বিবাহ করার জন্য পাগল হইয়া ওঠেন—এই বৃদ্ধ বয়সেও। এক অর্থ পিশাচ ব্রাহ্মণ শিরোমণি নন্দবাবুর বিবাহের ব্যবস্থা করেন, টাকার লোভে। তরুলতা নামে এক যুবতীর সহিত নলিন নামে পাড়ার এক যুবকের ভালোবাসা ছিল। মেয়ের বাপ অর্থের লোভে এই বিবাহ দিতে রাজী হয়। অন্যদিকে শিরোমণি নিজের শিশুপুত্রের সহিত এক যুবতী কাঞ্চনমালার, বিবাহ স্থির করেন। নলিন বিপিন প্রভৃতি যুবকেরা সমালোচনা করে বটে; কিন্তু উক্ত দুইটি বিবাহ সম্পন্ন হয়, বিনাবাধায়। বুড়ো নন্দ যুবতী স্ত্রীকে রঙ্গরসে ভরিয়া তুলিতে চায় কিন্তু তাহার বয়সের জন্য শুধু স্ত্রীর বিরক্তির কারণ হয়। ওদিকে কাঞ্চন শাশুড়ী-ননদ-স্বামীর অত্যাচারে অতীষ্ট হইয়া ওঠে; স্বামী-সোহাগ হইতে বঞ্চিতা হতভাগ্য কাঞ্চন, অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় বিষপানে আত্মহত্যা করে। পুলিশ উপস্থিত হয় এবং শিরোমণির বাড়ীর সকলকে থানায় লইয়া যায়। অপরদিকে গ্রামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে শুনিয়া তরু তাহাকে নলিন ভাবিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। তাহার অনুমান সত্য হয় এবং তরু পুরানো স্মৃতি জাগাইয়া তাহাকে লইয়া পলাইয়া যাইতে অনুরোধ করে। নলিন অসম্মত হয়—সে এখন পরস্ত্রী। তাহাকে ভগিনী সম্বোধন করিয়া নলিন চলিয়া যায়। নন্দ সেখানে হাজির হয়। তরু বিলাপ করে; বিপিন তাহাকে সতীত্ব শিক্ষা দেয়। নন্দ নিজের ভুল বুঝিতে পারে এবং আত্মধিক্কার দেয়—কেউ যেন বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ না করে। ওদিকে শিরোমণিও উপস্থিত হইয়া নিজের কৃতকর্মের জন্য বিলাপ করে—কেউ যেন অল্প বয়সে ছেলের বিবাহ না দেয়।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আক্কেল গুড়ুম' বা 'কুলের প্রদীপ' প্রহসন কলিকাতা হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

অযোগ্য বিবাহে স্ত্রীপক্ষের যৌন বঞ্চনা প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করিয়া প্রহসনটি রচিত। অযোগ্য বিবাহে প্রবৃত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি বৃত্তিকে কটাক্ষ করিয়া নামকরণ করা হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি আক্কেল লাভের পর মন্তব্য করিয়াছে, 'এবার অবধি ছেলে পুলে হ'লে বিবাহের সময় আগে উভয়ের মনের মিল দেখে বিবাহ

দেবো, আর এই প্রথা যেন আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়'—ইহা নিঃসন্দেহে আধুনিকতার পরিচায়ক। ইহার কাহিনী নিম্নরূপ—

পদ্মনাথ গুণালংকার নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বসন্ত বয়সে তরুণী, অথচ তাঁর যৌবন গত হইয়াছে। দুইজনের মধ্যে দাম্পত্য সদ্ভাব ছিল না। পদ্মনাথের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একজন সেবাদাসী ছিল; তথাপি তিনি পতিতালয়েও যাইতেন। পদ্মনাথ নরেন নামে একটি যুবককে আপন ঘরে প্রতিপালন করিতেন। সেবাদাসী মাতঙ্গিনী আপন কার্যসিদ্ধির জন্য নরেন-বসন্তকে লইয়া কুৎসিত সম্বন্ধ রচনা করিত। একদিন পতিতা কমলার হাতে নির্যাতিত হইয়া পদ্মনাথ সেখানে যাওয়া পরিত্যাগ করেন—নরেনেরও সেখানে যাতায়াত ছিল। পদ্মনাথ নরেনকে বাটি হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহাতে বসন্ত মর্মাহত হয়। সে মাতঙ্গিনীর কাছে নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করে, পদ্মনাথ তাহা শুনিয়া বসন্তকে তিরস্কার করেন। বসন্ত সহসা সরম ভুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'না রুইলে কি চাষ হয়? দেখতে পাবে, যখন ফল ফলবে, তখন তোমার পোড়ার মুখ কোন চুলোয় লুকাবে!'—ইহা শুনিয়া পদ্মনাথের আক্কেল গুড়ম্। তিনি বোঝেন,—যে সন্তানের মত, তার সঙ্গে প্রেম সম্ভবপর নয়—উভয়ের মনের মিল না হইলে ভালোবাসা হয় না। তখন তিনি মন্তব্য করেন, 'ছেলেপুলে হলে উভয়ের মনের মিল দেখে বিবাহ দেবো।' ইহার পর তিনি বসন্তের মান ভাঙাইয়া সোহাগ করেন এবং বসন্তকে 'কুলের প্রদীপ' বলিয়া ডাকেন।

শম্ভুনাথ বিশ্বাস রচিত 'কচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্ত-কথা' (১৮৮৩ খৃঃ) একটি সংক্ষিপ্ত প্রহসন। অযোগ্য বিবাহের কুফলকে কেন্দ্র করিয়া আরও কয়েকটি প্রহসন রচনার সন্ধান পাওয়া যায়: কিন্তু তাহাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সামান্যই জানা সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রহসনটির কাহিনী হিসাবে জানা যায় যে, একজন বৃদ্ধের একটি তরুণী স্ত্রী ছিল। সে ব্যাভিচারিণী হয় এবং এক তরুণের সাথে প্রায়ই মিলিত হইত। বৃদ্ধ তাহা জানিতে পারে এবং যুবকটিকে ধরিয়া শাস্তি দিবার জন্য বারবার নানান কৌশল করে। কিন্তু, তাহার স্ত্রী প্রতিবারেই বৃদ্ধের ফন্দী ব্যর্থ করিয়া দেয়।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য রচিত 'কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে' কলিকাতা হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১০-১৫ বছর বয়সে তখনকার কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের কুলের গৌরবে

বিবাহ করিতে আগ্রহী হইতেন। ইহার পিছনে কতখানি গৌরব আর কতটুকু মনোবিকার তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। যদিও লেখক বৃদ্ধের বিবাহ-উন্মাদনাই বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি তদানিন্তন সমাজে এইরূপ বিবাহ যেন স্বাভাবিকভাবেই ঘটিতে পারিত। ইহাতে শুধু বৃদ্ধের পাগলামিই প্রকাশ পাইয়াছে তাই নয়, তাহাকে বাধা দিবার মত কোন বলিষ্ঠ যুবক-মন তখনও দেখা যায় নাই। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল—

৭০-৭৫ বছর বয়সের বৃদ্ধ সুরেশের স্ত্রী যখন মৃত্যুশয্যায়, তিনি তখন পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করিতে সুরু করিলেন। ছেলে-নাতি-নাতনী তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। স্ত্রীবিয়োগের পর বৃদ্ধ সুরেশ বন্ধুদের নিকট তাহার মনোবাসনা ব্যক্ত করে। জনৈক বন্ধু সুরেশের পুত্রদের নিকট তাদের পিতার বক্তব্য জানায়। পুত্রেরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। কর্তার মেয়ে এবং অন্যান্য সকলে তাহাকে তিরস্কার করে, নানারূপ কটূক্তি করে ; কিন্তু বিবাহ করিতে নিষেধ করায় তিনি গলায় ফাঁসি দিতে উদ্যত হন। যাই হোক সোনারপুর হইতে একটি সম্বন্ধ আসে। সুরেশবাবু আনন্দে পুলকিত হন। মেয়ের বাড়ীতে সুরেশবাবুর বড় ঘরের খবর পাইয়া সকলে বাজী পুড়াইয়া বিবাহের ধুম করে। কিন্তু বিবাহ-বাসরে বৃদ্ধ বর দেখিয়া মেয়ের ভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি বলেন, 'কুলে কি স্বর্গ দেবে ?' বিয়ের সভায় সকলেই বৃদ্ধকে তামাসা করে। বাসর ঘরে মেয়েরা কিল-চড় দিয়া বরকে আদর জানাইতে গেলে, বৃদ্ধ মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। পুত্র রামনাথ আসিয়া দেখে পিতা মৃত। কিন্তু, আর সকলে পরিহাস করিতে থাকে, ভাবে নেশার ঘোরে ওইরূপ হইয়াছে।

'মাগ সর্বস্ব' (১৮৮৪ খৃঃ) রামকানাই দাস রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রহসন। একজন বাঙালীবাবু বৃদ্ধ বয়সে এক যুবতীকে বিবাহ করিয়া তাহার দেহমন সর্বস্ব স্ত্রীর সেবায় উৎসর্গ করে। যুবতী স্ত্রীর মন রাখিবার জন্য সে তাহার মা এবং বিধবা ভগিনীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। পরে সে তাহার সওদাগরী অফিসের তহবিল তছরূপ করিয়া সেই অর্থে স্ত্রীকে গহনা গড়াইয়া দেয়। অবশেষে পুলিশ তাহাকে ধরিয়া জেলে দেয়। প্রহসনটি আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একজন মহিলা কর্তৃক রচিত এই বিষয়ক একটি প্রহসনেরও সন্ধান পাওয়া

যায়। লেখিকার নাম প্রফুল্ল নলিনী দাসী। প্রহসনের নাম 'ষষ্ঠি বাঁটা প্রহসন' (কলিকাতা ১৮৮৭ খৃঃ)—

প্রহসনটির বিষয়বস্তু কিছুটা আধুনিক। বিবাহে মেয়েদের যে কোন স্বাধীনতা নাই, একদিকে যেমন তাহা বলা হইয়াছে তেমনি অপরদিকে সম-সংস্কৃতি সম্পন্ন স্বামী-স্ত্রী যে দাম্পত্য জীবনে সুখী হইতে পারে, তাহারও ইংগীত দেওয়া হইয়াছে। সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিরা মেয়েদের পণ্য হিসাবে দেখেন। কিন্তু, সমাজের অন্তরালে মেয়েদের পরাধীন জীবনের যে বেদনা রহিয়াছে তাহাকে করুণ সমাপ্তির মধ্যে প্রকাশ করা প্রহসনটি একটি ট্রাজিডি হইয়া উঠিয়াছে। প্রচলিত সামাজিক প্রহসনগুলি হইতে ইহাকে ভিন্ন জাতের বলা যাইতে পারে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল—

হরনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুই মেয়ে কুমুদিনী ও চারুশীলা দুইজনেই শিক্ষিতা। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া ছাত্র চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদিনীর স্বামী। কুমুদিনী ব্রাহ্মসমাজের রীতিনীতি লইয়া সমালোচনা করার সাহস রাখে। কুমুদিনী শিক্ষিত স্বামী লইয়া সুখী। কনিষ্ঠা চারুশীলার বিবাহ স্থির হয়, এক সংস্কৃত পণ্ডিতের সঙ্গে। ইংরাজী পড়া মেয়ের সাথে ব্যাকরণ পড়া ছেলের বিবাহ দিতে বন্ধুরা হরনাথকে নিষেধ করেন। তবে জনৈক বন্ধু মনে করেন, 'মেয়ে—তার আবার মনোমত আর অমনোমত? যাতে ঘর থেকে বার করতে পারলেই হল···।' কিন্তু এদিকে চারুশীলা অপর এক পুরুষে আসক্তা; সে ভাবে যে, যখন একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়া সে তাহার দেহ-মন-যৌবন অর্পণ করিয়াছে, তখন অপর পুরুষকে সে গ্রহণ করিতে পারে না। সে বিনাপ্রতিবাদে বিষপান করিয়া এই সমস্যার সমাধান করে। সেদিন জামাই ষষ্ঠীর রাত্রি। চন্দ্রকুমার উপস্থিত—সকলে জামাইকে লইয়া আনন্দ উৎসবে মত্ত রহিয়াছে, তখন ওদিকে চারুশীলা একা তাহার শয়নঘরে মৃতা পড়িয়া রহিল।

'বুড়ো বাঁদর' (কলিকাতা ১৮৯০ খৃঃ)—অতুল কৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক রচিত। বৈকালিপক ইংরাজী নাম The old cuckold. মলাটে কবিতায় দীনবন্ধু মিত্রের একটি ছড়া উদ্ধৃতি দেওয়া আছে—

"বুড়ো বয়সে বিয়ে করা
আপনা হতে জ্যান্তে মরা।"

নামকরণের মধ্যেই লেখকের বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর বক্তব্য হিসাবে দেখি এক তরুণীর পাপাচার লিপ্সা; বৃদ্ধ স্বামীর নিকট হইতে যৌন অতৃপ্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে তরুণী স্ত্রী যৌনকামনা পরিতৃপ্তির জন্য ভ্রষ্টা হইয়াছে। পরিশেষে বৃদ্ধ স্বামী আপনার ভুল বুঝিতে পারেন। কাহিনীটি এইরূপ—

ষাঁড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। তিনি তাঁর যুবতী স্ত্রীকে যুবকদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে চান। পাড়ার যুবকদিগের ভয়ে কেবলই পাড়া বদল করেন। তাঁহার বয়স ষাটের উপর; তাঁহার ঘরে ষোলো-সতের বছরের স্ত্রী সুতরাং বিপদ তাঁহার সর্বত্র। নতুন পাড়ার প্রতিবেশী হরিদাস বৃদ্ধকে সাবধান করিতে যাইয়া তিরস্কৃত হন। ছোট গিন্নির মনে স্বৈরাচারের বাসনা জাগে। সে যুবকদের নিকট আকারে ইংগীতে মনের ভাব প্রকাশ করে; পথচারী যুবক বালকদের সামনে পানের খিলি, ফুলের তোড়া ছুঁড়িয়া দেয়। ক্রমে সে সেই প্রতিবেশী হরিদাসের সঙ্গে অবৈধ ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া তোলে। হরিদাস বিবাহিত—তাহার স্ত্রী ব্যাপারটা জানিয়া ফেলে; হরিদাস গোপন করে না। তখন হরিদাসের স্ত্রী এবং ভগিনী, বৃদ্ধের স্ত্রীকে জব্দ করিবার জন্য তাহাদের বাগানবাড়ীতে এক রাতে আহ্বান করে। হরিদাসের ভগিনী হরিদাসী পুরুষের বেশে সেখানে যায় এবং ছোট গিন্নীকে কটুক্তি করে; হরিদাসের স্ত্রীও উপস্থিত হয়। পরে ষাঁড়েশ্বর বড় গিন্নিকে লইয়া সেখানে হাজির হয়। হরিদাস উপস্থিত হইয়া সকল কথা প্রকাশ করে যে, পুরুষ বেশী ভদ্রলোক তাহারই ভগিনী। ষাঁড়েশ্বর ধড়ে প্রাণ পায়; এবং ছোট গিন্নি যে অসতী হয় নাই, তাহার জন্য সে সমাদরে তাহাকে গৃহে লইয়া যায়।

কৃষ্ণবিহারী রায় রচিত 'পশ্চিম প্রহসন' কলিকাতা হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রহসনটিতে প্রদত্ত ভূমিকাটি সমাজচিত্রের মাত্রা নির্ধারণে যথেষ্ট মূল্যবান। পশ্চিম প্রদেশের বাঙালী সমাজে এরূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটিত। ইহার নায়ককে প্রকৃতই উন্মাদ আখ্যা দেওয়া যায়—বিবাহের জন্য এইরূপ আচরণ ভদ্র সমাজে কল্পনা করাও দুষ্কর। কিন্তু ভূমিকায় বলা হইয়াছে, 'ইহার কোন অংশ কল্পনা প্রসূত নহে।' কিন্তু ইহাকে পাগলামী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ইহার কাহিনীবস্তুটি নিম্নরূপ—

গবেন্দ্রের বয়স ষাট—পিঠ কুঁজাইয়া গিয়াছে, পুত্র-পৌত্রাদি তার সবই

আছে। কিন্তু হঠাৎ তার বিবাহ করার সখ গেল। পাড়ার ছেলেরা বৃদ্ধকে লইয়া নানারূপ রসিকতা করে, নানান লোভ দেখায়। মিথ্যা ঘটক সাজাইয়া ছেলেরা মাঝে মাঝে গবেন্দ্রের বাড়ী লোক পাঠায় এবং বহু লোভ দেখায়। বৃদ্ধ এমনই উন্মাদ যে, নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া দেখে না; সত্য ঘটক ভাবিয়া তাহাদের জামাই আদরে তাহার বাড়ীতে রাখে। শেষে দুইটি কাল্পনিক সম্বন্ধ স্থির হয়। এক মিথ্যা ঘটককে গবেন্দ্র টাকা দেয়; সে তাহাকে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান পর্যন্ত করাইয়া সরিয়া পড়ে। গবেন্দ্র একাই কনের বাড়ী যাত্রা করে; কিন্তু কাহারও কোন সন্ধান না পাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। শেষে দ্বিতীয় বিবাহের দিন আসে, মানপুরে। বিবাহের দিনে কোন বরযাত্রী না পাওয়ায়, একাই গবেন্দ্র বিবাহে যায়; কিন্তু বরপক্ষের কোন সাক্ষী না থাকায় বিবাহ বন্ধ হয়; গবেন্দ্র এক চুক্তিপত্র করাইয়া লয়। পরে বিবাহের দিনস্থির হয়। কিন্তু, ঠিক সেইদিন তিনি টেলিগ্রাম পাইলেন কন্যা কলেরায় মারা গিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা এরপর একজন জ্যোতিষকে পাঠায়; এবং গবেন্দ্রের ভাগ্যের দোষ কাটাইবার ছলে, তাহাকে গাধার পিঠে চড়াইয়া অত্যন্ত অপমান করিয়া ছাড়ে—তথাপি তাহার পাগলামি ঘোচে নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

পণপ্রথা—কন্যাপণ ও বরপণ

বিবাহ ব্যাপারে পণপ্রথার উদ্ভব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণের উপর নির্ভরশীল বলিয়া আলোচ্য প্রথাটি ব্যক্তি জীবন তথা সমাজ জীবনে নানা প্রকার জটিল সম্পর্ক সৃষ্টি করে। পৃথিবীর সর্ব দেশে সর্ব সমাজে বিবাহ ব্যাপারে কোনো প্রকার আর্থিক সম্পর্ক জড়িত। মুদ্রা বা দ্রব্য আদান প্রদানের ভিতর দিয়া এই প্রথা আত্মপ্রকাশ করে। উপহার ও আশীর্বাদ প্রভৃতি শব্দের আড়ালে এই প্রথা আত্মগোপন করে আবার কোথাও বা উহা আর্থিক লেনদেনে পর্যবসিত হয়। আভিজাত্যের মর্যাদা স্বরূপ এই প্রথা কোথাও বা অভিনন্দিত। আবার কোথাও বা চরম অনর্থকারী সামাজিক বিপর্যয়রূপে চিহ্নিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই প্রথা বাঙালীর সমাজ জীবনে কি রূপ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহার সম্পর্কে ই. এ. গেট সাহেব এক সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঐ অভিমত হইতে সে যুগের পণপ্রথা সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। আবার এই কথাও সত্য যে, সামাজিক আয়ের উপর কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় সেই সময়ে সংঘটিত হয় নাই বলিয়া একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র ঐ তথ্য হইতে পাওয়া সম্ভব নয়। গেট সাহেবের মতে, বাঙালী সমাজের বিচিত্র প্রথা বিবাহ চুক্তি ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এই প্রথাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের সমাজে বিবাহ অভিভাবকের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং বলা যায়, আমাদের বিবাহ ব্যাপারটি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নহে, সমাজের সঙ্গে বিবাহ। বরের অভিভাবক কোথাও কন্যার অভিভাবকের নিকট হইতে পণ আদায় করে। কোথাও বা ইহার বিপরীত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। স্বল্পক্ষেত্রে বিবাহ ব্যাপারে আর্থিক সম্পর্ক না ঘটিতেও দেখা যায়। অবশ্য সেই সকল ক্ষেত্রে উপহার বা দ্রব্য আদান প্রদানের ব্যাপার থাকিতে পারে। আভিজাত্য ও মর্যাদা পণগ্রহণের উপর অনেকখানি নির্ভর করে বলিয়া সমাজের উচ্চকোটি

সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বরপণ দাবী করে। নিম্নকোটি সম্প্রদায়ের লোকেরা উচ্চকোটিকে অনুসরণ করে মাত্র। বিশেষ করিয়া যাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে।

সমস্ত ব্যাপারটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অর্থশাস্ত্রের নিয়মানুসারে চাহিদা ও যোগানের উপরই পণের অঙ্ক নির্দ্ধারিত হয়। বর ও কন্যার রূপ, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আভিজাত্য এই সবের উপরেই পণপ্রথা নির্ভরশীল। বিবাহের বাজারে কুমারী ও বিধবার মূল্য এক নহে। বরের ক্ষেত্রে বংশমর্যাদা, শিক্ষার ও আয়ের তারতম্য অনুসারে বরপণ নির্দ্ধারিত হয়। আবার শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পবয়স্কা সুন্দরী কুমারী অপেক্ষা, পরিণত ও সক্ষমা বিধবার মূল্য অনেক বেশি। আবার কন্যাপক্ষও বরপণ দিবার সময় বরের বয়স, আয় ও শিক্ষার উপর পণের অঙ্ক নির্দ্ধারণ করে।

সাধারণ নিয়মে কন্যার পিতা বরপক্ষকে পণ দিয়া থাকে। পাত্রকে নানাবিধ যৌতুক ও পাত্রের আত্মীয় স্বজনকে উপহার দেওয়া হয়। পূর্বে খুব স্বল্প পরিমাণ টাকাতেই পণ নির্দিষ্ট ছিল। উপযুক্ত পাত্র সন্ধানের কষ্ট-সাধ্যতায় পণ মাত্রাতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে পণের অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পায়। কুলীনদের মধ্যে নির্বাচন ও নীতি নিয়ম খুব দৃঢ় বলিয়াই কুলীনদের মধ্যে দাবীর উগ্রতা অনেক পরিমাণে বেশি। পাত্রী যদি কুৎসিতা হয় বরপণ বাড়ে কেননা পাত্রী ইচ্ছিত নহে। অলঙ্কার ছাড়াও একহাজার টাকা নগদ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বরপণ হিসাবে একটা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচহাজার টাকা নগদ বরপণ হিসাবে প্রদান করার দৃষ্টান্ত আছে।

জটিল শ্রেণী বিন্যাসের উপর বরপণ যে উঠা নামা করে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দখা গিয়াছে। রাঢ়ী, শ্রোত্রিয়, বারেন্দ্র, ও বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই পণপ্রথা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যেহেতু শ্রোত্রিয় পাত্রীর পিতা কুলীন ও শ্রোত্রিয় উভয় শ্রেণীতেই কন্যা অর্পণ করিতে পারিতেন। আর তাহা ছাড়া কুলীন পরিবারে অন্ততঃ একটি শ্রোত্রিয় কন্যা বিবাহ করবার বাধ্যতামূলক প্রথা ছিল। এই সব কারণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে শ্রোত্রিয় সমাজে কন্যাপণ দুইশত টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত উঠা নামা করিয়াছে।

রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা কদর্যতায় পরিণত হইয়াছিল। ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলে সূপকার বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণরা কন্যাপণ হিসাবে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দান করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অনেকে অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিয়াছে।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী শ্রেণীর মত উপসম্প্রদায় দেখা যায়। রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে সেখানে একটি উপসম্প্রদায় বংশজ নামে খ্যাত, বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে সেইরূপ উপসম্পদায় 'কাপ' নামে পরিচিত। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রথার জটিলতা রাঢ়ী শ্রেণীর তুলনায় কম হইলেও সাধারণ রীতিনীতি প্রায় একরকম। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে একজন কুলীন পাত্র, একজন কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পণ আদায় করিয়াছে পঞ্চাশ হইতে একশত টাকা। শ্রোত্রিয় পাত্র শ্রোত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ একই ধরণের পণ লাভ করিয়াছে। অথচ শ্রোত্রিয়দের মধ্যে যাহারা নিজের কন্যার জন্য কুলীন বা কাপ পাত্র ইচ্ছা করিয়াছে তাহাদের একহাজার টাকা পণ প্রদান করিতে হইয়াছে। বারেন্দ্র শ্রেণীর নীচু সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাপণ প্রচলিত আছে।

বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়—পাশ্চাত্ত্য ও দাক্ষিণাত্য। পাশ্চাত্ত্য বৈদিকদের মধ্যে জাতিসমস্যার বাড়াবাড়ি নাই। দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের মধ্যে তিনটি উপসম্প্রদায় আছে—কুলীন, বংশজ ও মৌলিক। বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূর্বে কোনো পণপ্রথা প্রচলিত ছিল না। পণ প্রথা হিসাবে মর্যাদা লাভ করার পর বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে একশত টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত উঠা নামা করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা পণের দৃষ্টান্ত আছে।

বাংলাদেশে কায়স্থদের দুইভাগে ভাগ করা যায়—কুলীন এবং মৌলিক। কুলীনদের কুল পুত্রগত। কুলীনরা তাহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীন ঘরের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে বাধ্য থাকে। মৌলিকদের বিবাহ কুলীন ঘরে সম্ভব হইলে তাহাদের কুল মর্যাদা বাড়ে। অন্যান্য উপসম্প্রদায়ের মধ্যে পণ নির্ভর করে বরের শিক্ষা দীক্ষা আভিজাত্যের উপর। পূর্বে কায়স্থদের মধ্যে পণপ্রথা ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে শিক্ষিত বর কন্যাপক্ষের নিকট হইতে প্রচুর পণ আদায় করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে এই সামাজিক প্রথাকে রক্ষা করিতে গিয়া অনেক পাত্রীর পিতাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে।

বাংলা দেশে অন্যান্য জাতিসম্প্রদায়ের মধ্যে বরপণ অপেক্ষা কন্যাপণের চাহিদাই ছিল বেশি। সদগোপ, তিলি, মাহিস্য সম্প্রদায় উচ্চকোটি সম্প্রদায়কে অনুসরণ করিয়া বরপণ গ্রহণ করিয়া আভিজাত্য অর্জনের চেষ্টা করে। কোচদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকায় কুমারী কন্যাপণ কুড়ি টাকা এবং বিধবা কন্যাপণ দশটাকা ছিল। গোয়ালা ও রাজবংশীদের মধ্যে দেখা গিয়াছে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা হইতে তিনশত টাকা পর্যন্ত কন্যাপণ উঠা নামা করিয়াছে। নমঃসূদ্র ও পদ্মরাজদের কন্যাপণ পনেরো টাকা হইতে দেড়শত টাকা পর্যন্ত এবং বোষ্টমদের মধ্যে পঁচিশ টাকা হইতে একশত পঁচিশ টাকায় উঠা নামা করিয়াছে।

সুতরাং গেট সাহেবের তথ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পণপ্রথা যেখানে পাত্রপাত্রী পক্ষের আর্থিক সুসংগতির উপর নির্ভরশীল সেখানে পণপ্রথা সমাজে কোনো বিপর্যয় বা সংকট সৃষ্টি করে না। কিন্তু যেখানে একপক্ষের লাভের ব্যাপারে অপর পক্ষ ঋণগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হয় সেখানে সমগ্র প্রথাটি সামাজিক জীবনে কুফল প্রসব করে। শিক্ষার প্রসার ও ব্যক্তির মুক্তি সংসাধিত না হইলে এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সমাজে না আসিলে পণপ্রথার ভয়াবহ পরিণাম হইতে সমাজকে রক্ষা করা যায় না। চরম অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও শেষ পর্যন্ত এই প্রথাকে আঁকাড়াইয়া কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করিতে চাহে। সেইকারণে সর্বাঙ্গীন আর্থিক মুক্তিই সমাজ জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করিতে পারে।

ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একটি নূতন অভিজাত শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে। ভূমি ব্যবস্থার অসমবন্টন এবং অত্যধিক করভার সাধারণ প্রজাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া শহরের অফিসে আদালতে চাকুরীজীবী শ্রেণীতে ধীরে ধীরে পরিণত হয়। সেই কারণে অভিজাত শ্রেণী এই পণপ্রথার মাধ্যমে নিজ নিজ সম্পত্তি অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ পাইলেও উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই পণপ্রথার কবলে বিশেষ সংকট অবস্থায় পতিত হয়। যে পিতা নিজ কন্যার বিবাহে হয়ত সর্বস্বান্ত হইয়াছে সেই পিতাই নিজ পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে পাত্রী পক্ষকে নির্মম ভাবে শোষণ করিতে ছাড়ে নাই। আবার আমাদের

দেশে বিবাহের মধ্য দিয়া পাত্রের ভবিষ্যৎ সৃষ্টির লোভ থাকে এবং পাত্রীর পিতা এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া ভালো পাত্র সংগ্রহ করে। সুতরাং, সুযোগ হিসাবে এই প্রথাটি যতই সমাজে অপ্রার্থিত হউক না কেন শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো ছল-ছুতায় টিকিয়া গিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে পণপ্রথা যে সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি সেই সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং বহুতর্ক বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রাধিকা প্রসাদ শেঠ চৌধুরী বরপণ ও ক্ষতি নামে একটি গ্রন্থের মলাটে পদ্য লিখেন 'বরপণে কি বিষম ক্ষতি পড়লে বুঝবে যাবে ভ্রান্তি'। ৬৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থে তিনি ১৮ রকম ক্ষতির উল্লেখ করিয়াছেন।

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজ প্রগতিশীল অর্থনীতিকে গ্রহণ না করিয়া অথবা গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। বিবাহ ব্যবসা এক ধরণের রক্ষণশীল অর্থনীতি। কুলীনদের বহু বিবাহ জাতি ব্যবসায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে এই ব্যবসায়ের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করা হইয়াছিল। সামাজিক অবক্ষয়ের ভয়াবহ চিত্র সে যুগের নাটক প্রহসনগুলির ভিতর বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। কুলীনদের বহু বিবাহ ব্যাপারে তথাকথিত শাস্ত্রীয় সমর্থন উল্লেখ করিয়া সাক্ষাৎ স্বর্গলাভের লোভ পর্যন্ত দেখানো হইয়াছে।

অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে কৌলীন্য প্রথা পরিবর্তিত হইলে পণ গ্রহণের এক নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার সমাদর বৃদ্ধি হইয়াছে। অভিভাবক বিদ্বান্ পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইত। গেট্ সাহেবের ভাষায়—The degree of B. A. is a very valuable asset in the matrimonial market. মোহিনী মোহন সেনগুপ্ত রচিত 'পাস করার ডাকাতি বা বর কন্যা বিক্রয়' পুস্তিকাতেও ও এই ধরণের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পণের অঙ্ক ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিখ্যাত গানে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। গানটি অমৃতলালের 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনটিতে ব্যবহৃত হইয়া জনপ্রিয় হইয়াছে।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয়,
বাঙ্গালায় কন্যাদায় যত গৃহস্থ লোকেরা মারা যায়।
পা হাত এনেট্রেন্‌স্ পাস, চায়গো রূপার থাল গেলাস
বি. এ. সোনার ঘড়া-গাড়ু, এম. এ. সর্বস্ব চায়।

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য 'বঙ্গ-বিবাহ' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'এই ব্যবসায়ে যে ব্যক্তির্ পুত্র আছে সে অতি ভাগ্যবান। কেন না এ উপার্জনে পরিশ্রম নাই, আয়াস নাই, ইহাতে রাজস্ব নাই, রাজকর নাই।

বরপণের মত কন্যাপণও সামাজিক ব্যাধিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কন্যাপণ আমাদের সমাজে এতখানি বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে—'বিয়ে ফাঁদতে কড়ি, ঘর বাঁধিতে দড়ি', প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। কন্যা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বচন অনেকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা যে কতদূর কার্যকর হইয়াছিল, সে বিষয় সন্দেহ আছে।

বাংলা প্রহসনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে যেমন একদিকে বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গী ব্যক্ত হইয়াছে, অপর দিকে এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে করা যায়, সেই সম্পর্কেও বিস্তৃত চিন্তা ও প্রচার করা হইয়াছে। সমস্যার গুরুত্ববোধ সামাজিক চিন্তার বিষয় হইয়া সমস্যার নিরসন দাবী করিয়াছে। অর্থলোভে মানুষ দাম্পত্য সম্পর্ককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছে। অমৃতলালের 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনে আছে—

ছি-ছি বঙ্গবাসিগণ ঘৃণায় কি পোড়ে না মন
পাঁঠা-পাঁঠীর মতন করে কি
বেটা-বেটি বেচতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তরে কন্যাপণ এবং বরপণ উভয়ই প্রায় সমানভাবে প্রচলিত ছিল। সেই অনুযায়ী বাংলার নাটক-প্রহসনও এই দুইটি বিষয় লইয়াই রচিত হইয়াছে। তবে উচ্চতর সমাজে ক্রমে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই হোক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, কন্যাপণ প্রথা সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়া কালক্রমে কেবলমাত্র বরপণ প্রথাই অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার ফলে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত নাটকগুলির বিষয়-বস্তুরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী নাটক-গুলির মধ্যে কন্যাপণ-প্রথার বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

Marriage by Purchase অর্থাৎ কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করা পৃথিবীর প্রায় সকল আদিম সমাজেরই একটি অতি প্রাচীন রীতি, ইহার মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক। কারণ, পরিবারের একটি কন্যাসন্তান পরিবারের অর্থনৈতিক জীবন পরিপুষ্টির সহায়ক হইয়া থাকে—গার্হস্থ্য জীবনের নানা কর্ম করিয়া পরিবারের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় সে সাহায্য করিয়া থাকে—এমন কি, প্রয়োজন বোধ করিলে সে কৃষিক্ষেত্রে গিয়া কৃষিকর্মেরও সহায়তা করিতে পারে ; সুতরাং সেই কন্যাকে যখন পরগৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়, তখন পরিবারে এই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য স্বাভাবিক সূত্রেই বরের পরিবারকে কন্যার জন্য মূল্য দিতে হয়। আদিম সমাজে এই মূল্য নগদ কিছুই ছিল না, এখনও ছোটনাগপুরের কোন কোন আদিবাসী সমাজে পরিবারকে একটি মাত্র গরু কিংবা মহিষ কিংবা কন্যার মাতাকে একখানি মাত্র বস্ত্র দিয়া এবং কন্যার পল্লী-বাসীকে কয়েক ভাণ্ড দেশীয় মদ্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়াই কন্যাকে গ্রহণ করা হয়। মাতাপিতা যেমন কন্যার উপর এই অধিকার কিছুতেই পরিত্যাগ করে না, তেমনই গ্রামবাসীরাও তাহাদের স্ব-গ্রামবাসী কন্যার উপর হইতে কোনদিন এই সামান্য অধিকারটুকুও বিসর্জন দেয় না। অথচ এই সামান্য বিষয়ের অভাবে অনেক আদিবাসী যুবককে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই সম্পর্কে একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিতে পারি। উড়িষ্যার কোরাপুট জিলার গুণুপুর তালুকের অন্তর্গত শবর বা শোরা নামক আদিবাসীর এক গ্রামে আমি যখন উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে একদিন শুনিতে পাওয়া গেল, একটি বয়স্কা কুমারী কন্যা প্রতিবেশী গ্রামের অধিবাসী এক যুবক কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছে। অবশ্য এই প্রকার অপহরণ কার্যের মূলে অপহৃতা কন্যার সম্মতি না থাকিলে তাহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না; গ্রামের মধ্যে ইহাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, এই চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়াই তিন চারিদিন কাটিয়া গেল—অপহৃতা কন্যা অপহারকের গৃহে বাস করিতে লাগিল। সহসা একদিন দেখিতে পাওয়া গেল, সমগ্র গ্রামের পুরুষ একত্র সমবেত হইয়াছে এবং তীর-ধনুক-টাঙ্গি ইত্যাদি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া কন্যা অপহারকের গ্রামের দিকে যাত্রা করিয়াছে এবং কিছুক্ষণ পরে কন্যাকে অগ্রবর্তিনী করিয়া সশস্ত্র গ্রামবাসী নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারা গেল, তাহাদের এই সশস্ত্র অভিযানের উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না—কন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, বিনা

মূল্যে যে কন্যাটিকে লইয়া গিয়াছে, ইহাতেই তাহাদের আপত্তি। যথোপযুক্ত মূল্য দিয়া, অর্থাৎ কন্যার পিতাকে একটি গাভী, মাতাকে একখানি শাড়ী এবং গ্রামবাসীকে একদিন তাড়ির ভোজ না দিয়া কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু বরের এমন সামর্থ্য নাই যে, সে এতগুলি দাবী পূর্ণ করিয়া কন্যাকে লইয়া যাইতে পারে। অথচ এই ক্ষেত্রে কন্যা এবং বর উভয়েরই যে এই বিবাহে সম্মতি ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই—কন্যাপণ, সে যত সামান্যই হোক, তাহা না দিলে মাতাপিতা যেমন কন্যার উপর অধিকার ত্যাগ করিবে না, তেমনই গোষ্ঠীসমাজের অধিবাসী গ্রামবাসীরাও তাহার উপর অধিকার পরিত্যাগ করিবে না। সুতরাং এই অবস্থায় উক্ত যুবক এবং যুবতীকে অবিবাহিত থাকা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই; সেইজন্য অনেক সময় কোন আদিবাসী যুবককে, আসামের চা-বাগান অঞ্চলে গিয়া চাকুরি করিয়া, অর্থ সঞ্চয়ের পর দেশে আসিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিতে হয়—সমবয়স্কা কন্যার তখন অভাব দেখা দেয়; বাধ্য হইয়া সে তাহা অপেক্ষা অল্প বয়স্কা কন্যাকে যখন বিবাহ করে, তখন দাম্পত্য জীবনে নানা অসন্তোষ দেখা দেয়।

সুতরাং কন্যাপণ এখানে একটি অবশ্য পালনীয় সামাজিক প্রথারূপেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ব্যতিক্রম করিয়া কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার উপায় নাই। যদি ইহা কেবলমাত্র পারিবারিক প্রথা হইত, তবে তাহা পরিবারের খামখেয়াল অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিত, কিন্তু ইহা বৃহত্তর সামাজিক প্রথা—এই সম্পর্কে গোষ্ঠীসমাজের (Community life)-ও একটি সচেতনতা রহিয়াছে, সুতরাং বিশেষ কোন পরিবার এই বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করিলেও সমাজ ইহার দায়িত্ব পালন করিতে আপনি অগ্রসর হইবে। প্রকৃত পক্ষে গোষ্ঠীজীবন হইতে মূলতঃ এই ভাবেই সকল সামাজিক প্রথার উদ্ভব হইয়াছে; সেইজন্য ইহাদিগের প্রভাব এত সুদূর প্রসারী।

বাংলার নিম্নশ্রেণীর সমাজে আজ পর্যন্ত প্রচলিত কন্যাপণের প্রথা, মূলতঃ আদিবাসী সমাজের যুগ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সমাজের অর্থনৈতিক মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এমন কি, আদিবাসী সমাজের মধ্যেও পূর্বে মাত্র চার-পাঁচ টাকা ব্যয় করিয়া যে কন্যা বিবাহ করা যাইত, সেখানেও ইহার টাকার পরিমাণ আজ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অর্থ সংগ্রহ করিবার অসামর্থ্যের জন্য বহু দরিদ্র আদিবাসী

সন্তানকে বাধ্য হইয়া অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই প্রথা বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে এতই প্রবল যে কোন কোন দরিদ্র আদিবাসী যুবক কেবল মাত্র বিবাহ করিবার প্রত্যাশায় কোন কন্যাসন্তানের পিতার নিকট আজীবন ভৃত্য বা মজুরের কাজ গ্রহণ করে, নিজের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যখন কন্যাক্রয়ের অর্থ পরিশোধ দিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তাহার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হয়। কিন্তু যে ভাবেই হোক—নগদ অর্থ, শ্রমদান কিংবা গো-মহিষাদির বিনিময় ব্যতীত পত্নীলাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। এই আদিম জীবনের সংস্কারের ধারাই পরবর্তী উচ্চতর সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইহাদের মধ্যেও কন্যাপণ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে অসমতা এবং অসঙ্গতি কখনও কখনও অনিবার্য রূপে দেখা দেয়, তাহার ফলে সমাজ-দেহ বিষাক্ত হইয়া পড়ে। বাংলার সে যুগের নাটক-প্রহসনে তাহারই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বাংলার লোক-সাহিত্য বা প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়া গীতি ইত্যাদির মধ্যে কন্যাপণের ফলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের নানা দুঃখ-বেদনার কথা, হতাশা ও বঞ্চনার কথা নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

মনুসংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পরবর্তী কাল পর্যন্ত হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র তীব্রতম ভাষায় কন্যাপণ বা কন্যাবিক্রয় প্রথার নিন্দা করিয়া আসিতেছে; ইহার নিন্দায় শাস্ত্রকারগণ 'দত্তক মীমাংসা'য় এই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ॥

অর্থাৎ ক্রয় করিয়া যে কন্যাকে বিবাহ করা যায়, (marriage by purchase) সে স্ত্রী নহে—দাসী মাত্র। এমন কি, তাহার গর্ভজাত পুত্রও পুত্রের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না, দাস-পুত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়।

ক্রীতা যা রমিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে।
তস্মাৎ যো জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্ত স স্মৃতঃ॥

বিক্রীত কন্যার পুত্র কোন ধর্মীয় অধিকার লাভ করিতে পারে না, স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাকে 'চণ্ডাল তুল্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন,

বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়াঃ পুত্রো যো জায়তে দ্বিজঃ।
স চণ্ডাল ইব জ্ঞেয়ঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ॥

ক্রীতা কন্যার পুত্র পিণ্ডদানের অধিকারী হয় না, পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীও হইতে পারে না, রাজপুত্র হইলেও যে সিংহাসনের অধিকারী হয় না, সে সকল পুত্রের অধম বলিয়া নিন্দিত হয়।

ন রাজ্ঞো রাজ্যভোক্ সম্যাদ্বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকৃন্নচ।
অধমঃ সর্বপুত্রেভ্যস্তাম্মত্তং পরিবর্জয়েৎ ॥

'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে'ও কন্যাবিক্রয়ের দোষ বর্ণনা করিয়া এই শ্লোক-গুলি উদ্ধৃত হইয়াছে,—

'কন্যবিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ।' —(পদ্মপুরাণ)
'যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো কোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংকুলম্ ॥' —(ক্রিয়া যোগসার)
'কন্যাবিক্রয়িণঃ পুংসো মুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ।
পশ্যেৎ অজ্ঞানতো বাপি কুর্যভাস্করদর্শনম্ ॥'
'যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম কন্যাবিক্রয়িণঃ পুনঃ।
শুভং তৎসকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি ॥'
'তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।'

অবশ্য শুক্রবিক্রয়ী অর্থে কন্যা এবং পুত্র উভয় বিক্রেতাকেই বুঝায়।

'ন কুর্যাদর্থ সম্বন্ধ কন্যাদানে কদাচন।' ইত্যাদি

কিন্তু এই সকল শাস্ত্রীয় বাধা নিষেধ সত্ত্বেও এই রীতি বাংলার মধ্যযুগের সমাজে উচ্চনীচ শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে যে প্রচলিত ছিল এবং তাহার ধারা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, তাহা সে যুগের কয়েকটি নাটক ও প্রহসন পাঠ না করিলে জানিতে পারা যায় না।

বাংলার একটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়, পতিগৃহ যাত্রাকালে ক্ষুদ্র বালিকাটি এই বলিয়া কাঁদিতেছে যে,

এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়া।

অর্থাৎ বেশি টাকার লোভে পিতা কন্যাটিকে বহু দূরদেশে বিবাহ দিয়া পাঠাইয়া দিতেছেন; তাহার অভিমানের অর্থ এই যে, অল্প টাকা লইলে তাহাকে গৃহের কোণেই বিবাহ দিতে পারিতেন এবং সে পিতৃগৃহ হইতে এত দূরবর্তী প্রদেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার বেদনা অনুভব করিত না। যেখানে টাকা-কড়ির ব্যাপার, সেখানে ক্রমে হৃদয়হীনতার ভাবটি সহজেই আসিয়া যায় এবং একটি ব্যবসায়-বুদ্ধির সৃষ্টি হয়; অর্থের আকর্ষণই পিতার হৃদয় হইতে কন্যার

প্রতি স্নেহের অনুভূতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। কারণ, প্রলোভনের ত অন্ত নাই; পিতার এই হৃদয়হীন প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া, অসহায় কন্যা কি ভাবে যে বলি প্রদত্ত হইত, তাহার কথাই এই নাটকগুলির মধ্যে আছে। যাঁহার অধিক কন্যা থাকিত, সে সমাজের সকলের ঈর্ষার কারণ হইত ; কারণ, তাহার দারিদ্র্য অবস্থা হইতে ধনবান্ হইবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের মধ্যে এমনই একটি উপকাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এক বৈদিক ব্রাহ্মণ চারিটি কন্যা বিক্রয় করিয়া খড়ো ঘর হইতে 'কোঠা-বাড়ী' করিয়াছেন, কিন্তু তাহারই অন্য ভ্রাতৃজায়া কেবল মাত্র পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াই দরিদ্র হইয়াছেন। সেই জন্য বৈদিক সমাজে কন্যা জন্মই প্রার্থিত ছিল, পুত্রজন্ম প্রার্থিত ছিল না।

রাধাবিনোদ হালদারের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮৫) প্রহসনে কন্যাপণ লোভী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ জাতিকে গো ব্যবসায়ী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

হরিশচন্দ্র মিত্রের 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' (১৮৬৩) প্রহসনে বলা হইয়াছে, কন্যার পিতারা কশাইয়ের মত। স্বর্ণের বিনিময়ে কানা, কুঁজো যে কোনো পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করিতে তাহারা প্রস্তুত। এই ধরণের কন্যার পিতার কথা 'কনের মা কাঁদে' (১৮৬৩) প্রহসনেও ব্যক্ত হইয়াছে।

স্বনামধন্য শিশির কুমার ঘোষ কন্যাপণের উপর বিখ্যাত প্রহসন 'নয়শো রুপেয়া' রচনা করিয়াছিলেন। রামধনের অর্থলোভ অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে সেখানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থটির একস্থলে সাতু রামধনকে বলিয়াছে, কলিকাতায় মেয়ে লইয়া গেলে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম উঠিবে। ক্রেতা হিসাবে সোনার বেনেরা উক্ত টাকা দিতে সক্ষম সে কথাও বলা হইয়াছে। প্রহসনে বিধবা কন্যার মূল্য আটশত টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে এবং বুড়ো বরের মৃত্যু হইলে পুনরায় পাঁচ-সাতশ টাকা পাওয়া যাইবে। রামধনের একটি মাত্র কন্যা। তাহার বিবাহ হইলে বিক্রয়ের জন্য আর কন্যা থাকিবে না, সেজন্য তাহাকে হা-হুতাশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রোত্রিয় পাত্রদের অতিকষ্টে টাকা সংগ্রহ করিয়া বিবাহ করার ইতিহাস অতীব মর্মান্তিক। কন্যা কামনায় দিন গণিবার আগেই কার্তিকের গৃহশূন্য হয় ; তাহার ফলে সকল আশা জলাঞ্জলি দিতে হয়। বিধবা-বিবাহ, ব্রাহ্ম

কন্যা বিবাহ, বোষ্টমী সংগ্রহ প্রভৃতি বিকৃত মনোভাব এই প্রহসনের বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কন্যাপণ যেমন আমাদের সমাজে আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতিকারক হইয়া দেখা দিয়াছিল, অপর দিকে যৌন ব্যাপারে অযোগ্য বিবাহের দৃষ্টান্তও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। 'ষষ্ঠী বাটা' প্রহসনের নায়িকা মৃত্যুর পূর্বে সোচ্চারে ঘোষণা করিয়াছে যে, কেহ যেন কখনও অযোগ্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ না করে। কন্যাপণের মত বরপণ সামাজিক সংকটকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। রামকৃষ্ণ রায় 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র প্রহসনে' (১৮৯০) বরের লোভী বাপকে চিত্রিত করিয়াছে। একস্থলে লোভেন্দ্র বলিতেছে; 'যাকে বাঙালায় বলে আদর্শ বরের বাপ। অন্য অন্য বাবারা আমার কাছে ছেলে রূপ পাঁঠা বেচা শিখে নিক।' দুর্গাদাস দে রচিত 'ছবি' (১৮৯৬) প্রহসনে কালাচাঁদ বলিয়াছে—চালের দরের মতন ছেলের দর খুব বাড়ছে'। হীরালাল ঘোষের 'রোকা কড়ি চোকা মাল' (১৮৭৯) প্রহসনেও একই প্রকার বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

'বিয়ের বাজার' শব্দ আমাদের সমাজে বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ প্রচলিত। 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র প্রহসনে' লোভেন্দ্র গান ধরিয়াছে—

এক এক ছেলে দশ হাজারে
বেচবো কসে বে'র বাজারে
মেয়ের বাবার দফারফা
ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দেবো।

বিবাহে মেয়ের বাপের যে সত্য সত্যই দফা রফা হয়, কন্যাদায় কথাটি উল্লেখ করিলেই তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রমাণিত হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কন্যাদায়' (১৮৯৩) প্রহসনে চন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়া বলিয়াছে—'মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে লোকের সর্বনাশ করে ছেড়ে মূর্খ ছেলের বে তে সর্বগ্রাস করে, মেয়ের বাপ মাকে পথের ভিখারী করে, টাকা নিয়ে কি তারা স্বর্গ সুখ পাবেন।' অমৃতলাল বিশ্বাসের 'গাঁয়ের মোড়ল' প্রহসনে আছে যে, রামসদয়ের স্ত্রী রামসদয়কে সতর্ক করিয়া বলিয়াছে যেন সে কন্যাদায় মাথায় লইয়া গাঁয়ের মোড়লের বিরুদ্ধাচরণ না করে। এখানে শুধু আর্থিক চাপই নহে, সামাজিক চাপও যথেষ্ট আছে। যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলা-চিত্ত-চাপল্য' (১৮৫৭) প্রহসনে অবিবাহিতা

তিনটি কন্যাকে এক পাত্রে সমর্পণের অভিলাষ জানাইয়াছে। জামাতার মৃত্যুতে তিন কন্যার একই সঙ্গে বৈধব্যবরণ জড়িত থাকা সত্বেও ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাহাদের আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'এই কি সেই' (১৮৭৯) প্রহসনে শরতের স্বগতোক্তিটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মত— 'ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদায় যেরূপ বিষম দায়, এমন দায় আর দুটি দেখতে পাই না।'

পণপ্রথার এই ভয়াবহ পরিণতি হইতে সমাজকে কি উপায়ে রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে সে যুগের প্রহসন রচয়িতাগণ নানাভাবে চিন্তা করিয়াছেন। সমস্যার জটিলতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অনেকে সমাধান কল্পে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিগত বিদ্রোহ, সমস্যা নিরসনের একমাত্র পথ বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। প্রণয়ঘটিত বিবাহ, কেহ কেহ অনুমোদন করিয়াছেন। সরকারী আইন প্রয়োগ করিয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও অনেকে উপদেশ দিয়াছেন। সমস্যাটি যে সেই যুগের চিন্তানায়কগণকে বিশেষ ভাবে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল, ঐ সমস্ত মতামত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রহসনগুলির কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সমাজ-সংকটের একটি সম্পূর্ণাঙ্গ চিত্র যে পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কন্যাপণ সম্পর্কিত কয়েকটি নাটক এবং প্রহসনের নিম্ন-বর্ণিত কাহিনী আলোচনা করিলে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়।

'কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে' (১৮৬৩) প্রহসনটির রচয়িতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। কন্যাপণের বিরুদ্ধে—কন্যাকর্তার অর্থলোভ যে কি প্রকার নির্লজ্জ ও হৃদয়হীন আলোচ্য প্রহসনটি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; অবশ্য শুধু আর্থিক লোভই বড় কথা নহে, অযোগ্য বিবাহ ও যৌন সমস্যাও এই প্রহসনের মূলে আছে।

রায় মহাশয়ের কন্যা বিবাহ-উপযুক্তা হইলে তাহাকে যে কোনো পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া মোটা টাকা সংগ্রহ করাই ছিল রায় মহাশয়ের উদ্দেশ্য।

লেখা পড়া বুঝে কিবা আছে প্রয়োজন,
বেশি পণ যেবা দিবে সুপাত্র সেজন।

সুপাত্রের নূতন সংজ্ঞা আমাদের মনে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করে। ঘটক সম্প্রদায় বিভিন্ন পাত্রের সন্ধান আনে। কিন্তু রায় মহাশয়ের সহিত দরে পোষায় না। রায় মহাশয় বলেন, 'আজকাল আঁতুড়ে মেয়েদের দর কত! আঁতুড় খরচ, আর এই যে এগারো বছর খাওয়ানো গিয়েছে, তাতে কি কম খরচ হোয়েছে! লোকে আমাদের পাঁঠি বেচা বামুন বলে; কিন্তু তলিয়ে বুঝে না যে কত ধানে কত চাল হয়? আপনারা বে করবো টাকা দিয়ে, আমার মেয়ের বিয়েও যদি টাকা দে দিব, তবে আমাদের দশা কি হবে?' ঘোষাল ঘটক রায় মহাশয়কে দর কমাইতে অনুরোধ করিলে তিনি সখেদে বলেন, 'একশ', দেড়শো টাকায় ভাল মেয়ে পাওয়া যায় সত্য, ওদিকে জেতের বিষয় অনেকের ও কর্ম হোয়ে যায়।' ঘটক বড়াল মহাশয়কে রায় মহাশয় বলেন; 'মোশায়। আমাদের ঘরের একটি মেয়ে পাবার তরে কত লোক মুখচেয়ে থাকে, কত লোক আগামী দুশো, একশো টাকা বায়না দে রাখে, আমরা ভরদ্বাজী রায়, আমাদের ঘরের মেয়েরা প্রায়ই মা গোঁসাই হয়, কেমন সুখে থাকে। রায় মহাশয় অতিশয় চতুর ব্যক্তি। দর কম উঠিবে বলিয়া মেয়ের বিবাহ অল্প বয়সে দিতে তিনি নারাজ। মেয়েকে ঘরে বসাইয়া রাখিবার মত অর্থ-সঙ্গতি তাঁহার আছে। সুতরাং দর কষাকষি তিনি চালাইয়া যান।

অবশেষে এক বৃদ্ধ বর আট শত টাকার প্রস্তাব লইয়া তাঁহার কাছে আসে। রায় মহাশয় মনে মনে বেজায় খুশী। ঘরখরচা বাবদ পাঁচ-সাত টাকা মাত্র খরচ করিয়া বাকী টাকায় যে তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বনিয়া যাইবেন, সে সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকেন। অবশ্য এই সম্বন্ধে প্রতিকূলতা করেন রায় গৃহিণী। তাঁহার একজন মনোমত পাত্র ছিল। পাত্র উকীল এবং বয়সে যুবক। দেড়শো টাকার বেশি দিবার ক্ষমতা অবশ্য তাহার নাই। উকীলের পেটে জিলিপির প্যাঁচ। সুতরাং তাহাকে জামাই করিতে রায় মহাশয় নারাজ। যাহাই হউক, রায় মহাশয়ের ব্যবসায়ী বুদ্ধিই পরিণামে জয়যুক্ত হয়। বিবাহের দিন বৃদ্ধ বর বিবাহ সভায় আসে। প্রতিবেশীরা ব্যাপারটি প্রথমে গ্রহণ করে কৌতুকের সঙ্গে। তাহাদের ধারণা বরের ঠাকুর্দা বুঝি ঠাট্টা করিয়া বরের অভিনয় করিতেছে। কিন্তু কন্যার মাতা বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিতে পারিয়া কান্নায় অধীর হইয়া যান। কয়েকজন মদ্যপায়ী বিবাহ সভায় প্রবেশ করিয়া এই তথাকথিত শিব-বিবাহে

নন্দী-ভৃঙ্গির অভিনয় করে এবং মাতলামী করিতে থাকে, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ বরের পুত্রও ছিল। হঠাৎ তাহার খেয়াল হয় যে, পিতার বিবাহ দেখিতে নাই, তাই সে অন্যত্র চলিয়া যায়। অন্যেরা মাতলামী করিতে থাকে। ঘটক তাহাদের মাতলামীর নিন্দা করিলে তাহাদের একজন বলে যে, অমানুষ তাহারা নহে, অমানুষ ঘটক, তাহা না হইল এই অসম বিবাহ সে দেয় কেমন করিয়া? রায় গৃহিণী তো কিছুতেই এই বৃদ্ধ বরের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবেন না। রায় মহাশয় ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়া গৃহিণীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। কটুক্তি উভয়তই চলিতে থাকে। অবশেষে সমস্ত টাকাগুলি গৃহিণীকে দিবার প্রতিশ্রুতিতে গৃহিণীর মন গলিয়া যায়। চোখে জল, কিন্তু মুখে হাসির রেখা আভাসিত হয়। কন্যার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে টাকার পুঁটলি বাঁধিতে থাকেন।

সমগ্র ব্যাপারটি কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই। কিন্তু কৌতুকের আড়ালে সমাজ-বিধির প্রতি যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লুক্কায়িত আছে এবং সেই বিদ্রূপের হুল কতখানি জ্বালাময় তাহা সহজেই অনুমেয়।

'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'(১৮৮৬) প্রহসনটির রচয়িতা রাধাবিনোদ হালদার। এই প্রহসনটিতেও অযোগ্য বিবাহ, অর্থগৃধ্নুতা ও কন্যাপণের উৎকট দিকটি সুপরিস্ফুট করিবার প্রয়াস আছে। কন্যাপণ সমাজে ব্যাধিরূপে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যত্বকে কি ভাবে লাঞ্ছিত করে, তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আলোচ্য প্রহসনের ছত্রে ছত্রে অনুভূত হয়। প্রহসনটিতে দেখানো হইয়াছে, ভজহরির কন্যা সুশীলা। সে সমর্থা ও সুন্দরী। ভজহরির কাছে সেই কারণে বহু ব্যক্তি যাওয়া আসা করে। বিবাহের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু কেহই ভজহরির টাকার অঙ্কে টিকিয়া উঠিতে পারে না। ভজহরি সেই কারণে সর্বদাই বিরক্ত।

নটবর এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ভজহরির নিকট বিবাহ প্রস্তাব দেয়। ভজহরি তাহা প্রত্যাখ্যান করে। নটবর তাহাকে শাসায়। ভজহরির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চারুশীলা। প্রথম পক্ষের স্ত্রী সুহাসিনীর সন্তানাদি না হওয়ায় ভজহরি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। দুই সতীনে দিবারাত্র কলহের দরুণ ভজহরির প্রাণ কণ্ঠাগত। চারুশীলারই কন্যা সুশীলা। চারুশীলা সুশীলার বিবাহ ভালো ঘর-বরে হয় এবং শ্বশুর বাড়ীর আদরের বউ হয়, তাহাই কামনা করে। সেই কারণে চারুশীলারও আশার অন্ত নাই। একদিন চারু ভজহরিকে ভাত খাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে

সুশীলার বিবাহের কথা উত্থাপন করে। এমন সময়, সুহাসিনী দুইজনকে একত্র দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয় এবং চারুকে নানা প্রকার বাক্য যন্ত্রণায় পীড়ন করিতে থাকে। চারুশীলাও ছাড়িবার পাত্রী নহে। প্রত্যুত্তরে কড়া কড়া অম্লমধুর বাক্য সুহাসিনীকে শুনাইয়া দেয়। দুই সতীনের তুমুল দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক বিদ্রূপবাণে ভজহরি অস্বস্তি বোধ করে এবং মনে মনে নিজেকে দুই বিবাহ করার দরুণ ধিক্কার দিতে থাকে। ভজহরি সুশীলার বিবাহের জন্য এক অশীতিপর বৃদ্ধ পাত্র স্থির করিয়া চারুশীলাকে নানা স্তোকবাক্য দিতে থাকে। অর্থলোভী ভজহরি বৃদ্ধের সঙ্গে সুন্দরী কন্যার বিবাহ দেন। বৃদ্ধ তারাচাঁদ ভট্টাচার্য যজমানি করিয়া কোনক্রমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। সুশীলার দুঃখের আর অন্ত নাই। আদরের সুশীলার অবস্থা বৈগুণ্যে লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। তাহা ছাড়া অসম বিবাহ সুশীলার দাম্পত্য জীবনকে নিরানন্দ করিয়া তোলে। এদিকে অপমানিত নটবর কুটনী কমলার সহায়তায় সুশীলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। ছেলেবেলায় সুশীলা যখন স্কুলে যাইত, তখন হইতেই নটবরের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেই কারণে নটবর মদ্যপ হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রতি সুশীলা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে।

তারাচাঁদের অনুপস্থিতিতে নটবর সুশীলার গৃহে আসে এবং প্রেমালাপে মত্ত হয়। কিন্তু এই প্রেমালাপ তাহাদের ভালো লাগে না। তাহারা বিদেশে যাইবার সংকল্প করে। কিন্তু সেই সংকল্পকে কাজে লাগাইতে তাহারা নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করে। সুশীলা ফন্দি-ফিকির করিয়া বৃদ্ধের মন জয় করে এবং বৃদ্ধকে কাশী যাইবার জন্য অনুরোধ করে। বৃদ্ধ তরুণী ভার্যার আবেদনে সাড়া দেয় এবং সুশীলার সঙ্গে কাশী যায়। নটবরও সুশীলার কথা মত কাশী যায় এবং কৌশলে বৃদ্ধকে প্রতারিত করিয়া নটবরের সহিত মিলিত হয়।

উপরোক্ত প্রহসনে অর্থলোভ, অসম বিবাহ এবং গোপন সুড়ঙ্গ পথে যে অবৈধ প্রণয় প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহা কন্যাপণের বিষময় ফলেরই পরিণতি। সুশীলার চারিত্রিক বিপর্যয়ের মূলে সমাজ নীতির সকরুণ পরিহাসই বিশেষ ভাবে বিজড়িত।

ইহার পর শিশিরকুমার ঘোষ রচিত 'নয়শো রূপেয়া' (১৮৭৪ খৃঃ) প্রহসনটির নামকরণের ভিতরেই ইহার অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অর্থলোলুপতার সুতীব্র ইঙ্গিত। কন্যা এবং পণ্যদ্রব্য যে সমার্থক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে তাহা রূপায়িত করাই লেখকের অভিপ্রেত। যৌন সমস্যার দিকটিও লেখক আলোচ্য

প্রহসনে সমান গুরুত্ব দিয়াছেন। 'নয়শো রূপেয়া'র কাহিনীতে দেখা যায় যে, রামধন মজুমদার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। আপন ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে বিবাহ করিয়াছিল। সেই কারণে তাহার মনোগত ইচ্ছা ছিল, যদি তাহার কন্যা হয়, তবে কন্যা বিক্রয় করিয়া ভ্রাতা সাতুলালের বিবাহ দিবে। কন্যা বড় হইলে বহু পাত্র ও ঘটক রামধনের নিকট কন্যার বিবাহের প্রস্তাব আনিতে লাগিল। কিন্তু কোনো প্রস্তাবই তাহার মনোমত হইল না। টাকার অঙ্কে সবাই পিছাইয়া গেল। রামধনকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল।

অপরদিকে প্রতিবেশী ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় রঞ্জনের সঙ্গে রামধনের কন্যা সরলার খুব ভাব। রঞ্জন ও সরলা দুই জনেই যৌবনে পদার্পণ করিলে উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা জন্মায়। রঞ্জনের সঙ্গে সরলার মেলামেশাতে কাহারও কোনো আপত্তি ছিল না। রঞ্জন সরলাকে পড়াশুনা দেখাইয়া দেয়। কিন্তু সরলার বিবাহের প্রস্তাব আসিলে রঞ্জন কেমন উদাস হইয়া যায়।

বনগ্রাম হইতে হলধর নামে এক ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব লইয়া রামধনের গৃহে আসে। রামধন সকল প্রকার ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া হাজার টাকা পণ দাবী করে। প্রতাপকাটির মুখুজ্জেরা নাকি তাহাকে ৭০০৲ টাকা দিতে চাহিয়াছে। গ্রামের বুড়ো মুখুজ্জে নাকি নিজেই ৮০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত। হলধর অনেক বোঝানো সত্ত্বেও রামধন গোঁ ছাড়িলে না। হলধর তাহাকে দুই কথা শুনাইতেও ছাড়ল না। ভাই সাতুলাল রঞ্জনের সঙ্গে সরলার বিবাহের প্রস্তাব তুলিলে রঞ্জন গরীব বলিয়া রামধন আপত্তি করিল। সাতুলাল গাঁজা-খোর, তবু উদারতা দেখাইয়া সে নিজ বিবাহ-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া রঞ্জনের সহিত সরলার বিবাহ দিতে বলিল। রামধন ভাবে, গাঁজা সাতুলালের সমস্ত বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ করিয়াছে।

ইহার ভিতর গোপীনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে এক কৌতুককর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। গোপীনাথের জামাতা গোপীনাথের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল টাকার বিনিময়ে। কিন্তু সব টাকা সে দেয় নাই বলিয়া গোপীনাথ কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠান নাই এবং জামাইকে কন্যার সহিত মিলিত হইতে দেন নাই। এক বিবাহোপলক্ষ্যে জামাই গোপীনাথদের গ্রামে আসিলে গোপীনাথের স্ত্রী কৌশলে জামাতাকে ডাকিয়া আনেন এবং কন্যা বামার সহিত মিলিত করিয়া দেন। জামাতার শয়ন কক্ষে রাত্রে বামাকে প্রেরণ করেন। নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোপীনাথ সর্ব বিষয় অবগত হইয়া জামাতাকে তীব্রভাবে

গালিগালাজ করিতে থাকেন। তাঁহার চিৎকারে পাড়াপ্রতিবেশী ভাবে ডাকাত পড়িয়াছে। সাতুলাল আসিয়া রাত্রের মত গোপীনাথকে নিরস্ত করে এবং জামাতাকে খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করিতে পরামর্শ দেয়। বাহিরে পাল্‌কী বেহারা সব প্রস্তুত ছিল। ঐ ঘরেই গোপীনাথের ৩৫০৲ টাকা পোঁতা ছিল। জামাতা সেই টাকা ও বামাকে লইয়া পলায়ন করে। পরদিন গোপীনাথ সর্ব বিষয়ে অবগত হইয়া টাকার শোকে পাগল হন ও স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিতে থাকেন।

গাঁজাখোর সাতুলাল শ্রোত্রিয়দের বিবাহ ব্যাপার লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করে। রঞ্জনের মামা কান্তি মজুমদার বয়স হওয়া সত্ত্বেও অর্থের অভাবে নিজে বিবাহ করিতে পারেন নাই এবং তিনটি ছোট ভাইয়েরও বিবাহ দিতে পারেন নাই। সাতুলাল একটি ফন্দি আঁটে। ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চারিজন প্রৌঢ়া ভগ্নীকে সাতুলাল বলে যে, কান্তি মজুমদারের বাড়ী মহাভারত পাঠ হইবে —তাহারা যেন শুনিতে যায়। কান্তি মজুমদারের বাড়ী তাহারা উপস্থিত হইলে মজুমদারের চারি ভ্রাতার সহিত ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চারি ভগ্নীর মিলন সাতুলাল সম্পাদন করে। সকলে যখন ছিঃ ছিঃ বলিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকে, তখন সাতুলাল বলে, ইহার জন্য সমাজই দায়ী।

কানাই ঘোষালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শশীর মার কাছে রঞ্জনের যাতায়াত আছে। শশীর মা রঞ্জনকে ছেলের মত ভালবাসে। শশীর মার পরপর দুইটি ছেলে মেয়ে মারা যাইবার পর সকলের সম্মতিক্রমে কানাই ঘোষাল কাশী নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে। সরলারও এই বাড়ীতে যাওয়া আসা আছে। রঞ্জন একদিন এইখানে সরলাকে জানায় যে, কাশীতে তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি মৃত্যুকালে কিছু দেনা রাখিয়া গিয়াছেন। সেই দেনা পরিশোধ করিয়া এক হাজার টাকা হয়তো সে সংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু বিবাহের পর সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া যাইবে। তবু সরলার জন্য সে সর্ব দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত। অন্তরাল হইতে 'লভে'র ব্যাপার শুনিয়া সাতুলাল বলে, সরলা রঞ্জনের মামাতো বোন। শশীর মাও এই বিবাহে আপত্তি করে। রঞ্জনের মুখ কালো হইয়া যায়। সরলা অজ্ঞান হইয়া যায়। ডাক্তার-বৈদ্যি আসে। সাতুলাল বলে আসল রোগ প্রেমঘটিত। পরে সরলা সুস্থ হইয়া উঠে।

রঞ্জন হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতিতে রামধন এই বিবাহে মত দেয়।

একে রঞ্জনের অশৌচ, তাহার উপর মামাতো বোন' এই বলিয়া গ্রামবাসী ঘোঁট পাকায়। পুরোহিত ও বিদ্যাভূষণ ১০০৲ টাকা আদায় করিয়া এই বিবাহে মত দেয়।

বিবাহের ব্যবস্থা পাকাপাকি হইলে সরলার মনে আত্মদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সে এই বিবাহ না করিতে রঞ্জনকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু রঞ্জন আশাহত হইয়া তাহাকে এক উদ্ভট পরামর্শ দেয়। বিবাহের পর তাহারা ভাই-বোনের মত থাকিবে এবং রঞ্জনকে আর একটি বিবাহ করিতে হইবে—ইহাতে রঞ্জন আরও দুঃখিত হয়। তখন সরলা বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে অনুমোদন আনিতে বলে। রঞ্জন তাহাতে রাজি হয়।

ইতিমধ্যে আর একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হইল যে, রঞ্জন আসলে শশীর মার ছেলে। কানাই ঘোষাল এই সংবাদ অবগত হইয়া শশীর মার প্রতি এতদিন বিরূপ ব্যবহার করিবার জন্য ক্ষুব্ধ হইলেন। সাতুলাল সমস্ত ব্যাপারটি জানিয়া-শুনিয়া মজা করিবার জন্য বিবাহ সভায় উপস্থিত হইল।

বিবাহ সভায় রঞ্জনের ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বন্ধু নবীন হিন্দুদের পৌত্তলিকতাকে ব্যঙ্গ করিয়া এ বিবাহ যে অসিদ্ধ, তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইল এবং অনুতাপ করিতে লাগিল। রঞ্জন ১০৲ টাকা কম দেওয়ায় রামধন খুব অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সুযোগে সাতুলাল রামধনের সমালোচনা করিতে লাগিল। সাতুলাল বিদ্যাভূষণকেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। রামধন অবশেষে বৃদ্ধ মুখুজ্যের সঙ্গেই বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। অবশেষে কানাই ঘোষাল সব রহস্য উন্মোচন করিয়া, রঞ্জন যে তাঁহারই পুত্র, এই কথা ঘোষণা করায়, সানন্দে সরলার সহিত রঞ্জনের বিবাহ হইয়া গেল।

'অম্বুরোদ্বাহ' (১৮৬৯) নামক প্রহসনটির রচয়িতা 'জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ;' রচয়িতার প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কন্যাপণ সম্বন্ধীয় ব্যবহার কুৎসিৎ। কাহিনীর ভিতরে দেখা যায় যে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হরিহর চক্রবর্তীর স্ত্রী কামিনীর নিকট প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণ কন্যা ক্ষীরোদা বর্তমান যুগের বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করে। আলোচনার বিষয়বস্তু—কন্যার পিতারা হৃদয়হীন। অর্থলোভে বিগতযৌবন, পলিতকেশ বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিতে তাহারা প্রস্তুত। ক্ষীরোদা নীরবে এ সমস্ত কথা শুনিয়া যায়, কোনো উত্তর দেয় না। এমন সময় সৌদামিনী নামে কায়স্থ কন্যা আসিয়া কামিনীকে ও'পাড়ার কেদার

নাথ রায়ের সঙ্গে কামিনীর কন্যা জ্ঞানদার বিবাহ দিতে বলিলে প্রত্যুত্তরে কামিনী জানায় যে, তাহার কর্তা কেদারের সহিত কিছুতেই বিবাহ দিবেন না; বরঞ্চ যেখানে দশ টাকা বেশী পাইবেন, সেইখানে কন্যার বিবাহ দিবেন। শ্রোত্রিয় সমাজের কন্যাপণ লইয়া কামিনী দুঃখ করিতে থাকেন। কেদারনাথ অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে যাইতে বদ্ধপরিকর। বন্ধু শ্যামাচরণ তাহাতে আপত্তি জানায়। শ্যামাচরণও অবিবাহিত। কেদার নাথ শ্যামাচরণের নিকট জানিতে পারে, টাকার সঙ্গতি না থাকায়, তাহাকে অবিবাহিত থাকিতে হইবে। তাহাদের কথাবার্তার মধ্যে কৈলাসচন্দ্র নামে কুলাচার্য আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাহাদের কথাবার্তার সূত্র ধরিয়া মন্তব্য করেন, পণ লওয়া পাপ, ক্রীত কন্যার সন্তান আইন সঙ্গত নহে।

জ্ঞানদার জন্য ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে সম্বন্ধ আসে। তাহারা ৪০০৲ টাকা পণ হিসাবে দিতে রাজি। কিন্তু কামিনীর নিকট সৌদামিনী শুনিয়া অবাক হয় যে, তিন বছরের জ্ঞানদার সঙ্গে ছত্রিশ বছরের পাত্রের বিবাহ হইবে। কামিনী বলে কর্তার নাকি আরও পাঁচটাকা বেশি পাইলে তবেই কন্যার বিবাহ দিবেন। সৌদামিনী হরিহর বাবুর অর্থলোভ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। ঘটকও লোভের বশবর্তী হইয়া পাত্র সম্পর্কে নানা তথ্য অপ্রকাশিত রাখিয়াছে। পাত্র বেকার এবং নিঃসম্বল, সে কথা হরিহরকে বলে নাই। কেদারের জন্য ঘটক একটি সম্বন্ধ আনে। তাহার দাবী ৬০০৲ টাকা। কেদারের বাবার বন্ধু গঙ্গাপ্রসাদ বলেন, মেয়েটির জন্য ৪০০৲ টাকা পর্যন্ত খরচ করিতে পারেন। অবশ্য মেয়েটি বয়স্থা, কিন্তু বিবাহ হইলে ভাল মানাইবে। একদিনে জ্ঞানদার সঙ্গে একটি পাত্রের এবং কেদারের সঙ্গে একটি পাত্রীর বিবাহ স্থির হয়। জ্ঞানদা কাহার যে বিবাহ, তাহা বুঝিতে পারে না। সৌদামিনীর মুখে কেদারের বয়স্থা পাত্রীর সহিত বিবাহ শুনিয়া কামিনী বিরূপ মন্তব্য করে। গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে যথারীতি কেদারের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহ হয়। ঐ দিনেই হরিহরের বাড়ীতে প্রৌঢ়ের সঙ্গে শিশু জ্ঞানদার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীর মেয়েরা বর দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয়। ইতিমধ্যে কেদারের বিবাহ সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাপ্রসাদ হরিহরের বাড়ীতে আসেন। হরিহরের বাড়ীতে পণ লইয়া বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। মেয়ের মানসিকের কথা তুলিয়া হরিহর আরও ২৫৲ টাকা দাবী করে। বর কিন্তু যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ৫১০৲ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি। বুড়ো বর তাহাতেই রাজি হয়। টাকা

পাইয়া হরিহর আরও চল্লিশ টাকা চাহে। বরকর্তা অভয়াচরণ তখন ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু বর টাকা দিতে স্বীকৃত হন। হরিহর আরো কুড়ি টাকার দাবী তুলিলে বরের নির্দেশে বরকর্তা সব দাবী মিটাইয়া দেন; এমন কি, আঁতুড় খরচার জন্য বরের নির্দেশে বরকর্তা আরও ৫০৲ টাকা তুলিয়া দেন। বিবাহের পর বর বুঝিতে পারে যে, বিবাহের নামে তাহার ভিক্ষুকের অবস্থা লাভ হইয়াছে। ওদিকে বিবাহের পর কেদারনাথ জানিতে পারে তাহার বিবাহিত স্ত্রী বিধবা; অর্থলোভে আর একবার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই বিবাহ অসিদ্ধ। সমাজ তাহাকে 'একঘরে' করিবে। কেদারের নব-বিবাহিতা স্ত্রী কুমুদিনী নিজের অতীত চিন্তা করে। যদিও শৈশবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল এবং সে বিবাহ তাহার মনে নাই, তবু আজন্মের সংস্কার তাহাকে পীড়িত করে। কেদারের মা রেবতী কুমুদিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহাকে আদর করেন। সৌদামিনী ভাবেন কুমুদিনীর বুঝি বাপের বাড়ীর জন্য মন ছটফট করিতেছে।

সমাজ কেদারকে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে বলিলে, নিরপরাধা অনাথা স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে কেদারের বাধে। শ্যামাচরণ পরামর্শ দেয়, ব্রাহ্মণেরা অর্থ লোভে এই নির্মম বিধান দিয়াছে। সকলের মুখ রক্ষার জন্য কুমুদিনীকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির হয়, উদ্দেশ্য তাহাকে পরিত্যাগ করা।

মুথাভাঙার কাছাকাছি পাল্কী আসিলে হরিহরের নির্দেশে আহ্লাদী দাসী তাহার গাত্র হইতে আভরণ খুলিতে গেলে কুমুদিনী স্বেচ্ছায় খুলিয়া দেয় এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত হইয়া আহ্লাদীর সঙ্গে পিতৃগৃহে যায়। আহ্লাদী কন্যাকর্তা মামাকে এক পত্র দেয়। সে পত্র হরিহরেরই লেখা। তাহাতে লেখা ছিল, কেদার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কালীপ্রসাদও কুমুদিনীকে ব্যাভিচারিণী বলিয়া নিন্দা করে এবং তাড়াইয়া দেয়। হয় পতিত জীবন যাপন, নয় দাসীবৃত্ত করা ছাড়া কুমুদিনীর নিকট কোনো পথ নাই। সেই কারণে সে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়। তাহার শেষোক্তি—'হে ভগবান, আমি আত্মঘাতী হইয়া সংসার যাত্রা সংবরণ করি। মৃত্যু আশ্রয় ব্যতীত এই হতভাগিনীর আশ্রয় নাই। তোমার কাছে যেন স্থানচ্যুত না হই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

কন্যাপণের উপর তীব্র ঘৃণা ও সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ লইয়া কুমুদিনী আত্মহত্যা করে।

'রোকাকড়ি চোকামাল' হীরালাল ঘোষ প্রণীত। (১৮৭৯)। এই প্রহসনে প্রহসনকার পাত্রকে পণ্যদ্রব্যের সামিল করিয়া দেখিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব ও মানবতার স্থান মানুষের জীবনে নিতান্তই যে অকিঞ্চিৎকর তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কাহিনী এই প্রকার—গোবরডাঙার রাখালচন্দ্র রায়ের বিবাহযোগ্যা কন্যা কুসুমকুমারী। রাখালের স্ত্রী কুসুমের বিবাহের জন্যে রাখালকে বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। পাড়ার অল্প-বয়সী কন্যা কুমুদিনীরও বিবাহ হইয়া গেল, অথচ এ সম্পর্কে রাখাল যে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহার জন্য স্বামীকে বিশ আইনের কথা তুলিয়া বিবাহ ব্যাপারে সত্বর উদ্যোগী হইতে বলেন। ইতিমধ্যে ঘটকী আসে, ইচ্ছাপুরের ৪৫ বৎসর বয়স্ক পাত্রের সন্ধান লইয়া। তাহারা দেনাপাওনা পূর্বে স্থির করিয়া তাহার পর পাত্রী দেখিতে চাহে। রাখালের জিদ আছে। কন্যাকে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করিবার দিকে তাহার তেমন মত নাই। ইচ্ছাপুরের পাত্রের সহিত বিবাহ না হইলে তিনি ব্রাহ্মমতে নি-খরচায় কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত। তাহার ধারণা কন্যা বড় হইলে অনেকেই বিবাহের জন্য সাধাসাধি করিবে। এলোকেশীর ইচ্ছা কিন্তু স্বতন্ত্র। কন্যার সত্বর বিবাহ হউক ইহা যেমন তাহার কাম্য আবার বৃদ্ধের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতেও তিনি নারাজ। রাখাল ইহাতে এলোকেশীকে কন্যা সন্তান প্রসব করার জন্য ধিক্কার দেন এবং বলেন অল্পবয়সের পাত্র জোগাড় করিতে হইলে প্রচুর পণ লাগে। অবশেষে খাঁটুরা হইতে একটি সম্বন্ধ আসে। রাখাল তাহার ভাই রাসবিহারীকে সঙ্গে লইয়া খাঁটুরায় যান। বসন্তবাবু (পাত্রের পিতা) পাত্রের গুণগান করিয়া এক দীর্ঘ ফর্দ রাখালকে দেন এবং বলেন 'রোকাকড়ি চোকামাল, যেমন জিনিস তার তেমনি দর।' বসন্তবাবুর পুত্রের নাম চারুচন্দ্র। রাখাল ছেলের বিদ্যা পরীক্ষার জন্য গণ্ডাকিয়া বলিতে বলেন। চারুচন্দ্র জবাব দিতে পারে না এবং বলে ডিভাইড ইত্যাদি করতে পারে। ইংরেজি অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় ভুল উত্তর দেয়। এই সময় ঘরের পাশ দিয়া ভৃত্য যাইতে যাইতে মন্তব্য করে, 'এ বাপ বেটার চেয়ে আমি বিদ্বান আছি, আমায় বে দেলেন না কেন?'

রাখাল ও রাসবিহারী অবশেষে এক মতলব আঁটেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া বসন্তবাবুর পণ প্রস্তাবটি পুরাপুরি মানিয়া লন। যথারীতি বিবাহ

বাসর বসে। বসন্তবাবু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন পনের টাকা পাইলেন না তখন অধৈর্য হইয়া রাখালবাবুকে সেই বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দেন। রাখালবাবু স্তোক বাক্য দিয়া আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। বসন্তবাবু শেষে বলেন, 'কুমীরকে কলা দেখাচ্ছ যে'। রাখাল বাবু হাসিয়া উত্তর দেন, আপনার পাওনার মধ্যে কেবলই কন্যাটি—এই বলিয়া কুসুমকে সকলের মাঝখানে আনিয়া দাঁড় করান। বসন্তবাবু চারুকে লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে চারু কুসুমের রূপ দেখিয়া মোহিত হয় এবং কুসুমকে বিবাহ না করিয়া কিছুতেই যাইবে না—এই কথা বলে। তখন কন্যাপক্ষরা মহানন্দে চারুকে ছাঁতনা তলায় লইয়া যায় আর বসন্তবাবু নিজ আর্থিক ক্ষতি স্মরণ করিয়া ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রচন্দ্র শর্মা (১৮৯৩) রচিত 'কন্যাদায়' প্রহসনটি উল্লেখযোগ্য।

এই প্রহসনটির ভিতর দিয়া লেখক একদিকে কন্যাদায়ের মর্মান্তিক যন্ত্রণা, অপর দিকে পাত্র পক্ষের বরপণ লোভের নির্লজ্জতা প্রকাশ করিয়া, যেমন সামাজিক নিষ্ঠুরতার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন, তেমনি দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজের আত্ম-সংশোধনের প্রচেষ্টাও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার কাহিনীটি নিম্নরূপ ;—

চন্দ্রনাথবাবু কন্যাদায়গ্রস্ত কায়স্থ। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েরই ইচ্ছা কন্যাকে সুপাত্রে দান করেন। কারণ পাঁচ সাত হাজার টাকা প্রয়োজনে সে ইচ্ছা কিছুতেই পণলোভী সমাজে চরিতার্থ হইবার নহে ; সেই কারণে তিনি জমি বিক্রয়ের মনস্থ করিয়া কামিনী দালালকে সব ব্যাপার খুলিয়া বলেন। কামিনী পূর্ববঙ্গের লোক। সে সকল কথা শুনিয়া কলিকাতার কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের মর্মান্তিক দুঃখের প্রতি সহানুভূতি দেখান এবং তাঁহাদের দেশে যে কন্যাপণ পাওয়া যায় এই কথা বলেন ও চন্দ্রনাথ বাবুকে তাঁহাদের দেশে যাইতে বলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু নিজ সঙ্কল্পে অটল থাকেন।

শিক্ষিত উকীল বিপিনবাবু ওকালতি ব্যবসায়ে পসার জমাইতে না পারিয়া ঘটকালির ব্যবসায়ে নামিয়াছেন। তাঁহার কাছে কন্যার বিবাহের বিষয়ে চন্দ্রনাথ গেলেন। বিপিন প্রথমেই চন্দ্রনাথকে টাকার কথা বলিলেন। চন্দ্রনাথ জানাইলেন তিন হাজারের বেশী তিনি খরচ করিতে অক্ষম। তাহার

উত্তরে বিপিন বলেন যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কায়স্থ পাত্র পাঁচ হাজারের কম হয় না; অবশ্য ব্রাহ্ম পাত্র ঐ টাকার কমেও হইতে পারে। কিন্তু চন্দ্রনাথ ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন বিপিন চন্দ্রনাথের কাছ হইতে একশত টাকা ঘটক বিদায় চাহেন, কিন্তু বিপিন দশ টাকার বেশী দিতে রাজি নহেন। অবশেষে চন্দ্রনাথের প্রস্তাবে বিপিন রাজি হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে সব টাকাটাই যে তিনি আদায় করিয়া লইবেন, তাহারও ফন্দী আঁটিলেন।

চন্দ্রনাথবাবু বৃদ্ধ জমিদার যোগেনবাবুর কাছে ৫০০০৲ টাকায় বাড়ী বাঁধা দেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর পুত্র কিশোরীর সঙ্গে বিবাহ পাকাপাকি করেন। কিন্তু কিশোরী উন্নতমনা যুবক। পিতার পণ লোভের আকাঙ্ক্ষা জানিয়া, সকলের অগোচরে যোগেনবাবুকে টাকা পরিশোধ করিয়া দলিলটি চন্দ্রনাথবাবুকে দিয়া দেন। চন্দ্রনাথ দেবতুল্য জামাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু কিশোরীর মা পুত্রের শ্বশুর বাড়ীর প্রতি অনুরক্তি দেখিয়া কান্না সুরু করেন। কিশোরীও পিতাকে আর্থিক দুঃখ দেওয়ায় অনুতাপ করে এবং কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যায়। শ্যামাচরণ-বাবু পুত্রের জন্য দুঃখ করেন। অবশেষে নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় ওকালতী করিয়া প্রচুর অর্থ কিশোরী শ্যামাচরণ কে আনিয়া দেয়, তাহাতে পিতার মনোকষ্টও দূর হয়। অপর দিকে যোগেনবাবু ছিলেন অর্থলোভী। পুত্রের বিবাহে প্রচুর অর্থ পাইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার মনোবাসনা। এমন সময়ে প্রমদা নাম্নী এক বৃদ্ধা পতিতা তাহার কন্যার বিবাহ ব্যবস্থার জন্য বিপিনের কাছে আসে। ভাল ঘরে বিবাহ দিতে পারিলে এক হাজার টাকা নগদ ঘটক-বিদায় সে দিতে প্রস্তুত এবং কন্যার বিবাহে আট দশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করিবে। বিপিন কৌশলে যোগেনবাবুর পুত্রের সঙ্গে প্রমদার কন্যার বিবাহের স্থির করে। টাকার অঙ্ক শুনিয়া যোগেনবাবু কুল-শীলের পরিচয় না লইয়াই বিবাহ দিয়া দেন। অবশেষে সব জানাজানি হইয়া যায়। পাড়া প্রতিবেশী যোগেনকে তীব্র ধিকার দিতে থাকে। যোগেন নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করিতে থাকে।

'লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র' (১৮৯০) প্রহসনটির রচয়িতা রাজকৃষ্ণ রায়। বরপণকে কেন্দ্র করিয়া যে পৈশাচিকতা ও দুর্নীতি বাংলা দেশের সমাজ-জীবনে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র প্রহসনের ভিতরে তাহা পরিস্ফুট

হইয়া উঠিয়াছে। প্রহসনকার সামজিক ব্যাধির কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করিয়া সেই ব্যাধির দুষ্ট বীজাণু সমাজ দেহকে কি ভাবে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। ইহার কাহিনীটি হইতেছে এই যে লোভেন্দ্রবাবু পুত্রের বিবাহে প্রচুর পণ সংগ্রহ করিয়া বিত্তবান হইবেন এবং ছেলে-রূপ পাঁঠা বেচায় তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোভেন্দ্রবাবুর একটিমাত্র পুত্র। তাঁহার যদি কুড়িটি পুত্র থাকিত তবে তিনি নিশ্চয়ই মতি শীল বা রামদুলাল সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বড়লোক হইতে পারিতেন।

লোভেন্দ্রের পুত্রের নাম গবেন্দ্র। গবেন্দ্রের বিবাহে প্রচুর পণ পাইবার আশায় খুব বড়লোকী চালে তিনি পুত্রের বাবুগিরিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন। গবেন্দ্রও পোষাক পরিচ্ছদে, প্রসাধনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। চরস, আফিঙ, মদ খায় এবং স্কুল পলাইয়া পান্না বেশ্যার বাড়ী যায়।

গোবিন্দপুরের পরাণবাবুর মেয়ের সঙ্গে গবেন্দ্রের সম্বন্ধ হয়। লোভেন্দ্র ১৪০০০৲ হাজার টাকার এক পয়সা কমাইবেন না। এদিকে পরাণবাবু পাঁচ মেয়ের বাবা। সর্বস্ব খোয়াইয়া প্রথম দুই জনের বিবাহ দিয়াছেন। ঐ বিবাহ ব্যাপারে দুই দফায় লোভেন্দ্রর নিকট হইতে বাড়ী বন্দক দিয়া দশ হাজার টাকা পরাণবাবু লইয়াছেন। এখন সুদে-আসলে দাঁড়াইয়াছে তের হাজার টাকা। লোভেন্দ্র বাড়ীর বিক্রয় কবলা দশ হাজার টাকায় লিখিয়া দিতে এবং বরপণ হিসাবে চার হাজার টাকা দিয়া গবেন্দ্রের সহিত তাঁহার তৃতীয়া কন্যার বিবাহ দিতে বলেন। পরাণের বন্ধু শ্যামবাবু ও হরিবাবু লোভেন্দ্রের এই পৈশাচিক মনোবৃত্তি জানিতে পারিয়া লোভেন্দ্রকে জব্দ করিতে এবং পরাণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়।

অপর দিকে গবেন্দ্র অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাইয়াছে। মায়ের নিকট হইতে অর্থ-অলঙ্কার জোর পূর্বক সংগ্রহ করিয়া অসৎপথে টাকা উড়াইতে থাকে। লোভেন্দ্র খবর পাইয়া পুত্রের সন্ধানে গেলে গবেন্দ্র পিতাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেয়। লোভেন্দ্রের এই দুরবস্থার সময় হরিবাবু হাজির হন এবং তাঁহাকে বলেন যে, মানিকতলার পুলের কাছে এক সন্ন্যাসী তামাকে সোনা করিতে পারে। অর্থলোভে লোভেন্দ্র যথাস্থানে উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, শ্যামবাবুই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বসিয়া থাকেন। এমন সময়, পূর্ব-

নির্দেশ মত গোপাল, হরি, মধু কাক্রীর মুখোস পরিয়া তলোয়ার হাতে ছুটিয়া আসে এবং লোভেন্দ্রকে তাহারা বলে যে, বিশ হাজার টাকা না দিলে এখনি তাহারা লোভেন্দ্রকে হত্যা করিবে। হরির নির্দেশ মতো লোভেন্দ্র গবেন্দ্রকে চিঠি লেখে পত্রপাঠ টাকা আনিতে। গবেন্দ্র ও কুসুমকুমারী বিশ হাজার টাকা আনিলে সেই টাকা লইয়া হরিবাবুর দল প্রস্থান করে। লোভেন্দ্র কপাল চাপড়ায়। ভৃত্য আশ্বাস দিয়া বলে—'কি ছাই কুড়ি হাজার টাকা। আপনার জীবন্ত ষষ্ঠী ঠাকরুণের গর্ভকোষ, ট্যাঁকশাল। লাখ লাখ টাকা তোয়ের হবে।'

'পাশ করা ছেলে' (১৮৭৯) দুর্গাচরণ রায় রচিত একটি প্রহসন। শিক্ষাগত যোগ্যতা পণ প্রথার সহিত জড়িত হইয়া সমগ্র শিক্ষা ব্যাপারটি কিরূপভাবে বৈষয়িকতায় পরিণত হয় তাহা পাশ করা ছেলে প্রহসনে লেখক দেখাইয়াছেন। ইহার কাহিনীটি হইতেছে—বারাণসীর তারাপ্রসন্ন বাবু কালেকটারের সেরেস্তাদার। তাঁহার কন্যার সহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামদাস শর্মার পুত্র কিশোরীর বিবাহ হয়। কিশোরী পাশ করা ছেলে এবং অত্যন্ত সৎ। বহু কষ্ট করিয়া বিদ্যার্জন করিয়াছে। অবশ্য এই বিবাহে কিশোরীর অমত ছিল। তারাপ্রসন্নের কন্যা নগেন্দ্রবালা বিবাহের পর শ্বশুর ঘরে আসে। কিন্তু ধনীর কন্যা দরিদ্রের ঘরে সম্পূর্ণ বেমানান। কিশোরী নগেন্দ্রবালার বাক্য-যন্ত্রণায় নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। অবশেষে নগেন্দ্রবালা কিশোরীকে বাধ্য করে তাহাকে বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে। কিশোরী চাকুরী পায় এবং যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু নগেন্দ্রবালা সুকৌশলে সমস্ত টাকা নিজের হাতে রাখে এবং পাছে কিশোরী মা বাবাকে টাকা পাঠায়, খোঁজ খবর করে, সেইজন্য কিশোরীকে প্রতিনিবৃত্ত করে। কিশোরী তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় কাল কাটাইতে থাকে।

একদিন এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া, সকলের অগোচরে কিশোরী স্বগ্রামে মাতাপিতার নিকট চলিয়া যায়। নগেন্দ্র স্বামীকে না দেখিয়া সব বুঝিতে পারে এবং অনুশোচনা করে। তারাপ্রসন্ন সব ব্যাপার জানিয়া কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেন। নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে কিশোরী ও নগেন্দ্র-বালার সাক্ষাৎ হয়।

রাধাবিনোদ হালদার রচিত প্রহসনটিতে 'পাশ করা জামাই' (১৮৮০), সাংস্কৃতিক রুচির সহিত অর্থনৈতিক ব্যাপারটি জড়িত হইয়া প্রহসনটি

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার কাহিনীটি এই,—কেদার বি, এ পাশ। তাহার পিতা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। সেই কারণে পাঁচ হাজার টাকার কমে তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে নারাজ। অবশেষে ঐ টাকায় বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরে সাহেবী-ভাবাপন্ন কেদার অন্যান্য মহিলাদের কুরুচিপূর্ণ ব্যবহারে অতিষ্ট হইয়া বাসর ত্যাগ করে। অর্থলোভী পিতা পুত্রের ব্যবহারে অপদস্থ হন।

কোন এক অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক 'রহস্যের অন্তর্জলী' নামক একটি প্রহসন রচিত হয়। কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের পণপ্রথা ও অর্থলোভকে কেন্দ্র করিয়া ইহা রচিত। স্বকৃত ভঙ্গ কুলীন চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ হরচন্দ্র চক্রবর্তী উভয়েই সমান লোভী। প্রথম ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিয়া অর্থ উপার্জন করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মেয়ের বিবাহ দিয়া অর্থ উপার্জন করে। চন্দ্রকান্ত হৃদয়হীন ব্যক্তি। একটির পর একটি বিবাহ করিয়া আয়ের পথ বাড়াইয়া চলেন এবং বর্তমান যুগের বহু বিবাহ বিরোধী চিন্তাকে কটূক্তি করেন। আর হরচন্দ্র কন্যা বিক্রয়ের জন্য সমাজে নাপিতের নিকটেও অপদস্থ হন।

গ্রামের জমিদার চন্দ্রশেখর ও তাহার ভাই শশিশেখর নব্যযুগের আবহাওয়ার মানুষ, তাঁহাদের নিকট কোনো সমর্থন পাইবার আশা চন্দ্রকান্ত-হরচন্দ্রের নাই। তবু নাপিত বিশ্বনাথের দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহারা উভয়েই চন্দ্রশেখরবাবুর পুত্র প্রমথর নিকট অভিযোগ করেন। সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়া বিশ্বনাথকে মৃদু তিরস্কার করিয়া চলিয়া যান।

ওদিকে চন্দ্রকান্তের পত্নী নীরদবালার দুঃখের অন্ত নাই। সে সারাদিন পৈতা কাটিয়া মাত্র ২৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। হরচন্দ্রের অবিবাহিত কন্যা বিরাজ মাঝে মাঝে তাহার নিকট আসে ও সহানুভূতি জানায়। তাহারও দুঃখের অন্ত নাই। পিতা অর্থলোভে মৃত্যু পথযাত্রী রুগ্ন বৃদ্ধ শঙ্কর ঘোষালের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। একদিন চন্দ্রকান্ত নীরদবালার কাছে আসিয়া দশটাকা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং অবশেষে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বলিয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যান।

গ্রামের যুবক প্রবোধের বিরাজকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হরচন্দ্রের অর্থলোভ সে অভিলাষের অন্তরায়।

জমিদার চন্দ্রশেখর, তাঁহার ভাই শশিশেখর ও নাপিত বিশ্বনাথ নীরদ-বালার অপমান শুনিয়া লোভী চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিবার এক ষড়যন্ত্র করে। বিশ্বনাথ কৌশলে শ্রীরামপুরে চন্দ্রকান্তকে চমৎকার পতিতার বাড়ী লইয়া যায়। চমৎকার অবশ্য ছদ্মবেশী নীরদবালা। চন্দ্রকান্ত মোহে পড়েন। বিশ্বনাথকে আবার লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় বার চন্দ্রকান্ত চমৎকারের নিকট গেলে, বিরাজ চন্দ্রকান্তকে বিদ্রূপ করে এবং চন্দ্রকান্ত অপ্রস্তুত হন। পাশের ঘরে চন্দ্রশেখর, শশিশেখর উপস্থিত ছিলেন। নীরদ-বালা আত্মপ্রকাশ করেন এবং চন্দ্রকান্তের আদেশ সে যে পালন করিয়াছে ও প্রচুর টাকা উপার্জন করিয়াছে তাহাও বলে। চন্দ্রকান্ত কিন্তু পত্নী হিসাবে তাহাকে স্বীকৃতি জানাইতে দ্বিধা করেন। পরে অবশ্য জমিদারবাবুরা জানান, নীরদবালা সতী। চন্দ্রকান্ত লজ্জায় পত্নীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ওদিকে বৃদ্ধ শঙ্কর ঘোষাল বিবাহ সভায় আসিলে বিশ্বনাথ তাহাকে বিদ্রূপ করে। কাশিতে কাশিতে শঙ্করের শ্বাস উপস্থিত হয়। তখন সকলে তাহাকে অন্তর্জলী করাইবার জন্য বাহিরে লইয়া যায়। একদিকে অন্তর্জলীর মন্ত্র উচ্চারিত, অপর দিকে বরযাত্রী প্রবোধের সহিত বিরাজের বিবাহমন্ত্র পঠিত হইতে থাকে।

‘বিবাহ বিভ্রাট’ (১৮৮৪), রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রণীত। বিবাহ-পণ-লোভে পুত্রের বিবাহ দেওয়া এবং অত্যধিক অর্থলোভকে বিপরীত ঘটনার প্রতিঘাতে পর্য্যুদস্ত করা, এই প্রহসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইহার কাহিনী এইরূপ—গোপীনাথ সরকারের ছেলে নন্দলাল ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনের সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। পাশ করা ছেলের বিবাহ দিয়া প্রচুর বর পণের আশায় ছেলের পিছনে যথেচ্ছ খরচ করেন। ইহার জন্য দেনাও হইয়াছে যথেষ্ট। ধোপা, নাপিত, মুদী ও ঝি-এর বেতনও তিনি দেড় বছর যাবৎ বাকী রাখিয়াছেন।

বাংলার পণপ্রথার বিষময় ফল নির্দেশ করিয়া, একখানি নাটক রচনা করিবার জন্য, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তদানীন্তন সমাজ-হিতৈষী মণীষী সারদাচরণ মিত্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া ‘বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান’ এই কথা প্রচার করিয়া, তিনি ‘বলিদান’ নামক তাঁহার সুপরিচিত নাটকখানি রচনা করেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নাটকখানি যতদূর সম্ভব রোমাঞ্চকর করা হইয়াছে; ইহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি যাহাতে

সহজেই আকর্ষণ করা যাইতে পারে, তাহার প্রতি নাট্যকার লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে, অতি নাট্যিক ঘটনার পরিবেশে নাটকখানি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটক রচনার কোন দিনই পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ তিনি একজন সুনিপুণ সমাজ-দ্রষ্টা ছিলেন না; বিশেষতঃ যে বৃহত্তর সমাজ জীবনকে আশ্রয় করিয়া পণপ্রথার বিস্তার ও বিকাশ, তাহার সঙ্গেও তাঁহার সুনিবিড় পরিচয় ছিল না। তিনি সমাজকে বাহির হইতে আংশিক দেখিয়াছেন, অর্থাৎ নাগরিক জীবনের একাংশকেই তিনি বাহির হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য অন্য কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যখন তিনি সামাজিক নাটক রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাহার যথার্থ রস বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু নাটক হিসাবে 'বলিদান' ত্রুটিবহুল হইলেও উদ্দেশ্যের সফলতায় ইহা বাংলার জনপ্রিয় নাটকগুলির অন্যতম। একজন সমালোচক বলেন, 'বলিদানের তুল্য বর্তমান হিন্দুবিবাহ সংক্রান্ত নাটক বা উপন্যাস, এমন কি, প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।' ইহার কাহিনী এই—

করুণাময় বসু কলিকাতা সহরের একজন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। তাঁহার তিন কন্যা—কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী ও জ্যোতির্ময়ী এবং একপুত্র নলিন। করুণাময়ের স্ত্রীর নাম সরস্বতী। করুণাময় অনেক অনুসন্ধানের ফলে প্রথমা কন্যা কিরণ্ময়ীর বিবাহ দিলেন, জামাতা মোহিতলম্পট মাতাল, শাশুড়ী বউকাটুকি; স্বামী ও শাশুড়ীর অকথ্য নির্যাতন মাথায় বহিয়া হিরন্ময়ী অল্পদিনের মধ্যেই পিত্রালয়ে আসিয়া আশ্রয় লইল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কন্যা হিরণ্ময়ী বিবাহযোগ্যা হইল। বহু অনুসন্ধানের ফলে তাহার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের এক রুগ্ন ও বৃদ্ধ বর জুটিল। বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই চিরণ্ময়ী বিধবা হইল। স্বামীর প্রথম পক্ষের পুত্রগণ বিমাতাকে প্রহার করিয়া তাহাকে স্বামীর সংসার হইতে বিতাড়িত করিল। সে পিত্রালয়ে আশ্রয় লইল। দুই কন্যার বিবাহ দিয়াই করুণাময় ঋণ ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্থের অনটনে একমাত্র পুত্রের পড়া বন্ধ হইল। পিতার দুঃখ দেখিয়া বিধবা কন্য' হিরণ্ময়ী জলে ডুবিয়া আত্মঘাতিনী হইল। তখনও তৃতীয়া কন্যা অনূঢ়া। তাহারও বিবাহের বয়স আসিয়া পড়িল। করুণাময় তাহার এক প্রতিবেশীর দুশ্চরিত্র লম্পট পুত্রের নিকট জ্যোতির্ময়ীর বিবাহ দিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলেন। অবস্থার বিপর্যয়ে পড়িয়া তিনি অপ্রকৃতস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতি

করুণা-পরবশ হইয়া এক উদারপ্রাণ শিক্ষিত ও ধনবান যুবক জ্যোতির্ময়ীকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিতে চাহিল। যুবকের নাম কিশোর। কিশোরের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর বিবাহের দিন স্থির হইল। বিবাহের লগ্নও আসন্ন হইতে চলিল, এমন সময় করুণাময়ের পূর্ব চুক্তি অনুসারে উক্ত লম্পট পুত্রের পিতা বিবাহ সভায় আসিয়া কন্যাকে তাহার পুত্রের নিকট বাগদত্তা বলিয়া দাবী করিল। করুণাময় পরম সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি সত্যভ্রষ্ট হইলেন বলিয়া আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অথচ তখন ফিরিবার আর উপায় ছিল না—কিশোরের সঙ্গেই জ্যোতির্ময়ীর বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু করুণাময় এই অনুশোচনায় সেই বিবাহের রাত্রেই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন; সরস্বতী পতির অনুগামিনী হইলেন। এইখানেই এই শোচনীয় বিয়োগান্তক নাট্যের যবনিকাপাত হইল।

সাধারণ নাটকের আদর্শে 'বলিদানের' মূল্য বিচার করিবার উপায় নাই। উদ্দেশ্যমূলক রচনা হিসাবেই ইহার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলেই ইহার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করা যাইবে।

করুণাময় বসুর পরিবারের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য ইহার প্রত্যেকটি চরিত্রই যেমন আদর্শরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তেমনি অন্যান্য চরিত্রগুলিকে পাঠকের বিরক্তি-ভাজন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সকল প্রকার দোষের আকর করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। নৈতিক বিচারে এই নাটকের মধ্যে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইবে। অবিমিশ্র গুণ বা অবিমিশ্র দোষ ইহার প্রত্যেকটি চরিত্রের বিশেষত্ব; অতএব ইহাতে কোন বাস্তব প্রকৃতির মানবচরিত্রের পরিচয় লাভ করিবার উপায় নাই। দীনবন্ধু আন্তরিকতার গুণে উদ্দেশ্যমূলক নাটকের মধ্যেও বাস্তব মানবচরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি সুগভীর আন্তরিকতা না থাকার জন্যই গিরিশচন্দ্র, অন্যের অনুরোধে লিখিত, তাঁহার বলিদান নাটকে তাহা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, নীলদর্পণের পর বাংলা সাহিত্যে বলিদানই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উদ্দেশ্যমূলক নাটক—তবে তাহা রচনার দিক দিয়া নহে, উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও ব্যাপকতার দিক দিয়া। ইহার বিয়োগান্তক ঘটনাবলীর পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র যে 'নীলদর্পণের' নিকটও ঋণী নহেন তাহা বলিবার উপায় নাই।

'বলিদান' নাটকের স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জনের দোষ, বিরক্তি উৎপাদন করে। কিরণ্ময়ীর শাশুড়ীর চরিত্রের মধ্যে কোন মানবোচিত অনুভূতিই নাই,—অত্যাচারের প্রাণহীন একটি যন্ত্র রূপেই লেখক তাহাকে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'প্রফুল্ল' নাটকে তাঁহার এই শ্রেণীর দুই একটি চরিত্র সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বলিদানের দুলালচাঁদ একান্ত অস্বাভাবিক চরিত্র—দীনবন্ধুর নিমচাঁদের ক্ষীণ ছায়া মাত্র। করুণাময় বসুর চরিত্র পরিকল্পনায় লেখক কতকটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ব্যগ্রতায় লেখক তাঁহাকে একবার উন্মাদ ও তারপর আদর্শ রক্ষায় আত্মঘাতী করিয়াও শেষ পর্যন্ত ইহার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বলিদানের আর একটি চরিত্র সম্বন্ধে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। তাহা উন্মাদিনী জোবির চরিত্র। জোবি লম্পট স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা, শাশুড়ী-লাঞ্ছিতা ও বিমাতা কর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িতা; এক মাথায় এত দুঃখের বোঝা বহিয়াও তাহার অন্তরে পতিভক্তির নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বাস্তবতার দিক দিয়া কোন মূল্য না থাকিলেও আদর্শের দিক দিয়া চরিত্রটি সুন্দর। লোক-শিক্ষার যে সুমহান্ আদর্শ ইহা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই এই চরিত্রের একমাত্র আকর্ষণ।

উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনা বলিয়া কিংবা চরিত্র পরিকল্পনায় এত ত্রুটি সত্ত্বেও একমাত্র বিষয়বস্তুর গুণে বলিদান অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ লোক-প্রীতি অর্জন করিয়াছিল। এদেশের সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করিয়া বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতেই বহু নাটক রচিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহাদের মধ্যে লঘু ব্যঙ্গের ভাবই অধিক অনুভূত হইত। 'বলিদানে' বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের একটি গভীর ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে গিয়া লেখক যে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার গুণেই ইহা সমাজ হিতৈষী মাত্রেরই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পূর্বে উল্লিখিত 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনখানির ভিতর দিয়া অমৃতলাল পণ-প্রথার দোষ কীর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা ও নব্যবঙ্গের কলেজী শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার একখানি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য-মূলক রচনা। ইহার ভারত বাক্যে ইহার অন্যতম প্রধান চরিত্র বরের পিতা গোপীনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, 'ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার

দড়ি আছে—সেও ভাল কিন্তু কেউ যেন ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজকারের চেষ্টা না করে—অতি ইতর! অতি চামার! অতি কসাই-এর কাজ (২।৪)।' প্রহসনখানির ভিতর দিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ইহার কাহিনীর মধ্যে কোন জটিলতা নাই। পুত্রের বিবাহে উচ্চপণ গ্রহণ করিয়া বরের পিতার নিজের ঋণ শোধ করিবার সকল কৌশল পুত্র স্বয়ং ব্যর্থ করিয়া দিয়া সে নিজেই সে অর্থ অধিকার করিয়া কি ভাবে যে বিলাত চলিয়া গেল তাহাই কাহিনীতে বর্ণনা করা হইয়াছে। বরের পিতা এবং ক'ণের পিতা দুজনই এখানে ছাঁচ চরিত্র (type) মাত্র; একজন হৃদয়হীন অত্যাচারী, আর একজন উপায়হীন অত্যাচারিত ইহাদের কাহারও কোন বিশিষ্ট রূপ প্রহসন খানির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। উদ্দেশ্য-মূলক রচনা বলিয়া এই অত্যাচারের চিত্রের মধ্যে যে, অতিরঞ্জনের দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মধ্যে মধ্যে পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মদ্যপান

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের সংস্পর্শে আসিবার ফলে বাঙ্গালী সমাজে যে এক নূতন কুপ্রথার জন্ম হইল, তাহা মদ্যপান। সে যুগের বাংলার সমাজসংস্কারকদিগকে যেমন এক দিক দিয়া দেশীয় সনাতন কুপ্রথাগুলি দূর করিবার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তেমনই ইংরেজি সভ্যতার দান স্বরূপ সে দিন আরও নূতন যে সকল কুপ্রথা জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে মদ্যপান চিরদিনই নিন্দনীয় এবং প্রায়শ্চিত্তযোগ্য পাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, নিম্নশ্রেণী এবং হীনচরিত্র ব্যক্তিদিগের মধ্যেই সমাজে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই পাপ সীমাবদ্ধ ছিল ; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সমাজের আচরণ অনুসরণ করিয়া ইহা পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত উচ্চতর হিন্দু সমাজের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সমাজে যে সকল সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ব্যক্তি সে দিন মেলামেশা করিতেন, তাহাদের মধ্যেও, অনুকরণপ্রিয়তার জন্যই, ইউরোপীয় আচার আচরণ অনুসরণ করিতে গিয়া মদ্যপান ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীই একদিকে যেমন নানা প্রাচীন সামাজিক কুপ্রথার কবলগ্রস্ত হইয়া সামাজিক জীবনে নানাদিক দিয়া পঙ্গু হইয়াছিল, তেমনই নব্যশিক্ষিত সমাজও ইংরেজ-অনুসারী মদ্যপান প্রথার কবলগ্রস্ত হইয়া নৈতিক দিক দিয়া অন্তঃসারশূন্য হইয়া যাইতেছিল, তাহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া সে যুগের বাংলার নাটক এবং প্রহসনের মধ্য দিয়া দেখা গিয়াছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাতি রাখার কি উপায়' নামক গ্রন্থে তখনকার কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 'কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।'

রাজকোষে আয়বৃদ্ধির জন্য সে কালের ইংরেজ সরকার মদ্য অতি সহজ-প্রাপ্য করিয়া দিয়াছিলেন; কলিকাতায় অলি-গলিতে মদের দোকান স্থাপিত হইল; এমন কি, মফঃস্বলেও ছোট বড় গঞ্জ, হাট, বন্দরে মদ্য বিক্রয়ের সকল প্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। এই ভাবে সহর এবং পল্লীগ্রামের মধ্যে মদ্যপান বিস্তার লাভ করিয়া ক্রমে তাহা স্ত্রীসমাজ এবং অপরিণত বয়স্ক বালক-সমাজকেও গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিল। শহরে শিক্ষিত বাবুদিগের অনুকরণে এবং তাহাদের অনুরোধে অনেক কুলস্ত্রী মদের নেশায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কালের একটি বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, 'কলিকাতায় কোন কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত লোক আপন স্ত্রীকে বলপূর্বক মদ্য পান করাইতেন এবং স্ত্রী তাহা অস্বীকার করিলে প্রহার করিতেন' (মদিরা'—ভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত (১২৮৭)। অনেক স্ত্রী মদ্যপান বিষয়ে স্বামীকেও ছাড়াইয়া যাইত। 'সমাজ-সময়-সংস্করণ' (১৮৮৩) নামক একটি প্রহসনে পাওয়া যায়, এক স্বামী তাহার নিজের তুলনায় তাহার স্ত্রীর মদ্যপান সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলিয়াছে—'এই বিষয়ে সে আমার বড়দাদা। আমার কোনদিন এক ডোজ হলেও হয়, না হলেও হয়, কিন্তু তার না হলে নয়। গত রাত্রের পূর্ব রাত্রে এক মজা হইয়া গিয়াছে, গৃহিণী একটা পাথর বাটিতে আমাকে গোপন করে খানিকটা মদ ঢেলে রেখেছিল, এখন একটা ছেলে তাহা চিনির পানা বলিয়া পান করে, তাই দেখে ওয়াইফ গরগর করিয়া মরে, কেবল বলিতে লাগিল 'রাত্রে ঘুমোব কেমন করে?'

উনবিংশ শতাব্দীর বহু সামাজিক নাটক এবং প্রহসনের মধ্যেই নানা ভাবে মদ্যপানের প্রসঙ্গ আসিয়াছে, তথাপি যে কয়টি উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ইহাকে মুখ্য স্থান দিয়া ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ইহার ক্ষতিকর রূপটি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কেই নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

নব্য বাংলার মদ্যাসক্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য দোষ বর্ণনা করিয়া যে রচনাখানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ইহা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা সহিত্যে এই বিষয়ক প্রহসন রচনায় ইহাই সর্বপ্রথম গ্রন্থ এবং ইহার অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে আরও কয়েকজন নাট্যকার কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচনা করেন—তাহাদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অন্যতম। মধুসূদনের প্রহসনখানি বেলগাছিয়া নাট্যশালায়

অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল; কিন্তু জানিতে পারা যায়, ইহা কোন কারণে অভিনীত হয় নাই। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এই—

কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, তিনি অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনেই বাস করেন। পুত্র নববাবু কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশোনা করিয়া থাকেন। নববাবু বিবাহিত, তাঁহার স্ত্রীর নাম হরকামিনী। নববাবু তাঁহার কয়েকজন ইয়ার বন্ধু লইয়া 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, সভার উদ্দেশ্য মদ্যপান ও বারবনিতাসঙ্গ। একবার কর্তা মহাশয় বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। নববাবুকে সর্বদা চোখে চোখে রাখেন, সেইজন্য তাঁহার পক্ষে সভায় যাতায়াত করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। কালীবাবু নববাবুর ইয়ার বন্ধু, তুল্য মদ্যপ। তিনি কর্তা মহাশয়কে বলিয়া নববাবুকে একদিন 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় লইয়া গেলেন। কর্তাবাবুর একটু সন্দেহ হইল, তিনি তাঁহার একজন অনুচর বৈরাগীকে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় নববাবুর সন্ধান লইতে পাঠাইলেন। বৈরাগী গিয়া দেখিল, সেখানে গণিকাদিগের বাস। নববাবু উৎকোচ দিয়া বৈরাগীর মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। অধিক রাত্রে মদ্যপান করিয়া নেশার ঝোঁকে আবোল-তাবোল বকিতে বকিতে নববাবু গৃহে ফিরিলেন। কর্তা মহাশয় দেখিয়া সমস্তই বুঝিলেন এবং পরদিনই কলিকাতার বাস উঠাইয়া দিয়া সকলকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

প্রায় অনুরূপ বিষয় লইয়া ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রহসন রচনা বাংলা সাহিত্যে এই সর্বপ্রথম। অবশ্য এ'কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, উক্ত গদ্য রচনাগুলির মধ্যেও প্রহসনের অনেক গুণ বর্তমান ছিল এবং তাহাদের কোনটিই পূর্ণাঙ্গ প্রহসন না হইলেও অনুরূপ বিষয়বস্তু লইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রহসন রচনা করিবার পথ ইহারাই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট তদানীন্তন কলিকাতার নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়াই মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের মধ্যে বাস্তব জীবনরসানুভূতি যে কত প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার দুইখানি প্রহসন হইতেই জানিতে পারা যাইবে। এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করিবার জন্য ইহাদের একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

নববাবুকে অবলম্বন করিয়াই এই প্রহসন। নববাবু ইয়ং বেঙ্গলের যোগ্য প্রতিনিধি। তিনি 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু কালীবাবু বলেন, 'আমাদের কলেজ থেকে কেবল ইংরেজি চর্চা হয়েছিল, তা' আমাদের জাতীয় ভাষা ত কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য স্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।' তদানীন্তন কোন অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করিয়াই মধুসূদন 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সভার এক অধিবেশনে নববাবু যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দিয়াই 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—

'জেণ্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে; জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমা সকলে মাথা, মন এক করে এ দেশের সোসিয়াল রিফরমেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

জেণ্টেলম্যান, তোমাদের মেয়েদের এডুকেট কর,—তাদের স্বাধীনতা দাও —জাতিভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা হ'লে এবং কেবল তাহ'লে আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে,—নচেৎ নয়।'

যাহাই হউক, বক্তৃতা শেষে নববাবু 'লেট অস্ এঞ্জয় আওয়ারসেল্‌ভ্‌স্' বলিয়া মদ্যপান ও বারবনিতাসঙ্গ দ্বারা সভার কার্য শেষ করিলেন।

তারপর নববাবুর আর এক দৃশ্য। তিনি মদ্যপান করিয়া রাত্রে গৃহে ফিরিলেন, ইহার পূর্বে একদিন তিনি এই অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া বয়স্থা ভগিনীকে চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এতে দোষ কি? সাহেবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?' ইহার পর হইতে বাড়ীর মেয়েরা তাহার সম্মুখে বাহির হয় না। স্ত্রী পর্যন্ত তাহার সম্মুখ হইতে পালাইয়া যায়। মত্ত অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সে সেদিনও বারবনিতার মত ব্যবহার করিল, পিতাকে 'মদ ল্যাও' বলিয়া ডাকিল। সকল দিক দিয়া নববাবুর চরিত্রটি নাট্যকার বাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন, এই চরিত্রটি পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে একটি শিক্ষিত মাতাল চরিত্রসৃষ্টির প্রেরণা

দিয়াছিল, তাহা 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হইবে যে, নববাবু সে যুগের নব্য শিক্ষিত সমাজের একজন প্রতিনিধি মাত্র, তাহার ভিতর দিয়া বিশিষ্ট কোন পরিচয় রূপলাভ করিতে পারে নাই; মধুসূদনের এই নির্বিশেষ চরিত্রটিকে অবলম্বন করিয়াই দীনবন্ধু তাঁহার নিমচাঁদের বিশিষ্ট রূপ দিয়াছেন। প্রহসন রচনায় মধুসূদনের একটি প্রধান গুণ—তিনি তাঁহার চিত্রগুলিকে অতিরঞ্জিত করেন নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র কোন চিত্রই অতিরঞ্জিত নহে; এ সম্পর্কে ডক্টর রাজেন্দ্র-লাল মিত্র বলিয়াছেন, 'ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নববাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।' মধুসূদন জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই নববাবুর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দীনবন্ধুর যে অতিরঞ্জনের প্রবণতা ছিল, মধুসূদনের তাহা ছিল না; সেইজন্য নব্য বাংলার একটি যথাযথ পরিচয় ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম অবস্থায় এ'দেশের নব্য শিক্ষিত সমাজ যে কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, মধুসূদন নিজেও তাহার প্রমাণ; অতএব তাঁহার হাত হইতে নব্য বাংলার এই যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বাস্তব মূল্য অনস্বীকার্য।

নববাবুর মধ্যে দিয়া নব্য বাংলার পরিচয় যে রকম প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই কর্তা মহাশয়ের চরিত্রের ভিতর দিয়া সেকালের সমাজের আর একটি দিকের সঙ্গে পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ধর্মভীরু ও পরম বৈষ্ণব, কিন্তু সেইজন্য সাংসারিক বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ নহেন। তিনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। পুত্রের চরিত্রে তাঁহার প্রথম হইতেই সন্দেহ হইতেছিল; কারণ, তিনি বৃন্দাবনবাসী হইলেও জানেন, 'এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই।' এই জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকে লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। পিতা ও পুত্রের চরিত্রের মধ্যে যে একটি সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানির নাট্যিক গুণ বর্ধিত হইয়াছে। কর্তা মহাশয়ের চরিত্র-পরিকল্পনাও মধুসূদনের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল বলিতে হইবে; কারণ, তাঁহার মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই দেশীয় একটি বিশিষ্ট সামাজিক চরিত্রের রূপ প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় চরিত্রের সর্বশেষ পরিচয়, ইহার পরই নববাবুর যুগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে বাধা দিবার জন্য আর কেহ তখন অবশিষ্ট ছিল না।

অন্যান্য পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে পুলিশ সার্জেণ্টের চরিত্রটি বড় জীবন্ত হইয়াছে। চোর সন্দেহে বৈরাগীকে ধরিয়া তাহার ঝুলি হইতে সে চারিটি টাকা পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে অব্যাহতি দিল। তাহার কথাবার্তা ও আচরণের মধ্য দিয়া লেখকের যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। দুইটি মুসলমান মুটিয়ার ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব অনুভব করা যায়।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র স্ত্রীচরিত্রগুলির কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে নববাবুর স্ত্রী হরকামিনী ও তাহার বিবাহিত ভগিনী প্রসন্নময়ীই প্রধানা। একটি দৃশ্যে চারিটি যুবতীর তাস খেলার চিত্রটি বড়ই বাস্তব হইয়াছে। তাস খেলায় অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নাট্যকার চারিটি চরিত্রকেই একাকার করিয়া ফেলেন নাই, ইহাতে প্রত্যেকের নিজস্ব এক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নৃত্যকালী পাকা খেলোয়াড়, কমল একেবারে কিছুই নয়, প্রসন্ন ও হরকামিনী মাঝামাঝি; কথাবার্তার ভিতর দিয়া ইহাদের মুখভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইহাদের কাহাকেও চিনিতে ভুল হয় না। এই পরিবারটির কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, পুত্র পাঁড় মাতাল, যুবতী বধূ ও কন্যাগণ তাস খেলিয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করে—অপরিসর রচনার ভিতর দিয়াও মধুসূদন ক্ষুদ্র পরিবারটির এই বৈচিত্র্যগুলি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

মধুসূদনের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার প্রহসনের মধ্যে নীতিকথাটি অত্যন্ত গৌণ হইয়া পড়িয়া ইহার বাস্তব রসটিই উচ্ছল হইয়া উঠে, নতুবা তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার রামনারায়ণ কৌলীন্যের দোষ কীর্তন করিয়া নাটক রচনা করিতে গিয়া নাটকের মধ্যে বারবার বল্লালের নাম করিয়া অভিসম্পাত দিয়াছেন; মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে তাহা কিছু করেন নাই। যদিও মদ্যপানের কুফল প্রদর্শনই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিশিষ্ট উদ্দেশ্য, তথাপি এই প্রহসনের কোথাও এই বিষয়ক কোন বক্তৃতা নাই, কেবল মাত্র নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়াই ইহার অপকার দেখান হইয়াছে। এই বিষয়ে রামনারায়ণ হইতে মধুসূদন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। মধুসূদন যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালীর সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পরিণত অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ইহারই ফলে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ননদ-ভাজ প্রসন্নময়ী ও হরকামিনীর কথাবার্তার ভিতর দিয়া স্বাভাবিক শালীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

হরকামিনীর চরিত্রটি দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নায়িকা কুমুদিনী চরিত্রর অগ্রদূত। হরকামিনী মাতাল স্বামীকে গৃহমধ্যে মূর্ছিতা দেখিয়া বলিয়াছিল, 'এই কলকতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে,তার সীমা নাই'—ইহাই দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশীর' প্রেরণা দিয়াছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা' হইতে একটি দৃশ্য এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্য হইতে মধুসূদনের সহজ গদ্য ভাষার যেমন একটি সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনই তাঁহার সমসাময়িক সমাজের মদ্যপান-বিষয়টি সম্পর্কেও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—

(কতিপয় বাবুর প্রবেশ)

চৈতন। নব আর কালী আজ যে দেরী কচ্চে, এর কারণ কি ?

বলাই। আমি তা কেমন ক'রে বলবো ? ওহে, ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা সকল কর্মেই লীড্ নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হ'লে বুঝি আর কোন কর্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, ওরা দুজনে বেশ লেখাপড়া জানে।

বলাই। বিটুইন আওয়ার সেল্‌ভস্, এমন কি জানে ?

মহেশ। হাঁ, হাঁ, সকলেরই বিদ্যা জানা আছে। সেদিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল তা তো দেখিইছো, তাতে লিগুলি মরের যে দুর্দ্দশা তা তো মনেআছে ?

বলাই। এতেও আবার প্রাইডটুকু দেখেছো ? কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেশ।

চৈতন। আঃ তারা ফ্রেণ্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি ? বিশেষ ওরা আছে ব'লে তাই আজও সভা চলছে তা জান ?

মহেশ। তা টুরুথ্ বলবো, তার আর ফ্রেণ্ড কি ?

বলাই। আচ্ছা সেকথা যাক্ ; আমরাও ত মেম্বার বটে, তবে তাদের দুজনের জন্য ওয়েট করবার আবশ্যক কি ?

শিবু। তাই তো এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাক্ না কেন ?

মহেশ। হিয়ার—হিয়ার আমি এ মোসন সেকেণ্ড করি।

বলাই। হাঃ—হাঃ—হাঃ! এতে দেখছি কারো অবজেক্‌সন্ নাই একেবারে জেস্‌কন্ ব্র্যাভো! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

মহেশ। (ঘড়ি দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি, নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতনবাবুকে চেয়ারম্যান প্রপোজ করি।

সকলে। হিয়ার—হিয়ার!

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) জেণ্টেলম্যান আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম আমি যতদূর পারি প্রাণ-পণে চালাতে কসুর কর্‌বো না, নাউ টু বিজনেস্।

সকলে। হিয়ার হিয়ার! (করতালি)

চৈতন। (উচ্চৈঃস্বরে) খানসামা—বেহারা—

(নেপথ্যে)। জী আজ্ঞে!

চৈতন। গোটা দুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছে হয় তো বল।

বলাই। এমন সময় কোন শালা বিয়ার খায়?

সকলে। হিয়ার—হিয়ার!

[খানসামা ও বেহারার মদ্য ও তামাক লইয়া প্রবেশ]

চৈতন। সব বাবু লোক্‌কো সরাব দেও (সকলের মদ্যপান) আর বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর দেও।

খনি। আচ্ছা বাবু। [বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান]

চৈতন। বেয়ারা—ঐ খেম্‌টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ খানিকটে বরফ আন।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]

বলাই। আমি তোমাদের নতুন চেয়ারম্যানের হেল্‌থ দিতে চাই।

সকলে। হিয়ার—হিয়ার! (মদ্যপান করিয়া) হিপ্ হিপ হুরে হুরে।

[নিতম্বিনী পয়োধরী এবং যন্ত্রিগণের প্রবেশ]

চৈতন। আরে এসো বসো! কেমন ভাই চিনতে পার? তবে ভাল আছ তো?

(সকলের উপবেশন)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কৈ? আমার কি তেমন কপাল?

সকলে। ব্র্যাভো, হিয়ার! (করতালি)

চৈতন। ও পয়োধরি। একটু এদিকে স'রে বসো না।

পয়ো। না আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাইবাবু এদের একটু কিছু খাওয়াও না।

বলাই। এই এসো। (সকলের মদ্যপান)

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা তুই ঘুমুচ্ছিস্ নাকি?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না-হে, তা নয় ঘুমবো কেন? নব আসেনি বটে?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাভো! ব্রাভো!

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গান গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না?

চৈতন। না, না পরে আবার কেন? শুভ কর্মে বিলম্বে কাজ কি?

পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড খেমটা।

(গীত)

শঙ্করা—খেমটা।

এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি সে মন আছে।
নূতন পেয়ে পুরাতনে
তোমার যে যতন গিয়েছে।
তখনকার ভাব থাক্‌তো যদি
তোমায় পেতেম নিরবধি,
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম হয়েছে।
যা হবার আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে
কোন নতুনে মন মজেছে॥

সকলে। কিয়াবাৎ। সাবাস্। বেঁচে থাক বাবা! জিতারও বাবা।

চৈতন। ও বলাইবাবু, তুমি কেমন সাকী হে?

বলাই। সাকী আবার কি?

চৈতন । যে মদ দেয়, তাকে পারসীতে সাকী বলে।

শিবু । (গাইয়া) পরইয়ার নহো সাকী। তা এসো।

(সকলের মদ্য পান)

চৈতন । চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্ছে না ?

বলাই । বোধ করি নব আর কালী—

[নব এবং কালীর প্রবেশ]

সকলে । (গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ্ হিপ্ হুরে !

কালী । (প্রমত্ত ভাবে) হুরে হুরে !

নব । বসো ভাই সকলে বসো (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্সিউজ কর্ত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরী হয়ে গেছে !

শিবু । (প্রমত্ত ভাবে) দ্যাটস্ এ লাই।

নব । (ক্রুদ্ধ ভাবে) হোয়াট্, তুমি আমাকে লায়ার বল ? তুমি জাননা আমি তোমাকে এখনি সুট করবো ?

চৈতন । (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ যেতে দাও, যেতে দাও, একটা ট্রাইফলিং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন ?

নব । ট্রাইফলিং ?—ও আমাকে লায়ার বললে—আবার ট্রাইফলিং ? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বললে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্লে না কেন ? তাতে কোন শালা রাগ করতো ? কিন্তু লায়ার —একি বরদাস্ত হয় ?

চৈতন । আরে যেতে দাও, ও কথার আর মেন্সন্ করো না।

[উপবেশন করিয়া]

নব । কি গো পয়োধরি। নিতম্বিনি! তোমরা ভাল আছ তো ?

পয়ো । হাঁ আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল দেখছিনে —এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব । আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রাণ্ডি দাও তো।

সকলে । ওহে আমাদের ভুলো না হে। (সকলের মদ্যপান)

নব । ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েছো ?

কালী । আমি এই বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একে বারে অবাক হয়েছি।

শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুস খেয়ে মিথ্যা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট্‌!

নব। মরুক, সে থাক। ও পয়োধরি! তোমরা একবার ওঠনা, নাচটা দেখা যাক্।

সকলে। না, না, আগে তোমার ইস্‌পীচ্‌।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা জেণ্টেলম্যান, আপনারা এই দেয়ালের দিকে একবার চেয়ে দেখুন, এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখছেন, এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার—হিয়ার—

নব। জেণ্টেলম্যান, এ সভার নাম 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভা'—আমরা সকলে এর মেম্বর, আমরা এখানে মিট করে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই করে থাকি—এণ্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ।

সকলে। হিয়ার—হিয়ার! উই আর জলি গুড ফেলোজ।

নব। জেণ্টেলম্যান, আমাদের সকলে হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু বিদ্যাবলে সুপারিষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে আর হাঁটু নোয়াতে স্বীকার করি নে; জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে এদেশের সোসিয়াল রিফর্মেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার! হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যান, আমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতি ভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে, নচেৎ নয়।

সকলে। হিয়ার! হিয়ার! হিয়ার!

নব। কিন্তু জেণ্টেলম্যান, এখন দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা, এই গৃহ কেবল আমাদের লিবারটি অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যা খুসী, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যান, ইন দি নেম অব ফ্রীডম্‌, লেট অস্‌ এঞ্জয় আওয়ার সেলভস! (উপবেশন)

সকলে । হিয়ার—হিয়ার, হিপ্, হিপ হুরে, হু-রে; লিবরটি হল—বি-ফ্রী, লেট অস্ এঞ্জয় আওয়ার সেল্ভস।

নব । ওহে বলাই! একবার সকলকে দাও না।

বলাই । আচ্ছা, এই এসো। (সকলের মদ্যপান)

নব । তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক্। কম্ ওপেন দি বল্, মাই বিউটিস্।

পয়ো, নিত। (নৃত্য এবং গীত)

নব । কিয়াবাত, জীতা রও! বেঁচে থাক ভাই!

কালী । হুরে।—জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভা ফর এভার।

সকলে। জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভা ফর এভার। (করতালি)

নব । চল ভাই এখন সপর টেবিলে যাওয়া যাক্।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) থ্রী চিয়ার্স ফর আমাদের চিয়ারম্যান—

সকলে। হিপ-হিপ-হিপ হুরে! হু-রে! হুরে!

নব । ও পয়োধরি! তুমি ভাই আমার আরম নিও।

পয়ো । তোমার কি নেব ভাই—

নব । এসো আমার হাত ধর।

কালী । ও নিতম্বিনি! তুমি ভাই আমাকে ফেভর কর! আহা কি সফট হাত!

সকলে। ব্রাভো! (করতালি)

[যন্ত্রিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

তবলা। ও ভাই, দেখতো বোতলটায় আর কিছু আছে কি না?

বেহালা। কৈ দেখি! হ্যা আছে, এই নেও!

(উভয়ের মদ্যপান)

তবলা। আঃ খাসা মাল যেহে।

(নেপথ্যে)। হিপ হিপ্ হুরে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্রাণ্ডিতে আমাদের শানে না!

[সকলের প্রস্থান]

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের অনুকরণ করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নামক প্রসিদ্ধ প্রহসনখানি রচিত হয়।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দুইখানি প্রহসনের বক্তব্য অভিন্ন হইলেও বিষয়-বিন্যাস এবং চরিত্র সৃষ্টিতে দীনবন্ধু তাঁহার রচনায় যে মৌলিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ:

কলিকাতার এক ধনাঢ্য ব্যক্তি জীবনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অটলবিহারী ইংরেজি বিদ্যালয়ে সামান্য কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ করিল এবং কয়েকজন ইয়ার জুটাইয়া তাহাদের সঙ্গে দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উচ্চশিক্ষিত যুবক নিমচাঁদ তাহার ইয়ারদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান। নিমচাঁদ ইতিপূর্বেই মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছিল, ক্রমে অটলকেও সেই পথ ধরাইল, অল্পদিনের মধ্যে অটল একজন পাকা মদ্যপ হইয়া উঠিল। অটলের অর্থে নিমচাঁদ ও তাহার অন্যান্য ইয়ারগণ প্রচুর মদ্যপান করিয়া যেখানে সেখানে মাতলামি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অটলের খুড়শ্বশুর গোকুলচন্দ্রের সাহায্যে অটলের পিতা পুত্রের মতিগতি পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। অটলের স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। স্বামীর সঙ্গে তাহার কোন দিন সাক্ষাৎ হয় না। অটল কাঞ্চন নামক এক বারবনিতাকে নিজের রক্ষিতারূপে রাখিয়া তাহার সংসর্গেই দিবারাত্র কাটাইতে লাগিল। কোন কোন দিন তাহাকে নিজের বৈঠক-খানায় লইয়া আসিয়া সেখানে বসিয়াই মদ্যাদি পান করিতে লাগিল। অটলের জননীর পুত্রস্নেহান্ধতার জন্য জীবনচন্দ্র পুত্রকে কোন প্রকারে শাসন করিতে পারিতেন না; এমন কি, তিনিই গোপনে পুত্রের সকল প্রকার অন্যায় ব্যয়ের জন্য অর্থ যোগাইতেন। কাঞ্চনের নিকট হইতে একদিন অপমানিত হইয়া অটল স্থির করিল, তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে, সে ভদ্রঘরের মেয়ে বাহির করিয়া বাগানে লইয়া রাখিবে, কাঞ্চনের পথ আর মাড়াইবে না। সেদিন তাহার গৃহে মেয়েদের একটা উৎসব ছিল, সেই উপলক্ষে তাহার খুড়শাশুড়ী গোকুলবাবুর স্ত্রী তাহার গৃহে আসিয়াছিলেন, গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য অটল ষড়যন্ত্র করিল। এক হিজ্‌ড়াকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া বৈঠকখানায় তাহার সম্মুখে লইয়া আসিতে বলিল। নিমচাঁদ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অটল বৈঠকখানায় এক ছদ্মবেশ ধরিয়া বসিয়া রহিল! হিজ্‌ড়া ভুল করিয়া কুমুদিনীকে লইয়া আসিল। অটলের পিতৃব্য আসিয়া নিমচাঁদ ও অটলকে এই কার্যের জন্য গুরুতর প্রহার করিলেন। অটলের ছদ্মবেশ খসিয়া

পড়িল; কুমুদিনী চিনিল, যাহার নিকট তাহাকে আনিয়াছে, সে তাহার স্বামী। নিমচাঁদ এই কার্যে অনুতপ্ত হইয়া অটলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, অটলের মনেও একটু কেমন যেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই পুনরায় উভয়ে 'ব্রাণ্ডী' পান করিবার জন্য বাগানে চলিয়া গেল।

'নীল-দর্পণে'র মত 'সধবার একাদশী'ও উদ্দেশ্যমূলক নাটক। ইহার উদ্দেশ্যরূপে নাট্যকার প্রারম্ভেই কয়েকটি ইংরেজি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে এলিবু বারেটের 'Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates' উক্তিটি নাটকের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। দীনবন্ধুর যে অনুভূতিশীল হৃদয় একদিন পল্লীর নীলচাষীদিগের দুঃখদুর্দশা দেখিয়া কাতর হইয়াছিল, তাহাই সমসাময়িক নাগরিক সভ্যতার এক কদর্য রূপ দেখিয়া সেদিন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। 'সধবার একাদশী'র মধ্য দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস ইতিপূর্বেই এদেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। দীনবন্ধু তাহারই সূত্র ধরিয়া সেকালের শিক্ষিত নব্য বাংলার একটি জঘন্য দুর্নীতির ও তাহার শোচনীয় পরিণামের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছিল, তাহা আমাদের বিচার্য নহে; সাহিত্যিক রচনা হিসাবে তাহা কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাই আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান যে অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়া শিক্ষিত সমাজের নৈতিক ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিল, সমসাময়িক সাহিত্য হইতেই তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে—সেই ইতিবৃত্তের এখানে আর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহিনা। প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তিই ইহার প্রতিকারের নানাবিধ উপায় সন্ধান করিতেছিলেন, অল্পকাল মধ্যেই সমবেতভাবে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সাধারণ প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইল। তাহাদের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত Temperance Society বা 'সুরাপান-নিবারণী-সমিতি' অন্যতম। এই সমিতির কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য তখন দেশের শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয় ছিল। দীনবন্ধুর 'সধবার

একাদশী' Temperance Society প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরই রচিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সমিতির ও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকের উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন।

'সধবার একাদশী'র মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চরিত্র নিমচাঁদ। এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় দীনবন্ধুর স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যক্ষদৃষ্ট সমাজ-চরিত্রগুলি দীনবন্ধুর পরিকল্পনায় যত শক্তিশালী হয়, কল্পিত চরিত্রগুলি তেমন হয় না। নিমচাঁদও দীনবন্ধু কর্তৃক প্রত্যক্ষদৃষ্ট তদানীন্তন সমাজের একটি বিশিষ্ট বাস্তব চরিত্র; কিন্তু এই কথাটিই এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'সধবার একাদশী'র প্রায় সকল নায়ক-নায়িকাই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; নিমচাঁদও ইহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু কেহ কেহ যে মনে করেন, নিমচাঁদ মাইকেল মধুস্থদন দত্তের প্রতিকৃতি, তাহা সত্য নহে। কারণ, যদিও নিমচাঁদের মুখে মধুস্থদনের নিজস্ব তুই একটি উক্তির স্থান দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সমগ্রভাবে মধুস্থদনের ব্যক্তিগত চরিত্র বিচার করিয়া দেখিলে ইহার সঙ্গে নিমচাঁদের চরিত্রের কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। মধুস্থদনের সমস্ত কার্যাবলীর মধ্যেই যেমন সর্বদাই কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার নহে, উচ্চতর প্রতিভারও একটা স্পর্শ থাকিত, নিমচাঁদের চরিত্রের মধ্যে তাহা নাই। নিমচাঁদের শিক্ষার ফল তাহার মজ্জায় গিয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, এক কথায় শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া তাহার জীবনের আদর্শ গঠনে সহায়তা করিতে পারে নাই, কিন্তু মধুস্থদন সম্পর্কে একথা বলিতে পারা যায় না। একটা উচ্চতর জীবনাদর্শ সর্বদাই মধুস্থদনের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, সেই আদর্শ বাস্তবের সম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া তাঁহার জীবন ট্র্যাজেডিতে পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু নিমচাঁদের জীবনে কোন উচ্চ আদর্শ ছিল না; তাহার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ছিল সত্য, কিন্তু তাহা সর্বদাই তাহার পরিবেশের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। তবে মধুস্থদনের সঙ্গে নিমচাঁদের সম্পর্ক কল্পনা করিবার কারণ কি? মনে হয়, নিমচাঁদের মুখে মধুস্থদনের তুই একটি নিজস্ব উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়াই মুখ্যত এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই যুগের ডিরোজিও-রিচার্ডসনের ছাত্রদিগের মধ্যে এই ধরণের কথা সকলের পক্ষেই

সমান স্বাভাবিক ছিল। অতএব এই উক্তিগুলির ভিতর দিয়া একমাত্র মধুসূদন নহে, তদানীন্তন সমগ্র শিক্ষিত নব্যযুবক-সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব দীনবন্ধু এই অভিযোগের উত্তরে যে বলিয়াছেন যে, 'মধু কি কখনও নিম হয়', তাহা কেবলমাত্র একটি সাধারণ লৌকিক যুক্তি হিসাবেই গ্রহণযোগ্য নহে, ইহার মধ্যেও তাহার একটি সার্থক ইঙ্গিত ছিল তবে একথা সত্য যে, নিমচাঁদের চরিত্র মধুসূদনের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত না হইলেও এই বিষয়ে কোনো জীবন্ত আদর্শ যে দীনবন্ধুর সম্মুখে ছিল, এই বিষয়ে কোন ভুল নাই। তবে তাহা অন্য কাহারও হইতে পারে।?

নিমচাঁদের চরিত্রের মধ্যে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির উপাদান ছিল, নাট্যকার সেভাবে তাহা যদি ব্যবহার কবিতে পারিতেন, তাহা হইলে 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হইতে পারিত। কিন্তু এই উপাদান-গুলি এতই অস্পষ্ট আভাস মাত্র দিয়া যায় যে, তাহা দ্বারা ট্র্যাজেডির প্রকৃত কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না; সেইজন্যই 'সধবার একাদশী' ট্র্যাজেডি না হইয়া হইয়াছে প্রহসন।

নিমচাঁদের সমগ্র জীবনের ব্যর্থতার জন্য তাহার দাম্পত্য জীবনই যে দায়ী সমগ্র নাটকের মধ্যে তাহার অস্পষ্ট আভাসমাত্র আছে। অথচ ইহার উপরই তাহার সমগ্র চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বুঝিতে না পারিলে নিমচাঁদের চরিত্রের কোন তাৎপর্যই বুঝিতে পারা যায় না—তাহার মাতলামি কেবলমাত্র মাতলামির জন্যই বলিয়া ভুল হয়। একদিন নিমচাঁদ অটলের বাড়ীতে মদ খাইয়া পড়িয়া আছে, কেনারাম ডেপুটিও সেখানে ছিল—নিমচাঁদ কাঞ্চনের বাড়ী যাইবার প্রস্তাব করিল। অটল বলিল,

অটল। তুই ওঠ, আর এক জায়গায় চল।

নিম। প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড্, এতে সব ক্রাইম আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি। ২।২

এইখানেই সর্বপ্রথম নিমচাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার আভাসটুকু পাওয়া গেল। তারপর আর একবার মাত্র বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট হইয়াছে। নিমচাঁদের নিকট অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার প্রস্তাব করিল। নিমচাঁদ অটলের এই প্রস্তাব সমর্থন করিল না। ইহাতে অটল ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল,

অটল। তুই তবে তোর মাগের কাছে যা।

নিম। Thou sticketh a dagger in me. অটল কি গালাগালিই তুই দিলি। ৩।২

সমগ্র প্রহসনের মধ্যে ইহার সর্বপ্রধান চরিত্র নিমচাঁদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে এই সামান্য আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যায়। নিমচাঁদের মদ্যপানের আচরণের মধ্যে তাহার জীবনের এই প্রচ্ছন্ন বেদনার অভিব্যক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। এইটুকু বুঝিতে পারিলে তাহার চরিত্রের প্রতি ঘৃণা অপেক্ষা সমবেদনাই অধিক হয়। এই সম্পর্কে অনতিকাল ব্যবধানে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাহা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র। ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনই দেবেন্দ্রনাথের চারিত্রিক অধঃপতনের মূল। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'যদি কখনও স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ কর্ণে শুনি, তবে মদ ছাড়িব নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।' নিমচাঁদের দাম্পত্য জীবনের যে, আভাসটুকু আমরা পাইলাম, তাহাতে তাহার পক্ষেও বাঁচা-মরা সমান কথাই ছিল। দীনবন্ধু অপূর্ব কৌশলে তাহার আচরণের মধ্য দিয়া এই ভাবটুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং এই তথ্যটুকুর উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার চরিত্রকে একটি মানবিক রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

নিমচাঁদের মদ্যাসক্তির মূলে এই ইতিহাসটুকু ছিল বলিয়াই মাতাল হইয়াও সে নিজের বিবেক বিসর্জন দেয় নাই—সে মত্ততার মধ্যে কখনও আত্মলোপ করে নাই, মত্ততার মধ্যে সে তাহার ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের বিস্মৃতির সন্ধান করিয়াছে মাত্র, কিন্তু অন্য বিষয়ে তাহার আত্মসম্মান সজাগ ছিল। অটল যখন গোকুলের স্ত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য নিমচাঁদের নিকট প্রস্তাব করিল, তখন নিমচাঁদ বলিল, 'এ কি ভদ্রলোকে পারে?" বলিয়া সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করিল। 'বিষবৃক্ষে'র দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিমচাঁদের এইখানেই পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্র রূপ-তৃষ্ণায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ছিল। কিন্তু নিমচাঁদ নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আর কোন নিষ্পাপ জীবনকে জড়াইতে চাহে নাই, ইহা নিমচাঁদের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব।

নিমচাঁদের চরিত্রের এই গুরুত্বের দিকটা নাটকের মধ্যে প্রাধান্য পায় নাই, বরং আভাসে ও ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে বলিয়া নিমচাঁদ ট্র্যাজেডির নায়ক না হইয়া এক সাধারণ প্রহসনের পাত্র হইয়াছে; তাহার মাতলামি, তাহার রুচি ও নীতি-বিরুদ্ধ উক্তি, তাহার অশ্লীল আচরণ

ইত্যাদিই নাটকের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধনের ইহাই একমাত্র উপায় ছিল। তিনি 'সধবার একাদশী'কে 'নীল-দর্পণের' মত বিয়োগান্তক নাটকে পরিণত করিতে চাহেন নাই। কিন্তু বোধ হয়, তাহা করিলেই ভাল হইত, দীনবন্ধুর হাতে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক আমরা পাইতাম। এখানে দীনবন্ধু সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া একটি সাময়িক সামাজিক দুর্নীতিকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের কতকগুলি চরিত্র লইয়া বিভিন্ন দিক হইতে মদ্যপানের কুফল বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে নাট্যকাহিনীর সংহতিও যে কতকটা নষ্ট হইয়াছে, সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে বলিতেছি।

নিমচাঁদ ব্যতীত এই নাটকে আর কোন চরিত্রই প্রকৃত স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। নিমচাঁদের পরই অটলের চরিত্রের কথা আলোচনা করিতে হয়। অটল ধনী মাতাপিতার একমাত্র পুত্র, সামান্য বিদ্যালাভ করিয়াই কুসঙ্গে পড়িয়াছে, তারপর সময়গুণে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। সে মূর্খ, সে 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিনিয়াছে শুনিয়া নিমচাঁদ তাহাকে বলিল, 'ওর ভালমন্দ তুমি বুঝিবে কি? তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদা পড়েছে কাশীদাস, তামার হাতে "মেঘনাদ", কাঠুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাংলার মিল্টন।'। দুইজনে এক সঙ্গে বসিয়া মদ খাইলেও এই দুইজনের মধ্যে এই পার্থক্য।

অটলের গৃহে সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী, তথাপি সে বারবনিতা-বিলাসী। কারণ, রক্ষিতা রাখা সে বড়মানুষী বলিয়া মনে করে। কলিকাতা সহরের সকল বড় লোকের উপর দিয়া বাহাদুরী লইবার জন্য সে সহরের খ্যাতনামা বারবনিতাকে নিজের রক্ষিতারূপে রাখিয়াছে। ইহা তাহার মূর্খতার সম্পূর্ণ উপযোগী কার্যই হইয়াছে। তারপর সেই বারবনিতা যখন তাহাকে অপমান করিয়াছে, তখন সেই বারবনিতাকে অপমান করিবার জন্য নিজের এক কুলবধূকে ঘরের বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। নাট্যকার অপূর্ব কৌশলে তাহার চরিত্রগত এই আনুপূর্বিক সামঞ্জস্যগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে শ্রেণীর নাটকই হউক, তাহাদের চরিত্রের একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্দেশ করা সর্বদাই নাট্যকারের কর্তব্য। অটলের পরিণতি-নির্দেশ খুব স্পষ্ট নহে। গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বাহির করিতে গিয়া ভুল করিয়া নিজের স্ত্রীকেই সে বাহির করিয়া আনিল, এই ঘটনাটির মধ্যে একটি উচ্চাঙ্গের কৌতুকরস ছিল,

কিন্তু অটলের উপর এই ঘটনার কোন সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায় না। রামধনের প্রহারের প্রতিক্রিয়াও ক্ষণিক মাত্র। ঐ অবস্থায় স্ত্রীকে নিকটে পাইয়া ও তাহার কথা শুনিয়া অটল তাহাকে বলিল, 'তোমার আর লেকচার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, গিন্নীপনা কর্তে এলেন।' কুমুদিনী 'যমের বাড়ী যাই' বলিয়া সক্রোধে বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করিল, অটলও ব্রাণ্ডী খাইয়া মায়ের জ্বালা ভুলিবার জন্য নিমচাঁদকে লইয়া বাগানে চলিয়া গেল—এই ভাবেই নাটকের যবনিকা পতন হইল। অর্থাৎ ঘটনার দিক দিয়া নাটক যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, প্রায় সেখানেই শেষ হইয়াছে। অবশ্য একথাও সত্য যে, প্রহসনের মধ্যে ঘটনার দিক দিয়া খুব বেশি কিছু দাবী করা চলে না। কিন্তু 'সধবার একাদশী' সেই জাতীয় প্রহসন নহে বলিয়াই ইহার বিষয়ে এই দাবী যেন কতকটা না তুলিয়া পারা যায় না। নীলকরের অত্যাচারে গোলোক বসুর পরিবার যে ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই তুলনায় পুত্রের মদ্যপানের জন্য জীবনচন্দ্রের বিপুল ধন-সম্পত্তির কিংবা তাহার পরিবারের যেন বিশেষ একটা কিছুই হয় নাই বলিয়াই অনুভূত হয়।

উপরোক্ত ত্রুটির অন্যতম কারণ, অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর চরিত্র-পরিকল্পনার ব্যর্থতা। কুমুদিনীই এই নাটকের নায়িকা—মাতাল স্বামীর উপেক্ষিতা পত্নী। নাটকের নামকরণ দেখিয়া মনে হয়, তাহার নারীজীবনের ব্যর্থতা নির্দেশ করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থকথা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, নাটকের মধ্যে তাহার স্থান বড়ই সঙ্কীর্ণ, মাত্র দুই তিনটি দৃশ্যে তাহার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি তাহাদের ভিতর দিয়াও সে পাঠকের কোন সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ, তাহার চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার এমন কোন গুণ আছে বলিয়া নির্দেশ করেন নাই, যে তাহা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। বরং ননদের সঙ্গে তাহার কুরুচিপূর্ণ বাক্যালাপে হাস্যরসের উদ্রেক হওয়ার পরিবর্তে তাহার বিরুদ্ধেই মন বিরূপ হইয়া উঠে। সৌদামিনীর সঙ্গে তাহার যে কথোপকথন শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এতই কুরুচিপূর্ণ যে তাহা দ্বারা সে কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। অবশ্য ভ্রাতৃবধূ এবং ননদ উভয়েই এই বিষয়ে সমান পারদর্শী—ধনিগৃহের বয়স্থা কন্যা ও বধূ সম্পর্কে দীনবন্ধুর এই ধারণারই যে কি ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা

বুঝিতে পারা যায় না—হয়ত এই সম্বন্ধে দীনবন্ধুর জ্ঞান সুস্পষ্ট বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল ছিল না, এই বিষয়ে তাঁহাকে কতকটা মধুসূদনের প্রহসনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় এই চরিত্রগুলি তাঁহার এই নাটকের মধ্যে এমন শক্তিহীন হইয়াছে। কুমুদিনী দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হইয়াই যে কথাটি প্রথম উচ্চারণ করিয়াছে, তাহা এই—'এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল।' তারপর সেই দৃশ্যেই আবার বলিয়াছে, 'আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি, একদিন তাকে ঘরে দেখতে পেলাম না। এক মরে যায় জানলুম—আপদ গেল।' অতএব দেখা যাইতেছে, আদর্শ হিন্দু নারী করিয়া নাট্যকার কুমুদিনীকে চিত্রিত করেন নাই, স্বামীর নিকট হইতে প্রত্যক্ষ কোন আঘাত না পাইয়াই নিজের একাদশীর সে কামনা করিতেছে, নাট্যকার কেবলমাত্র ইহার উপরই তাঁহার নাটকের 'সধবার একাদশী' নামকরণ করিয়াছেন। নাটকে আরও একবার কুমুদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তখন সে নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া কাঁকালে মস্ত আলবার্ট চেন-এ বাঁধা ঘড়ি ঝুলাইয়া উৎসব গৃহে 'হেসে হেসে মেয়েদের অভ্যর্থনা' করিতেছে। স্বামীর উপেক্ষিতা নারীর এই আচরণ কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না—এই সহজ কথাটি নাট্যকার এখানে বিস্মৃত হইয়াছেন। অতএব মনে হয়, নাট্যকার 'সধবার একাদশী'কে যথার্থই প্রহসন করিতে চাহিয়াছেন—ইহা লইয়া তাঁহার অন্য কোন উচ্চাশা ছিল না। তবে নিমচাঁদের চরিত্রের মধ্যে হয়ত তাঁহার অলক্ষ্যেই কতকগুলি নাটকীয় গুণ আসিয়া গিয়াছিল। যথার্থ নাট্যিক উপাদান হাতে পাইয়াও কত বড় একটা সম্ভাবনাকে নাট্যকার যে এখানে সামান্য একটা প্রহসনের কাছে বলি দিয়াছেন, এই নাটকখানি বিশেষ ভাবে অনুসরণ করিলে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি অনাবশ্যক চরিত্রের সমাবেশ এই নাটকের আর একটি গুরুতর ত্রুটি। মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে কেনারাম ডেপুটি, রামমাণিক্য ও ভোলার কোন স্থান নাই। তবে নানাদিক হইতে মাতলামির কুফল দেখাইবার জন্য নাট্যকার এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির কতকগুলি চরিত্র আনিয়া একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি ছাড়া ইহাদের দ্বারা আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই।

'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর যে অভিযোগ তাহা রুচির অভিযোগ। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কারণ, একথাও

সত্য যে, এই বিষয়ে মতের অনৈক্য চিরদিনই থাকিবে। কারণ, পাঠকের ব্যক্তিগত নীতি ও রুচি-বোধ দ্বারাই সাহিত্যের নৈতিক মূল্য সাধারণতঃ বিচার করা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত নীতি-বোধের উর্ধ্বে' না উঠিতে পারিলে কেহ আর্টের রস উপভোগ করিতে পারে না। মদ্যপানের কুফল বর্ণনা করিবার মত প্রচার করিতে গিয়াও যে রচনা খানি বাংলা সাহিত্য যথার্থ আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, তাহাই 'সধবার একাদশী' এই প্রসঙ্গে আমরা 'সধবার একাদশী' প্রহসনের প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতে পারি,—

নকু। ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে ?

নিম। পানায়, খায় না।

নকু। সুরাপান-নিবারণী সভা কচ্চে কি ?

নিম। Creating a concourse of hypocrites.

নকু। না হে এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েছে—মদ খাওয়া অনেক কমেচে।

নিম। প্রকাশ্য রূপে খাওয়া কম্‌চে, গোপনে খাওয়া বাড়্‌চে।

নকু। তুমি মাতাল, এ সভায় কি উপকার হচ্ছে, তুমি বুঝ্‌বে কি ? অনেক ভদ্রসন্তান মাতালদের অনুরোধে পড়ে মদ্ খেতে আরম্ভ করতো—এখন অনুরোধ করবা মাত্র তারা বলে সভার প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিছি, মাতাল ভায়ারা অম্‌নি পেচয়ে যান।

নিম। Vice versa.

নকু। সে আবার কি ?

নিম। অনেকে অনুরোধে পড়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু মদ দেখলেই এগ্‌য়ে আসেন।

নকু। সে দুই একটি।

নিম। ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজুড়।

নকু। আমার সংস্কার হয়ে পড়েচে, এখন আর ছাড়া দুষ্কর, তা নইলে আমি সভায় নাম লিখয়ে মদ ছাড়্‌তেম।

নিম। তোমার স্ত্রীরও কি সংস্কার হয়েছে ?

নকু। কিছুমাত্র না।

নিম। প্রথমও না, দ্বিতীয়ও না।

নকু। সে মদ ছোঁয় না।

নিম। তবে তাঁকে নাম লেখাতে বলো।

নকু। সে যে তোর বোন হয়।

নিম। আর গৌতম মুনি আমার বোনাই হয়।

নকু। নিমচাঁদ তুই কেন সুরাপান-নিবারণী সভার সভ্য হ না।

নিম। আগে লিবারের উপক্রম হক্—কতকগুলিন নাম কাটা সেপাই ঢুকেছেন।

নকু। তারা কারা ?

নিম। শূল, পীলে, পাত, অগ্রমাস, কাঁসর ঘণ্টায় যাঁদের পেটে জায়গা নাই—তাঁরা চিরকাল মদ খেয়ে নেচে বেড়ালেন, এখন উদরে স্থান সংকীর্ণ বিধায়, অষ্টম হেন্‌রির ক্যাথারাইন পরিত্যাগের ন্যায় মদ ছেড়ে দিলেন। নেমোক হারাম ব্যাটাদের মুখ দেখতে নাই—

নকু। নিমচাঁদ, আপনার কথায় আপনি ঠক্‌লে—ও সকল রোগ মদেতেই জন্মে, সুতরাং মদ অতি ভয়ঙ্কর শত্রু।

নিম। রস বাবা একটু খেয়ে নিই, বুদ্ধিকে সজীব করি, তারপর তোমার কথার উত্তর দিচ্চি। (মদ্যপান)

নকু। অধীনকে কিঞ্চিত দিতে আজ্ঞা হক্।

নিম। এস, বাপ এস। (মদ্যপান)

নকু। (মদ্য পানান্তর) এত ভাবি, কম করে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ দেখিবামাত্র প্রাণটা লাপ্‌য়ে ওটে।

নিম। (মদ্যপান করিয়া) মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে, এমন কিছু নিদান শাস্ত্রে লেখা নাই—যদিই জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্যেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠ্‌য়ে দিলেম, তাঁতি সোনার বেণে কুমার কামারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম, যে মহাত্মার গুণ প্রভাবে বন্ধুপক্ষে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর শরীরের অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ করবো ? পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ—কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা—শরীর অসুস্থ হন, গোল্লাই যান—মনকে রোগ স্পর্শ কত্তে পারে না, মদের বিচ্ছেদে মনকে কেন ক্ষোভিত করবো ?

"—the mind and spirit remains
Invincible and vigour soon returns."

নকু। রোগ জর্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান—কারণ, তাঁরা কাজের বার, তাঁদের সুরাপান-নিবারণী সভায় নাম না লিখয়ে নিমতলার দিকে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা লওয়া কর্তব্য—আমার প্রস্তাব এই, যারা মদ কখন খায় নি, অথবা যারা কেবল খেতে আরম্ভ করেছে, এই সকল ভয়ানক আশঙ্কায় তাদের মদ হতে তফাৎ থাকা উচিত।

নিম। তুমি আর এক গেলাস না খেলে কোন শালা তোমার কথার উত্তর দেয় —মনঃক্ষেত্র মদ্যরসে আর্দ্র কর, তার পরে আমার উপদেশবীজ বপন করবো, অচিরাৎ অঙ্কুরিত হবে।

নকু। (মদ্যপান করিয়া) আমি ত কাজের বার হইচি—আমার জন্যে আমি বলি না—দেশের মঙ্গলের জন্যে বলি—

নিম। Charity begins at home—আমি আমার জন্যে বলি, সুরাপান নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয়, আমার ভারি অমঙ্গল—বড় মানসের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি ধেনো খেয়ে মরবো—এক ব্যাটা বড মানসের ছেলে মদ ধল্লে, দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

নকু। তুমি যা বলো তা বলো, আমার বিবেচনায় সুরাপান-নিবারণী সভাটি অতি উপযুক্ত সময় সংস্থাপিত হয়েছে—এ সভাটি না হলে অসংখ্য যুবক সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়ে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হতো।

নিম। রোগের ভয়ে মদ না খাওয়া, অথবা ধরে ছেড়ে দেওয়া অতি ভীরুতার কর্ম—

"—To be weak is miserable
Doing or suffering".

তোমার সঙ্গে সভাপতি খুড়োর পরিচয় আছে ?

নকু। আছে।

নিম। তাঁকে বলে পাঠাও, পরিণয়-নিবারণী নামে একটি শাখা স্থাপন করুন।

নকু। পরিণয়ে অপরাধ ?

নিম। ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্ছে, কতিপয় বিবাহিত কামিনী পতিকে প্লানটিন্ দেখিয়ে উপপতি করেছে এবং দুই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাতে পত্নী কর্ত্তৃক পতি বিনাশিত হয়েছে—সুতরাং বিবাহটা অতি ভয়ংকর, বিবাহ প্রচলিত থাকাতে অস্মদ্দেশে কত বিদ্যাবিশারদ দেশহিতৈষী যুবক কামাতুরা কামধুরার হস্তে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন, কত যুবক যাঁহাদের বিদ্যা, বদান্যতা, দেশানুরাগিতা, সাহস, বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছিল, যাহাদিগকে বঙ্গদেশের সভ্যতার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করণের আয়োজন হয়েছিল, যাঁহারা বঙ্গসমাজের কুসংস্কারকলাপ নিরাকরণের সদুপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সকল যুবক স্বীয় বিবাহিতা বনিতার ব্যভিচার দৃষ্টে ভগ্নোদ্যম হয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছেন; কত যুবক রমণীর কুচরিত্রজাত দুঃসহ ক্রোধানল মনে রাখিয়া যেমন চেয়ারে উপবেশন করিতেছিলেন, অমনি হুস্ করে অনলশিখা হয়ে পুড়ে মরেছেন। যখন দেখা যাইতেছে, বিবাহ দ্বারা এবংবিধ বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তখন বিবাহ হইতে আব্‌ষ্টেন্ হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য।

নকু। তুমি ঠাট্টা কর, আর যা কর, আমি এ সভার কখন নিন্দা করবো না।

নিম॥ দেখ দেখি বাবা, আস্পর্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ করতে হবে!—পীড়া হয়, প্রতিকার কর, মেডিকেল্ সায়ান্স হয়েচে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সুখ পাবি—

"Rich the treasure,
Sweet the pleasure.
Sweet is pleasure after pain,"

নকু। তুই দেখিস্ আমি ত্বরায় সভায় নাম লেখাব।

নিম। বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না, তুমি নাম লেখালে, সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা নিতে হবে।

নকু। কেন, রামসুন্দর বাবু বিশ বৎসর একাদিক্রমে মদ খেয়েছেন, এখন মদ ছেড়ে দিয়ে সুরাপান-নিবারণী সভার সভ্য হয়েছেন, সভ্য হয়ে তিনি ত বেশ আছেন।

নকু। তাঁর ত সভ্য হওয়া নয়, জাবরকাটা—তিনি বিশ বৎসর যে কায়গো বোঝাই নিয়েছেন, বিশ বৎসর যাবে হজম কত্তে—তিনি সভায় বসে মদের জাবর কাটছেন। (ভঙ্গির সহিত জাবর কাটন)

অটলবিহারীর প্রবেশ

এস আমার মাখনলাল মদের গোপাল এস।

অট। এ ব্যাটা খুব খেয়েছে বুঝি?

নকু। কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেঁজেছে।

নিম। পালা আরম্ভ করি। (মদ্যপান) অটল বাবা এক সিপ্ নাও।—

অট। আমি মদ খাব না, সকলেই বলে একবার ধল্লে আর ছাড়া যায়না—আমি সেদিন তোমাদের অনুরোধে একটু খেচ্‌লেম, তাতে আমার হেডেক হয়েছিল।

নিম। তোমার হেডটিতে আইরিশ ষ্টু হয়।

নকু। কেন?

নিম। অনেক পোট্যাটো আছে।

নকু। অটলকে একটু শ্যাম্‌পেন্ দাও।

অট। আমি তাও খেতে পারবো না।

নিম। তুমি কি প্রতিজ্ঞাপত্রে বাঁদরে আঁচড়েচ? থুড়ি, সই করেচ?

অট। সই করি আর না করি, আমি মদ খাব না।

নিম। তোর বাবা খাবে।

অট। আমার বাবা পরম ধার্মিক, প্রত্যহ শিবপূজা করেন।

নিম। তাই এমন গণেশের জন্ম হয়েছে। (অটলের হস্তে শ্যাম্‌পেন্ দিয়া) ঢক করে গিলে ফেল, লক্ষ্মী বাপ্ আমার।

অট। নকুল বাবু—খাব?

নকু। খাও, একটু খেতে দোষ কি? তুমি ত আর মাতাল হচ্চো না। মডরেট্‌লি খাওয়ায় কোন অপকার করে না—আমোদ করা বই ত নয়—

নিম। জুড়িয়ে গেল।

অট। (মদ্যপান করিয়া) আমি কিন্তু আর খাব না।

নিম। কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছ?

অট। বেটি তিন শ টাকা মাসয়ারা চায়।

নিম। তুচ্ছ কথা....তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাকলে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখতেম।

নকু। কাঞ্চন আজ আসবে, কথা আছে।

নিম। তবে মঙ্গলাচরণ করি। (মদ্যপান) অটল শক্তির সম্ভাষণ উপযোগী আয়োজন কর, আর একটু শ্যামপেন্ খাও।

অট। নকুলবাবু চুপ করে রইলেন যে—উনি কি মদ্য ত্যাগ করেছেন নাকি?

নকু। বাপু আমাদের উদর সমুদ্রবিশেষ—এক ঘড়া তুল্যেও কমে না, এক ঘড়া ঢাল্‌লেও বাড়ে না। (মদ্যপান)

নিম। এখন তুমি একটু খাও।

অট। নিমচাঁদ তোর পায়ে পড়ি আমায় আর দিস নে—বাবা যদি জানতে পারেন, আমি মদ খেইচি তিনি গলায় দড়ি দেবেন।

নিম। তুমি নকুলবাবুর অনুরোধে খেতে পালো, আমার অনুরোধে খেতে পার না? আমি তোমার সতাত বাপ? তুই যদি এক গেলাস না খাস, আমি গলায় দড়ি দেব, তোর পিতৃহত্যার পাতক হবে।

অট। মাইরি ভাই, মদে আমার বড় ভয়—আমি আর খাব না।

নকু। পেড়াপিড়ি কাজ কি।

নিম। খাবে না?

অট। না।

নিম। যা ব্যাটা তুই প্যারিসাইড, তোর মুখ দেখ্‌তে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা' নামক প্রহসনটি প্রকাশিত হয়। এবং ইহাই মদ্যপান বিষয়ে প্রথম প্রহসন। কিন্তু ইহার কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, তথাপি ইহার কাহিনীটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তাহা এই :—

গোপালচন্দ্র, হরিহর, নিতাই ও শ্যামলাল চারিজন পরম বন্ধু বা 'ইয়ার'। ইহাদের মধ্যে গোপাল মদ্যপ, হরিহর অহিফেন-সেবী, নিতাই গুলিখোর এবং শ্যামলাল গাঁজাখোর। ইহারা প্রত্যেকেই সম্পন্ন পরিবারের সন্তান ছিল, কিন্তু নেশার বশবর্তী হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি

বিনষ্ট করিয়াছে। এখন অনাহারে অর্ধাহারে তাহাদের দিন কাটে, কিন্তু তথাপি নেশার প্রভাব কাটাইতে পারে না। কিন্তু ক্রমে তাহাও বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। নিতাই ভাবিয়া স্থির করিল, বড়লোকের তোষামোদ করিতে পারিলে আহারের চিন্তা থাকিবে না। সে স্থির করিল, বড়লোকের নিকটে আমি বাবু হইয়া গমন করিব, পরে অল্প দিবসের মধ্যেই তাহাকে আমি মদ্য পান করিতে শিখাইব এবং তাহা হইলে অনায়াসে কৃতকার্য করিতে পারিব। সে কাপড় চোপড় ভাড়া করিয়া বড় লোকের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইল। গোপালচন্দ্রের প্রতিবেশী রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের গুরুদেব সদানন্দ গোস্বামী। সদানন্দ গোস্বামী গুরুব্যবসায়ী হইয়াও মদ্যপায়ী। শিষ্য তাহাকে মদ্যপ দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রণাম মহাশয়, আজ এরূপ দেখছি, কেন? আপনি প্রধান গোস্বামী। এ কর্ম কোথা শিক্‌লেন। সদানন্দ বলেন, 'শুঁড়ির বাড়ী, আর কোথা?' বলিয়া তিনি মাৎলামি করিতে থাকেন।

প্রসন্নবাবুর বৈঠকখানায় চারিজন ইয়ার ইতিমধ্যেই যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। নন্দরাম ভট্টচার্য নামে আর একজন ইয়ার তাহাদের সঙ্গে জুটিয়াছেন। তিনি মদ্যের সঙ্গে নুন, চাটনি ও ছাগ মাংসের আবশ্যকতা বিষয় সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করেন।

অবশেষে চারিজন ইয়ারে মিলিয়া বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ করিল। প্রসন্ন বাবুরও মদ্যপানের জন্য অর্থনাশের ফলে সকল সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল, কেবল মাত্র বসতবাড়ীটুকু রহিল। ইহাই বিক্রয় করিয়া চার ইয়ারের জন্য বৃন্দাবন যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ হইল। তাহারা সকলে মিলিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিল তাহাদের স্ত্রীগণও গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল।

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'সুধা না গরল' প্রহসনখানি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মদ্যপ মানুষ এবং পশুর মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই তাহা তিনি তাহার এই গ্রন্থের পরিচয়লিপির দুইটি উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

উকিল বিধুবাবুর গর্ব তাঁহার ন্যায় সভ্য ও কুসংস্কারশূন্য ব্যক্তি নাই বললেই চলে। কারণ, তিনি ব্রাহ্ম সমাজে নাম লেখাইয়াছেন, হিন্দুদের দেবতা মানেন না এবং চাচাদের দোকানে রুটি খান, তাঁহার মতে দেশের এই কুসংস্কারগুলি দূর না করিলে মঙ্গল নাই। তাই তিনি তাঁহার ৪০ বৎসরের বিধবা বোনের বিবাহ দিয়াছেন এবং বোনের একটি সন্তানও বর্তমান। বিধুবাবুর বন্ধু রামেশ্বর

বাবুর এই সব ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া, মুসলমান ও উইলসনের দোকানে বিস্কুট খাওয়া, আলবট ফ্যাসনের টেরিকাটা পছন্দ নয়।

গণেশ ডাক্তার বিধুবাবুর বন্ধু। তিনি মদ্যপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেও বিনা দ্বিধায় মদ্যপান করেন। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদের অন্ত নাই, কিন্তু বোসেদের বউ-এর রূপ দেখিয়া হতচেতন প্রায়। বোসেদের বউ সধবা হইলেও স্বামী বেশ্যালয়েই পড়িয়া থাকে। এইজন্য গণেশ ডাক্তারের তাহাকে হস্তগত করিবার খুব ইচ্ছা। মাঝে মাঝে বাইনাকুলার দ্বারা বোসেদের বাড়ীর ছাদে প্রেমিকাকে দেখিবার চেষ্টা করে, সদা সুযোগ সন্ধান করে কি ভাবে সে তাহাকে করায়ত্ত করিবে।

বিধুবাবুর বৈঠকখানায় মদ্যপান চলে। নলিনবিহারী, শম্ভু, গোলাপী ইত্যাদির শুভাগমনে নরক গুলজার হয়। নলিনবিহারী অল্পবয়স্ক, সুশ্রী যুবক, থিয়েটারে স্ত্রীলোকের পাঠ করে। গোলাপী বাঈজী। কেবল ইহারা নয় এই নরকে ইস্কুলের ফোর্থ টীচার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়েরও শুভাগমন হয়। তিনি আবার গোলাপীর পূর্বপরিচিত। বৈঠকখানার একদিকে এইরূপ নরক গুলজার চলে, অন্যদিকে রাজেনবাবু, অবিনাশবাবু দেশের পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিতে থাকেন। রাজেনবাবু বলেন যে, আমাদের দেশে ব্যায়াম, যাকে বলে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ তাহার প্রচলন হওয়া উচিত।

অবিনাশবাবুর তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলেন, আমাদের দেশে ত বিবাহ করা হয় না বিবাহ দেওয়া হয়। যাহার সঙ্গে চিরকাল একত্র বাস করিতে হইবে, তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া বিবাহ করা উচিত। বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে রাজেনবাবু বলেন যে অপক্ক বীজে কখন সতেজ বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না।

এই নাটকের উপসংহারে দেখা যায় যে, শম্ভুর স্ত্রী স্বামীকে মদ বেশ্যা ছাড়িতে বলায় সে স্ত্রীর কাছে রতনচুর চায় ও পরিশেষে স্ত্রীকে লাথি মারে এবং তাতেই শম্ভুর স্ত্রী মারা যায়। অন্যদিকে গণেশ ডাক্তার বোসেদের বাড়ি ব্যভিচার করিতে গিয়া খুব জব্দে পড়েন ও প্রহার খাইয়া দেশত্যাগী হন।

রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'মাতালের জননী বিলাপ' ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাও একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন। মদ্যপানে যে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, ইহাই ইহার মূল বক্তব্য। বুদ্ধিভ্রংশতার জন্য জননীর অপমানই ইহার মধ্য দিয়া স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কাহিনীটি এই,—হরিশবাবু কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। কিন্তু নিজে অত্যন্ত মদ্যপ।

প্রায় পনর বার প্রতিজ্ঞা করিবার পরও তিনি মদ্যপান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গত দিনও মদ্যপান করিয়া রাস্তায় উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার অনুশোচনার অন্ত নাই। তিনিও তাঁহার এটর্নি বন্ধু উভয়ে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আর মদ্যপান করিবেন না, ব্রাহ্মসমাজেও যাইবেন না।

হরিশবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া এটর্নি বাবু বলেন যে, তিনি ফাকি দিয়া উকিল হইয়াছেন, মামলা-মোকর্দমা কিছুই বোঝেন না। এমন সময় উড়িয়া চাকর মদের বোতল ও গ্লাস লইয়া ঘরে ঢুকিলে হরিশবাবুর চোখের সামনে এটর্নি মদ্যপান শুরু করেন। হরিশবাবু কিছুক্ষণ পরে সমস্ত প্রতিজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করেন এবং পরে দুইজনে নাচিতে নাচিতে কামিনী পতিতার গৃহের দিকে পা বাড়াইলেন।

হরিশবাবুর অধঃপতন এইভাবে দিনদিন চরমে উঠে। একদিন হরিশ কামিনীর বাড়ী যাইবার পূর্বে মা সাবিত্রীর নিকট টাকা চাহিতেই সাবিত্রী বলেন যে টাকা তিনি দিতে পারেন; কিন্তু তাহার কোথাও যাওয়া চলিবে না। হরিশ তাহাতে উত্তর দেয় যে মদ খাওয়া একটা সভ্যতার চিহ্ন আর ডাক্তারেরা বলেন যে মদে অনেক উপকার আছে। মা উত্তর দেন যে মদ সভ্যতার চিহ্ন নয়, অসভ্যতার চিহ্ন। এদিকে বন্ধুর ডাকাডাকিতে অধৈর্য হইয়া হরিশ মাকে লাথি মারিয়া বাক্স লইয়া উধাও হয়।

হরিশের চরিত্রের এই অধঃপতন দেখিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন এবং বলেন যে মদ কি আমার সবনাশ করিবার জন্য ইংরাজেরা এদেশে আনিয়াছিল। হায়, এমন দিন কবে হইবে যে দিন সকলে মদ গরল বলিয়া আর স্পর্শ করিবে না। এই বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইহার পর গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪) প্রহসনখানি সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহার কাহিনী এই প্রকার—

শিবপুরের জমিদার কমলাকান্ত রায়ের মৃত ভাই-এর দুই পুত্র—শারদা ও বরদা। শারদা বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট। বরদা কিছুদিন যাবৎ বদ বন্ধুদের সঙ্গে মিলিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন বন্ধুরা মিলিয়া প্রস্তাব করিল যে কমলাকান্তকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিলে অনেকটা নিষ্কণ্টক হওয়া যায়। কিন্তু ঘটনার দিন কমলাকান্ত জানিতে পারিয়া সাবধান হইয়া যায় এবং বিধুকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

বরদার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ও গোরাচাঁদের স্ত্রী যামিনীর দুঃখ যে তাহাদের স্বামী রাত্রে বাড়ী থাকে না। শারদার স্ত্রী সৌদামিনীর স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোরাচাঁদ প্রেমপত্র লিখতে শুরু করে। এইসব দেখিয়া শুনিয়া কমলাকান্ত কাশী চলিয়া যান।

গোরাচাঁদের পরিকল্পনা বিরাট, সে বরদাকে মদ খাইতে শিখাইয়াছে লিভার পচাইয়া মারিবার উদ্দেশ্যে। শারদা নাই, কমলাকান্ত কাশীতে! তাহা হইলে সে সৌদামিনীকে ভোগ করিতে পারিবে এবং সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিতে পারিবে।

কমলাকান্তের কাশী যাত্রার পর বরদা অধঃপতনের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। বরদা অত্যধিক মদ্যপানে মারা যায় এবং স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ইহাতে পাগল হইয়া আত্মহত্যা করে।

গোরাচাঁদের অত্যাচারে সৌদামিনী কাশীতে পলাইয়া আসেন এবং শারদার সঙ্গে বহু বাধা বিপত্তির পর মিলন হয় এবং নিজকর্মদোষে গোরাচাঁদ বিষযুক্ত খাদ্য খাইয়া মরিতে বাধ্য হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় (জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামানী) রচিত 'দ্বাদশ গোপাল' নামক প্রহসনখানি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কোন কোন উৎসব উপলক্ষে শিক্ষিত সমাজের মদ্যপান চরম আকার লাভ করিত। মাহেশে দ্বাদশ গোপাল দর্শন উপলক্ষে কলিকাতার বাবু সমাজ মদ্যপান এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য ব্যভিচারে উন্মত্ত হইয়া উঠিত! সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 'দ্বাদশ গোপালের' কাহিনী এই প্রকার :—

কলিকাতার চারিজন বাবু এক পতিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নৌকাযোগে গঙ্গাপথে মাহেশে দ্বাদশ গোপাল দেখিতে যাত্রা করিয়াছে। বাবুদের একজনের নাম নন্দলাল। সে নিজের বাড়ীর শালগ্রাম শিলার সোনার পৈতা চুরি করিয়া ত্রিশ টাকায় তাহা বিক্রয় করিয়াছে এবং তাহা দিয়া মদ কিনিয়াছে; স্ত্রীকে প্রহার করিয়া তাহার গলার সোনার হার ছিনাইয়া আনিয়াছে, তাহার প্রয়োজন মত মদ্য কিনিয়া পান করিবে। আর একজন বাবুর নাম বিধুভূষণ। সে মাইনের টাকায় মদ কিনিয়া খায়, স্ত্রীপুত্র উপবাসী থাকে। সকলে মিলিয়া বাক্স হইতে মদ বাহির করিয়া পান করিতে লাগিল এবং মত্ত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। কখনও গান ধরে, কখনও মারামারি আরম্ভ করিয়া দেয়। নদীতীর হইতে এক ইনসপেক্টর ও পাহারাওয়ালা

তাহা শুনিয়া নৌকা তীরে ভিড়াইতে বলে। মাতালেরা কান্নাকাটি করিয়া তাহাদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু পাহারাওয়ালা নৌকার জিনিসপত্রসহ তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। ইন্‌সপেক্টর সাহেব তাহাদের কিছু সদুপদেশ দেন।

ইহা নাটকও নহে, প্রহসনও নহে, তবে নাটকের আকারে লিখিত মাত্র। ইহা চিত্র, রচনার গুণে চিত্রগুলি বাস্তব এবং জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার বাবুদিগের ব্যভিচারের চিত্র বর্ণনা করিয়া সে যুগে অসংখ্য নাটক, প্রহসন এবং ব্যঙ্গ রচনা যে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা তাহাদেরই একটি অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস মাত্র। ইহার আর কোন গুণ না থাকিলেও সেকালের সমাজ-জীবনের বিকৃত রুচি এবং নৈতিক অধঃপতনের যে পরিচয় ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষে কতকটা মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

এই শ্রেণীর আর একখানি প্রহসনের নাম 'এই এক প্রহসন।' ইহা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, লেখকের নাম অজ্ঞাত। ইহার কাহিনী এই প্রকার ;—বামাপদ অফিসের কেরাণী, একদিন মাথা ধরার নাম করিয়া সকাল সকাল অফিস হইতে বাড়ী যাইবার পথে বই-এর দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া একটি সস্তা দামের বই চাহিলেন। দোকানী—'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নামে নামে একটি বই দিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল যে লেখকেরা বুড়োদের উপর এত চটা কেন? এমন সময় হলধর নামে আর এক কেরাণী সেখানে উপস্থিত হইয়া বলেন যে 'চোরের উপর চাতুরী' বইখানির বিষয়বস্তু স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ এবং এই বইটি তিনি কিনে পুড়িয়ে দিয়েছেন। বামাপদবাবুর সঙ্গে হলধরবাবুর খুব বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় এবং হলধর তাঁহার ঠিকানা দিয়া বামাপদ বাবুকে সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

হলধর যেখানে বামাপদ বাবুকে আসিতে বলিয়াছিল, তাহা একটি পতিতালয়। বামাপদ বাবু সেখানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং মদ্যপান করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে এবং অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অজ্ঞান হওয়ার পূর্বে সে একটি কাগজের টুকরায় কি লিখিয়া যায়। পান্না ও হলধর সেই কাগজখানি লইয়া বামাপদ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। চিঠিতে লেখা ছিল যে তিনি এক ভয়ানক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কৃষ্ণপ্রিয়া যেন সাবধানে থাকে এবং এক হাজার টাকার তোড়াটি সাবধানে

রাখে। . পরে পুনশ্চ দিয়া লেখা আছে, যেন ওই টাকাটা পত্রবাহকদের দিয়া দেওয়া হয়। বামাপদবাবুর স্ত্রী সমস্ত বুঝিতে পারিয়া হলধরদের আটকাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু হলধর পলাইয়া যায়।

পরে বামাপদ বাবু ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী কৃষ্ণপ্রিয়ার কাছে সমস্ত শ্রবণ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কোনদিন ও পথে পা বাড়াইবেন না।

পরদিন এক মাতাল বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বামাপদবাবুকে মদ্যপান করিতে অনুরোধ করে, তখন বামাপদবাবু সমস্ত খুলিয়া বলেন যে কত ছোঁড়া বই বিক্রি করিয়া মদ্যপান করে, পতিতালয়ে যায়। লক্ষ টাকা খরচ করিয়া মুখে চুণ মাখে, কিন্তু সত্যের তুল্য আর কিছুই নাই।

বামাপদ বাবুর উপদেশে মাতাল বন্ধু নিজের ভুল বুঝিতে পারে এবং সঙ্কল্প করে যে জীবনে সে আর কখনও এমন দুষ্কর্ম করিবে না।

মদ্যপান বিষয়ক আর একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮১)। ইহার নায়ক চরিত্র যোগেশের মদ্যপান ও তাহার পরিণামের যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালীর সমাজ-জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ ছিল, ইহারও চিত্র গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সমাজ-জীবন হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি রচনার পর হইতেই তদানীন্তন নাগরিক জীবনের এই কলঙ্কের কথা প্রচার লাভ করিয়া কত নাটক-প্রহসন যে রচিত হইয়াছিল. তাহার অন্ত নাই। শুধু তাহাই নহে, দেশে সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সমাজদেহের এই দুরন্ত ব্যাধি দূর করিবার প্রয়াসও দেখা দিয়াছিল। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়াও সমসাময়িক বাংলা দেশের এই মসীলিপ্ত চিত্রই প্রকাশ করিয়া সমাজের দৃষ্টি ইহার মর্মান্তিক পরিণতির দিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছিল। সে দিন কলিকাতা মহানগরীর কত অন্তঃপুরই যে জ্ঞানদার মত কত হতভাগিনী পত্নীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হিসাব কোনদিনই কেহ করিতে পারিবে না এবং এই পথেই যে কত সাজান বাগান শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারিবে? গিরিশচন্দ্র সেদিনকার সমাজের এই রূপটিকে সুস্পষ্টভাবে তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে সংলগ্ন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই যোগেশ চরিত্রটি এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানদার সংলাপেও সর্বত্রই মদ্যপানের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রফুল্ল

যখন জ্ঞানদাকে বলিল, 'দিদি, তুমি খেতে দাও কেন, দিদি?' জ্ঞানদা তাহার উত্তরে বলিল,—'আমি কি করবো বোন, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হলো। আহা! কোম্পানির রাজে এত হ'চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলি তুলে দেয়, তা হলে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে, আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করে।' ইহাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার নাগরিক জীবনের চিত্র।

যোগেশ একদিন মাতলামি করিতে করিতেই বলিল, 'সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিজ্....আমার মা রত্নগর্ভা, একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর।' (২।৪)। উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজের অনুকরণে মদ্যপানের অভ্যাস সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে মামলা মোকদ্দমারও সৃষ্টি হইয়াছিল, মদ এবং মোকদ্দমা দুই-ই সেদিন বাংলার পরিবার ধ্বংস করিতেছিল। মোকদ্দমার সহায়ক উকিল-মোক্তার, অর্থোপার্জনের জন্য সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের বৃত্তি ছিল, তাহাদের কবলে পড়িয়া সাধারণ লোক যে কি ভাবে লাঞ্ছিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহার মধ্য দিয়া সেই ভাবটিও প্রকাশ পাইয়াছে। পল্লী জীবনে একদিন যে কাজ একটি বৈঠকেই পঞ্চায়েৎ কিংবা গ্রামবৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিতেন; তাহাই উকিল মোক্তারের করুণায় দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর মাস, মাসের পর বৎসর ধরিয়া টানা পোড়েন হইতে লাগিল, তাহার ফলে ভুক্তভোগীর জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিতে লাগিল। সমসাময়িক সমাজের এই ভাবটিই এই উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নব প্রতিষ্ঠিত সমাজ-জীবনের মধ্যে যে সকল দুষ্ট ক্ষত প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মদ্যপান যেমন ছিল, মাম্‌লা-মোকদ্দমাও তেমনি ছিল। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভিতর দিয়া বাংলা নাটকে মদ্যপানের যে কুফল বর্ণনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত বাংলা নাটকের অবলম্বন হইয়াছিল। এমন কি, সে যুগের বাংলার এমন কোন সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসন ছিল না, যাহাতে মদ্যপান সম্পর্কে নিন্দা প্রকাশ করা না হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র যুগের সেই প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'র নায়ক চরিত্র যোগেশের অধঃপতনের মূলে তাঁহার এই কু-অভ্যাসটাকে আনিয়া যুক্ত

করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে মদ্যপান প্রায় সামাজিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, সমাজ-দেহে ইহা দ্বারা যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটকের নায়ক-চরিত্রের মধ্যেই ইহার রূপটি প্রতিফলিত করিয়াছেন। মধুসূদন যেমন নিজের জীবনে ইহার কুফল অনুভব করিয়াই তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ভিতর দিয়া ইহার রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সধবার একাদশী' নাটকের মধ্যে ইহারই পরিচয়টিকে আরও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রও সেই পথই অনুসরণ করিয়া তাঁহার যোগেশ চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা সামাজিক নাটকের একটি ধারা অনুসরণ করিয়াই মাতাল চরিত্র যোগেশের সৃষ্টি হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক সমাজের মধ্যে এই রূপটি প্রত্যক্ষ ছিল বলিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে যোগেশ চরিত্রের মাতাল রূপটিকে জীবন্ত এবং বাস্তব করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে মদ্যপায়ী নববাবুর যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কেবলমাত্র সবিশেষ কোন চারিত্রিক রূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই—ইহা যেন মদ্যপায়ীর একটি 'টাইপ' বা ছাঁচ মাত্র; বিশেষতঃ তাহার মধ্যে মদ্যপানের জন্যই মদ্যপানের তৃষ্ণা অনুভূত হইত; ইহা তাহার অর্থহীন লোক-দেখানো খেয়াল এবং বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না; কিন্তু মদ্যপায়ী তাহার মদ্যপানের মধ্য দিয়াও যে নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র হইতে পারে, তাহা দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সধবা একাদশী'র নিমে দত্তর চরিত্রের মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম দেখাইলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পর অধিকাংশ নাটকেই মদ্যপ কোন বিশিষ্ট নাটকীয় চরিত্ররূপে প্রকাশ পাইতে পারে নাই, কেবল মাত্র মদ্যপায়ীর আদর্শ, টাইপ বা ছাঁচ হইয়া রহিয়াছে। দীনবন্ধুর পর গিরিশচন্দ্রই যোগেশের মধ্য দিয়া মদ্যপায়ীকে একটি বিশিষ্ট নাটকীয় চরিত্ররূপে গড়িয়া তুলিলেন। সেজন্য মাতাল হইলেও যোগেশ সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়া, বিশেষতঃ সন্তানতুল্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার অকারণ বিশ্বাসঘাতকতা লক্ষ্য করিয়া তাহার অবস্থার প্রতি সকলেই বেদনা অনুভব করিবেন।

যোগেশের মাতলামির একটা ধারা আছে। মদ্যপান করিয়াও কিছুতেই তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া যান না; তিনি কখনও জ্ঞানহারা হইয়া কোনও

আচরণ করেন না। বহু জঘন্য আচরণ তিনি মত্তাবস্থায় করিয়াছেন, কিন্তু সচেতন ভাবেই তিনি তাহা করিয়াছেন, যেন রমেশের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আক্রোশ মিটাইবার জন্য নিজের চুল নিজে টানিয়া ছিঁড়িয়াছেন, নিজের দেহকে নখে আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। রমেশের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া তিনি আত্মরক্ষার কোন যে উপায় সন্ধান করিলেন না, তাহা তাঁহার মদ্যপানজনিত বুদ্ধি-ভ্রংশের ফল নহে—বরং যেন ভ্রাতার বিরুদ্ধে আক্রোশ মিটাইবার উপায় বলিয়াই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কি, তাহা তিনি যেমন জানিতেন, তেমনই রমেশ যে কি; তাহাও তিনি জানিয়েছিলেন; এমন কি, সুরেশ সম্পর্কেও তাহার কোন অজ্ঞতা ছিল না। সেই জন্যই তিনি সহজভাবে তাঁহার জননীকে বলিতে পারিয়াছিলেন, যে তাঁহার তিনটি পুত্র-সন্তানই সমান—'একটি মাতাল, একটি উকিল একটি চোর।'

উকিল সম্পর্কেও গিরিশচন্দ্রের ধারণা মাতাল হইতে কোন বিষয়েই উন্নত ছিল না। মামলা-মোকদ্দমা নাগরিক জীবনের অভিশাপ রূপে এই দেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল, পরে পল্লীর নিরুপদ্রব জীবনকেও ইহা গ্রাস করিল। সত্যনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র উকিল-মোক্তারের অসদাচরণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না; সেইজন্য তীব্রতম ভাষায় তিনি তাহাদের ব্যবসা এবং তাহার সঙ্গে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রচিত 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রধান villain বা খল-চরিত্রকে তিনি এটর্নি বা আইন ব্যবসায়ী রূপে পরিচিত করিয়াছেন. মদ্যপান তাঁহার মতে যে শ্রেণীর সামাজিক পাপ, ওকালতি ব্যবসায়ও তাঁহার দৃষ্টিতে সেই শ্রেণীর সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

বাংলা নাটকের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই 'নীল-দর্পণ' নাটকে সর্বপ্রথম মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমার চিত্র এবং অর্থগৃধ্নু আইন ব্যববসায়ী দুই মোক্তারের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মোক্তারের চক্রান্তে মিথ্যা মোকদ্দমার ফলে সেখানেও একটি পরিবার বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহাতেও নাট্যকার নীলকর পক্ষীয় যে এক মোক্তারের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে গিরিশচন্দ্র আইন ব্যবসায়ীদিগের সম্পর্কে এই ধারণা সৃষ্টি করিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আসিয়া মিশ্রিত হইবার ফলে, আইনের ব্যবসায়ীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার ঘৃণা তীব্রতম হইয়া উঠিয়াছিল।

'প্রফুল্ল নাটক হইতে একটি মদ্যপানের দৃশ্য এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ।

ব্যাপারীদ্বয়.

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'ল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকাবার জন্য সাজস ক'রে এইটে ক'রেছে?

২য় ব্যাপারী। কি বল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশবাবু কাল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে, আমায় কি না সবেশ্বর সাধুখাঁ পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেঁচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুলবে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে; জুচ্চুরি মতলবটা দেখ! ও সাজস, সাজস।

১ম ব্যাপারী। শুন্‌ছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

২য় ব্যাপারী। সেও সাজস।

ব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রবেশ

দেও। ওহে, তোমরা যাও না সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ম ব্যাপারী। আর মশয় যে হুজুকি দেখিয়েছিলেন।

দেও। "আর ভয় নেই" বল্লেই হল, না বাতি জ্বালালেই হ'ল!

১ম ব্যাপারী। মশয়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ, শুনছি নাকি রমেশবাবুর সব ফাঁকি দে লিখে পড়ে নিয়েছেন, এ সাজস, না সত্যি?

দেও। সাজস না, সত্য; রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

২য় ব্যাপারী। কি করে জান্‌লেন মশয়?

দেও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক

পেমেণ্ট করবে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত করো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা কত্তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে রেজেষ্টারি হল কি করে? ঠকান বটে; সাজসও বটে; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী কত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর উনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন মতলব করেছেন।

ব্যাপারীদ্বয় ও দেওয়ানের প্রস্থান

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্ক যাবেন আর একটা এফিডেবিট করে আসবেন চলুন। আমি বলছি আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আসবেন।

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি কত্তে যাব?

পীতা। চেক্ বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না; একখানা চেকবই নিয়ে অসেবেন, আমাদের দেবে না, আর রমেশবাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস্ করেছিলেন, সেইটে ক্যানসেল করে আসবেন। আর হাজার দু'চার টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধে কত্তে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা কত্তে পারবে? ঐটে হলে আমি আর কিছু ভাবি নি, সুরেশটাকে ভুলতে পারছি নি! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধরেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা! কি দুর্বুদ্ধিই ঘটলো! কারে দুষছি, আমারই বা কি? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা রয়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, গাড়ীরই বা কি হয়েছে, একখানা গাড়ী নেই? বোধ হয় সব খড়দায় বেরিয়ে গিয়েছে; আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী করে নিয়ে আসছি।

শিব। পীতাম্বরবাবু—শুনেছি নাকি জেলে ঘুষ দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি শিবনাথ। যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা

নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি ; কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস্ দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখছি।

শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান

ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

২য় ব্যাপারী। এই যে যোগেশবাবু! লুকুবেন না—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমন জুচ্চুরিটে ক'ত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়িতে ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হক্কের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি ক'রে নিই নি।

ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান

যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল! ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি করেছি, দূর হ'ক, মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

কজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গীত

মা, তোমার এ কোন দেশী বিচার।
আমি কেঁদে বেড়াই পথে, দেখা দাও না একটি বার॥
মদ্ খেয়ে বেড়াস্ ধেয়ে কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লিনি চেয়ে,
আমিও মাত্‌বো মদে, মা ব'লে ডাক্‌বো না আর॥

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড় নয়নে চাচ্ছ' যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেক্ করিস্ নি।

স্ত্রী। স'রে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

যোগেশ। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাব না, যার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে! সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি ক'র্‌বো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে,

আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে? যে মরে মরুক, আমার আর পেছু ফেরবার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান! কিসের লজ্জা? টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ী, ঘড়ীর চেন র'য়েছে! (দোকানে প্রবেশ পূর্বক) ভাই, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডী দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ি। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগেশ। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ি। দাও হে একটা ব্রাণ্ডী দাও। ম'শায়, নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা? নিন, ভদ্রলোক—চাচ্চেন, ফেরাব না, পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

যোগেশের প্রস্থান

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক যা চায়; দিস্।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে

গীত

রাণী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে পয়সা নেবে না।
ঠোঙ্গা ক'রে শাল পাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে,
তেলমাথা মটরভাজা মোলাম বেদানা॥

রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। কই ছাই গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ির দোকানে ঢুকলেন নাকি? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন।

শুঁড়ি। ম'শায় যান কেন? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। দুর্গা দুর্গা!

পীতাম্বরের প্রস্থান

১ম মাতাল। আয় আবার গাই আয়—আবার গাই আয়।

২য় মাতাল। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হ'বে।

গীত

চুচ্চুরে হ'য়ে মদে এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হর্ ঘড়ী তামাক দেয় সেজে,—

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)

বাপের বেটী মুদীর মেয়ে ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেতা পড়ে থাক যেথা সেথা
জমাদার পাহারা'লার নাইক নিশানা ॥

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা। কি সর্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী বাগ্দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্ছেন। বাবু, বাবু, কি ক'চ্ছেন? আসুন।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না—

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আসতে পারিস্?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক্ পার্‌বে না, মাতোয়ালা হুয়া।

পীতা। ওহে, তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোকটা বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ি। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা!

যোগেশ। নাচ, নাচ, নাচ; ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ম লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগেশ। আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাক্‌ছে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

যোগেশ, পীতাম্বর ও মাতালগণের প্রস্থান

দোকানের মধ্যে জনৈক মাতাল। ওহে, আর একটা ব্র্যাণ্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ি। যাচ্ছি বাবু। প্রস্থান

'প্রফুল্ল' নাটক রচিত হইবার পর গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে অনুরূপ আরও বহু নাটক ও প্রহসন রচিত হয়। তাহাদের মধ্যে একখানি 'প্রেমের নক্সা' বা 'রগড়ের চাঁচি' (১৮৯৯)। ইহার রচয়িতার নাম বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায়। ইহার কাহিনী এই প্রকার—

রমেশবাবু নেশাখোর জমিদার, চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে ভাঁড়ামী করিয়া দিন কাটান। ফট্টটাই, ভাদুড়ি, হরিখুড়ো তাহার ইয়ার বন্ধুদের অন্যতম। এই বাপের উপযুক্ত পুত্র অঙ্গদ। নেশাখোর পদ্মলোচন তাহার সহচর। মেয়ে মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপের জন্য পদ্মলোচন নিয়ত প্রেমের জ্ঞান দেয় অঙ্গদকে। এইসব ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন হয়। পদ্মলোচন অঙ্গদকে উপদেশ দেয় টাকা আনিবার জন্য। অঙ্গদের মাথায় ফন্দী আসে যদি সে ভাগলপুরের তালুকে যাইয়া পিতার মৃত্যু সংবাদ রটাইতে পারে তাহা হইলে কিছু আদায় হইতে পারে। পরে বালিশের তলা হইতে পাওয়া সামান্য টাকায় হুইস্কি নিয়ে প্রমদার বাড়ীতে গিয়ে রঙ্গরস করে। রমেশ সমস্ত জানিতে পারিয়া দুঃখ করেন, 'বেফাঁক বাঁশটায় ঘুণ ধরান।' এদিকে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে অঙ্গদ ভাগলপুরে যাইয়া উপস্থিত হইল। এবং জ্যান্ত পিতার শ্রাদ্ধের আয়োজন আরম্ভ করিল। এমন সময়ে রমেশবাবু সদল বলে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র একটি বৃষকাষ্ঠ স্থাপন করিয়া আলোচাল আর কলা দিয়া পিণ্ডী চটকাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশের সমাজ যখন বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদেই স্বদেশী আন্দোলনের সম্মুখীন হইল এবং তাহাতে বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ বিষয়ক নীতির অনুসরণ করিতে লাগিল, তখন হইতেই এদেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনেই যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন হইতে মদ্যপান আর কোন ব্যাপক সামাজিক সমস্যা রূপে গণ্য হইবার কোন কারণ ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়

নৈতিক ব্যভিচার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'ই হোক, কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'ই হোক, ইহারা যে সমাজ-সম্পর্কহীন ব্যক্তি-মানসের বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নহে, সমসাময়িক সমাজ-জীবনের সুগভীর তলদেশ হইতেই ইহাদের প্রেরণা এবং বিষয়বস্তু জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য সেই যুগে এই বিষয়ের যে অংসখ্য আরও নাটক এবং প্রহসন রচিত হইয়াছিল, তাহাদের অনুসন্ধান আবশ্যক। তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, উক্ত দুইখানি রচনা শক্তিশালী লেখকের হাতে পড়িয়া বিশিষ্টতা অর্জন করিলেও এই বিষয়ে বহু সমাজহিতৈষী ব্যক্তি নাটক এবং প্রহসন রচনার অক্ষম প্রয়াসের মধ্য দিয়াও এই বিষয়ে নির্ভীক ভাবে তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের বিচারে এই সকল নাটক প্রহসনের কোন মুল্য নাই সত্য, তবে আধুনিক বাংলার সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে হইলে ইহাদের অনুশীলন অপরিহার্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-জীবনের নৈতিক ব্যভিচার যে কেবল মাত্র মদ্যপানের সঙ্গেই জড়িত ছিল, তাহা নহে, তবে মদ্যপানের ব্যাপকতা তাহার সহায়ক হইয়াছিল মাত্র। ইহা মানুষের একটি জৈব বৃত্তি। সমাজ নীতির শাসনে ইহাকে দমন করিয়া রাখা হয় (Repressed), যাহারা সমাজ-নীতিকে অস্বীকার করিয়া চলিবার মত শক্তির অধিকারী, তাহারা ইহার পরবশ হন। সমাজ-শাসনকে অস্বীকার করিবার শক্তি দুই দিক হইতে আসিতে পারে; প্রথমতঃ সামজিক প্রতিপত্তির দিক হইতে, দ্বিতীয়তঃ আর্থিক প্রতিপত্তির দিক দিয়া। অর্থ দ্বারা ষাট বৎসর বয়স্ক যে ব্যক্তি ষোড়শী কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সেও এই বৃত্তির তাড়নায়ই এই কাজ করিয়াথাকে, ইহার মধ্যে সমাজের সমর্থন আছে বলিয়া ইহাকে ব্যভিচার বলা হয় না, কিন্তু তথাপি ইহা ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নহে। সামাজিক প্রতিপত্তিও ইহার সহায়ক। যাহাদের অর্থনৈতিক কিংবা অন্যান্য কারণেও সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহাবাই

সমাজ-নীতিকে লঙ্ঘন করিবার শক্তি ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমাজের বশ হন না, বরং সমাজ তাঁহাদেরই বশীভূত বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন—তাঁহারাও সমাজের মধ্যে নৈতিক ব্যভিচারে লিপ্ত হন। এই সম্পর্কে বিগত শতাব্দীতে তারকেশ্বরের মোহান্ত এবং এলোকেশী নাম্নী একটি গৃহস্থ-বধূর যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া দেশময় আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। মোহান্ত সামাজিক প্রতিপন্ন সম্পন্ন ব্যক্তি—তিনি কেবল বিত্তশালীই ছিলেন না, বরং তাহার ব্যাপক সামাজিক অধিকার ছিল, ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংস্রবের জন্য তাঁহার সেই প্রতিপত্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কারণ, এ'দেশে ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ফলে ধর্মের ভেক পরিয়া যাহারা ব্যভিচার করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি সমাজের সন্দেহ সহজে ধাবিত হইতে পারে না। এই সুযোগ লইয়া বিত্তশালী ধর্মের ভেকধারী ব্যক্তিরাও তাহাদের নির্জিত (repressed) জৈব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় সন্ধান করিয়া থাকে। তারকেশ্বরের মোহান্ত ইহার একটি মাত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইলেও অনুরূপ ঘটনা এ'দেশের ধর্মান্ধ সমাজে চিরকালই ঘটিয়াছে। সুতরাং সামাজিক প্রতিপত্তি অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির মতই ব্যভিচারের সহায়ক হইয়া থাকে।

অতৃপ্ত জৈব তৃষ্ণা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ব্যভিচারের প্রেরণা দিয়া থাকে। নানা কৃত্রিম সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্য দিয়া ব্যক্তির জীবনে স্বাভাবিক জৈব উপভোগের যে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাও ব্যভিচারের প্রেরণা দিয়া থাকে। 'বহু-বিবাহ' বিষয়ক অধ্যায়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকটি যখন আলোচনা করিয়াছি, তখন কৌলীন্য প্রথাজাত বহুবিবাহ কি ভাবে যে বিবাহিত কুলীন কন্যাদিগের মধ্যে ব্যভিচারের প্রবৃত্তির জন্মদান করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিবাহিত কুলীন নারীর অতৃপ্ত জৈব তৃষ্ণা ইহার কারণ হইলেও, বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাই যে মূলতঃ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপনের এখানে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং কৌলীন্য প্রথাই এখানে নারীর নৈতিক ব্যভিচারের প্রতিপালক। বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত না থাকিবার জন্য বাল-বিধবাদিগের মধ্যে যে ব্যভিচারের প্রবৃত্তি দেখা যাইত, তাহাও স্বাভাবিক জৈব তৃষ্ণার চরিতার্থতার অভাবেরই ফল। এই সকল ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের যে সামাজিক দায়িত্ব ছিল, তাহা পালন না করিবার জন্য এই

ব্যভিচারের মাত্রা নানা ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্য, লোক-সাহিত্য সর্বত্রই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যা কতকগুলি বিশেষ কারণে আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। কলিকাতায় বাণিজ্য ও শিল্প-কেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা ইহার প্রথম কারণ; এই নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ইহা যে কেবলমাত্র কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজকেই বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাই নহে, কলিকাতার সঙ্গে ক্রমে সমগ্র বাংলা দেশের অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক জীবন সংযুক্ত হইয়া যাইবার ফলে তাহা সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষিত এবং সম্পন্ন সমাজের মধ্যেই ব্যাপক আকার লাভ করিয়াছিল। কলিকাতার নাগরিক সমাজের বিলাস-জীবনের আকর্ষণে দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় কেহ কেহ কলিকাতায় আসিয়া বিলাস এবং আনুষঙ্গিক ব্যভিচার—জীবনে গা ভাসাইয়া চলিয়াছিলেন, আবার কেহ বা মফঃস্বলে থাকিয়াই তাহারা আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। সেই কারণগুলি কি, তাহা কিছু কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতে পারে।

যতদিন এ'দেশের সমাজ কৃষি-ভিত্তিক এবং পল্লীজীবন-কেন্দ্রিক ছিল, ততদিন পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত সমাজে মদ্যপান কিংবা নৈতিক শৈথিল্য ব্যাপক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার কতকগুলি অন্তরায় ছিল। যৌথ পরিবার বা কর্তা শাসিত পরিবারিক জীবনেও ব্যক্তি-চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে পৌছিতে পারিত না। কিন্তু ইংরেজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে জমিদার প্রথার প্রবর্তন এবং অন্যদিকে বাণিজ্য এবং শিল্পকেন্দ্রিক কলিকাতার নাগরিক জীবনে চাকুরি-জীবীর আবির্ভাবের ফলেই প্রধানতঃ উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ব্যভিচারের আত্মপ্রকাশ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদার সমাজের অলস বিলাস-জীবন এবং কলিকাতার চাকুরিজীবীর স্বাধীন নগদ অর্থের উপার্জন এই বিষয়টিকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। পল্লীজীবনে যেমন এক শ্রেণীর বিলাসী জমিদার সমাজের সৃষ্টি হইল, নাগরিক জীবনেও তেমনই সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এক শ্রেণীর বাবুয়ানা দেখা দিল। এই উভয় সম্প্রদায়ই ব্যভিচারের নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর নব গঠিত কলিকাতার সমাজ-আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল।

কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবারভুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের হাতে নগদ টাকা (cash money) পড়িবার বিশেষ সুযোগ ছিল না, কিন্তু

শিল্প-বাণিজ্য এবং শিক্ষা-কেন্দ্রিক কলিকাতার নাগরিক জীবনের অধিবাসী-দিগের নিকট নানাদিক হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত নগদ টাকা স্বাধীনভাবে আসিয়া পড়িতে লাগিল। স্বাধীন ভাবে শব্দের অর্থ এই যে, এই অর্থ যৌথ-পরিবারের আয় বলিয়া গৃহীত হইত না, সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষ তাহার ইচ্ছা এবং খেয়াল অনুযায়ী তাহা ব্যয় করিবার সুযোগ লাভ করিত। স্বাধীনভাবে উপার্জন করিয়া যাহারা স্বাধীনভাবে এই অর্থ ব্যয় করিত, তাহাদের ব্যয় অপব্যয় ব্যতীত আর কিছুই হইবার সুযোগ পাইত না। মুষ্টিমেয় পারিবারিক দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি এই প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেও সাধারণ নাগরিক আকস্মিক এবং অনভ্যস্ত উপার্জিত অর্থের যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে জানিত না, ইংরেজের আপিশ-কাছারীতে চাকুরি করিতে গিয়া ইংরেজ সমাজ-জীবনের অন্ধ অনুকরণ করিয়া দুর্দশার তলদেশে তলাইয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে কলিকতার নাগরিক সমাজে 'বাবু' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায় রচিত 'নববাবুবিলাস' 'নববিবিবিলাস' 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়া সেকালের কলিকাতার ' বাবু ' সমাজের চিত্র পরিবেষণ করা হইয়াছে।

রাজকোষে আয়বৃদ্ধির জন্য এই সময় কলিকাতার অলিতে গলিতে ইংরেজ সরকার দেশী ও বিলাতি মদের দোকান খুলিতে লাগিলেন। কলিকাতার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া মফঃস্বল শহর, বাজার, গঞ্জ-বন্দরেও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হইতে লাগিল। তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত দেশ দেশী ও বিদেশী মদের দোকানে ছাইয়া গেল।

নৈতিক ব্যভিচারের প্রধান অবলম্বন পতিতা। এই সময় নানা কারণে কলিকাতায় পতিতালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাবুদিগের দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া পতিতার সংখ্যা ক্রমাগতই পরিপুষ্ট হইয়া চলিল। পাশ্চাত্য শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও প্রাকাশ্যে বারবনিতা সংসর্গ করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;

'একালে যেমন পান দোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরীর অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যার সংখ্যার

বৃদ্ধি। পূর্বে গ্রামের প্রান্তে দুই একঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত, এক্ষণে পল্লীগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমন বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা কিন্তু সভ্যতার চিহ্ন। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।' (সা-প, সং পৃঃ ৭৮)

কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠার পূর্বে পল্লীঅঞ্চলের কুলত্যাগিনীগণ কোথাও আশ্রয় পাইত না, সেই ভয়ে কেহই এই পথে পা বাড়াইতে বড় সাহস পাইত না, কিন্তু বিবিধ বৃত্তিধারীর পরম আশ্রয় দাতারূপে কলিকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নানা সামাজিক এবং পরিবারিক নিপীড়নের ফলে পল্লী অঞ্চল হইতে কুলত্যাগ করিয়া সকল শ্রেণীর নারী অনায়াসে আসিয়া কলিকাতার পতিতালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার সুযোগ লাভ করিল এবং কলিকাতার বাবুদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহাদের সমৃদ্ধি প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পল্লীজীবনের সঙ্গে কলিকাতার নাগরিক জীবনের সম্পর্ক বিছিন্ন হইয়া যায় নাই, কলিকাতায় যাঁহারা চাকুরি করিতে আসিতেন, তাঁহাদের প্রধান একটি অংশ তাহাদের পত্নী-পুত্রকন্যাকে গৃহে রাখিয়া আসিবার প্রয়োজন হইত। তাহাদেরও স্বাধীন উপার্জিত অর্থ পতিতা-সেবায় নিয়োজিত হইতে লাগিল। এইভাবে কত পরিবার যে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া গেল, তাহা হিসাব করিয়া বলা যাইবে না। কলিকাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মফঃস্বলের বাবুরা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন এবং বাংলার সমাজের নীতি, নিয়ম, ধর্ম সকল কিছুই ধ্বংসের সম্মুখীন হইল।

কিন্তু নৈতিক ব্যভিচার যে কেবলমাত্র মদ্য এবং পতিতার সঙ্গেই জড়িত ছিল, তাহাই নহে ; পূর্বেই বলিয়াছি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা চিরকালই নিজের রুচি এবং মনোবৃত্তি অনুযায়ী ইহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম যে উল্লেখযোগ্য নাটক বা প্রহসনটি রচিত হইয়াছিল, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' ; ইহার সঙ্গে মদ্য কিংবা ব্যবসায়ী পতিতার প্রত্যক্ষ কোন সংস্রব না থাকিলেও ইহার মধ্য দিয়াও সে যুগের সমাজের রুচি ও নীতিবোধের ইঙ্গিত লাভ করিতে পারা যায়। ইহা পল্লীর

সমাজ-জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র; পূর্বেই বলিয়াছি, নাগরিক জীবনে মদ্য ও পতিতা যে ভাবে ব্যভিচারের সহায়তা করিয়াছে, পল্লীজীবনে তাহা তত করিতে পারে নাই। 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' তাহারই আলেখ্য। এই নাটকখানি পরবর্তী এই শ্রেণীর বহু নাটক রচনায় প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া ইহার বিষয় এখানে একটু বিস্তৃতভাবেই উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষা বিশেষতঃ নাটকীয় সংলাপের উপযোগী কথ্যভাষার উপর মধুসূদনের যে কতখানি অধিকার ছিল, তাহাও উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তারপর যে মধুসূদন কেবলমাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগরণের কবি বলিয়া পরিচিত, তিনি বাংলা সমাজ সংস্কার-মূলক নাটক প্রহসন রচনারও অগ্রদূত, তাহাও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই প্রহসন খানি রচিত হয়, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাই এই শ্রেণীর প্রহসন বা নাট্য রচনার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে প্রহসনখানির সূচনা হইয়াছে—

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা।

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ।

হানি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বলবো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাল্‌লাম না—খোদাতালার মর্জি!

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি করবি?

হানি। আর মোর মাথা কর্‌বো। এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ্ দাদার ভিটেটিও কি আখেরে ছাড়তি হলো!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্‌চেন। তা আমিও তোর হয়ে তুই এক কথা বল্‌তে কসুর করব্যো না। দেখ্ কি হয়।

(ভক্তবাবুর প্রবেশ।)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল তো? (মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কত্তা. এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েচেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হোক আর না হোক, তাতে আমার কি বয়ে গেল।

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। গদা—

গদা। আজ্ঞে-এ-এ-এ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আর তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ। আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দুএটা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্‌ফেকে এবারকার মতন মাফ্ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

গদা । মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো। বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত । (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যা, বলিস্ কি রে ?

গদা । আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্‌চি ? আপনি তাকে দেখ্‌তে চান্ তো বলুন।

ভক্ত । (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভকভক্ করে বেরোয় তা মনে হলো বমি এসে।

গদা । কত্তাবাবু, সে তেমন নয় ।

ভক্ত । (চিন্তা করিয়া) মুসলমান ! যবন ম্লেচ্ছ ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো ?

গদা । মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি ? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্তোন।

ভক্ত । দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি ? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে ;—বড সুন্দরী বটে, অ্যাঁ ? আচ্ছা ডাক, হান্‌ফেকে ডাক।

গদা । ও হানিফ, এদিকে আয়।

হানি । অ্যাঁ, কি ?

ভক্ত । ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি ?

হানি । কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস ছ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত । আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্‌জীকে দে গে।

হানি । (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচ্‌লাম ! বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। (প্রকাশে) সালাম কত্তা।

ভক্ত । ওরে গদা—

গদা । আজ্ঞে এএএ।

ভক্ত । এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্যে পারবি ?

গদা । আজ্ঞে, তার ভাবনা কি ? গোটা কুড়িক টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত । কু-ড়ি টা-কা ! বলিস্ কি ?

গদা । আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমানুষ কি না ।

ভক্ত । আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে ।

গদা । যে আজ্ঞে ।

ভক্ত । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ? বাচস্পতি না ?

(বাচস্পতির প্রবেশ ।)

কে ও ? বাচস্পতি দাদা যে ! প্রণাম । এ কি ?

বাচ । আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে ! (রোদন ।)

ভক্ত । বল কি ? তা এ কবে হলো ?

বাচ । অদ্য চতুর্থ দিবস ।

ভক্ত । হয়েছিল কি ?

বাচ । এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন ।

ভক্ত । প্রভো, তোমারই ইচ্ছা ! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা ।

বাচ । তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে । যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে ।

ভক্ত । আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন ?

বাচ । না, সে তো গিয়েইছে—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে ।

ভক্ত । আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে ।

বাচ । আপনার এ রাজসংসার । মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের ? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয় ।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না, তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম।

[বাচস্পতির প্রস্থান

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখ্ছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখ্তে খুব ভাল তো রে!

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো!

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্‌চাজ্জিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখতে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্‌ফের মাগ তার চাইতে দেখতে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিক্‌ঠাক্ কত্যে পার্‌বি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলেই তো আমরা বাঁচি, —গো মড়কেই মুচির পার্বণ।

ভক্ত (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্‌তে আস্‌চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হলো শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥" আহা! "কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগলো দেখচি। বুড়ো হলে লোভাত্তি হয়; কোন ভালমন্দ জিনিস সামনে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। এদিকে কিছু কত্যে টত্যে পারিস?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

(কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ।)

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিন্‌তে পারেন না?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী। আজ্ঞে থানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বডমানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখতে বড ভাল। আর কল্‌কেতায় থেকে লেখা পড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভাল বাসেন, আর বছরে দু'এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেতাতেই থাকে বটে?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বল্‌বো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগরটি হয়ে উঠেচিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ও মা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।

ভক্ত। (স্বগত) "শ্রীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহাহা!

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে।

ভগী। ওর এখানে একমাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সমরে বধ করেন;—আমি কি আর একমাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না? (প্রকাশে) কৃষ্ণঃ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী। কত্তাবাবু! আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে নুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে?

ভগী। আজ্ঞে চার পাঁচদিনের মধ্যে আস্‌বে বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে।

ভগী। আয়, মা, আয়।

(ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতাম্বরে না আসতেই এ কর্মটা সার্‌তে পার্‌লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ী কি সুন্দরী। কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে। (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখছি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্, এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস্?

গদা। কর্ত্তামশায়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে তা বলতে পারি নে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্‌গে। আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে করিতে) কর্ত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে।

(প্রস্থান।)

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমরই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ির কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

(চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ।)

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই যা কর। আঃ, ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্যে পারি।

(উভয়ের প্রস্থান।

তারপর বাচস্পতি ও হানিফের সঙ্গে যুক্তি করিয়া গদাধর ভক্তপ্রসাদকে সায়েস্তা করিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া হানিফের স্ত্রী ফতেমাকে এক গভীর রাত্রিতে এক নির্জন ভগ্ন শিবমন্দিরে আনিয়া উপস্থিত করিল। কুট্টিনী পুঁটিসহ ফতেমাকে প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া অন্যান্য সকলে ভক্তপ্রসাদের জন্য অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিল, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভক্তপ্রসাদের সেখানে আসিবার সময় হইল।

(ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ।)

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। তা এইখেনে দাঁড়া না। কর্ত্তাবাবু ততখন আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার, বড ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমন কোরে থাকপো?

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোদ্যত।)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্, ছুঁড়ী। আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশ্যে)। তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদ্‌মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্‌পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন? সে কেমন করে জান্‌তে পার্‌বে বল্ সে কি আর এখানে দেখতে আসছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হল না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষণ্ণ ভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই তবে আর কি করবো; এখানে আল্লা যা করে! তা চল্ মোরা ঐ মস্‌জিদের মদ্দি যাই। আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখতি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেক্‌রা মরেছে না কি?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি কে দুজন আস্‌চে, আমি ভাই ঐ মস্‌জিদের মদ্দি লুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তা-বাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আস্‌চে। আঃ, বাঁছলেম।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ।)

পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যেন্ বলে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়!

(প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক্। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো!—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি এসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন?

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, একশো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্ নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে 'তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।' কত্তাবাবুকে পেলে কত বামুন কায়েতে বর্ত্তে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের জাত আছে, না ধর্ম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্!

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর

বাঁচবো কিসে ?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চন্দো পুরুষ !—

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো ॥"

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না ; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাক্‌বে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন্ রে ? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্‌তে পায় ; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে ?—হাঁ ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার ?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটেরে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার ? (সকলের ভয়।)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ—আ-আ-আ—আমি না ! ও বাবা ! এ কি ? কোথা যাব !

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম ! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম !

ভক্ত। ও গদা ! কাছে আয় না।

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—

(নেপথ্যে হুঙ্কার-ধ্বনি।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই ! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম !—ও মা গো—কি হবে !

(নেপথ্যে।) এই দেখ্ না কি হয় ?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা ! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত। আঁা—আঁা—আঁা!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—'মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ী, এই তো বিচার বটে', এবং প্রবেশ)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাঁচলেম; বামুণের কাছে ভূত আসতে পায় না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। এ কি! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি? অ্যাঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচ্পোৎ দাদা না কি? আঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম!

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে! আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাক্লে অনেক রোজগার হবে! (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভট্‌চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন্ দেখি, ব্যাপারটাই কি? আপনিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখ্‌ছি হানিফ্ গাজীর মাগ্।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর একদিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমায় হাতে ধরে বল্‌চি, এই ভিক্ষাটি দেও, যে এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়্‌বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো।

বাচ। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্মটি করো যেন আজ্‌কের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, কর্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে! কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্তো স্বীকার হলেন, তখন তার তো একপ্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তাঁ আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি?—তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ্ গাজীর প্রবেশ)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি! অ্যাঁ! এ আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকি পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্‌তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপ্‌নারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্‌নি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু একথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি, কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্ পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ্? ও বাচস্পতি দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্‌কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফকে এক পার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু?—নাড়োর মায়ো কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু?—এই, মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো।

পুঁটি। উঠুক্ বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফকে দুটি শত টাকা দিন, তাহলেই সব গোলমাল মিটে যায়।

ভক্ত। দু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচ্‌পোং দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞে না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লেম যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এ প্রার্থনা করি, যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

এই বিষয়ক পরবর্তী অধিকাংশ নাটক প্রহসনই মধুসূদনের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার পাল রচিত 'বেশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক'খানি স্বভাবতই তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত। কলিকাতায় পতিতার সংখ্যা যে কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই নাটকখানি তাহারই একটি জীবন্ত বিবরণ। ইহার কাহিনীটি এই প্রকার :

ছিদাম ঘোষের ছেলে শ্যামাচরণ মদ্যপ এবং কামুক লম্পট। শ্যামাচরণের স্ত্রী শশীমুখীর কষ্টের অন্ত নাই। আপন মনের দুঃখ পাড়া প্রতিবেশিনীদের কাছে ব্যক্ত করিয়া দুঃখভার লাঘব করে। তাহার উপর আছে শাশুড়ীর বাক্য যন্ত্রণা। ছিদামের কন্যা বিনোদিনীর দুঃখও কম নয়। তাহার স্বামী কোন খোঁজ খবর করে না। এক জ্যৈষ্ঠমাসে বিনোদিনীর স্বামী মদনকৃষ্ণকে আনানো হয়। এই সূত্রে শশিমুখী ও মদনকৃষ্ণের পরিচয় ঘনিষ্ট হয়। মদনকৃষ্ণ শশিমুখীর কথায় তাহার অতৃপ্ত জীবনের কথা বুঝিতে পারে এবং কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য হরগোয়ালিনীর সাহায্যে মদনকৃষ্ণের সহিত কৌশলে গৃহত্যাগ করে। পথে পুলিশ সার্জেন তাহাদের ধরে। বিচারে মদনকৃষ্ণ ও হর-গোয়ালিনীর জেল হয় এবং শশীমুখী পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। শ্যামাচরণ গোলাপ নামক পতিতার সহিত দিন কাটায়।

ঢাকা হইতে সে যুগের সুপরিচিত সাহিত্যিক হরিশ্চন্দ্র মিত্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ বিষয় অবলম্বন করিয়া 'ঘর থাকৃতে বাবুই ভেজে' নাটকটি রচনা করেন। দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সধবার একাদশী' ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, ইহার তিন বৎসর পূর্বেই হরিশ্চন্দ্র মিত্র তাহারই অনুরূপ বিষয় লইয়া তাঁহার উক্ত নাটকের কাহিনীর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইহার কাহিনীটি এই :

মোহন এ যুগের মার্কামারা বাবু। ইয়ারদের সঙ্গে মদ্যপান ও লাম্পট্য করাই তাহার পেশা। রসিক তার ঘনিষ্ট ইয়ার। বৈঠকখানায় মোহন ও মাখন গল্পগুজব করে। রসিক অনুপস্থিত থাকায় সে সন্দেহ করে যে নিশ্চয়ই সে স্ফূর্তিতে মত্ত হইয়া কোথায় বোধ হয় গিয়াছেন 'এয়ার বিনে দিল ফাঁক' এই প্রবাদ বাক্য অবলম্বনে দুইজনে একটি লাম্পট্যের গল্প ফাঁদে। গল্পের বিষয় বস্তু এক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের পতিতা-প্রীতি। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এই কুৎসিৎ প্রবৃত্তির মূলে ছিল ইয়ার বন্ধুদের সহযোগিতা। তাই তাহার মন গৃহে বসিত না। এমন সময় রসিক তথায় উপস্থিত হইয়া ইয়ার বন্ধুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়। রসিকের পিতা ও পিতৃবন্ধুরা ইয়ার

বন্ধুদের পরিত্যাগ করিতে বলিলে রসিক তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। রসিকের স্ত্রীর দুঃখের অন্ত নাই। ভরা যৌবন তাহার বৃথা যায়। স্বামীর অবহেলা ও অপমান নিরন্তর তাহাকে বিদ্ধ করে। সে আপন মাতাপিতাকে এ হেন পাত্রে সমর্পণের জন্য দোষী করে ও নিজ ভাগ্যকে দোষ দেয়। রসিক একদিন গৃহে স্ত্রীর নিকট আসে এবং মিষ্ট কথায় তাহাকে প্রলুব্ধ করে। আসলে তাহার উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীর অলঙ্কার আত্মসাৎ করা এবং বুঁচি নামক পতিতার মনোরঞ্জন করা। স্ত্রী ব্যাপারটি বুঝিয়া চিৎকার করে। শাশুড়ী ননদ উঠিয়া পড়িলে চতুরতার সহিত রসিক বালিকাবধূর বালিকাসুলভ আচরণের কথা বলে। ইহাতে তাহার উপর নির্যাতন আরও বাড়িয়া যায়।

মদ্যপ রসিক একদিন বুঁচির গৃহে যাইয়া দেখে তাহারই এক ইয়ার বন্ধু বুঁচির সহিত প্রেমালাপে রত। ইহাতে রসিকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সে চিৎকার করিলে বুঁচি পুলিশের সাহায্যে তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করে। রসিক তখন বুঁচিকে অলঙ্কার প্রদানের কথা বলে। পুলিশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রসিককে বিতাড়িত করে।

সেকালে কলিকাতার যে পরিচয় দাঁড়াইয়াছিল তাহা এই,

রাঁড় ভাঁড় মিথ্যাকথা
তিন লয়ে কলিকাতা।

রাঁড় শব্দের অর্থ পতিতা এবং ভাঁড় শব্দের অর্থ মদের ভাঁড় বুঝিতে হইবে। কলিকাতার এই পরিচয় অবলম্বন করিয়া 'রাঁড় ভাঁড় মিথ্যাকথা, তিন লয়ে কলিকাতা' এই নামে প্যারীমোহন সেন একখানি প্রহসন রচনা করেন। ইহার রচনাকাল ১৮৬৩; কাহিনীটি এই:—

এক সাধু শহর দেখিতে কলিকাতায় আসে। পথে সে একটি অদ্ভুত গান শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। সে গানের মর্মার্থ শহর কলিকাতায় লাম্পট্যের জীবনই সারবস্তু, সুতরাং লাম্পট্য যে যত পার কর। এই ধরনের গান সাধু ইতিপূর্বে শোনে নাই। জনৈক পথিককে ডাকিয়া সাধু এই গানের নিহিতার্থ জিজ্ঞাসা করে। পথিকও ভদ্রবেশী লম্পট; কিন্তু সহৃদয়। এই গানটি বিশদভাবে সাধুকে বুঝাইবার জন্য পথিক সাধুকে পতিতাপল্লী সোনাগাছি অঞ্চলে লইয়া যায় এবং তথাকার কুৎসিৎ জীবনযাত্রা সাধুকে দেখায়। শহরের গণ্যমান্যদের সম্পর্কে পথিক মন্তব্য করে:

দিনমানে যাঁরে দেখে নমস্কার করি—রজনীতে তাঁরে দেখে লজ্জা পেয়ে মরি।

মদ্যপান, লাম্পট্য দেখিতে দেখিতে সাধুর হৃদয় পরিবর্তিত হয়। জাল জুয়াচুরি প্রতারণা ও মাতলামীতে যখন কলিযুগ পরিপূর্ণ, তখন সাধুত্ব পরিহার করিয়া লাম্পট্যের জীবন বরণ করাই শ্রেয় এই মনে করিয়া সাধু বারবনিতা লইয়া কাল কাটাইতে লাগিল। পরে তাহার কি পরিণতি হইয়াছিল, ইহার সম্পর্কে আর এক প্রহসন নাট্যকার রচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু সেই রচনাটি পাওয়া যায় নাই।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নামক একটি প্রহসন রচনা করেন, ইহার কাহিনীটি এই—

সুধীর কলিকাতায় সম্প্রতি একটি চাকুরী লাভ করিয়া প্রতিবেশী ভোলানাথের তত্ত্বাবধানে নিজ স্ত্রী সুমতিকে রাখিয়া যায়; সঙ্গে থাকে দাসী মতের মা। ভোলানাথ সুধীরের গৃহে মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। সুমতির অর্থের প্রয়োজন হইলে অর্থ দিবার ছলে আপনার মনের কু-অভিসন্ধি জানায়। ভোলানাথ আবার স্থানীয় মুন্সেফের পেস্‌কার। মুন্সেফও সুমতির প্রতি কু-দৃষ্টি দেয় এবং মতের মার মারফৎ কু-প্রস্তাব করে; অবশ্য মতের মা-ই মুন্সেফকে কড়া কথা শুনাইয়া দেয়। এদিকে সুধীর কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে সুমতি আনুপূর্বিক সমস্ত কথা তাহাকে জানাইয়া দেয়। ভোলানাথের কীর্তি ও মুন্সেফের দুরভিসন্ধি তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া যায়। তখন সে স্ত্রীকে পরামর্শ দেয় অবিলম্বে যেন সুমতি ভোলানাথ ও মুন্সেফকে নিমন্ত্রণ করে। এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ভোলানাথ ও মুন্সেফকে উচিত শিক্ষা দেওয়া। নিমন্ত্রণ পাইয়া তো ভোলা ও মুন্সেফের আনন্দের অন্ত নাই—তাহা ছাড়া তাহারা শুনিল যে সুধীর থাকিবে না। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে দুই জনে উপস্থিত হইলে সুমতি মতির মার সহায়তায় সুকৌশলে তাহাদের বিড়ম্বিত করে এবং সেই সময় সুধীর আসিয়া উপস্থিত হইলে সম্মানিত ব্যক্তিদের কীর্তিকলাপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাদের গালে তেলকালি মাখাইয়া ছাড়িয়া দিল; লাম্পট্যের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিল।

ইহা প্রধানতঃ মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অনুসরণ করিয়া রচিত বলিয়া ইহা রামনারায়ণের প্রথমোক্ত নাটকখানির মত তত শক্তিশালী রচনা হইতে পারে নাই। ইহার সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল :—

সুধীর পত্নী সুমতিকে গৃহে রাখিয়া কলিকাতায় চাকুরি করিতে গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিয়াছিল। বহুদিন পর সুধীর প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে পাইল, যে ভোলাদাদাকে সুমতির দেখাশোনার ভার দিয়া গিয়াছিলেন, সে তাঁহার অনুপস্থিতিতে সুমতির প্রতি অশিষ্ট আচরণ করিয়াছে। সুমতি যখন লজ্জাবশতঃ সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না, তখন সুধীর বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং ক্রমে সকল বিবরণ কি ভাবে প্রকাশ পাইল, তাহা রামনারায়ণের রচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে—

সুধীর। আমি ভেবেছিলেম্ ভোলাদাদা মুন্সোবের কাছারীতে কর্ম করেন, দেশেই থাক্‌বেন; আর আমারও পরমাত্মীয়; এই ভেবে আমি তাঁর প্রতি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের সকল ভারই দিয়ে গিছিলেম।

সুমতি। (অধোবদন) ভাই, "ডাইনের কোলে পো সমর্পণ"। যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।

সুধীর। (সবিস্ময়ে) সে কি কথা! অ্যাঁ, তবে কি ভোলাদাদাই দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করেছেন? অ্যাঁ, (স্বগত) ভোলাদাদাতো লোক ভাল, অতি জ্ঞানী, অতি ধার্মিক, এ কেমন হলো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। (চিন্তা করিয়া) না,—এমনটা কি হতে পারে? বলাও যায় না, লোক্‌কে আজকের কালে চেনা ভার! (প্রকাশে) তা স্পষ্ট করেই বল না কি হয়েছিল?

সুমতি। নাথ! কি করে্য বল্‌বো, বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে।

সুধীর। লজ্জা কি? এমন কি কথা আছে যে স্বামীর নিকটে বলা যায় না?

সুমতি। তুমি কি আর বুঝ্‌তে পাল্লে না?

সুধীর। হাঁ, কতক পেরেছি। তা—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) ভোলাদাদা যে তোমার ভাসুর হয়।

সুমতি। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তা আর হল কৈ? বলেন অমুক আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়।

সুধীর। আ মলো! ক্ষেপেছে নাকি? আমি জান্তেম ভোলাদাদা বড় জ্ঞানী, বড় ধার্মিক, তা এই যে, সকল বিষেই প্রকাশ হচ্ছে।

মনুষ্যের চরিত্র বোঝা দুষ্কর। ভাই, তুমি সঙ্কোচ কর না, তার চরিত্রের কথা খুলে বলো ত, আমাকে শুন্তে হলো।

সুমিত। তবে বলি, যা যা হয়েছিলো সব শোন। তুমি কলকাতায় গেলে তিনি প্রথম যেন কত আত্মীয়, আজ মাছ পাঠান, আজ মিঠাই পাঠান, আসেন, যান, জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মাস খানেকের পর, একদিন মতের মাকে ডেকে বলেছেন, "হেদেখ্ মতের মা, আমি যে এতটা কচ্চি, তা বৌ আমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন তো?" তা মতের মা বল্‌লে "তুষ্ট হবেন না, এমন কথা? বৌমা আমার কাছে আপনার কত সুখ্যেত করেন; বলেন, এমন ভাসুর হতে নাই। তা বাবু বাড়ী থেকে গেছেন, আপনি না করলে কে কর্‌বে। বাবু সকল ভারই আপনাকে দিয়ে গেছেন।" মতের মার মুখে এই কথা শুনে মিন্সে অমনি বলে বসলো কি, বলে 'হাঁ, বাবু সকল ভারই আমাকে দিয়ে গেছেন, তা তোমাদের বৌকে এই কথাটি বুঝে চল্‌তে বলো।' মতের মা এসে আমাকে এইসব কথাগুলো বল্লে, তা ভাই সে কথায় আমি কি বুঝবো?

সুধীর। তার পর?

সুমতি। তারপর দুদিন দশদিন যায়, একদিন আমার খরচের অপ্রতুল হয়েছে, তা কি করি, মতের মাকে পাঠিয়ে দিলেম, বলি যা দেখি ও বাড়ীর বড় ভাসুরের কাছে, যদি কিছু ধার দেন, বলিস্ কল্‌কাতা থেকে খরচ পত্র এলে শোধ দেবো। মতের মা গিয়ে চাইলে. তা মিন্সের আক্‌কেলের কথা শুনেছ, বলে, 'বৌ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন্ ধার কেন যত টাকা চান অম্নি দিতে পারি।' এই কথা বল্যে, আরো বুঝি কিছু পষ্টাপষ্টি বলেও থাক্‌বে, মতের মা শুনে অম্নি ঘেন্নায় লজ্জায় ছি ছি করে পালিয়ে এলো, এসে মাগী আমার কাছে কেঁদে মরে; বলে 'বৌ মা, এক সন্ধে খাবো সেও ভালো, আর তুমি ও মিন্সের কাছে আমাকে পাঠিয়ো না, মিন্সে যে সব বল্লে গো, শুনে হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়।' আমি তখন বলি বটে! এই বনে এই বাঘ, তাঁর এত গুণ, ঐ নিমিত্তেই মাছ দেওয়া, মিঠাই দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি এত বুঝ্‌তে পারিনি। তা মতের মা, আর কাঁদলে কি হবে? তুই আর তার

কাছে যাসনে; আমাদের যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। যদি বিধাতা কখন দিন দেন তবে এর কথা!

সুধীর। উঃ! এতদূর পর্যন্ত হয়েছিল?

সুমতি। শোন না বলি, বিপদের কথা। মিন্সে মতের মার কাছে তার কোন উত্তর না পেয়ে বোধ হয় বুঝতে পার্‌লে, যে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হলো না; বুঝে রাগ ভরে আর জিজ্ঞাসা নাই, বাদ নাই, মরে গেলেও একবার উঁকি মেরে দেখা নাই, নাই নাই, তার একটা দুঃখ কি? আমি যো সো করে সংসার চালাচ্ছিলেম; আজ দিন চার পাঁচ হলো—এই সোমবার দিন, আমি সোমবার করেছি, মতের মা বাজারে গেছে, দণ্ড দুচ্চার বেলা আছে, আমি রকে বাতাসে সবে চুলের দড়ি ভাঙ্‌চি, ভাই, মনে কর্‌লে এখনো গাটা শিউরে উঠে! মিন্সে হঠাৎ বাড়ীর ভেতর এসে বল্‌লে, 'বৌ, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও না, অথচ আমি তোমার দেওর হই; তা শোনো, তাঁর পত্র এসেছে, তিনি আর দুই তিন বচ্ছর আস্‌বেন না; লক্ষ্ণৌতে তাঁর কি একটা ভারি কর্ম হয়েছে, তিনি সেখানেই গেছেন। তা আর কেন ক্লেশে কাল যাপন কর, মতের মাকে যা বলেচি তাতেই সম্মত হও, আমি তোমাকে পরম সুখে রাখ্‌বো' বলে দেখি মিন্সে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগ্‌লো। (সজল নয়নে) নাথ, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, দেখে আত্মাপুরুষ অম্‌নি শুকিয়ে গেল। বলি হা ভগবান! আমার অদৃষ্টে এই ছিল। চতুর্দিক শূন্য দেখ্‌লাম, কোথায় যাবো, কি করবো, কে আমাকে রক্ষা করবে? বলি হে পৃথিবী! তুমি বৈ আর আমার কেউ নাই; তুমি একটু স্থান দাও, আমি তোমাতেই প্রবেশ করি, এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে চক্ষের জলে অম্‌নি বুক ভেসে যেতে লাগলো। নাথ, সেই সময়ে আমি তোমাকে মনে মনে কতো ডেকেছিলেম, তা ডাকুলে কি হবে, তুমি এমনি নিষ্ঠুর. আমাকে শূন্য পুরীতে ফেলে গেছ, ডাকুলে কি আসবে?

সুধীর। (সকাতরে) প্রিয়ে, আর ও কথা বলো না, বলো না, আমার মনে যা হচ্ছে, তার আর কি বল্‌বো।—তারপর তুমি কি কর্‌লে?

সুমতি। আর কি করবো ভাই, ভাবলেম বলি যদি মিন্সে কাছে এসে হাতখান ধরে তা হলেই তো জাত্‌কুল সব যাবে; তা কি করি, কথাতো

কখন কৈনে, কিন্তু না কৈলেও হলো না। ভাবলেম্, বলি এখন ত রক্ষা পাই, পরে অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। ভেবে বল্লেম্, 'আমার বড় ব্যামো হয়েছে, সারুক; পরে যা বল্‌বে তাই কর্‌বো। এই কথায় দেখি না মিন্সে ধম্মে ধম্মে নিরস্ত হলো, মতের মাও সেই সময় এসে পড়্‌লো দেখে অম্‌নি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো।

সুধীর। কি আস্পধা! বাঘের বাসায় ঘোঘ নাচ্‌তে চায়।

সুমতি। ভাই, তখন আমি নিশ্বেস ফেলে বাঁচি; শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো, সর্বাঙ্গে পিলপিল করে ঘাম বেরুতে লাগ্‌লো, শিবপুজা করা, হবিষ্যি করা মাথায় উঠলো, অমনি গে বিছানা করে শুলেম। (সজল নয়নে) নাথ, দেখ দেখি আমি এমনি অভাগিনী। তুমি ফেলে গেছ, —ভাল, তা লোকের মা বাপ থাকে, ভাই ভগিনী থাকে, না হয় তাদের কাছে দুদিন যাই, তা আমার ত্রিসংসারে কেউ কোথাও নাই—কোথায় যাই, কে আমাকে রক্ষা করে, কোথায় দাঁড়াই, শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেম্ বলি, আজ যেন রক্ষা পেলেম, এরপর কি হবে? হা পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিলো। আমার ধম্ম নষ্ট হবে, আমি পর পুরুষকে কখন মনে জ্ঞানেও করি নাই, আমার অদেষ্টে একি হলো! এইসব ভাবতে ভাবতে অমনি চক্ষের উপর দে রাত পোয়ে গেল! নাথ, তোমাকে সত্যি বল্‌চি, সেই অবধি আমি আহার নিদ্রে পরিত্যাগ করিছি। এই দেখ আমার কি দশা হয়েছে (গাত্র প্রদর্শন); আজ ভাবলেম বলি কেন আর ভেবে ভেবে মরি, এর চেয়ে একবারে যাই সে ভাল। তাই দড়ির যো করে রেখেছি। ঐ দেখ গদির নীচে রয়েছে।

সুধীর। (দেখিয়া) একি! দড়ি কেন? অ্যাঁ!

সুমতি। আর কেন! কি বল্‌বো পোড়াকপালের কথা! আজ ভেবে স্থির করেছিলাম, বলি কবে আবার মিন্সে এসে জোর কর্যে আমার ধর্মটা নষ্ট করবে, তার চেয়ে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌লিই ত সকল আপদ চুকে যায়। কিন্তু আবার ভাবলেম্ বলি তাহলে তো আর তাঁর সঙ্গে জন্মের মত দেখা হলো না। তা না হলো নাই হলো কি কর্‌বো। যদি আমি পতিব্রতা হই, তাঁর চরণে যদি মন থাকে, তা'হলে জন্মান্তরেও কি দেখা দিবেন না? এই ভেবে ভাই মরণই

স্থির করেছিলেম। তা আমার কপাল গুণে মধ্যে দেখি ধর্ম্মই তোমাকে এনে মিলিয়ে দিলেন। তা এসেছো ভাল হলো, আমার প্রাণ রক্ষা হলো, জাত রক্ষা হলো, মান রক্ষা হলো, এখন এই ভিক্ষা করি,—

সুমতি। কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁতে কুটো করে বিনয় করি, আমাকে বই শূন্যপুরীতে একা রেখে আর তুমি কোথাও যেও না, আমি আর—(সরোদনে চরণ ধারণ) !

সুধীর। ছি ! ছি ! ছি ! ও কি ও ! আমি ত এসেছি আর ভয় কি ? (সবিস্ময়ে) একি ! এমন পতিব্রতা স্ত্রীরও এরূপ অবস্থা করতে উদ্যত ! অ্যাঁ ! সে দুর্বৃত্ত দুরাচার বিশ্বাসঘাতক, তাকে বধ করলেও। পাপ নাই উঃ ! কি বলবো, ইচ্ছে হচ্ছে এই দণ্ডে গে তার মাথাটা কেটে আনি।

সুমতি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) কিন্তু ভাই, দেখো একথা যেন প্রকাশ না হয় ; প্রকাশ হলে আমি লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবো না।

সুধীর। আমি কি তা বুঝিনে। আমি যা করবো তা বিবেচনা করেই করবো। যে রূপে হোক অবিলম্বে সে নরাধমের সমুচিত করতে হবে।

সুমতি। কেবল সেই কেন ? আরো বলবো। ভাই, তোমাদের যে দেশ, আমি যে কি করে দিনপাত করেছি, তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

সুধীর। আবার কে ?

সুমতি। 'কাঁদিয়ে বলিতে পোড়ামুখে আসে হাসি।' এই তোমার দেশের মুন্সোব, ভুঁদো মিন্সের এই বয়েসে আবার আমার উপর চোক্ পড়েছে। মরণ আর কি ! ইচ্ছা হয় মেয়ে নাথিতে মিন্সের মুখ ভেঙে দি।

সুধীর। কে ? বুড়ো বেটা ?

সুমতি। হাঁ হে, বলচি কি ? তিনি আবার প্রতিদিন কাছারি থেকে যাবার সময় ঐ খিড়কির পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি যদি ঘাটে টাটে যাই, দেখতে পান, তবে কত রঙ্গ ভঙ্গ করেন, ঠাট্টা তামাসা করা হয়, সে সকল দেখে শুনে ভাই আমার কেবল হাসি পায়। আবার মিনসের আস্পর্দ্ধার কথা শুনবে ? সেদিন

মতের মাকে ডেকে নাকি বলেছে—'ওরে, তোর মা ঠাকুরণের সঙ্গে আমায় দেখা করিয়া দিতে পারিস? তোকে দশ টাকা দেবো। তা মতের মাও তেমনি, খুব দশ কথা শুনিয়ে দেচে; দেবে না কেন, ভয় কি? তিনি মুন্সোব আছেন, আপনিই আছেন?

সুধীর। হাঁ, ও বেটার চরিত্র আমি বিশেষ জানি। যার স্ত্রী, কি ভগিনী বড় সুন্দর, সে নালিশ করলে অমনি ডিক্রী, আর সাক্ষী সাবুদ চাই না। তা ঐ দুজনকেই ভাল করে নাকাল কত্যে হয়েছে, অথচ যেন চোরের মার কান্না হয়। কি করা যায় বল দেখি? (চিন্তা) হাঁ সেই ভাল। দেখ, আমি বাড়ীতে এসেছি এখন প্রকাশ করে্য কায নাই; আমি এই নিকটে কোথাও লুকিয়ে থাকি, তুমি কাল মতের মাকে দিয়ে সন্ধ্যের সময় ওদের দুজনকেই আসতে বলে পাঠাও, পরে সেই সময় যা করবার আমি করবো।

সুমতি। ওমা! ওকি কথা বল? না ভাই, আমি তা পারবো না, দুটো পুরুষ ঘরের ভিতর আসবে, আর তাদের কাছে আমি একলা থাকবো? ওমা! তা তো আমার কম্ম নয়; বাবা মনে করলে গা শিউরে উঠে।

সুধীর। তায় হানি কি? আমি ত এই কাছেই থাকবো, আর যা যা করতে হবে, আমি সব ভাল করে্য বলে দেবো এখন, তোমার কোন ভয় নাই। আমি যা বলচি তাই কর্তব্য, নতুবা তাদের বিশেষ শাসন কিছুতেই হবে না। তা এখন এসো, আহারাদি করা যাগ গে; আজ রাত্রি হয়েছে।

সুমতি। চল, কিন্তু ভাই সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কথাটায় ভাল মন সচো না। (উভয়ে প্রস্থান)

তারপর ক্রমে ভোলা দাদা এবং মুন্সেফবাবু এই ফাঁদে পা বাড়াইলেন। উভয়েই ধরা পড়িয়া সুধীরের হস্তে চরম লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইয়া বিদায় হইলেন এবং জীবনের নামে তাহাদের কি ভাবে শিক্ষা হইল, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। ভক্তপ্রসাদেরই পরিণতির সঙ্গে তাহাদের পরিণতির আর কোন পার্থক্য রহিল না।

নিমাইচাঁদ শীল 'এঁরাই আবার বড়লোক' (১৮৬৭) নামক প্রহসন রচনা করেন, ইহার কাহিনী এই—

রাজাবাবু পল্লী অঞ্চলের একজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি। চতুর্দিকে তাঁহার দানের অন্ত নাই। স্কুল স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, নারী সমিতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে তিনি বিশেষ উদ্যোগী। কিন্তু বাইরে সমাজ সেবার ভান, ভিতরে লাম্পট্য প্রবৃত্তি. ইহাই রাজাবাবুর চরিত্র। ঘরে বিধবা ভ্রাতৃবধূর ধর্মনাশ, বাইরে সুন্দরী বিধবা মহিলাদের প্রতি অসৎপ্রবৃত্তি চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তর্নিহিত দুষ্ট চরিত্রের পরিচয়। গ্রামের জয় ডাক্তার ও শিক্ষক কৃষ্ণকিশোর রাজাবাবুর লাম্পট্য বৃত্তির প্রধান সহায়ক।

রাজাবাবু আবার ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোক্তা। বিলাতী প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত তিনি চাঁদা প্রেরণ করেন। একদা কৃষ্ণকিশোর শশিকলা নাম্নী এক বিধবা মহিলাকে রাজাবাবুর কাছে লইয়া আসেন। কৃষ্ণকিশোরের উদ্দেশ্য রাজাবাবুর নিকট ঐ মহিলাকে ছলে বলে সমর্পণ করা। বিধবা মহিলা শশিকলা নিষ্ঠাবতী। তিনি রাজাবাবুর কাছে আবেদন নিবেদন করিয়াও খাজনা মকুব করিতে পারিলেন না। উপরন্তু রাজাবাবু তাঁহাকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বলিলেন। শশিকলা অপমানিত হইলেন এবং ভয়ে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। গ্রামের হিতৈষী যুবকদের নিকট আপন মর্মবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন।

রাজাবাবু, জয় ডাক্তার ও কৃষ্ণকিশোরের লাম্পট্য তীব্রভাবে বাড়িয়া চলিল। কৃষ্ণকিশোর স্কুল তহবিল তছরূপ করিলেন। জয় ডাক্তার লাম্পট্য করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন এবং নির্যাতিত হইলেন। রাজাবাবু বিধবা ভ্রাতৃবধূর সহিত অন্তঃপুরে যখন মদ্যপান করিতেছিলেন, তখন রাজাবাবুর স্ত্রী নির্মলা কান্নাকাটি করিতে থাকে। রাজাবাবু শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া মদের বোতলের দ্বারা স্ত্রীকে হত্যা করে। দেশহিতৈষী যুবক নবকুমার রাজাবাবুকে ধিক্কার দেয় এই বলিয়া, 'এঁরাই আবার সমাজের ভূষণ। এঁরাই আবার বড়লোক।'

রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৬৯ সনে 'চক্ষুদান' নামক যে প্রহসনটি রচনা করেন, তাহার কাহিনীটি সবদিক দিয়া কৌতুককর। তাহা এই,—

মাতাল ও দুশ্চরিত্র নিকুঞ্জের জন্য তাহার স্ত্রী বসুমতীর মনে সুখ নাই। নিকুঞ্জ প্রতিদিন গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। বসুমতী সকল দুঃখ তাহার মা-কে জানায়। তাহার অবস্থা চাক্ষুষ করিবার জন্য বাপের বাড়ী হইতে

নাপিত বৌ আসে। বসুমতী বহুবার নিকুঞ্জের স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করিল। একদিন রাত্রে নিকুঞ্জ আসিয়া দেখে বসুমতী পরপুরুষের সহিত প্রণয়ালাপে মত্ত। নিকুঞ্জ তখন বসুমতীকে ধিক্কার দেয়; বসুমতীও তাহার লাম্পট্য কথা বলে, তাহাতে তাহার পৌরুষ আহত হয়। পরে প্রকাশিত হয় পরপুরুষ নাপিত বৌ। নিকুঞ্জর শিক্ষা হয়। সে প্রতিজ্ঞা করে এমন দুষ্কর্ম আর সে কদাচ করিবে না। বসুমতী সুখী হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্নের ভাষা যে 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সর্বশেষ নাট্যরচনা 'চক্ষুদান' পর্যন্ত কত সহজ এবং সাবলীল হইয়া আসিয়াছে, তাহা 'চক্ষুদানে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে নিকুঞ্জকে বহু রাত্রে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া পুরুষ বেশী নাপিত বৌ বসুমতীর সঙ্গে কপট প্রেমাভিনয় করিতেছে, এমন সময় নিকুঞ্জ ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,--

নিকুঞ্জ। (স্বগত) আজ আবার ঢের রাত্রি হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু আজ ঘুমিয়েছে বোধ হয়, এখনও কি জেগে আছে? (দেখিয়া স্বগত) ঘরে আলো জ্বলচে যে—কিসের গন্ধ বেরিয়েছে? এ যে আতর, গোলাপ ফুলের মালা বিছেনায় সাজান, ইস্। আজ যে বড় ঘটা দেখি, ঘর সাজান হয়েছে, বসুমতী বেশভূষা করে বড় যে পান সাজচে, কাণ্ডটা কি দেখ্‌তে হলো? (গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান)

বসুমতী। (স্বগত) সেই ভাল এই কথাই বলি। (প্রকাশে) ওকি ও যদি অনুগ্রহ করে এলে, তবে ওখানে কেন? এই বিছানায় এসে বসো। আমি যত্নকরে সব সাজিয়েছি, আমার তা সার্থক হোক —কেন? অধোবদন হলে যে, রাগ করেছ?

নিকুঞ্জ। (স্বগত) কাকে বলচে? আমাকে কি দেখতে পেয়েছে? না, তবে কার সঙ্গে কথা হচ্যে? ভাল দেখা যাচ্যে না, কে ঘরে এসেছে? সন্দেহ হলো যে, বৃত্তান্ত কি?

বসুমতী। ছিঃ ভাই, তুমি ম্লান বদনে থাকলে তোমার ম্লান বদন দেখলে আমার প্রাণটা কেমন করে।

নাপিতবৌ। যাও আর তোমার কথায় কাজ নাই।

বসুমতী। তোমার পায়ে পড়ি, ক্ষমা কর, আর রাগ করো না।

নাপিতবৌ। হাঁ, বড় ভালবাস, তা জানি আমি।

বসুমতী। তোমাকে ভালবাসিনে অমন কথা বোলোনা, তোমাকে আমি দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন সব সমর্পণ করেছি, তুমি আজ আসবে বলে আমি কত আয়োজন কচ্চি, এই নেও দেখি, এই পানটি খাও, কত মসলা টস্‌লা দে এই পানটি যে করেছি, তা ভাই আমি তোমার মুখে তুলে দিই। (গিয়া তাম্বূলদান এবং হস্ত ধরিয়া আনয়ন পূর্বক শয্যাতে বসাইয়া স্বয়ং উপবেশন) কেমন, এখন রাগটা পড়লো তো। আমার আজ সকল মনোরথ পূর্ণ করে যত্ন করে তোমার তরে এই দেখ ফুলের মালা গেঁথেছি, তোমার গলায় দিয়ে জীবন সফল করি। (মাল্যদানাদি শুশ্রূষা)

নিকুঞ্জ। (দেখিয়া সক্রোধে স্বগত) কি এত বড় যোগ্যতা। পাপীয়সী কচ্চে কি? কি কুপ্রবৃত্তি! আঁ্যা, একটা পরপুরুষ ঘরে এনেছে! ওকে এখনিই সংহার করবো, তারপর একেও, কিন্তু থাক এখন, ও তো যমের হাতেই পড়েছে, দরজা দিয়ে এসেছি, পালাবার যো নাই, হবেই এখন,—এটাকে আগে দেখতে হলো, চিন্তে পাচ্চিনে মানুষটা কে? (নিরীক্ষণ)

নাপিতবৌ। ভাল, আমি ভাই একটি কথা বলি, তুমি যে আমাকে কত আদর কচ্চ, এর মধ্যে যদি তোমার স্বামী এসে উপস্থিত হয়।

বসুমতী। তা হলেই বা, তার ভয় কি? তিনি জানেন।

নিকুঞ্জ। (স্বগত) কি? পাপীয়সী, দুরাচারিণী বলে কি? ও কুকর্ম করে, আমি জানি?

নাপিতবৌ। না, এ কথাটি তুমি মিথ্যে বলচো, তিনি জানেন, তোমাকে কিছু বলেন না?

বসুমতী। বলবেন আর কি? তিনি আপনি কি কচ্চেন?

নাপিতবৌ। আপনি কচ্চেন বলে কি তুমিও করবে?

বসুমতী। তা না তো কি? আমার এই দিন, এই কাল, একাকিনী ঘরে ফেলে চিরদিন যখন আপনি বেরোন তখন জান্তে আর কি বাকি আছে, অবশ্যই জানেন, তিনি তো নির্বোধ নন,—তা ও কথা রেখে দেও, এসো একটু আমোদ প্রমোদ করি, আমি ভাই তোমার কোলে একটু শুই। (ক্রোড়ে শয়ন)

নিকুঞ্জ। (সক্রোধে স্বগত) আর আমি সহ্য করতে পারিনে। (গৃহ-মধ্যে গমন করত প্রকাশ্য) কি হচ্যে! বড় রঙ্গরসে মেতেছিস্ যে! (উভয়ে ত্রস্তপ্রায়। নাপিতবৌ পলায়নোদ্যতা হইয়া গৃহকোণে লুক্কায়িত হইল।)

নিকুঞ্জ। বলি কাণ্ডটা কি? আমি জীয়ন্ত থাকতে এত দূর?

বসুমতী। কৈ! কৈ? কি হয়েছে? কি বল না?

নিকুঞ্জ। বলি ঘরে কাকে আনা হয়েছে?

বসুমতী কৈ? না, কৈ? ঘরে তো কেউ আসে নাই, তোমার ভ্রম হয়েছে?

নিকুঞ্জ। বটে? আমার ভ্রম হয়েছে বটে? কোথায় লুকিয়ে রাখবি? কোথা পালাবে? এখনি তাকে সংহার করবো—তোকেও কেটে ফেলবো;—এত বড় যোগ্যতা, তুই না পতিব্রতা? তুই না পরপুরুষের মুখাবলোকন করিসনে? কুলাঙ্গারি, পাপীয়সি, ব্যভিচারিণি—জানিস্ নে?

বসুমতী। বড় যে যা মুখে আসে তাই বল্‌তে লাগলে?

নিকুঞ্জ। বলবো না? তুই পরপুরুষ ঘরে আনবি?

বসুমতী। কৈ না? আমি তো পরপুরুষ ঘরে আনি নাই, আর যদি এনেই থাকি, তুমি কি করবে? তুমি নিজে কি কচ্যো, আপনার ধরনে বুঝতে পার না?

নিকুঞ্জ। এই বলে তুই কুকার্য করবি?

বসুমতী। কেন? আমি কি মানুষ নই? আমার রক্তমাংসের শরীর নয়? আমার মন নাই? ইন্দ্রিয় নাই, সুখদুঃখ নাই? কিছুই নাই? তুমি কর কেন? তুমি কি সৎকার্য করে থাকো?

নিকুঞ্জ। আমি তোকে এখনি কেটে ফেলবো।

বসুমতী। তা ফেলনা, তা হলেই তো সকল যাতনা একেবারে দূর হয়।

নিকুঞ্জ। তা হয়—এই—আগে তোর সমক্ষেতেই সেই তোর প্রাণধনকে সংহার করি, তারপর তোকে নানা যাতনা দে মেরে ফেল্‌বো; অমনি মারবো? কোথা গেল? সে কোথা গেল? এই দিগে গেছে—এই দিগে গেছে।—(ইতস্ততঃ অন্বেষণ)

বসুমতী। (ত্রস্তপ্রায়) না না, ওকে মাত্তো পাবে না, আমাকেই মারো, মারো? (হস্তধারণ এবং তাহা ছাড়াইয়া নাপ্‌তে বৌকে ধারণ, তাহাতে তাহার পুং বেশ পরিহার)

নিকুঞ্জ। (সবিস্ময়ে) একি? ব্যাপারটা কি? স্ত্রীলোক যে? সেই মাধবপুর থেকে এসেছিল সেই নাপতে বৌ না? একি রে?

নাপিতবৌ। আজ্ঞে আমিই বটে, দিদিঠাকুরুণ আমোদ করে আমাকে এইরূপ সাজিয়েছিলেন। দোহাই দাদাঠাকুর। আমার কোন দোষ নেই। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

নিকুঞ্জ। (তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অধোবদন)

বসুমতী। ওকি? মাথা হেঁট করে থাকলে কেন?

নিকুঞ্জ। বসুমতি বৃত্তান্ত কি বল দেখি? আমি তো তোমার অভিপ্রায় কিছু বুঝতে পাচ্চিনে।

বসুমতী। নাথ, তুমি কি ভাব, আমি ব্যভিচারিণী, আমি কুলটা, আমার কুলকলঙ্কের ভয় নাই, আমি কুকার্যই করে থাকি?

নিকুঞ্জ। তাতো নয়, আমি জানি, তা এমন কাণ্ডটা আজ করলে কেন, যথার্থ বল দেখি?

বসুমতী। তুমি আগে যথার্থ বলো এ ব্যাপার দেখে তোমার মন কেমন হয়েছে?

নিকুঞ্জ। আমার মন যে কিরূপ হয়েছে, তা বলতে পারিনে, তুমি পরপুরুষ ঘরে এনেছ দেখে আমার যে ক্রোধোদয় হয়েছিল, আত্মশিরশ্ছেদন তার অকিঞ্চিৎকর, জগৎ সংসারকে একেবারে সংহার করলেও তার নিবৃত্তি হয় না, এমনি জুগুপ্সার উদ্রেক হয়েছিল যে, সংসার-ধর্মকেই একেবারে বিসর্জন দি, কোন বস্তু চাইলে, কিছুতে প্রয়াস নাই, অধিক বলবো কি বসুমতি? আমার মন যে কি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তা আমি কথাদ্বারা প্রকাশ কত্তে পারিনে।

বসুমতী। সেইটী দেখাবার জন্যই আমি এ কাণ্ড করেছি। নাথ, বিবেচনা করে দেখ আমাদের তো এমনি হয়, তুমি বুদ্ধিমান বট, বিদ্বান বট, বিবেচনা শক্তি শরীরে আছে, তুমি যে এই অধীনীকে এই বয়সে এই শূন্যগৃহে একাকিনী চিরদিন ফেলে রেখে আত্মসুখ

রত থাক, আমি মনে কত দুঃখ পাই, শরীরে কত যাতনা হয়, অন্তরাত্মা কতদূর ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তুমি তা বিবেচনা করো না ? এই নিমিত্তে কি করি, ভেবেচিন্তে তোমাকে আজ এই চক্ষুদান দিলাম।

নিকুঞ্জ। বসুমতি, তুমি আজ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয়; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চক্ষুদান হলো। (সভা প্রতি কৃতাঞ্জলি পূর্বক) সভ্য মহাশয়রা কি বলেন ? এ আপনাদেরও কারু কারু চক্ষুদান।

[যবনিকা পতন।]

দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী' নামকরণের অনুকরণ করিয়া এবং প্রায় অনুরূপ বিষয়-বস্তু লইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিপিন বিহারী দে 'একাদশীর পারণ' নামক একখানি প্রহসন রচনা করেন। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,—

জমিদার আত্মারামের পুত্র আশুতোষ মদ ও বারনারীতে ঘোরতর আসক্ত হইয়া স্ত্রীকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিতে থাকে। অবশ্য ইহার জন্য আত্মারাম ইয়ার বন্ধুদের দায়ী করেন। কিন্তু আসলে আশুতোষই হেমাঙ্গিনী নাম্নী পতিতার প্রতি আসক্ত। বন্ধু সুধাকান্ত স্ত্রীর অনুরোধে পাপের পথ পরিত্যাগ করে এবং আশুতোষের বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া হেমাঙ্গিনীর অপর পুরুষের প্রতি আসক্তির কথা জানাইয়া দেয়।

আশুতোষের স্ত্রীর দুঃখের অন্ত নাই। অবিধবা হইয়াও সে একাদশীর পারণ করিতে পারে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। স্বামীর কাছে উপস্থিত হইলে স্বামী তাহাকে লাঞ্ছিত করে। আশুতোষ ঘোরতর পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলে আশুতোষের স্ত্রী সেবাযত্নের দ্বারা তাহাকে সুস্থ করে। আশুতোষ স্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আশুতোষের চৈতন্যোদয় হয়।

পতিতা কর্তৃক প্রতারিত হইয়া কি ভাবে যে এক ভদ্রসন্তানের সুমতির উদয় হয়, ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'মা এয়েচেন' (১৮৭৩) প্রহসন হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। 'মা এয়েচেন'-এর কাহিনীটি এই —

কামিনী ও মোহিনী দুইজন পতিতা। কামিনী কুলীনের ঘরের মেয়ে ছিল, কিন্তু আত্ম-বৈগুণ্যে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে। কামিনী পতিতা হইলেও একজন পুরুষের রক্ষিতা হিসাবে দিন যাপন করে। মোহিনী কিন্তু সে

রকম নয়। কানাইবাবুর সে রক্ষিতা। কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষের সহিত মদ্যপান ও সময় অতিবাহিত করে। একদিন তাহার ঘরে গিরিশ বোস আসিয়া উপস্থিত হইলে মোহিনী দারোয়ানের দ্বারা সংবাদ লয় যে কানাইবাবু কলিকাতায় নাই। মোহিনী গিরিশকে তাহার কক্ষে লইয়া যায়, এই সময় কানাইবাবু আসে। মোহিনী সুকৌশলে গিরিশকে তাহার বিধবা মা সাজায় ও কানাইবাবুকে মায়ের প্রণামীর জন্য ১০০ টাকা দিতে বলে। কানাই তাহাই করে, কিন্তু পরে সব ফাঁস হইয়া যায়। কানাই নিজ স্ত্রীর দুঃখের কথা ভাবে ও অনুতপ্ত হয়। মোহিনীকে বিতাড়িত করিয়া পূর্বকৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে।

শ্রীনাথ চৌধুরী 'আমি ত উন্মাদিনী' (১৮৭৪) নামক যে প্রহসন রচনা করেন, তাহাতে শ্বশুর-জামাতার লাম্পট্যের চিত্র এক সঙ্গেই প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনীটি এই,—

বিধুভূষণ লম্পট ও মাতাল। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিদেশিনীর দুঃখের অন্ত নাই। বিধু রক্ষিতা মালতীকে লইয়া বেশীর ভাগ সময় কাটায়। বিধুর প্রথম পক্ষের কন্যার স্বামীও লম্পট। সেও শ্বশুরের লাম্পট্য লইয়া ব্যঙ্গ করে। বিধু আবার গ্রাম্য দলাদলিতেও আছে। পরিশেষে বিধুর অনুশোচনা আসে। বিদেশিনীর কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বিধুর জামাতা লাম্পট্য বৃত্তি করিয়া বিধুর নাম ডোবায়। পাড়ায় কেশববাবুর বাড়ীতে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণে বিধুর জামাতা উপস্থিত হইলে কেশববাবু বিধুর কাছে কন্যাদান সম্পর্কে অনুশোচনা প্রকাশ করে। কেশববাবুর স্ত্রী কামিনী সৌদামিনীকে (বিধুর কন্যা) কৌতুক করিয়া বলে তাহার স্বামীর সর্বনাশ হইয়াছে। এই কৌতুক ধরিতে না পারিয়া সৌদামিনী মূর্ছিতা হয়। জ্ঞান হইলে বিধুর জামাতার রক্ষিতা গুণী গয়লানীর উদ্দেশ্যে গাল পাড়িতে থাকে। এইসব ঘটনায় বিধুর জামাতার অনুশোচনা হয়।

রাম নারায়ণের 'চক্ষুদান' নাটকের কাহিনী এবং নামকরণ অনুসরণ করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্যামলাল বসাক 'ইহারই নাম চক্ষুদান' প্রহসনটি রচনা করেন। ইহার কাহিনী অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাতে কোন মৌলিকতা নাই ;—

নব্যবাবু নীলকান্ত হেমচন্দ্রের সংসর্গে পড়িয়া মদ্যপান ও পতিতাপল্লীতে যাতায়াত সুরু করে। মাতঙ্গিনী নাম্নী পতিতার সংসর্গে কালযাপনের জন্য

স্ত্রী অবলার দুঃখের অন্ত নাই। অবলা স্বামীকে সংশোধন করিবার জন্য নানা প্রচেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। পরিশেষে চপলা নাম্নী এক দাসীকে পুরুষ বেশে সজ্জিত করিয়া তাহার গৃহে আসিতে বলে এবং নীলকান্তের সম্মুখে কপট প্রণয়ের অভিনয় করে। নীলকান্ত ইহাতে অপমানিত হইয়া চপলার হাত ধরে। চপলা আত্মপ্রকাশ করিলে নীলকান্ত লজ্জায় অধোবদন হয়। হেমচন্দ্র মনে প্রাণে চায় নীলকান্তের সর্বনাশ করিতে, তাই মদ ও বারনারীতে আসক্তি বর্ধিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু অবলা ও চপলার কাছে অপমানিত হইয়া তাহার চৈতন্যোদয় হয়। স্ত্রীর প্রচেষ্টায় তাহার লাম্পট্যবৃত্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র কাহিনীর শেষাংশ অনুসরণ করিয়া যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 'আমি তোমারই' নামক প্রহসন রচনা করেন। ইহার কাহিনী হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধুসূদনের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'র মত দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'ও এই শ্রেণীর নাটক প্রহসন রচনায় সুদূর-বিস্তারী প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল। ইহার কাহিনীটি এই,—

লম্পট নটবরবাবুর জ্বালায় পাড়ার সোমত্থ বৌ-ঝিদের নিরাপদে থাকার কোনো উপায় ছিল না। নিজে বিবাহিত হইয়াও অপরের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করা তাহার স্বভাব ছিল। সাম্প্রতিককালে সুশীলার উপর তাহার খুব নজর। সুশীলার স্বামী বিদেশে থাকায় সুশীলাকে নটবর প্রেমপত্র দেয় এবং অতিথি সেবাই যে নারীর ধর্ম এই কথা বলিয়া উপদেশ প্রদান করে। পাড়ার নাপিত বৌ তাহার পূর্ব কুকীর্তিগুলি প্রকাশ করিয়া দেয়। নটবরের স্ত্রী বিমলা সুশীলার প্রতি অসৎ ব্যবহারের কথা জানিতে পারিয়া মরমে মরিয়া যায় এবং লম্পট স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য গোপন ফন্দি আঁটে। বৈঠকখানায় নটবর যখন সুশীলার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, তখন সুশীলার ছদ্মবেশে বিমলা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার গায়ে যখন লম্পট নটবর হাত দিতে যায়, তখন বিমলা তাহাকে তীব্র কটূক্তি করে। নটবর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বিমলাকে মারধোর করে এবং তাহার ফলে বিমলার মৃত্যু হয়। বিমলার মৃত্যুতে নটবরের চিত্তে অনুশোচনা জাগে এবং বিমলার মৃতদেহের অধরে চুম্বন করিয়া সে বলে 'আমি তোমারই'।

শৈলেন্দ্রনাথ হালদার রচিত 'কলির সঙ্‌' (১৮৮০) প্রহসনখানির কাহিনী এই প্রকার,—

বেহারীবাবুর পুত্র গোপাল দুশ্চরিত্র। মদ্যপান ও পতিতাগৃহে যাতায়াত তাহার নিত্য কর্ম। পরের দাসত্ব করিতে হইবে বলিয়া সে চাকুরী পর্যন্ত করে না। মোকদ্দমা করা তাহার পেশা। স্ত্রীকে আনিবার জন্য গোপাল শ্বশুর বাড়ী যায় এবং শ্বশুর মশায়কে অপমান করে ও গালাগাল দেয়। এদিকে বেহারীবাবু দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া একদম স্ত্রৈণ হইয়া পড়িয়াছেন। গোপালের শ্বশুর কমলাকান্ত বেহারীবাবুকে গোপালের ব্যবহার আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। ইহাতে গোপাল পিতাকে ভয় দেখায় যে সব কথা সৎমাকে বলিয়া দিবে। বেহারী অপমানিত হইয়া বলে যে ইহাই কলিকালের স্বরূপ। গোপাল ইয়ার বন্ধুদের সাহায্যে কমলাকান্তের স্ত্রীকে কুলত্যাগ করানোর মৎলব করে। ইয়ারেরা পরামর্শ দেয় এই ব্যাপারে তাহারা সাহায্য করিবে; কিন্তু তাহার পুর্বে তাহার স্ত্রীকে আনা দরকার। গোপাল তাহার নিজের মায়ের নাম করিয়া চিঠি পাঠায়। ঐ চিঠিতে বলা হয়, 'আমাদের বাড়ীর বিশ্বাসী ভট্টাচার্য মশায়ের সহিত বধূমাতাকে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। না পাঠাইলে পুত্রের পুনরায় বিবাহ দেওয়া হইবে।' গোপালের মা পত্রের মর্ম জানিয়া খুশী হন। হরিহর ভট্টাচার্য ঐ চিঠি লইয়া কমলাকান্তের-গৃহে যায়। ইয়ারবন্ধু এদিকে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে কমলাকান্তের স্ত্রী কাদম্বিনীকে হাত দেখানোর মিথ্যা ছলনায় কুলত্যাগ করায়। গোপালের স্ত্রী মাতার চরিত্র দোষে মাতাকে ধিক্কার দিয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া আসে। গোপালের মা গিন্নীপনা ঘুচিয়া যায় দেখিয়া গোপালের নিকট তাহার বধূর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

দীননাথ চন্দ 'কমলা কাননে কলমের চারায় আঁটি', (১৮৮০) প্রহসনখানি রচনা করেন। ইহার কাহিনীটি এই,—

জমিদার বাসরচন্দ্র, চাটুকার প্রলাপচন্দ্র ভট্টাচার্য ও মোসাহেব যোগীন্দ্রনাথ চাটুজ্জেকে লইয়া দিন রাত আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করে। তাহার সহিত আছে মদ্যপান ও লবেজান নাম্নী এক মুসলমানী পতিতা। লবেজানের পিছনে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া চতুর্দিক হইতে বাসরচন্দ্র ঋণজালে জড়াইয়া পড়ে। এদিকে লবেজানকে উপহার দিবার জন্য একটি বাড়ী প্রস্তুত করিতে তাহার টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেহই তাহাকে টাকা দিতে চাহে না।

প্রলাপ ও যোগীন বাসরকে নিজ জন্মদিন পালনের জন্য উৎসাহিত করে। কিন্তু ঋণগ্রস্ত বাসর উক্ত প্রস্তাব পুর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়া পরে স্বীকৃত হন এবং

মোসাহেবদের অনুরোধে লবেজানের গৃহে ঐ উৎসব করিতে বলে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও পতিতা পল্লীতে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হয়।

জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাসরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখাত হন; কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণটি জনৈক ব্যক্তির পরামর্শে বারাঙ্গনা আসক্তির কথা জ্ঞাপন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। এদিকে লবেজানের গৃহে জন্মদিনের উৎসবে লবেজান বিবিকে 'হ্যাম' (শূকর মাংস) খাওয়ানোর জন্ম বাসর অপমানিত ও বিতাড়িত হন। মোসাহেবদেরও দুর্দিন চলিতে থাকে। বাসর কিন্তু লবেজান বিবিকে ভুলিতে পারে না। পরে মোসাহেব সহ লবেজান বিবির গৃহে উপনীত হইয়া তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং গঙ্গার নিবটবর্তী বাড়ীটি তাহার নামে লিখিয়া দেয়। লবেজান খুশী হইয়া বাসরকে অভিবাদন জানায়। প্রলাপ ও যোগীন আশ্বস্ত হয়।

মন্ত ও পতিতার প্রতি আসক্তির ফলে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার যে সেদিন দুর্গতির চরম অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, উপরি-উদ্ধৃত কাহিনীটিই তাহার প্রমাণ।

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮১) নামক একখানি প্রহসন রচনা করেন। পতিতার নিকট অপমানিত হইয়া কি ভাবে যে এক ভদ্রসন্তানের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল, ইহাই তাহার বিষয়,—

স্থরেন নব্যবাবু। ভগবান ডোমের বিধবা কন্যা হরিমতির সহিত সে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত। হরি স্থরেনকে প্রকৃতই ভালবাসে। হরির মা দয়া কিন্তু হরিকে উপদেশ দেয়, যখন সে এ পথে নামিয়াছে, তখন যেন অর্থ ও অলঙ্কার যাহার নিকট পাইবে তাহাকেই প্রশ্রয় দেয়। আধুনিক ভুবনবাবুরও তাহার উপর লোভ। সে দয়াকে টাকা দিয়া বশ করে এবং হরিকে হাত করিতে চায়। স্থরেন সব ব্যাপার জানিয়া ভুবনকে উচিত শিক্ষা দিবে বলে। একদিন ভুবন হরিমতির কাছে আসিয়া চোর বলিয়া ধরা পড়ে এবং যারপর-নাই অপদস্থ হয়।

ভুবনের কুসুম নাম্নী এক রক্ষিতা ছিল। কুসুম জানিতে পারে যে, ভুবন হরির গৃহে যাইবে। ভুবন আসিলে পাশের ঘরে লুকায়। হরি তাহাকে গাধা সাজিতে বলে। এমন সময় কুসুম আসিয়া উপস্থিত হয়। ভুবন গাধা সাজে, স্থরেন তাহার পিঠে চড়িয়া বসে, কুসুম গাধাকে তাড়াইতে থাকে। ভুবনের চৈতন্য হয়। সে বলে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী রচিত 'গোলক ধাঁদা' (১৮৮২) প্রহসনটির মধ্যে একটু নাটকীয় গুণ আছে। ইহা জমিদারের লাম্পট্যের বিষয় লইয়া রচিত—

নিশ্চিন্তপুরের জমিদার কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর লাম্পট্য সর্বজন বিদিত। মোসাহেবরা এই লাম্পট্যের ইন্ধন জোগায়। অর্থের দ্বারাই যে কোনো স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করা যায় ইহাই তাহাদের ধারণা ; কিন্তু বৈঠকখানায় হঠাৎ শিবে পাগলা হাজির হইয়া জানাইয়া দেয় যে প্রকৃত সতী নিজে মৃত্যুবরণ করিয়াও সতীত্ব জলাঞ্জলি দেয় না। কৃষ্ণকান্ত ও মোসাহেবের দল রাগিয়াই আগুন। দেওয়ান গ্রামের গৃহস্থ বধূ বিনোদবালার সন্ধান দেয় এবং জমিদার কৃষ্ণকান্তকে রাত্রে তাহার গৃহে যাইতে বলে।

শিবে পাগলা আর কেহই নহে, বিনোদবালার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাহার নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্য লম্পটদের শায়েস্তা করা এবং স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা করা। শিবে পাগলা বিনোদবালাকে একে একে সকলকে নির্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রণ করিতে উপদেশ দেয় এবং সেও যথাসময়ে উপস্থিত হইবে বলিয়া জানায়। বিনোদবালা কি ভাবে লম্পটদের জব্দ করা যায় দাসীর সহিত তাহার কৌশল আঁটিতে থাকে। বিনোদবালা ও দাসী অনুমান করে যে শিবে পাগলা আর কেহ নহে, স্বয়ং নগেন্দ্রনাথ।

নির্দিষ্ট দিনে জমিদারের কর্মচারী, দেওয়ান, জমিদার ও হরিহর তাঁতী বিভিন্ন সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয় বিনোদবালা কৌশলে কাহাকে ঘোড়া বানাইয়া দেয় এবং হরিহরকে মাথা মুণ্ডন করিয়া আসিতে বলে। ইতিমধ্যে নগেন্দ্র আবির্ভূত হইয়া সকলকে বেদম প্রহার করিতে থাকে এবং গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। বিনোদবালা ও নগেন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

প্রহৃত হইয়া কৃষ্ণকান্তের বৈঠকখানায় সবাই আসিয়া মিলিত হয়। এমন সময় মুণ্ডিত মস্তক লইয়া হরিহর তথায় উপস্থিত হয়। সকলে মাথা নেড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে ছড়ায় উত্তর দেয় ;—

হুজুর ঘোড়া দেওয়ান ভেড়া
মোসাহেবের মাথায় বাতি,
সেই তীর্থে মাথা মুড়িয়েছে
এ অভাগা হরে তাঁতী।

'সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ' (১৮৮৫) বেচুলাল বেনিয়া রচিত একটি প্রহসনের নাম ইহার কাহিনী এই প্রকার ;—

নব্যবাবু হনুমান মদ্যপ, লম্পট ও গঞ্জিকাসেবী। লালসার লোলুপতা তাহাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে লাগিল। পিতার মত তাহারও বারাঙ্গনা আসক্তি তীব্রভাবে বাড়িতে থাকে। হনুমানের ঘনিষ্ট বন্ধু ভোলা। স্ত্রীর কাছে প্রহৃত হওয়ার দুঃখ সে ভোলাকে জানায়। ভোলা তাহাকে সান্ত্বনা দেয় এই বলিয়া যে, স্ত্রীর প্রহার আদরের নামান্তর। লাম্পট্য প্রবৃত্তির বশে হনুমান ভোলার সহিত এক বৃদ্ধা পতিতা ভামিনীর গৃহে যায় এবং অসতী গৃহস্থ বধূকে কুৎসিৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আনিতে বলে। ভামিনী তাহা অসম্ভব জানিয়া এক ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে। এদিকে হনুমান ভাবে তাহার প্রত্যাশিত স্ত্রীলোক আসিলে তাহাকে মদ্যপান করাইয়া আনন্দ উপভোগ করিবে ; এই জন্য কিছু মদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। পতিতাপল্লীতে ফুলকুমারী বেওয়ার গৃহে মণি, চুনি, হরি প্রভৃতি গণিকারা গল্পগুজব করিতেছিল। বৃদ্ধা ভামিনীকে দেখিয়া তাহারা ঠাট্টা তামাসা করিতে থাকে। ভামিনী হরিকে আলাদা ডাকিয়া হনুমানের প্রস্তাব সবিস্তারে বলে। হরিকেই সে অসতী গৃহস্থ বধূ সাজাইয়া লইয়া যাইতে চায়। হরি রাজি হয়। ভামিনীর বাড়ীতে হনুমান ও ভোলা অপেক্ষা করিতেছিল। হরি সেখানে আসিয়া কুলবধূর ভাণ করে।। মদ্যপান ব্যাপারে হনুমানের সহিত ভোলার ঝগড়া হয় এবং সে চলিয়া যায়। ভামিনীর নির্দেশে হরি নিজ আলয়ে হনুমানকে লইয়া যায় এবং ন্যাকামি করিয়া বলে যে, তাহার স্বামী কামুক লম্পট। সর্বদা পতিতা গৃহেই থাকে। হরি বলে মদ্যপ স্বামীর রাখা খানিকটা মদ আছে। সেই মদ সে হনুমানকে দেয়। অবশেষে হরির ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া হনুমান শুইয়া পড়ে। একটু রাত্রি হইলে হুঁকা, ডাবর প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া পলায়নকালে হনুমান হরির চিৎকারে এক পথিক কর্তৃক ধৃত হয়। হনুমান অভিযোগ অস্বীকার করে। কিন্তু হরি ও তাহার সঙ্গিনীরা তাহাকে গৃহের ভিতর লইয়া আসিয়া তাহার বস্ত্রহরণ করে, অশ্লীল নির্যাতন চালায়। হনুমান এই ধরণের দুষ্কর্ম হইতে তাহাদের বিরত থাকিতে বলে।

অল্পবয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যেও যে কি ভাবে নৈতিক দোষ ঘটিয়াছিল তাহা হরিহর নন্দী প্রণীত ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'শিখছ কোথা ? ঠেকছি যথা' (১৮৮৮) হইতে জানা যায়। অভয় স্কুলের ছাত্র। সে ইয়ার বন্ধুদের লইয়া প্রায়ই মদ্যপান ও গণিকাগৃহে যাতায়াত করে এবং

নিজেদের অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। অধঃপতনের সূত্রপাত বন্ধুদের দ্বারাই হয়; কিন্তু পরে আর বন্ধুদের প্রয়োজন হয় না। গোপী অভয়ের বন্ধু। গোপী, গৌর প্রভৃতি ইয়ার বন্ধু লইয়া গণিকাগৃহ হইতে যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন গণিকা যে তাহাদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে সেই কথা তুলিয়া তাহার প্রতিশোধাত্মক নীতি গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। কিন্তু বন্ধুরা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলে। ইহাতে নাকি লোক জানাজানি হইবার সম্ভাবনা। রাত্রে গোপীর সহিত অভয়ের দেখা হইলে, গোপী অভয়কে বলে সে শুনিয়াছে যে, অভয় স্কুলে যাওয়ার নাম করিয়া গণিকালয়ে কাটায়। অভয় গোপীকে গণিকাগৃহে লইয়া যায়। গোপী রাস্তার মধ্যেই গান আরম্ভ করে। পাহারাওয়ালা বাধা দেয়। গোপী ও অভয় আস্ফালন করিতে থাকে। এমন সময় সার্জেণ্ট আসিয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করে। অশ্বিনী, নগেন্দ্র, গৌর, প্রতিজ্ঞা করে এমন দুষ্কর্ম আর করিবে না। অভয় তাহার উত্তরে বলে 'মাতালের প্রতিজ্ঞা ডাল ভাত'। অবশেষে পাহারাওয়ালাকে ঘুস দিয়া তাহারা মুক্তি পায়। অভয়ের চৈতন্যোদয় হয়, বলে—আর না, অন্য যথেষ্ট শিক্ষা পেলেম। শিখছ কোথা? ঠেকছি যথা।

নৈতিক দুশ্চরিত্রতা যে মানুষের দায়িত্ব বোধ কি ভাবে লুপ্ত করিয়া দিয়া তাহাকে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেয়, পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য রচিত 'বিচিত্র অন্নপ্রাশন' (১৮৮৯) নামক প্রহসনটি তাহার প্রমাণ। ইহার কাহিনীটি এই—

চারুবাবু পতিতা গোলাপীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সর্বস্ব-হারাইছেন। এদিকে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য তাহার টাকার দরকার। অথচ ঐ একদিনেই গোলাপীর পুত্রের অন্নপ্রাশন। গোলাপী তাহাকে যথারীতি ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছে। মোসাহেব চাটুকারের দল পিতৃশ্রাদ্ধ স্থগিত রাখিয়া অন্নপ্রাশন করিতে বলেন। মোসাহেব নবীন টাকা দিবেন বলেন। চারুবাবু অফিসের ক্যাশ ভাঙিয়া ৫০০০, হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। গোলাপীর বাড়ীতে যথারীতি উৎসব হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় ও অন্যান্য খরচায় সব টাকা খরচ হইয়া যায়। এমন সময় পুলিস আসিয়া চারুবাবুকে গ্রেফ্‌তার করে। চারুবাবু গোলাপীর সাহায্য চায়, কিন্তু গোলাপী তাহাকে এড়াইয়া যায়। চারুবাবু পতিতার স্বরূপ বুঝিতে পারেন এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেন।

সুধামাধব দাস রচিত 'দিল্লীকা লাড্ডু', (১৮৮৮) প্রহসনটির কাহিনী এইরূপ,—

বিনোদ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাহার স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তরঙ্গিণী নাম্নী পতিতার নিকট সে যাতায়াত করে। তরঙ্গিণী সুকৌশলে বিনোদকে সর্বস্বান্ত করে। তবু বিনোদের জ্ঞান হয় না। তরঙ্গিণীর মা তাহার 'ভালবাসা'র পুতুলের বিবাহে যৌতুক দিবার জন্য একশত টাকা চায়। বিনোদ অর্থসংগ্রহে বাহির হইয়া পড়ে। এমন সময় তরঙ্গিণীর মা আসিয়া তরঙ্গিনীকে নানা উপদেশ দেয়। বিনোদকে পথের ভিখারী না হওয়া পর্যন্ত শোষণ করিতে বলে। অন্যদিকে বিনোদ একশত টাকা জোগাড় করিতে অক্ষম হয়। বন্ধু কালীবাবুর নিকট অর্থ ধার করিতে গেলে বিনোদ তিরস্কৃত হয়। তখন বিনোদ সুকৌশলে আপন স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর চিক চুরি করিয়া পতিতা পল্লীর দিকে পা বাড়ায়। পথে সার্জেন্ট ও পাহারাওয়ালা সেই চিক কাড়িয়া লয়। তরঙ্গিণী অপারগ বিনোদকে যথেষ্ট অপমান করে এবং পতিতাবৃত্তিতে অর্থই তথাকথিত প্রেমের নিয়ামক, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়। চরম অপমানিত হইয়া বিনোদ রাজলক্ষ্মীর নিকট ফিরিয়া আসে এবং পূর্বকৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা করে। বারাঙ্গনা আসক্তি যে কত বিষময় তাহা উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বর-চিন্তায় মনপ্রাণ সমর্পণ করে।

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'বাবা ও তুমি' ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব বৎসর প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত 'দাদা ও আমি' প্রহসনের অনুকরণে ইহার নামকরণ হইয়াছে। গ্রন্থ-পরিচিতি রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহা 'ভাক্ত সমাজ সংস্কারকের নিখুঁত ফটোগ্রাফ।' ইহার কাহিনী এই প্রকার, —

বামনদাস শুঁই কলিকাতার একজন বিত্তশালী লোক, তবে একটু রক্ষণশীল। তাঁহার দুই পুত্র—সারদা দাস ও বরদা দাস। জ্যেষ্ঠ সারদা সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছে, কনিষ্ঠ বরদা ইহতে গর্ব অনুভব করে; সে নানাবিষয়ে এতদিন বক্তৃতা দিয়া নাম কিনিতে পারে নাই, দাদাকে আশ্রয় করিয়া সে একটা পত্রিকা বাহির করিবে, দাদার কলমে আর ভাইয়ের গলার জোরে সহজেই সংস্কারক হিসাবে তাহাদের নাম দাঁড়াইবে। দাদা আসিয়া প্রথমেই ভাইয়ের দেশী পোষাক ছাড়াইল, সাহেবি পোষাক পরাইল। তারপর সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত তাহাদের এই কর্মসূচী স্থির হইল যে, পোষাক পরিবর্তন, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার ও বেশ্যা-বিবাহ। বামনদাসের আচার্যের পুত্র পেলারাম বেশ্যা-সংগ্রহে পটু। দুই

ভাইয়ে পেলারামকে ধরে এবং বিবাহার্থে দুইটি বেশ্যা-সংগ্রহ করিয়া দিতে বলে। পেলারাম অনেক খুঁজিয়া লালমণি এবং তাহার কন্যা ল্যাভেণ্ডারকে সংগ্রহ করিল এবং তাহাদিগকে সব কথা খুলিয়া বলিল.—এমন কি বাবুদের মস্তিষ্ক বিকৃতির কথাও। লালমণি বয়স্কা এবং অনেক ঘাটের জল খাওয়া। তাহার ধারণা বাবুরা তাহাদের সম্পত্তি হাত করিবার জন্য এই চাল চালিয়াছে। সে আপত্তি করে। পেলারাম অনেক বুঝাইয়া রাজী করায়। বলে, কিছু অর্থপ্রাপ্তিযোগ বরং ঘটতে পারে, অবশেষে মায়ে-ঝিয়ে রাজী হয়। লালনের বাড়ীতে বিবাহের ঠিকঠাক। পেলা পুরোহিত। পেলা বিকৃত সংস্কৃতে শ্রাদ্ধের মন্ত্র আওড়ায়। জিজ্ঞাসিত হইয়া বলে, –'মন্তরের এইটুকুই তো আমার শেখা sir! তা শ্রাদ্ধই বল, আর বিবাহই বল।' দুই ভাইয়ে মিলিয়া মা আর মেয়েকে বিবাহ করে। অনুষ্ঠান চলিতেছে, ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া যায়। লালন বামনদাসের রক্ষিতা। সম্প্রদানকালে দারোয়ান আসিয়া হঠাৎ খবর দেয়—লালনের বাবু এসেছেন জামাই সাহেবকে নিয়ে। সবাই পালাইবার পথ খোঁজে। কিন্তু ইতিমধ্যে বামনদাস ও John Bull আসিয়া পড়ে। দুই ভাই তখন বেপরোয়া। তাহারা দুইজনে দুই পতিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখে। আইনগত অধিকার। অবশেষে বাবার ধমকে ছোট ভাই হার মানে, এবং সব কথা খুলিয়া বলে। বলে, সব পরামর্শের মূলে—'দাদা ও আমি।' বামনদাসকে John Bull এদিকে বলে যে সে বিলাত হইতে সারদাকে ধাওয়া করিয়া এখানে আসিয়াছে। সারদা দাগী আসামী। বুল্ সারদাকে জেলে পুরিতে চায়। বামনদাস কান্নাকাটি করে। অবশেষে নাকে খৎ দিয়া দুইজনে রেহাই পায়। ল্যাভেণ্ডারের ঘরে একটা গাধার মুখোস ছিল,। বুল্ সেটা আনাইয়া সারদাকে পরিতে বলে। তারপর ইংরেজী একটা বই হাতে দিয়া বলে—'দেখ্ তোম্ গাধা হ্যায়—এই কিতাবঠো পড়ো, পড়নেসে বুঝোগে Social Reformation কেস্কো বোলে।" সারদা সমাজ সংস্কারের পরিণাম বিষয়ক পয়ার আবৃত্তি করে। শেষে সে দর্শককে বলে—'সভ্য মহাশয়, আমরা ভাক্ত সমাজ সংস্কারক, আপনাদের মধ্যে আমাদের মত কেউ আছেন কি? থাকেন তো সাবধান!!!' বৃত্তান্তটি সমসাময়িক কোন ব্যক্তি এবং ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

যশোদানন্দন চট্টোপাধ্যায় 'কলির কাপ' (১৮৯৫) নামক যে প্রহসনটি রচনা করেন, তাহা বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল। কাহিনীটি এই,—

কাশীপুরের জমিদারের মৃত্যু হইলে তাহার পোষ্যপুত্র হরিহর সমগ্র জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইল। রমাকান্ত তাহার প্রধান কর্মচারী ও মোসাহেব। রমাকান্তের পরামর্শে ও চক্রান্তে হরিহর লাম্পট্য করিতে সুরু করে। রমাকান্তেরই ষড়যন্ত্রে ভৃত্য খুদিরাম হরিহরের চক্ষুশূল হয়। ইহার পর রমাকান্ত গ্রামের পণ্ডিত ও কুলপুরোহিতের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি নজর দিবার জন্য হরিহরকে প্ররোচিত করে। রমাকান্ত হরিহরকে বলে বামা বোষ্টমীই সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে। খুদিরাম আড়াল হইতে এই সব কুমন্ত্রণা শোনে এবং এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। বামা বোষ্টমী তর্কালঙ্কারের স্ত্রীর নিকট যাইয়া নানাভাবে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে থাকে, কিন্তু মনোরমা বামার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। অবশেষে তাহারও ভাবান্তর হয়। মনোরমা ভাবে তাহার সন্তানাদি না হইলে তর্কালঙ্কার তো আবার বিবাহ করিবে। সুতরাং তাহার নিজের ব্যবস্থা সময় থাকিতেই করা উচিত। এদিকে রমাকান্ত তর্কালঙ্কারকে হরিহরের পক্ষ লইয়া নানা কটুকথা বলে। কেননা তর্কালঙ্কার হরিহরের পালক পিতার নিকট হইতে তিনশত টাকা ধার করিয়াছিল। সেই টাকার খোঁটা দিয়াই রমাকান্ত তর্কালঙ্কারকে অপমান করে। ক্ষোভে দুঃখে অর্থ রোজগারের জন্য তর্কালঙ্কার মণিপুরে চলিয়া যান এবং সঙ্গে নদের চাঁদকে লইয়া যান। মণিপুরে তর্কালঙ্কার বহু অর্থ রোজগার করিলে পর নদের চাঁদ তাহা আত্মসাৎ করে। তর্কালঙ্কার স্ত্রীর গহনা গড়াইবার জন্য যে অর্থ নদের চাঁদকে দিয়াছিল নদের চাঁদ তাহা স্যাকরাকে না দিয়া চম্পট দেয়। স্যাকরা কোটালের সহায়তায় মণিপুরের রাজবাড়ীতে তর্কালঙ্কারকে ধরিয়া লইয়া যায়। অপরদিকে হরিহর দিন দিন অধঃপাতের পথে নামিয়া যায়। তাহার স্ত্রী সুনীতির ভাগ্যে কষ্টের সীমা পরিসীমা নাই। সে বুঝিতে পারে রমাকান্তই সব সর্বনাশের মূল। নবীনকে বিপদে ফেলিয়া নদের চাঁদেরও বিশেষ সুবিধা হয় নাই। ডাকাতের হাতে পড়িয়া সেও সর্বস্বান্ত হয়। ওদিকে বামা বোষ্টমীর কার্যকলাপে খুদিরাম অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে। হরিহর ও রমাকান্ত খুদিরামকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু বুদ্ধির চাতুর্যে খুদিরাম তাহাদের ষড়যন্ত্র ধরিয়া ফেলে এবং রমাকান্তকে যারপরনাই শাস্তি প্রদান করে। নবীনের পরামর্শে হরিহর লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি পায় এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে।

যে নাটক ও প্রহসনগুলির কথা উপরে উল্লেখ করা হইল, তাহাদের

কাহিনীতে যে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিশেষতঃ মধুসূদন এবং দীনবন্ধু উহাদের অনেকেরই আদর্শ ছিল। সেদিনকার সমাজের এই দুষ্ট ক্ষতকে দূর করিবার প্রয়াসে যাঁহারা নাটক এবং প্রহসনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনেকেরই যে নাটক-প্রহসন রচনার প্রতিভা ছিল না তাহা সত্য, কিন্তু সমাজ জীবনের কল্যাণ-কামনা যে তাহাদের লক্ষ্য ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহাদের মধ্যে বর্ণিত ঘটনা এবং কাহিনীগুলি অত্যন্ত স্থুল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই সত্য, কিন্তু কলিকাতার সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ও সে দিন এমনই স্থুল ছিল। বিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালী সমাজ যে নৈতিক ব্যভিচার হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছে তাহা নহে, তবে তাহার অভিব্যক্তি সূক্ষতর হইয়াছে মাত্র, এবং তাহার পরিচয়ও আধুনিকতম সামাজিক নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

পুরুষের ব্যভিচারের মত স্ত্রী জাতির নৈতিক ব্যভিচারের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াও সে যুগে কয়েকটি নাটক প্রহসন রচিত হইয়াছিল। বহুবিবাহ, অসম-বিবাহ ইত্যাদি সূত্রেই নারী ব্যভিচারিণী হইত, তাহার কথাও সমাজ সে দিন গোপন করে নাই। এক হিসাবে পুরুষের ব্যভিচার প্রবৃত্তির চরিতার্থতা স্ত্রীজাতির সংসর্গ দ্বারাই সম্ভব হইয়া থাকে, তথাপি এমন ক্ষেত্র দেখা যায়, যে স্ত্রীচরিত্রই ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্ত্রী-জাতির মধ্যে সে দিন মদ্যপানের প্রথাও প্রবেশ করিয়াছিল, অনেক ক্ষেত্রে ব্যভিচারী স্বামী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই প্রবৃত্তি স্ত্রী সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর তাহা স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের মধ্যে একটি নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাও স্ত্রীসমাজের ব্যভিচারের কারণ। প্রধানতঃ এই বিষয় অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি নাটক-প্রহসন রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত 'তুই না অবলা !!!' (১৮৭৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "তুই না অবলা !!!" প্রকাশিত হইল। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা বিষয়-বিশেষ লক্ষিত করিয়া লিখিত হয় নাই, কেবল কুলবালাগণকে সতীত্বের প্রাধান্য শিক্ষা দেওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে সকলে অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করতঃ দর্শন করিলে বাধিত হইব।"

রুগ্ন স্বামীর সুন্দরী পূর্ণ যৌবনা পত্নী কি ভাবে যে এক লম্পট ফিরিঙ্গির সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তাহারই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রুগ্নতার জন্য যে পুত্রের বিবাহ দেওয়া সঙ্গত ছিল না, সেই পুত্রকে বিবাহ

দিবার ফলে তাহার পত্নীর ব্যর্থ যৌবন কি ভাবে যে পরপুরুষকে আকর্ষণ করিল, তাহারই মর্মন্তুদ কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার পর অম্বিকাচরণ গুপ্ত 'কলির মেয়ে ছোট বৌ ওরফে ঘোর মূর্খ' (১৮৮১) প্রহসনখানি রচনা করেন। এখানে স্বামীর মূর্খতার জন্য যে কি ভাবে পত্নী ব্যভিচারিণী হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। মূর্খ স্বামীর নির্বুদ্ধিতার সুযোগ লইয়া তাহার পত্নী সারদা ইহার মধ্যে কি ভাবে যে বহু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারিণী হইয়াছে, তাহা ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। মূর্খের সঙ্গে বিবাহ দিবার বিরুদ্ধে ইহা যেন সারদার সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নহে। ব্যভিচারী পুরুষগুলিকে নাকে দড়ি দিয়া নাচাইতে নাচাইতে সারদা ছড়া কাটে—

সোয়ামীর চোখে ধূলো দিয়ে বারফট্‌কা মেয়ে।
কেমন করে মজায় দেখ বোকা পুরুষ পেয়ে॥
পরাণ, তুই একবার নাচ,
ডাঙ্গায় বসে ধরি আমি জলের ভিতর মাছ॥

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ বসু রচিত 'সমাজ-কলঙ্ক' প্রহসনটি প্রকাশিত হয়। কৌলীন্য প্রথার ফলে কি ভাবে যে নারীর মধ্যে ব্যভিচারের প্রবৃত্তি জাগিয়া থাকে, রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার 'কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটকে' জীবন্ত ভাবে তাহা দেখাইয়াছেন। অপদার্থ কুলীন পাত্রের নিকট বিবাহ দিবার পর হইতে পিতৃগৃহবাসিনী যুবতী কন্যা সুরো কি ভাবে যে অনাচারে (incest) লিপ্ত হইয়া নিজের সর্বনাশ করিয়াছিল, ইহাতে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

কবিরত্ন এই ছদ্মনামে সম্ভবতঃ কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'রহস্য মুকুর' নামক প্রহসন রচনা করেন। কাহিনীটি 'সত্যের ছায়া অবলম্বনে' লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশক দাবী করিয়াছেন। এক ব্যভিচারী জমিদারের উপেক্ষিত পত্নী কি ভাবে যে নিজেও ব্যভিচারিণী হইয়া স্বামীর দুষ্কার্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত নাটক প্রহসন ব্যতীতও একজন অজ্ঞাত লেখক প্রণীত 'হেমন্তকুমারী' (১৮৬৮) প্রহসনে এক নারী কি ভাবে দেবরের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহার কথা বর্ণিত হইয়াছে। বটকৃষ্ণ চক্রবর্তী 'কলির কুলটা প্রহসন' (১৮৭০) রচনা করিয়া কয়েকটি দুশ্চরিত্রা কুলনারীর জীবনের শোচনীয় পরিণামের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় 'তিন

জুতো' (১৮৮৪) নামক প্রহসন রচনা করিয়া এক ব্যভিচারিণী পত্নীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাকে 'ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক' বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। অনুরূপ বিষয় লইয়া অজ্ঞাত লেখক প্রণীত 'ফচ্‌কে ছুঁড়ির ভালবাসা' (১৮৮৬), চন্দ্রশেখর শর্মা রচিত 'নারী চাতুরী' (১৮৯৫), শরৎচন্দ্র দাস রচিত 'এ মেয়ে পুরুষের বাবা' (১৮৯৬) ইত্যাদি প্রহসন রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিনোদ বিহারী বসুর 'সরসীলতার গুপ্তকথা' (১৮৮৩), এস, এন, লাহার 'গোপালমণির স্বপ্নকথা' (১৮৮৭), মণিলাল মিত্র প্রণীত 'শান্তমণির চূড়ান্ত কথা', হারাণ শশী দে প্রণীত 'কলিকালের রসিক মেয়ে' (১৮৮৮), ইত্যাদি এই বিষয়ক বহু প্রহসন রচিত হয়। ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই সমাজ-জীবনের বাস্তব যে পরিচয়ই প্রকাশ পাক না কেন, তাহা সাহিত্য গুণান্বিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে নাই। সাহিত্যের জন্য ইহাদের মূল্য নহে—ইহাদের প্রকৃত মূল্য যাহা, তাহা সামাজিক ও ঐতিহাসিক।

পল্লীজীবনে বাংলার সমাজের যে রূপ ছিল, তাহাতে নারী যৌথ পরিবারের মধ্যে অভিভাবক স্থানীয়া নানা আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবৃত থাকিত বলিয়া, অনেক সময় ব্যভিচার জীবন যাপন করা তাহাদের মধ্যে যে কঠিন ছিল, নাগরিক জীবন ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবারাশ্রয়ী হইবার ফলে তাহার বন্ধন বহুলাংশে শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ব্যভিচারের প্রবণতা নারীর অস্বাভাবিক ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সর্বত্রই সমান ছিল, এ কথা সত্য ; কিন্তু পল্লীর যৌথ পরিবারভুক্ত জীবনে সেই প্রবণতা পরিবারিক জীবনের নানা কর্তব্যের মধ্য দিয়া নানা ভাবে মুক্তি লাভ করিতে পারিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনে তাহার উপায় ছিল না ; স্বামীর অনুপস্থিতিতেই নারী স্বাধীনতা লাভ করিবার সুযোগ পাইত বলিয়া তাহাতে ব্যভিচারের প্রবৃত্তি নানাভাবে চরিতার্থতা লাভ করিবার উপায় সন্ধান করিত। ক্রমে স্ত্রীসমাজে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী জাতির মধ্যে যে আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়াছে, তাহার ফলে এই প্রবৃত্তি বহুলাংশে আজ নাগরিক জীবনেও দূর হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সে দিন অশিক্ষিত এবং আদর্শহীন স্ত্রীসমাজের মধ্যে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছিল।

সমাজের মধ্যে নৈতিক শৈথিল্য যখন ব্যাপক হইয়া উঠে, তখন তাহা যে কেবলমাত্র পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা নহে—আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যেও সহজেই প্রসার লাভ করে। যে গৃহের পুরুষ

ব্যভিচারী, সেই গৃহের স্ত্রী এবং বালক-বালিকাও নৈতিক সংযম অটুট রাখিয়া চলিতে পারে না। সেইজন্য সেই যুগে বিদ্যালয়ের বালকদিগের মধ্যেও ব্যভিচার-প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। তাহার পরিচয়ও সে যুগের কয়েকখানি নাটক-প্রহসন হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়। এই বিষয়ক একটি প্রহসনের নাম, 'তুমি যে সর্বনেশে গোবর্ধন'; ইহা শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় রচিত এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার কাহিনী এই,—

দশ বছরের ছেলে গোবর্ধন নানা নেশায় অভ্যস্ত। পিতার শাসন অগ্রাহ্য করিয়া সে কুসঙ্গে পড়িয়া নানা নেশায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিল এবং অবশেষে পতিতালয়ে গিয়া মদ্য পান আরম্ভ করিল। পিতা হরিহর তাহাকে সেখান হইতে ধরিয়া লইয়া আসিয়া তাহাকে শাসন করিলেন, তথাপি কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে গোবর্ধন অর্থের জন্য পতিতালয় হইতে এক শাল চুরি করিল। দুশ্চিন্তায় পিতা হরিহর যখন একদিন আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন গোবর্ধনের চৈতন্যোদয় হইল, সে বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইল যে তাহার জন্যই তাহার পিতার শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হইল।

সুতরাং ইহা যেমন নাটকও নহে, তেমনই প্রহসনেরও বিশেষ কোনই লক্ষণ নাই, তথাপি তখনকার সমাজের বিকৃত চিত্রগুলি, সমাজহিতৈষীদিগের চিন্তা যে কতদিক দিয়া কি ভাবে অধিকার করিয়াছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

এই শ্রেণীর আর একখানি নাটকের নাম 'ষ্টুডেন্স-রহস্য' (১৮৮৮); রচয়িতার নাম মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের নামকরণটি পরিচয়-লিপিতে ইংরেজি অক্ষরে লিখিত হইয়াছে—'*Student's Rahasya, a Prahasana,*' বাংলায় আর কোন উল্লেখ নাই। ভূমিকাতেই নাটকের বিষয় সম্পর্কে নাট্যকার উল্লেখ করিয়াছেন, 'আজকাল সভ্য নব্যকুল-প্রদীপ স্কুলস্থ বালকদিগের চরিত্র ও আচার-ব্যবহার যারপর নাই দূষিত হইতেছে। ইহা তাহারই একখানি চিত্র মাত্র।' কয়েকটি স্কুলের বালকের যাবতীয় নৈতিক দুষ্কর্মের বিষয় ইহাতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, এক বাল-বিধবাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিবার কথাও তাহাতে বাদ যায় নাই। এতদ্ব্যতীত দ্বারকানাথ মিত্র প্রণীত 'মুষলম্ কুলনাশম্' (১৮৬৪), নলিনীলাল দাশগুপ্ত প্রণীত 'তোমার ভালবাসার মুখে আগুন' (১৮৮৫), লালবিহারী সেন প্রণীত 'ভালবাসার মুখে ছাই' (১৮৮৬) ইত্যাদি প্রহসনও এই বিষয়ই অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।

সেদিনকার সমাজ-জীবনের শুকারজনক রূপ ইহাদিগের মধ্য দিয়া যত বাস্তব পরিচয় লাভ করিয়াছে, সাহিত্যের কোন গুণ ইহাদের মধ্য দিয়া সেই পরিমাণে কিছুই বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। তবে এই দাবী ইহাদের সম্পর্কে হয়ত ইহাদের রচয়িতাদিগেরও ছিল না।

মধুসূদনের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এক শ্রেণীর ভণ্ড ধর্মধ্বজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বহু নাটক-প্রহসন রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের আর কাহারও মধ্যে জীবনের গভীর কোন অনুভূতির পরিচয় কিংবা বিষয়ের কোন বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বাহিরে ধর্মের ভেক ধারণ করিয়া ভিতরে নৈতিক অনাচার করিবার যে কতকগুলি সুযোগ আছে, তাহা নির্দেশ করা এবং সমাজের এই প্রকার প্রচ্ছন্ন অনাচারীদিগকে দিবালোকে স্পষ্ট করিয়া তোলাই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি রচনা অজাচার (incest)-কে ভিত্তি করিয়াও রচিত হইয়াছিল। সমাজ এবং পারিবারিক জীবনের কোন পাপকেই যে সেদিন গোপন না করিয়া প্রকাশ করিবার প্রবণতা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে হয় ত নীতি এবং রুচিকে অনেক ক্ষেত্রেই আঘাত করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্য দিয়া সে যুগে প্রত্যক্ষভাবে সত্যভাষণের যে দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এক দিক দিয়া প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে। সমাজ এবং পারিবারিক জীবনের এই শ্রেণীর পাপ আজ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহই মনে করিতে পারেন না, কিন্তু আজ আর এমন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। পাপ সমাজ-জীবনের গোপন রন্ধ্রপথ সন্ধান করিয়া লইয়া নিজের কাজ এখনও করিতেছে ; কিন্তু সেকালে যেমন তাহাকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এই বিষয়ে সমাজকে সতর্ক করিয়া দিবার প্রবৃত্তি দেখা যাইত, আজ তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, ব্যক্তির পাপাচরণ সম্পর্কে সেদিন সমাজ যত সতর্ক ছিল, আজ আর তাহা নাই। নাগরিক সমাজ আজ ইহার পরিপূর্ণ পরিচয় লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সে যুগের কলিকাতার সমাজ-জীবনে তখনও পল্লীর সমাজ-সংস্কার একেবারে দূর হইয়া যাইতে পারে নাই।

অজাচার বা incest-এর বিষয় অবলম্বন করিয়া সে যুগে যে একখানি নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহা কালীপদ ভাদুড়ী প্রণীত 'গুণের শ্বশুর'। ইহা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং নাটকখানি জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল

বলিয়া মনে হয়। ইহার জনপ্রিয়তা লাভ করিবার আর একটি কারণ হয়ত এই যে, ইহা কোন প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত। গ্রন্থখানির আলোচনা করিতে গিয়া ***Calcutta Gazettee*** মন্তব্য করিয়াছিল যে, ইহা 'probably a personal attack.' ইহার কাহিনীটি এই, —

বিশ্বনাথ তাঁহার দুই পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিয়াছেন, পুত্রবধূদিগের সম্পর্কে তাহার একটু complex সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি শ্বশুর হইয়াও সর্বদাই অন্তঃপুরে তাহাদের সান্নিধ্যে বাস করিতে ভালবাসেন। বিশ্বনাথের পিতার নাম রুইদাস, তিনিও জীবিত আছেন। তাঁহারও চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় কাহারও অবিদিত ছিল না।

অন্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে দ্বিপ্রহরে যখন তাস খেলা চলে, তখন বিশ্বনাথ দিবানিদ্রার আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে আসিয়া প্রবেশ করেন এবং পুত্রবধূদিগের সঙ্গে তাস খেলার সঙ্গী হইতে চাহেন। বধূরা স্বভাবতঃই লজ্জা পায়, কিন্তু তিনি বলেন, 'কেন লজ্জা কি, সাহেবদের বৌরা "বলেতে" তা'দের শ্বশুরের স্বমুখে নাচে, এ'সব নির্দোষ আমোদ, এতে দোষ কি?' কিন্তু বাড়ীর সকলেই কর্তার এই নির্লজ্জতা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসে। পত্নী হৈমবতীকে বিশ্বনাথ একটু ভয় করেন, কারণ, তাহার নিকট তাহার দৌর্বল্যের কথা অবিদিত ছিল না। ক্রমে এই দুর্বলতার কথা বিশ্বনাথের কন্যাও জানিতে পারিল, একদিন বলিল, 'বাবার জলখাবার সময় বড়-বৌ কাছে না থাক্‌লে বাবার জল খাওয়া হয় না, বাড়ীর ঝি বলিল, 'আর কদিন পরে হয়তো বড় বৌর বাতাস না পেলে বাবুর ঘুম হবে না।' বড় বৌর প্রতিই বিশ্বনাথের দুর্বলতার বিষয় আর কাহারও গোপন রহিল না। হৈমবতী তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিলেন। একদিন বড় বৌর প্রতি বিশ্বনাথের অশিষ্ট আচরণ চোখে দেখিতে পাইয়া ঝির সাহায্যে বড় বৌকে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া দিয়া আসিলেন; মনে করিলেন, ইহাতে স্বামীর চরিত্রের সংশোধন হইবে। কিন্তু তাহাতেও কিছুই হইল না। মেজ বৌয়ের প্রতি এইবার তাহার দৃষ্টি ন্যস্ত হইল। আর একটি পুত্রেরও বিবাহ দিলেন এবং নোতুন বৌ-এর প্রতিও অনুরূপ আচরণ করিতে চাহিলেন। নূতন বধূ তাহা বুঝিতে পারিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ ঘটাইল।

বিশ্বনাথের পুত্র কিশোরীও পিতার উপযুক্ত সন্তান। সে সদ্য বিবাহ করিলেও মেজ বৌদির প্রতি পূর্ব হইতেই অনুরক্ত। পত্নী তাহা একদিন নিজের চোখে দেখিয়া তাহাকে লইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ

একদিন মেজ বৌর প্রতি নিজের আসক্তির কথা প্রকাশ করিতে গিয়া পত্নীর হস্তে ধরা পড়িলেন এবং সম্মার্জনীর আঘাতে জর্জরিত হন। শ্বশুরের নিকট হইতে প্রেম-পত্র পাওয়ার অপমানে ছোট বৌ আত্মঘাতিনী হইল। কিন্তু তাহাতেও বিশ্বনাথের কোন শিক্ষা হইল বলিয়া বোধ হইল না।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই কাহিনী সমসাময়িক কোন পরিবারিক জীবনের সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণের ফলে রচিত হইয়াছে। সেইজন্য সামাজিক উত্তেজনার জন্যই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া হয়ত সম্ভব, ইহার অন্তর্নিহিত কোন সাহিত্যগুণের জন্য তাহা তত সম্ভব নহে, কারণ, সাহিত্যগুণ ইহাতে কিছু নাই, ইহা প্রধাণতঃ চিত্রধর্মী রচনা এবং চিত্রগুলিও যে অতিরঞ্জিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই প্রকার সমসাময়িক নৈতিক ব্যভিচারমূলক অনেক সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া সে যুগে বহু প্রহসন রচিত হইয়াছিল। এই বিষয়ক একটি প্রহসনের নাম 'মক্কেল মামা' (১৮৭৮), রচয়িতার নাম নটবর দাস। কলিকাতা হাইকোর্টে সমসাময়িক কালে মাতুল এবং ভাগিনেয়ীর সম্পর্কিত একটি ব্যভিচারের মোকদ্দমা চলিতেছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। অনুরূপ বিষয়ক আর একটি নাটকের নাম 'মামা ভাগ্নীর নাটক' (১৮৭৮), রচয়িতার নাম মহেশচন্দ্র দাস দে। ইহাদের মধ্য দিয়া সেকালের নাগরিক সমাজের যে জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতেই ইহাদের মূল্য।

নৈতিক ব্যভিচারমূলক সমসাময়িক একটি ঘটনা ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করিয়া গিয়াছে, তাহা তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি ও এলোকেশীর বৃত্তান্ত, ইহার বিষয়টি অবলম্বন করিয়া সেকালে অগণিত নাটক প্রহসন রচিত হইয়াছিল। ইহা একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিবার জন্যই এই বিষয়ক নাটক-প্রহসনগুলিও সহজেই প্রচার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই বিষয়ক প্রকৃত ঘটনাটি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এই,—

হুগলী জিলার ঘোলা গ্রামের অধিবাসী নীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন, পত্নীর নাম মন্দাকিনী। প্রথম পক্ষের একটি কন্যা ছিল, তাহার বিবাহ হইয়াছে, স্বামীর নাম নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নবীন স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রাখিয়া কলিকাতার এক ছাপাখানায় চাকুরি করে। পত্নীর নাম এলোকেশী। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এবং মন্দাকিনীর সহযোগিতায় এলোকেশী তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজ মাধব গিরির সঙ্গে

ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। নবীন একদিন ঘোলা গ্রামে আসিয়া তাহার স্ত্রী সম্পর্কে এই কথা জানিতে পারে। স্ত্রীকে সে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু মোহন্ত মহারাজের চক্রান্তে কোন পাল্‌কি, ডুলি কিংবা অন্য কোন যান-বাহন পায় না, হাঁটিয়া লইয়া যাইতেও সাহস পায় না; কারণ, মোহন্তের আদেশে তাহার লোক সর্বত্র সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে, যাহাতে এলোকেশীকে গ্রামান্তরে লইয়া যাইতে না পারে। নিরুপায় হইয়া নবীন এলোকেশীকে নিজ হস্তে দা দিয়া কাটিয়া হত্যা করে, তারপর পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই লইয়া বিচারের পর নবীনের দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং বিবাহিতা নারীর সঙ্গে ব্যভিচারের অপরাধে মাধব গিরির তিন বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়।

এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্র এবং সভা সমিতিতে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই বিষয় লইয়া বাংলায় নাটক ও প্রহসন রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন কি, অমৃতলাল বসুর 'স্মৃতিকথা' হইতে জানিতে পারা যায়, বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলি এই কাহিনীমূলক নাটকের অভিনয় করিয়া নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন, 'বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় চল্‌ছে, কিন্তু জম্‌ছে না, শেষে বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন; মোহন্ত মহারাজ এক ষোড়শী যাত্রী এলোকেশীর রূপে মোহিত হলেন, এলোকেশীর স্বামী পত্নীবধ করলেন, কে একজন বাঙ্গালী (কৃশ্চান বোধ হয়) "মোহন্তের এই কি কাজ?" বলে নাটক লিখলেন। সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়্‌ল। আমি আর নগেন উপরি উপরি দু'রাত্রি টিকিট কিন্‌তে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এ'লাম। মাইকেলের পরামর্শে নারী একট্রেস্ নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহন্ত শত শত লোক ফিরে দিতে লাগল (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)।

এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক প্রহসন এবং বটতলার ছাপা কাহিনীমূলক গদ্য রচনা সেদিন যে কত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। নাটকীয় কাহিনী-পরিকল্পনায় এলোকেশীর হত্যাদৃশ্যের একটি বাস্তব রূপ যেমন অনেক সময় দেখাইবার প্রয়াস দেখা যায়, তেমনই মোহন্তর জেলের মধ্যে ঘানি টানিবার একটি দৃশ্যও অনেক সময় পরিবেষিত হইয়াছে। এমন কি অপ্রাসঙ্গিকভাবে হইলেও অমৃতলাল বসু তাঁহার 'চোরের উপর

বাটপাড়ি' প্রহসনে (১৮৭৬) মোহন্তের প্রসঙ্গ যোগ করিয়াছেন। কোন কোন প্রহসনের মধ্যে নবীন খালাস পাইয়াছে বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। পাপাচরণে লিপ্ত বলিয়া এলোকেশী তাহার উপযুক্ত শাস্তি স্বরূপই মৃত্যুবরণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার শাস্তি দিতে গিয়া নবীনের যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে, ইহা দর্শকগণ সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া সে মুক্তিলাভ করিয়াছে; তাহা উল্লেখ করিয়া কাহিনীর একটি মিলনাত্মক পরিণতি নির্দেশ করা হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত এই কাহিনী সম্পর্কে অমৃতলাল তাঁহার উক্ত প্রহসনের একটি চরিত্রের মুখে বলিয়াছেন—

নারায়ণ। নবীনকে টেম্পল সাহেব দয়া করে খালাস দিয়েছেন। এখন সিম্‌লে কোন বাবুদের বাড়ীতে আছে।

কাঙ্গালী। হাঁ গা, লবীন, লবীন লবীন। লবীনটি কেমন?

নারায়ণ। কেমন আর, তুমি আমি যেমন। যা হোক একটা হুজুক ক'রে অনেকে অনেক পয়সা রোজগার কর্‌লে। বিশেষ বটতলার বইওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালারা।

কাঙ্গালী। হাঁ ঠিক ঠিক, আমি একবার চারি আনার এক টিকিট করে ব্যাঙ্গোলে 'মোহান্ত নাটক' দেখে এসেছি। আঃ ভ্যালা যা হোক, এলোকেশীকে কেটে লবীন যা কল্লে, রক্তে রক্তপাত। চরকি ঘুরে পাগল হ'লো। সেইখানি, বাবু, আমার বড় ভাল লেগেছিল।

নারায়ণ। আমি ও সব দেখেছি, আমার ফ্রি-টিকিট ছিল। মোহান্তের রামায়ণ পর্যন্ত দেখেছি—মোহান্তের 'সাতকাণ্ড'। সে দিন যে মোহান্তর ঘানি করেছিল, বহুত আচ্ছা, কোথা লাগে গ্রেট্ ন্যাশন্যালের 'সতী কি কলঙ্কিনী'।

তারকেশ্বরের মোহন্ত সংক্রান্ত উপরোক্ত বৃত্তান্তের মূল বিষয় প্রায় অবিকৃত রাখিয়া খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক কল্পিত তথ্য যোগ করিয়া বহু নাটক-প্রহসন সে যুগে রচিত হইয়াছিল। তবে এ কথাও সত্য, মোহন্তের সমর্থকও একটি দল ছিল, তাহারাও কয়েকখানি প্রহসন রচনা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছে যে, মোহান্ত নির্দোষ,কেবলমাত্র মোহন্তের পদ লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে দিন শ্যামগিরির এবং অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসিদিগের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই ষড়যন্ত্রক্রমে মাধবগিরিকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে

এই মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর নাটক-প্রহসন জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই।

তারকেশ্বরের মোহন্তর বিষয় অবলম্বন করিয়া সমসাময়িক কালে যে সকল নাটক-প্রহসন রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রচিত তারকেশ্বর নাটক' অর্থাৎ 'মোহান্ত লীলা' (১ম খণ্ড, ১৮৭৩) লক্ষ্মীকান্ত দাস রচিত 'মোহান্তের এই কি কাজ' (১৮৭৩, ৭৪), যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ 'রচিত মোহান্তের এই কি দশা' (১৮৭৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মোহন্ত-এলোকেশীর বৃত্তান্ত যে নাটকীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, তবে সকলেই যে ইহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও সত্য নহে, অনেকে তাহাদের রচনার মধ্য দিয়া ধর্মধ্বজী ভণ্ডের বিরুদ্ধে মনের জ্বালা জুড়াইতে গিয়া কাহিনীর সত্যতা হইতে অনেকখানি দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছেন, তবে মূল কাহিনীর কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তারের ফলে অন্যান্য সামাজিক কু-প্রথা হ্রাস পাইয়া গেলেও নৈতিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত যে বাংলার সমাজ হইতে হ্রাস পাইয়াছে, তাহা নহে। কারণ, ইহা ব্যাপকভাবে সামাজিক কু-প্রথার পরিবর্তে ব্যক্তিগত দুর্বলতা মাত্র—সমাজের চিন্তাধারার উত্থান-পতনের সঙ্গে ইহার যোগ যে খুব নিবিড়, তাহা নহে। বিংশতি শতাব্দীর সমাজে নৈতিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তবে তাহার প্রণালী সূক্ষ্মতর হইয়াছে। একদিন কলিকাতার নাগরিক জীবনেও যতটুকু সংহতি ছিল, তাহার ভিতর দিয়া ইহা সহজেই সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিত এবং সেই উত্তেজনার ভাব নাটক প্রহসন রচনার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিত। কিন্তু আজ সভ্য নাগরিক সমাজ-জীবন আরও শিথিলবদ্ধ হইয়াছে —সেই পরিমাণেই সমাজের এই বিষয়ে জাগ্রত কৌতূহলের অবসান হইয়াছে। নৈতিক ব্যভিচার সংক্রান্ত কোন ঘটনা যখন আজ আদালতের মধ্যে গিয়া পৌঁছায়, তখন দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার সুবিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় এবং সেই দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণী হইতেই সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া থাকে। এই বিষয়ক নাটক-প্রহসনের সাহিত্যগুণ যেমন নাই, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণীতেও তাহা নাই, সুতরাং উভয়েই এই বিষয়ে অভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেইজন্য একদিন নাটক-প্রহসনের মধ্য দিয়া সমাজের যে উত্তেজনা প্রশমিত হইত, আজ এই সকল

বিষয়ে সমাজের সেই কৌতূহল নাই সত্য, তথাপি যতটুকু আছে ততটুকু সংবাদ পত্রের প্রকাশিত বিবরণী হইতেই নিবৃত্ত হয়।

কিছুকাল পূর্বে অবিভক্ত বাংলার একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুই দুইবার আদালতে ব্যভিচারের মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল; তাহা লইয়া সমাজে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সংবাদপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিচারে দুইবারই তাঁহার দোষ প্রমাণিত না হওয়াতে তিনি মুক্তি-লাভ করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে এক উদ্বাস্তু বালিকার সঙ্গে ব্যভিচার করিবার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। তাহাও সংবাদপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিচারে উক্ত কর্মচারী দোষী সাব্যস্থ হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এক জমিদার তাহার সুন্দরী ও শিক্ষিতা পত্নীর বিরুদ্ধে অন্যের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিবার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাব্যবসায়ী তাঁহার এক রোগিণীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হন। এই সমস্ত বিবরণীই সংবাদপত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারিয়া ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রকার বহু ঘটনা প্রত্যহ সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। গুরুত্বের দিক দিয়া তারকেশ্বরের মোহন্তের ঘটনার তুলনায় ইহারা অনেক সময় কম নহে, কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে লইয়া পূর্বে যে পরিমাণ সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি হইত, আজ আর তাহা হয় না। কারণ, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সমাজের সম্মুখে একটি বলিষ্ঠ নৈতিক আদর্শ বর্তমান ছিল, তাহার সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলেই সমাজ সচেতন হইয়া উঠিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইত। বিংশ শতাব্দীতে সমাজের নীতি এবং দুর্নীতি বলিয়া আর কিছু নাই, বিশেষতঃ কলিকাতার নাগরিক জীবন ক্রমে এত শিথিলবদ্ধ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে যে, আজ আর প্রতিবেশীরও পরিচয় রাখিবার জন্য কেহ কোনও ঔৎসুক্য দেখাইবার প্রেরণা পায় না; সুতরাং প্রতিবেশী কি করে না করে, তাহার কোন্ আচরণ নীতি এবং ধর্মসম্মত কিংবা কোন্ কাজ তাহার ব্যতিক্রম, তাহা চিন্তা করিবারও প্রয়োজন বোধ করে না। তবে এ কথা সত্য, শিক্ষা-বিস্তারের ফলে সমাজের অন্যান্য বহুমুখী কু-প্রথা যতই লুপ্ত হইয়া যাক্ না কেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, আধিক বয়স্ক অবিবাহিত

স্ত্রী পুরুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে সমাজে ব্যভিচারের নিদর্শন পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। অধিকাংশ বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমাই হয় স্বামীর, নতুবা স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া সূত্র-পাত হয়। অথচ শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া এই সকল পরিবার সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। বরং অল্পশিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্যভিচারের এবং তাহার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত খুব বেশি শুনিতে পাওয়া যায় না।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমি যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি সেখানে যেমন আমার উক্ত বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তেমনি, যেখানে অতি আধুনিক যুগের নাটক অবলম্বন করিয়া বাংলা সামাজিক নাটকের রূপান্তরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, সেখানেও পুর্বোক্ত নৈতিক ব্যভিচারের প্রণালী কি ভাবে সূক্ষ্মতর রূপ লাভ করিয়া জাতীয় দুর্নীতিতে পৌঁছাইয়াছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রেমজ বিবাহ

যে দেশে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতির মত বিবাহ-বিষয়ক নানা কুপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, সে দেশের সমাজে বিবাহের পূর্বে নরনারীর মধ্যে প্রেম-সঞ্চারের কোনও সুযোগই উপস্থিত হইবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না। যে সমাজে পরিণত বয়সে বিবাহ বা adult marriage প্রচলিত আছে, কেবল মাত্র তাহাতেই বিবাহ বিষয়ের স্বাধীনতা বর্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য নাটক এবং উপন্যাস যখন আমাদের দেশে প্রচার লাভ করিতে লাগিল, তখন হইতেই পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের অনুকরণে আমাদের দেশেও অনুরূপ কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক এবং উপন্যাস রচনার প্রবণতা দেখা দিল। ইংরেজি নাটকের মধ্যে সেক্সপীয়রের প্রেম বিষয়ক নাটক *Romeo and Juliet*-ই এই বিষয়ে সে যুগের এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিল। যদিও *Romeo and Juliet* এর মত সামাজিক পরিস্থিতি কোনদিনই আমাদের দেশে ছিল না, তথাপি বিষয়-বস্তুর নূতনত্বের আকর্ষণে ইহার প্রতিই সাধারণভাবে ইংরেজী-শিক্ষিত নাট্য-কারদিগের মন বিশেষ ভাবে ধাবিত হইয়াছিল। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিযুগেই *Romeo and Juliet* নাটকের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ইহার বাংলা অনুবাদ 'চারুমুখ-চিত্তহরা', ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাধা-মাধব কর রচিত 'বসন্ত কুমারী', ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্র নারায়ণ দাস ঘোষ রচিত 'অজয় সিংহ ও বিলাসবতী', ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রোমিও জুলিয়েট' ইত্যাদি নাটকের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত সেক্সপীয়রের অন্যান্য নাটকের মধ্যেও যে সকল ক্ষেত্রে প্রণয়-মূলক বৃত্তান্ত তাহারও অনুকরণ করিয়া সে কালের বাংলা নাটকের বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও পরিণত বয়সে বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সূত্রেই তাহাতে বিবাহ বিষয়ে নরনারীর স্বাধীনতার কথাও

প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, ঋগ্‌বেদের মধ্যেই পুরুর বা উর্বশীর, কিংবা যম-যমীর প্রণয়বৃত্তান্তের মত স্বাধীন প্রেমের নানা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই অনুসরণ করিয়া মহাভারত কিংবা সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও এই বিষয়ের ব্যাপক ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, সংস্কৃত কাব্য-নাটকের কোন আদর্শ অনুসরণ করিয়া বাংলা নাটকে এই বিষয় ব্যবহৃত হয় নাই। প্রধানতঃ ইংরেজি নাটকের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই তাহা বাংলা নাটকে গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে সেক্সপীয়রের যে প্রভাব দেখা যায়, কালিদাস-ভবভূতির সেই প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের উপর ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের যে প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, সংস্কৃত নাটকের সেই প্রভাব ছিল না। বিশেষতঃ প্রকৃত স্বাধীন প্রেম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সংস্কৃত কাব্য-নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কুমার-সম্ভবে উমার প্রেমের মধ্যে একটি আদর্শগত লক্ষ্য ছিল, রক্তমাংসের দেহাশ্রিত মহাদেব তত লক্ষ্য ছিল না, তাহাতে রক্তমাংসের দেহধারী নরনারীর পারস্পরিক স্বাধীন সম্পর্কের মধ্য দিয়া সেখানে প্রেমের অনুভূতি বিকাশ লাভ করে নাই। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের মধ্য দিয়াই সেই প্রেম বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সুতরাং ইহার মধ্যে যতখানি আদর্শবাদ আছে, ততখানি বাস্তব চেতনা নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্যে ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের অনুরূপ বাস্তব-চেতনা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিতেছিল। সেইজন্য প্রাচীনধর্মী ভারতীয় কাব্য-নাটক অপেক্ষা আধুনিকধর্মী পাশ্চাত্ত্য নাটকই বাংলা নাটকের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, কালিদাসের যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' নাটকে দুষ্মন্তের সঙ্গে আশ্রমকন্যা শকুন্তলার স্বাধীন আচরণের মধ্য দিয়া বিবাহের পূর্বেই প্রণয়ের-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাও যে সে যুগের এই বিষয়ক কোন বাংলা নাটকের লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যাইবে না।

তারাচরণ শিকদার রচিত প্রথম মৌলিক বাংলা নাটকের মধ্যেও বিবাহের পূর্বেই সুভদ্রার মধ্যে অর্জুনের প্রতি প্রেমের বিকাশ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করিয়া ইহা পরিকল্পিত হইলেও ইহার মধ্যেও ভারতীয় জীবনের সংযম শুচি এবং শালীনতার যে অভাব ছিল তাহা অনুভূত হয় না। সুতরাং মহাভারত হইতে প্রণয়ের কাহিনী এখানে গৃহীত

হইলেও পাশ্চাত্ত্য সমাজের রুচি এবং নীতি দ্বারাই ইহার আত্মা গঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। অর্জুনকে প্রথম দর্শনেই সুভদ্রার যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, নাট্যকার তাহা এই ভাবে তাঁহার নাটকে উপস্থিত করিয়াছেন—

(অর্জুনকে দৃষ্ট করিয়া ভদ্রাচিত্ত চঞ্চল হইলে)

সুভ। সত্যভামে, আর আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে বলিও না।

সত্য। কেন ভদ্রে, এ' কথা কহিলে কেন?

সুভ। সখি, আর সে' কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।

সত্য। কেন লো সুভদ্রে তুই হইলি চঞ্চল।
কি হেতু হঠাৎ মন হইল বিকল॥
এই যে আমোদে ছিলি অর্জুনে দেখিতে।
এমন হইলি কেন দেখিতে দেখিতে॥

সুভ। বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়।
অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়।
তোমারে কহিতে আমি লজ্জা নাহি করি।
কি হইল সখি আজি দেখ প্রাণে মরি॥
এখন তোমার কথা হইল স্মরণ।
মিথ্যা নহে কহেছিলে যতেক বচন॥
অর্জুনের বাণ হেরি ত্রিলোকের ভয়।
এবে জানিলাম সত্য মিথ্যা কথা নয়॥

ইহা প্রথম দর্শনজাত প্রেম বলিয়া মনে হইলেও আসঙ্গ-লিপ্সা ব্যতীত আর কিছুই মনে হইতে পারে না। ইহার মধ্যে যেমন সংস্কৃত নাটকের সাত্ত্বিকতা নাই, তেমনই ইংরেজি নাটকেরও প্রেমের বাস্তব ক্রমবিকাশ নাই, ইহা যেন বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের অসংযত আসঙ্গ-লিপ্সা। এমন কি, সুভদ্রাকে প্রথম দর্শন মাত্র অর্জুনেরও এই মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সত্যভামা যখন সুভদ্রাকে লইয়া গোপনে অর্জুনের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন প্রথম সুভদ্রাকে দর্শন মাত্র অর্জুনের যে মনোভাবের উদয় হইল, তাহাকেও যথার্থ প্রেম বলা যায় না।

অর্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্তমানেও কন্দর্পদর্পহারী জনগণ প্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে

কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য! তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীর রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণী নষ্ট করিতেছেন, সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্র ভয়ে ভীত হইয়া তোমার স্মরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জু। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে। —কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্ণাই তোমাদের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে ত্বদীয় কান্তিরূপ কাদম্বিনীসহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন। গ্রহণ কর।

অর্জু। সত্যভামে, তুমি পরদুঃখকাতরা। আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত স্নেহ। তোমার চরণে বিক্রীত থাকিলেও এ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি না। (সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) এস, প্রিয়তমে, আমার দুঃখরাশি নাশ কর। মন্মথ বাণানল আমার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতেছে, এসো স্পর্শ করিয়া শীতল হই।

বাংলা মৌলিক নাটকের ইহাই সর্বপ্রথম প্রেম দৃশ্য (love scene) কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ইহাতে প্রেমাভিব্যক্তির ভাষার যেমন জন্মই হয় নাই, তেমনই যথার্থ প্রেমেরও উমেষ মাত্র দেখা যায় না। প্রথম দর্শনেই নায়ক যেখানে মন্মথ বাণানলে দগ্ধ হইতেছেন, তাহার মধ্যে আর যে ভাবেরই উদয় হোক, প্রেমভাবের উদয় হয় নাই ; সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব তখন পর্যন্ত বাংলার তথাকথিত প্রেম বিষয়ক রচনাকে যে অধিকার করিয়া লইয়াছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ।

প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রেমাখ্যানের অনুসরণ না করিয়াও প্রেমের সাত্ত্বিক পরিচয় রক্ষা করিয়া সর্বপ্রথম যে নাটক রচিত হয় তাহাই মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) নাটক। ইহা সংস্কৃত শৃঙ্গার রসাত্মক নাটকের আদর্শেই সাধারণতঃ রচিত হইলেও পাশ্চাত্ত্য রুচি এবং নীতিবোধের ফলে ইহার চরিত্র এবং নৈতিক আবহাওয়া অনেক উন্নত বলিয়া বোধ হয়। প্রেমজ বিবাহ বিষয়ক ইহাকে প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা যাইতে পারে, তবে শৃঙ্গার রসাত্মক সংস্কৃত নাটকই মূলত ইহার আদর্শ ছিল।

যযাতি-শর্মিষ্ঠার কাহিনী সর্বজন-পরিচিত। তাহা হইলেও মধুসূদন তাঁহার নাটকে ইহার যে অংশটুকু ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম :—

দৈত্যরাজের কন্যা শর্মিষ্ঠা একদিন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানির সঙ্গে কলহ করিয়া তাঁহাকে এক কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। চন্দ্রবংশের রাজা যযাতি তাঁহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করিলেন। শুক্রাচার্য তাঁহার একমাত্র কন্যা দেবযানিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দেবযানির প্রতি শর্মিষ্ঠার আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। অবশেষে দৈত্যরাজের অনেক অনুনয়-বিনয়ে এই সর্তে তিনি তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন যে, রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানির পরিচারিকা হইয়া থাকিবেন। শর্মিষ্ঠা রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া শুক্রাচার্যের আশ্রমে গিয়া দেবযানির পরিচারিকার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম দর্শনের পর হইতেই যযাতি ও দেবযানি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। শুক্রাচার্য কন্যার মনোভাব জানিতে পারিয়া যযাতির হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। পরিচারিকা শর্মিষ্ঠাকে সঙ্গে লইয়া দেবযানি স্বামি-গৃহে গেলেন। দেবযানির দুই পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কিছুদিনের মধ্যেই যযাতি ও শর্মিষ্ঠা উভয়েই উভয়ের প্রণয়াসক্ত হইলেন। গোপনে গান্ধর্ব প্রথায় তাহাদের বিবাহ হইল। ক্রমে শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অবশেষে একদিন দেবযানি শর্মিষ্ঠা ও যযাতির বিবাহের কথা জানিতে পারিয়া উভয়কে কঠোর তিরস্কার করিলেন এবং ক্রোধবশতঃ স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়া পিতার নিকট স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা ব্যক্ত করিলেন। শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, শর্মিষ্ঠার সন্তান পুরুর যৌবনের সঙ্গে নিজের জরার বিনিময় করিয়া লইলেন। পুরুর আত্মত্যাগে মুগ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য তাঁহার মাতা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানির দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। দুই সপত্নীতে বিরোধের অবসান হইল। যযাতি দুই রাজ্ঞীকে লইয়া দীর্ঘকাল সুখভোগে জীবন অতিবাহিত করিলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে প্রকৃত নাট্যিক ঘটনার সমাবেশের প্রচুর অবকাশ ছিল। অথচ নাট্যকার তাহাদের একটিরও সদ্ব্যবহার করেন নাই। ইহাই এই নাটকের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি। নাট্যিক ঘটনাসমূহ চরিত্রগুলির বিরক্তিকর

দীর্ঘ স্বগতোক্তি অথবা অনাবশ্যক কথোপকথনের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে; রঙ্গমঞ্চের উপর ঘটনাগুলির সক্রিয় সংঘটনের প্রয়াস দেখা যায় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল দৃশ্যে শুধু পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিয়া কাহিনীর অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকটি স্থলই অপূর্ব নাট্যিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। মধুসূদনের জীবনচরিতকার ইহাদের প্রথমটির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 'দৈত্য-সভামধ্যে শর্মিষ্ঠার প্রতি দৈত্যরাজের নির্বাসনদণ্ডাজ্ঞা শর্মিষ্ঠা উপাখ্যানের একটি উৎকৃষ্ট নাটকোচিত অংশ। সহিষ্ণুতায় এবং ধৈর্যে মহাভারতকার শর্মিষ্ঠাকে তথায় প্রকৃত দেবীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পিতার কঠোর আদেশে, এমন কি গর্বিতা দেবযানির ব্যঙ্গেও তাহার ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই। শর্মিষ্ঠা নাটকে এই অংশ পরিত্যাগ করাতে, শর্মিষ্ঠার চরিত্র পরিস্ফুটনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।' ইহা ছাড়াও দেবযানি কর্তৃক যযাতি-শর্মিষ্ঠার প্রণয় ব্যাপারের উদ্ঘাটন, শুক্রাচার্যের অভিশাপ পুত্রের যৌবন ভিক্ষা ইত্যাদির মত উৎকৃষ্ট নাটকীয় অংশও ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎ-পরিবর্তে এই সকল বিষয়ক কতকগুলি পরোক্ষ উক্তি শুনিয়াই দর্শকদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছে।

এই ত্রুটির মূল কারণ, সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ। ইহার পূর্বে যে কয়েকখানি বাংলা নাটক বিদ্বৎ-সমাজে একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, যেমন 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' ও 'রত্নাবলী' তাহাদের প্রত্যেকটিই সংস্কৃত রীতি ও আদর্শেই লিখিত হইয়াছিল এবং ইহাতে সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাসই সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাংলা নাটক রচনায় সংস্কৃত রীতি একেবারেই অপরিহার্য। মধুসূদন যখন বাংলা নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন তিনি অন্তরে অন্তরে সংস্কৃত রীতির অনুসরণের অযৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, বাহ্যতঃ এই বিশ্বাস তাঁহার এই প্রথম রচনার মধ্যে কার্যকর করিয়া তুলিতে পারিলেন না। তিনি বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য রীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী হইলেও, বাংলা নাট্যরচনার সমসাময়িক প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহার আরও একটি কারণ ছিল—'শর্মিষ্ঠা'ই তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা; ইহার সার্থকতার উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল;

সেইজন্য যাহাতে ইহা তদানীন্তন বাংলা নাট্য-দর্শকদিগের নিকট একেবারেই অনাদৃত না হয়, সেই বিষয়েও তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য আদর্শের প্রেরণা সমগ্র অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াও, তিনি তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ নাটক রচনার জন্যই রাখিয়া দিলেন, 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় পরিচিত প্রথাই অবলম্বন করিলেন।

কেহ কেহ মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সত্য নহে। ইহার রচনায় পাশ্চাত্ত্য আদর্শের কোন প্রত্যক্ষ ও কার্যকর প্রভাব অনুভব করা যায় না। সংস্কৃত নাটকই ইহার একমাত্র আদর্শ ছিল। গ্রন্থের সূচনায় কাহিনীর অবান্তর অংশ নান্দী এবং নটী-সূত্রধরের কথোপকথন পরিত্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের নিদর্শন বলা যায় না। কারণ, অনেক পাশ্চাত্ত্য নাটকেও অনুরূপ অংশের সহিত যেমন পরিচয় লাভ করা যায় (সেক্সপীয়র প্রণীত 'রোমিও জুলিয়েট' ও গেটে প্রণীত 'ফাউস্টে'র prologue তুলনীয়), তেমনই কোন কোন সংস্কৃত নাটকেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাসের সংস্কৃত নাটকে নান্দীর ব্যবহার নাই। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ীই শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী মিলনান্তক ও শৃঙ্গার-রসাত্মক হইয়াছে। যদিও ইতিপূর্বেই এদেশে ইউরোপীয় ধরণের মঞ্চ-সজ্জা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তথাপি মঞ্চোপকরণের অভাব পূরণার্থে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ রহিয়াছে, ইহাতেও তাহাদের প্রায় কোনটিরই ব্যতিক্রম হয় নাই। এইজন্যই প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে যোদ্ধৃবেশী দৈত্যের দীর্ঘ স্বগতোক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয় কালে দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, প্রমুখ যে সব ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইংরেজি আদর্শে উৎকৃষ্ট নাট্যিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী অপ্রিয় দণ্ডাদেশ বা কোন অভিশাপ ইহার অভিনয়-কালে উচ্চারিত হয় নাই। সংস্কৃত নাটকের নিপুণিকা চতুরিকাই এখানে পূর্ণিকা দেবিকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এখানেও রাজ-বয়স্য লড্ডুক-প্রিয় মাধব্য নামক বিদূষক। এমন কি, নিম্নলিখিত অংশগুলি কালিদাস কৃত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র অনুবাদ বলিয়া ধরিয়া লইতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না;—

রাজা।...এ কি, আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগল কেন। এ স্থলে

মাদৃশ জনের কি ফলাফল হতে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে। (৩।৩)

(নেপথ্যে)—রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন গো? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য? (৪।৩)

তারপর ইহার মধ্যেও সর্বত্রই সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী প্রবেশী চরিত্র সম্বন্ধে দৃশ্যস্থ চরিত্র কর্তৃক পূর্বেই পরিচয় প্রদানেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক সম্বন্ধে সহজে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে সংস্কৃত নাট্য-রীতির কোনই ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব ইহা মধুসূদনের রচনাবলীর মধ্যে স্থান পাইলেও, ইহা হইতে তাঁহার মৌলিক প্রতিভার কোন নিদর্শন উদ্ধার করা সম্ভব নহে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের যে সকল ত্রুটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ইংরেজি আদর্শ অনুযায়ী ত্রুটি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, মধুসূদনের তদানীন্তন আদর্শ, অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্যরচনার আদর্শ অনুযায়ী সর্বত্রই ত্রুটি বলিয়া স্বীকার্য নহে। শেষ যুগের শৃঙ্গার-রসাত্মক সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে যে কৃত্রিম গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা দেখা দিয়াছিল, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেরও তাহাই একমাত্র ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, মধুসূদন তাঁহার সর্বপ্রথম নাটকখানির রচনায় উপযুক্ত আদর্শের সন্ধান করিয়া লইতে পারেন নাই।

শেষ যুগের শৃঙ্গার রসাত্মক সংস্কৃত নাটকের মধ্যে বিশেষ একখানি নাটককেই মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার আদর্শরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন—তাহা শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী'। তখনকার দিনে রামনারায়ণ-কৃত সংস্কৃত নাটকের এই অনুবাদখানি সুধীসমাজে যথেষ্ট লোক-প্রীতি অর্জন করিয়াছিল। অতএব একই দর্শক-সমাজের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য লিখিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও তাহার প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিকই হইয়াছে। মধুসূদনের জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন, 'নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপর মধুসূদন তখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। সুতরাং নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে 'রত্নাবলী'কেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। উভয়গ্রন্থে সেইজন্য ভাবগত এবং কোন কোন স্থলে ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষিত হইবে।'

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের মধ্যে কোন চরিত্রই সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

কারণ, ইহাদের সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত নহে। পদে পদে বাহ্যিক আদর্শের বাধা ইহার স্বাধীন সৃষ্টি ব্যাহত করিয়াছে। তথাপি ইহাতে যে দুইটি চরিত্রে নাট্যকার একটু বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ইহার নায়িকা ও প্রতিনায়িকার চরিত্র। তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শর্মিষ্ঠা 'রত্নাবলী' নাটকের সাগরিকা চরিত্রের অনুরূপ সৃষ্টি। উভয়েই রাজকুমারী, কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহাদের মর্যাদা হইতে বঞ্চিতা। তবে শর্মিষ্ঠার এই বঞ্চনার জন্য সে নিজেই দায়ী, সাগরিকার জন্য দায়ী তাহার ভাগ্য-বিধাতা। এই উভয় চরিত্রের মধ্যে এই পার্থক্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। সাগরিকার অনুকরণের মোহে মধুসূদন শর্মিষ্ঠার এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটুকু কোথাও যে বিসর্জন দেন নাই, তাহাই বিশেষ প্রশংসার বিষয়। আত্মকৃত অপরাধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া পিতৃপ্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে শর্মিষ্ঠা সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন। রাজমর্যাদা-সম্ভব আভিজাত্য-বুদ্ধিই তাঁহার হৃদয়-দৌর্বল্যের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং এই সমুচ্চ আত্মমর্যাদা-বোধই তাঁহার বিপুল দুঃখের জীবনে তাঁহার আত্মার অম্লান জ্যোতি অনির্বাণ রাখিয়া চলিয়াছে। দুঃখের ভিতর দিয়া শর্মিষ্ঠার চরিত্র অপূর্ব মহিমময় করিয়া নাট্যকার কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের দুঃসংবাদ লইয়াই এই কাহিনীর আরম্ভ এবং তাঁহার সমগ্র দুঃখভোগের পরিসমাপ্তিতেই কাহিনীর উপসংহার। অতএব তাহার সঙ্গে পাঠকমাত্রেরই সহানুভূতি একান্ত স্বাভাবিক। পূর্বাপর এই সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে নাট্যকার প্রশংসনীয় সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

কাহিনীর প্রতিনায়িকা দেবযানীর চরিত্রের সঙ্গে ইহার নায়িকা-চরিত্র শর্মিষ্ঠার সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেবযানী পরাক্রান্ত তপস্বী শুক্রাচার্যের আদরিণী কন্যা। তিনি জানেন যে, দৈত্যরাজ তাঁহারই পিতার অনুগ্রহ পুষ্ট। অতএব রাজকুমারী শর্মিষ্ঠার দর্পচূর্ণ করিয়া তাঁহার নীচ প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয়। শুক্রাচার্য কন্যাকে স্নেহ দিয়া পালন করিয়াছেন, শিক্ষা দিয়া বর্ধিত করেন নাই, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ দেবযানির ভবিষ্যৎ চরিত্র যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা শর্মিষ্ঠা চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয় চরিত্রের এই বৈপরীত্য দ্বারাই কাহিনীর নাট্যিক গুণ সৃষ্ট হইয়াছে। শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু যখন তাহার যৌবন দান

করিয়া যযাতিকে জরামুক্ত করিল এবং শুক্রাচার্য স্বহস্তে শর্মিষ্ঠার কর যযাতির হস্তে অর্পণ করিলেন, তখনও রাজা দেবযানির অনুমতির অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য। (দেবযানির প্রতি) কেমন প্রিয়ে! তুমি কি বল?'

দেবযানি শর্মিষ্ঠার প্রতি রাজার পূর্ব ব্যবহারের ইঙ্গিত করিয়া তখনও বলিলেন,—

'রাজ্ঞী। (সহাস্য মুখে) নাথ। এতদিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?'—৫।২

এইখানে দেবযানির চরিত্রটি একটু বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। যযাতির চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্যই নাই, ইহা সংস্কৃত শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটকের নায়কের আদর্শে রচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রও বৈশিষ্ট্য-বর্জিত।

'শর্মিষ্ঠা' নাটক যখন রচিত হয়, তখনও বাংলা নাট্যসাহিত্যে পণ্ডিতি বাংলার অপ্রতিহত প্রভাব। 'আলালের ঘরের দুলাল' মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের বিষয়বস্তু আলালী ভাষায় প্রকাশের অনুকূল নহে। সেইজন্য 'শর্মিষ্ঠা'র ভাষায় মধুসূদন নূতন কোন পথের সন্ধান পাইলেন না, প্রচলিত পুরাতন রীতিরই অনুসরণ করিলেন মাত্র। বাংলায় নাট্যোপযোগী ভাষার তখনও জন্ম হয় নাই, অথচ মধুসূদনও সদ্য মাত্র সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন - তখন পর্যন্তও সংস্কৃত ও বাংলায় সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইতে পারেন নাই। সেইজন্য প্রচলিত নাট্যিক ভাষা অপেক্ষা তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা'র ভাষা কোন কোন স্থানে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সকল অপরিহার্য ত্রুটি সত্ত্বেও 'শর্মিষ্ঠা' নাটক তদানীন্তন সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছিল এবং ইহার মধ্য দিয়াই মধুসূদনের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হইল।

দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' (১৮৬৭) নাটকখানিই সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের আদর্শে রচিত প্রেমজ বিবাহ-বিষয়ক নাটক, কিন্তু অন্যান্য বিভিন্নমুখী বহু ঘটনার আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা বিস্তারের মধ্যে ইহার মূল প্রেমের কাহিনীটি কোথায় গৌণ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কাহিনীর পরিণতিটি মূল ধারা অনুসরণ করিয়াই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কাহিনীটি এই প্রকার—

বিপত্নীক জমিদার হরবিলাসের এক পুত্র ও দুই কন্যা ; পুত্রের নাম অরবিন্দ এবং কন্যা দুইটির মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম তারা এবং কনিষ্ঠার নাম লীলাবতী। হরবিলাস প্রথম বয়সে কাশীতে বাস করিতেন। তারা যখন নিতান্ত বালিকা তখন এক দাসী তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া এক ধনী হিন্দুস্থানীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। তাহার আর কোন সন্ধান নাই। ক্ষীরোদবাসিনী অরবিন্দের স্ত্রী। একদিন অরবিন্দ এক দাসীকন্যাকে স্ত্রীভ্রমে আলিঙ্গন করিতে গিয়া অপ্রস্তুত হন এবং অনুতাপে গৃহত্যাগ করেন। শুনা যায় তিনি আত্মঘাতী হইয়াছেন। লীলাবতী শিক্ষিতা ও সুন্দরী, গৃহে সেই তাহার পিতার একমাত্র অবলম্বন। হরবিলাস তাহার গৃহে লালিতমোহন নামক একটি বালককে শিশুকাল হইতেই পুত্র স্নেহে প্রতিপালিত করিতেছিলেন, সে এখন উচ্চশিক্ষিত এবং উদার মতাবলম্বী। হরবিলাস ললিতকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এক মূর্খ চরিত্রহীন কুলীন সন্তানের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ স্থির করিয়াছেন। লীলাবতী ললিতমোহনকে ভালবাসিত ললিতও লীলাবতীকে বাল্য হইতেই ভালবাসিয়া আসিয়াছে। সকলে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, কিন্তু হরবিলাস কুলীনে কন্যাদান এবং ললিতকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। ইতিমধ্যে একদিন ললিত গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই এক ব্রহ্মচারী আসিয়া হরবিলাসকে সংবাদ দিল যে অরবিন্দ জীবিত আছে, শীঘ্রই সে গৃহে ফিরিব, এই অবস্থায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা যেন তিনি অন্ততঃ এক মাসের জন্য স্থগিত রাখেন। ললিতের গৃহত্যাগের পর হইতেই হরবিলাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যোগজীবন নামক এক সন্ন্যাসী আসিয়া একদিন পরিচয় দিল যে, সে-ই অরবিন্দ, কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দ বলিয়া সে গৃহীতও হইল, ক্ষীরোদবাসিনীও তাহাকে স্বামী বলিয়া নিজের কক্ষে গ্রহণ করিল। হরবিলাস পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে নদের চাঁদ আসিয়া প্রচার করিয়া দিল যে, যোগজীবন প্রকৃত অরবিন্দ নয়, পোষ্যপুত্র গ্রহণ স্থগিত করিবার জন্য ক্ষীরোদবাসিনীর সহযোগিতায় ললিতমোহন এই জাল অরবিন্দকে আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। হরবিলাস ললিতের উপর সন্দিগ্ধ হইলেন। ইতিমধ্যে ললিতের সঙ্গে প্রকৃত অরবিন্দের কাশীতে সাক্ষাৎ হইল, অরবিন্দ বার বৎসর গৃহে ফিরিবে

না প্রতিজ্ঞা করিয়া কাশীতে এক কলেজে শিক্ষকতা করিতেছিল ; বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া ললিতকে সঙ্গে লইয়া সে গৃহে ফিরিয়া আসিল, ফিরিয়া দেখিতে পাইল, এক জাল অরবিন্দ তাহার গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। কে জাল ও কে প্রকৃত ইহার মীমাংসা হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল উভয়েই প্রকৃত অরবিন্দ বলিয়া দাবী করিতে লাগিল। অবশেষে জাল অরবিন্দ তাহার পরিচয় দিয়া বলিল যে, সে প্রকৃতপক্ষে যোগজীবন নামক সন্ন্যাসী—অরবিন্দকে সে পূর্বে তীর্থস্থানে দেখিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাহার দুইবার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। অরবিন্দ তাহাকে চিনিল, কিন্তু এখন সমস্যা দাঁড়াইল ক্ষীরোদবাসিনীকে লইয়া ;—সে তিন চার দিন যোগজীবনকে স্বামীজ্ঞানে তাহার সঙ্গে বাস করিয়াছে, অতএব সে ধর্মে পতিত হইয়াছে। এতক্ষণে যোগজীবন তাহার প্রকৃত রূপ ধারণ করিয়া দেখাইল যে, সে স্ত্রীলোক ; সকলে চিনিল, সে-ই চাঁপা—হরবিলাসের ঔরসজাত এক দাসীর কন্যা। ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বে আর কাহারও কোন সংশয় রহিল না। এদিকে দেখা গেল, বিপত্নীক জমিদার ভোলানাথ চৌধুরী অপহৃতা তারাকে অহল্যা নামে পরিচয় দিয়া বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়া তুলিয়াছেন—যোগজীবনরূপিণী চাঁপার চেষ্টাতেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। সকলের মিলন হইল, শুভলগ্নে ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হইয়া গেল।

কাহিনীটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা অত্যন্ত জটিল ; প্রণয় বৃত্তান্তটি ইহাতে গৌণ হইয়া পড়িয়া এবং কতকগুলি নিরুদ্দিষ্ট ও অদৃশ্য চরিত্রের উপর কেন্দ্র করিয়া কাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে—এই অদৃশ্য চরিত্রগুলিই দৃশ্য চরিত্রগুলির ভাগ্য ও নাট্যিক পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ; ইহার মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিক পরিকল্পনাও আছে, তাহাদের মধ্যে চাঁপার চরিত্রটিই প্রধান। দেখা যাইতেছে, সে যুবতী হইয়া সন্ন্যাসী পুরুষের ছদ্মবেশে উড়িষ্যা হইতে কানপুর পর্যন্ত সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে, লোকের অশেষ হিতসাধন করিয়াছে, অবশেষে ঠিক সময়মত পুরুষের ছদ্মবেশেই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কাহিনীর শুভ পরিণতির মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরিচয়টিও একটু অসাধারণ, সে জমিদারের ঔরসজাত বলিয়া স্বকীত এক দাসীর গর্ভজাত কন্যা ; প্রকৃতপক্ষে তাহার দ্বারাই সমগ্র কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, অথচ নাট্যকাহিনীর একমাত্র শেষাঙ্ক ব্যতীত তাহাকে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এই নাটকের মধ্যে ললিত ও লীলাবতীর যে প্রণয়ের বৃত্তান্তটি আছে, তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে বিস্তৃতভাবেই উল্লেখযোগ্য —

'হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি (ইহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত)। ইংরাজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে, ইংরাজকন্যার জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক নভেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই সেই সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত আদর্শ ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পাবে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই -স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।'

নাটকের মধ্যে কতকগুলি প্রসঙ্গ ও চরিত্র নিতান্তই অনাবশ্যক— যেমন, অহল্যা বা তারার চরিত্র এবং তাহার অপহরণ ও পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ, ইহাদের সহিত মুল নাট্যকাহিনীর কোন যোগ অনুভব করা যায় না।

এই নাট্যকাহিনীর আর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, অরবিন্দের গৃহত্যাগ ঘটনা দ্বারা ইহা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, যে কারণের উপর ভিত্তি করিয়া অরবিন্দ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে তাহার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। গৃহে বিবাহিতা সুন্দরী ও শিক্ষিতা স্ত্রী এবং পিতার ঐশ্বর্য ফেলিয়া রাখিয়া জমিদার পিতার একমাত্র পুত্র মিথ্যা লোকাপবাদের জন্য পিতৃসংসার হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, তারপর পিতার পোষ্যপুত্র গ্রহণের মুহূর্তে পুনরায় উপস্থিত হইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইত্যাদি ঘটনার

মধ্যে অতিনাটকীয়তা অত্যন্ত প্রকট। চাঁপার গৃহত্যাগের কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ অরবিন্দ ও চাঁপা উভয়েরই একই সময়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার ফলে যে অরবিন্দের দোষস্খালনের আর কোন উপায়ই থাকে না, নাট্যকার সেই দিকটা একেবারেই ভাবিয়া দেখেন নাই। অথচ অরবিন্দের দোষ সম্বন্ধে সকলে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে না পারিলে এই নাটকের শুভ পরিণতি ব্যর্থ হয়। অরবিন্দ বার বৎসর নিরুদ্দেশ থাকিয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিল, তাহা কেবলমাত্র প্রত্যাবৃত্ত অরবিন্দের ও যাহাকে লইয়া কলঙ্ক যোগজীবনবেশিনী সেই চাঁপার মৌখিক কথাতেই প্রকাশ পাইল, চাঁপা পুরুষ সাজিয়া দীর্ঘ বার বৎসর সন্ন্যাসী অরবিন্দকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, অথচ অরবিন্দ তাহাকে চিনিতেও পারে নাই—এই পরিকল্পনাও অতিরিক্ত রোমান্টিক ও পীড়াদায়ক। যেখানে দীনবন্ধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে কেবলমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেখানেই নাট্যকার হিসাবে তিনি ব্যর্থকাম হইয়াছেন। 'লীলাবতী' নাটকের ভিত্তি প্রধানতঃ দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নাটক হিসাবে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে। তবে দুই একটি চরিত্র যে দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাহাও নহে—তাহাদের মধ্যে একটি নদের চাঁদ ও অপরটি হেমচাঁদ, ইহারা দুইটি কুলীন ও মাসতুতো ভাই। জমিদারের শ্যালক শ্রীনাথের চরিত্রটিও এই শ্রেণীর চরিত্রের অন্তর্গত। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, এই চরিত্র কয়টি সমগ্র নাটকের মধ্যে কেমন যেন খাপছাড়া হইয়া আছে, ইহাদিগকে যেন 'সধবার একাদশী'র বাস্তব জগৎ হইতে ধরিয়া ধরিয়া আনিয়া 'লীলাবতী'র স্বপ্নরাজ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এইবার 'লীলাবতী' নাটকের কয়েকটি প্রধান চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহাদের সার্থকতা বিচার করা যাইবে। প্রথমেই জমিদার হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখযোগ্য। হরবিলাস বিপত্নীক, তাঁহার এক পুত্র অরবিন্দ ও দুই কন্যা তারা ও লীলা। হরবিলাস এককালে কাশীতে বাস করিতেন, সেখানে শৈশবে তারা অপহৃতা হয়। চাঁপার জন্মবৃত্তান্ত হইতে হরবিলাসের চরিত্রের একটু আভাস পাওয়া যায়; তাহাতে মনে হয়, তৎকালীন আর দশজন জমিদারের মত তিনি যৌবনে একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, কিন্তু পরিণত বয়সে এই উচ্ছৃঙ্খলতার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কন্যা লীলাবতীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, 'তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই,

কিন্তু কুলীনের নাম শুনলে তিনি সব ভুলে যান।' নাট্যকার এই স্থানেই হরবিলাসের চরিত্র একটু অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। নদের চাঁদের মত পাত্রের সহস্র দোষ জানিয়াও একমাত্র কুলীন বলিয়া তাঁহার একমাত্র স্নেহের কন্যাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে চান। নদের চাঁদের নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা ঝুলিতেছে, সে মূর্খ, নেশাখোর, অভদ্র ইত্যাদি সমস্ত সম্পূর্ণ জানিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়াও তিনি আত্মীয়-স্বজনের সকল পরামর্শ অবহেলা করিয়া তাহার সঙ্গেই লীলাবতীর বিবাহ স্থির করিয়াছেন—ইহা অস্বাভাবিক। কারণ, লীলাবতীকে হরবিলাস যদি প্রকৃতই স্নেহ করেন, তাহা হইলে এই কাজ কদাচ করিতে পারেন না, অথচ লীলাবতীর প্রতি তাঁহার প্রকৃতই যে স্নেহ ছিল; তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তারপর ললিতকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ সম্পর্কেও তিনি একগুঁয়ে হইয়া উঠিলেন—এই বিষয়ে যতই সকলে নিষেধ করিতে লাগিল, ততই যেন তিনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন, অথচ এই ব্যস্ততার তাঁহার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। এইভাবে হরবিলাসের চরিত্রটি নানা দিক দিয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনাথ হরবিলাসের শ্যালক। সংস্কৃত নাটকের রাজ-শ্যালকের চরিত্রের অনুকরণে প্রধানতঃ ইহা পরিকল্পিত হইলেও ইহার মধ্য দিয়াই দীনবন্ধুর মৌলিক প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, সমগ্রভাবে নাটকীয় পরিবেশটি শ্রীনাথের মত চরিত্রের অনুকূল ছিল না বলিয়াই তাহাকে যেন ইহার মধ্যে অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়া মনে হয়। নাটকীয় পটভূমিকার সঙ্গে তাহার কোন যোগ ছিল না, সেইজন্য তাহার চরিত্রের একটি সুসঙ্গত ক্রমবিকাশও ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এই চরিত্রটি দীনবন্ধুর বিশিষ্ট প্রতিভার অনুগামী হইয়াও পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

হেমচাঁদের চরিত্রটি দুই নৌকায় পা দিয়া চলিয়াছে। সে শ্রীনাথের ভাগিনেয়, কুলীন, লেখাপড়া কিছুই জানা নাই, গুলীর আড্ডার সভ্য। কিন্তু সে বিবাহ করিয়াছে ব্রাহ্মসমাজ-ঘেঁসা এক শিক্ষিতা মহিলাকে। এমন বিবাহই যে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, নাট্যকার তাহার আভাস মাত্র দেন নাই; তথাপি বুঝিতে হইবে, যে-কোন উপায়ে তাহা সম্ভব হইয়াছে। স্ত্রীর প্রভাববশতঃই তাহার চরিত্রের মধ্যে ক্রমে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—এই

পরিবর্তনের ধারাটি নাট্যকার অতি কৌশল ও সতর্কতার সঙ্গে দেখাইয়াছেন। এইখানে নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

হেমচাঁদের মাসতুতো ভাই নদের চাঁদ। এই চরিত্রটির মধ্যে দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক 'জামাই বারিকের' পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে। সে কুলীন এবং জমিদার মাতুলের আশ্রিত, নাট্যকার তাহাকে সর্ববিষয়ে লীলাবতীর অযোগ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাকে একটা ভাঁড় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে রক্তমাংসের কোন পরিচয় অবশিষ্ট রাখেন নাই। ইহা লীলাবতীর চরিত্রের উপর নাট্যকারের অতিরিক্ত সহানুভূতিরই ফল বলিতে হইবে—চরিত্রগত বৈপরীত্য সৃষ্টি করিতে গিয়া এখানে একটা কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। লীলাবতীর সঙ্গে বিবাহের অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া মানুষের চরিত্রে যত রকম দুর্গুণ থাকা সম্ভব একধার হইতে সকলই তাহার উপর নাট্যকার আরোপ করিয়াছেন, তাহার ফলে এই চরিত্রটিও দীনবন্ধুর প্রতিভার অনুগামী না হইয়া নাটকের মধ্যে কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে।

এইবার ললিতমোহনের চরিত্র-সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। ললিত-মোহনই প্রকৃতপক্ষে এই মিলনাত্মক নাটকের নায়ক। মানুষের চরিত্রে যত সদ্‌গুণ থাকা সম্ভব, নাট্যকার তাহার উপর প্রায় সকলই আরোপ করিয়াছেন, তাহার ফলে চরিত্রটি বাস্তব ও জীবন্ত না হইয়া একটি আদর্শ চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সে হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত, শিক্ষিত, উদারমতাবলম্বী, সুদর্শন যুবক। তাহার পরিচয়ের মধ্যে একমাত্র এই যে, সে হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত। পোষ্যপুত্র করিবেন বলিয়া হরবিলাস তাহাকে শিশুকালে আনাইয়াছিলেন, কিন্তু বধূমাতা বার বৎসর অপেক্ষা করিবার কথা বলিয়া কান্নাকাটি করায় তাহাকে এতকাল গৃহে রাখিয়া পালন করিতে হইয়াছে। তাহার আর কোন পিতৃমাতৃ পরিচয় নাই, তবে কুল-পরিচয় আছে সে কুলীন নহে, বংশজ, সেই জন্য তাঁহাকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করা সত্ত্বেও হরবিলাস তাহার হস্তে তাঁহার গুণবতী কন্যা লীলাবতীকে অর্পণ করিতে অনিচ্ছুক, বরং তিনি লীলাবতীকে নেশাখোর কুলীন নদের চাঁদের করে অর্পণ করিতে উৎসুক। হরবিলাস ললিতকে পোষ্যপুত্র রাখিতে আগ্রহান্বিত। পিতৃমাতৃপরিচয়হীন পরিণতবয়স্ক যুবককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার কল্পনা একটু বিসদৃশ বিবেচিত হইতে পারে; ললিত পোষ্যপুত্র হইয়া

না থাকিয়া বরং লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া হরবিলাসের জামাতা হইয়া থাকিতে চাহে এবং অরবিন্দের গৃহে প্রত্যাবর্তনের ফলে শেষ পর্যন্ত তাহার এই অভিলাষই পূর্ণ হয়। হরবিলাস তাহাকে পুত্রস্নেহে পালন করিলেও তাহাকে হরবিলাসের সঙ্গে এই নাটকের মধ্যে এমন কোন আচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে মনে হইতে পারে যে, সেও এই স্নেহের মর্যাদা রক্ষা করিয়া হরবিলাসকে পিতার মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। বরং হরবিলাস যখন তাহাকেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা স্থির করিয়া তদানুযায়ী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন একদিন ললিত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল—ইহাতে স্বভাবতঃই হরবিলাস ব্যথিত হইলেন, অবশ্য সে কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিল, ইহাতে হরবিলাসের প্রতি তাহার কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পায় না। তারপর জাল অরবিন্দের আবির্ভাবের ষড়যন্ত্রে হরবিলাস ললিতকেও লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিলেন। এই সকল ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, হরবিলাসের সঙ্গে ললিতের সম্পর্কটি নাট্যকার তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। ললিতকে যথার্থই হরবিলাসের গৃহে প্রতিপালিত ও তাঁহার প্রতি কোন প্রকার ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত বলিয়া মনে হয় না, ইহা ললিত-চরিত্রের প্রধান ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে। শৈশবের খেলাধূলার ভিতর দিয়া যৌবনে উত্তীর্ণ হইবার পথে ললিত ও লীলাবতীর প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া উভয়ের উক্তিতে প্রকাশ। এখন তাহারা পূর্ণ যুবক ও যুবতী এবং পরস্পর সুগভীর প্রণয়াসক্ত, কিন্তু এই আসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে একমাত্র দীর্ঘ ও মামুলী বক্তৃতায়—আত্মত্যাগে, দুঃখভোগ, সেবা কিংবা অন্য কোন কাযের ভিতর দিয়া নহে। সেইজন্য তাহাদের পরস্পর প্রণয়-সূচক মৌখিক বক্তৃতাগুলি যত দীর্ঘই হউক, তাহাতে বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই—তাহার উপর এই প্রণয়ের ক্রমবিকাশের ধারাটি কাহিনীর অন্তরালে রাখিয়া একেবারে তাহার পরিণত রূপটিই নাট্যকার পাঠকের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন বলিয়া ইহার আকস্মিকতাও পাঠককে আঘাত করিতে পারে। ললিতমোহনের সদ্‌গুণাবলীর বিষয়টিও একমাত্র মৌখিক বক্তৃতার উপরই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাও তাহার চরিত্র সম্পর্কে কার্যকরী বলিয়া মনে হয় না। নাট্যকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই চরিত্রটি রূপ লাভ করিতে পারে নাই।

স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে লীলাবতীই প্রধান। লীলাবতীই এই নাটকের নায়িকা। এই চরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা নারী সম্পর্কে দীনবন্ধুর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। তখন স্ত্রী-শিক্ষা এই দেশের সমাজে ব্যাপক হইয়া উঠে নাই, শিক্ষিতা নারী সম্পর্কে দীনবন্ধু ধারণা কল্পনার উপরই স্থাপিত হইয়াছে; আর যেখানে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, সেখানেই দীনবন্ধু ব্যর্থকাম হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার লীলাবতীর চরিত্রটিও কোনদিক দিয়াই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র লীলাবতী ও কামিনীকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছেন, বলা বাহুল্য, এই কামিনী 'নবীন তপস্বিনী'র কামিনী, 'জামাই-বারিকে'র কামিনী নহে। 'লীলাবতী' ও 'জামাই-বারিকে'র কামিনীতে পার্থক্য আছে। লীলাবতী ধনীব শিক্ষিতা কন্যা, কিন্তু এই কামিনী ধনিকন্যা মাত্র, সে বুদ্ধিমতী কিন্তু সে শিক্ষিতা নহে, লীলাবতী ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম-মহিলাদিগের সম্পর্কে আসিয়া মার্জিত রুচি ও উন্নত সংস্কারের অধিকারিণী হইয়াছে, কিন্তু 'জামাই-বারিকে'র কামিনী তাহা হইতে পারে নাই, অতএব লীলাবতী ও এই কামিনী এক নহে। তবে 'নবীন তপস্বিনী'র কামিনী ও 'লীলাবতী'র লীলাবতীতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। লীলাবতী নাট্যকারের ব্যর্থ সৃষ্টি হইলেও 'জামাই-বারিকে'র কামিনী সার্থক সৃষ্টি।

একথা সত্য যে, তৎকালীন সমাজের শিক্ষিতা স্ত্রী সম্পর্কে দীনবন্ধুর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া লীলাবতীর চরিত্র এমন নির্জীব ও প্রাণহীন রূপে চিহ্নিত হইয়াছে, অথচ লীলাবতীই কাহিনীর নায়িকা, সুতরাং তাহার পরিকল্পনার ব্যর্থতায় নাটকেরই ব্যর্থতা। সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের অনুকরণে এই নাটকে দীনবন্ধু ললিত-লীলাবতীর একটি সুদীর্ঘ প্রণয়-দৃশ্যের (love scene) অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু মনের সুগভীর স্তরে, সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষেত্রে নরনারীর যে প্রণয়-বেদনা স্তম্ভিত হইয়া আছে, তাহা জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে যে সূক্ষ্ম রসবোধের প্রয়োজন তাহা দীনবন্ধুর ছিল না। অতএব এই প্রণয়-দৃশ্য কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হইয়াছে। পাঠকের পক্ষে ইহা বিরক্তিকর, দর্শকের পক্ষেও ইহা দুঃসহ।

যে দীনবন্ধু তাঁহার 'নীল-দর্পণ' বা 'সধবার একাদশী' নাটকের ভিতর দিয়া চিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারই রচিত এই প্রণয়-দৃশ্যটি

যে কত নির্জীব এবং কৃত্রিম হইয়াছে, তাহা ইহার সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অপরের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া ললিতের মনোভাব ইহাতে প্রথমতঃ ব্যক্ত হইয়াছে—

ললিত। আমার মন এত ব্যাকুল হলো কেন? বোধ হচ্ছে পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত, অচিরাৎ জগৎ সংসার লয় প্রাপ্ত হবে। আমার সকলি তিক্ত অনুভব হচ্ছে, আমি যেন তিক্ত সাগরে নিমজ্জিত হচ্চি, কিছুই ভাল লাগে না, অধ্যয়ন করতে এত ভালবাসি, অধ্যয়নে নিযুক্ত হলে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, ক্ষুধা পিপাসা থাকে না, এমন বিজন-বান্ধব অধ্যয়ন এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্ছে।—উত্তমতায় পরিপূর্ণ বিশ্বসংসার কি সুখশূন্য হলো, না আমি সুখানুভবের ক্ষমতাহীন হ'লেম? বিশ্বসংসার অপরিবর্তনীয় তবে আমি এমন দেখছি কেন? নীলবর্ণের চশমা চক্ষে দিলে, কি শ্বেত, কি পিঙ্গল, কি নীল, কি পীত সকলই নীল দৃষ্ট হয়। পৃথিবী যেমন তেমনই আছে, আমার ব্যতিক্রম ঘটেছে, আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাই আমি বিষাদময় দৃষ্টি কচ্চি। বিষাদের জন্ম হ'ল কেমন ক'রে? আমি মনে মনে বিলক্ষণ জানি, কিন্তু মুখ দিয়ে বলতে আমি আপনার কাছে আপনি লজ্জা পাই! লীলাবতী নিস্তব্ধ হলে যে, কে আছে এখানে? লীলাবতী যখন অধ্যয়ন করে, তার সুন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে; এই কি আমার বিষাদের কারণ?—লীলাবতীকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, যাকে এত ভালবাসি সে অমন অপদার্থ নরাধমের কর কবলিত হচ্চে, এই কি বিষাদের কারণ? সিদ্ধেশ্বরকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, সিদ্ধেশ্বর যদি কুপাত্রী বিবাহ কত্তে বাধিত হয়, তা হলে আমি কি বিষাদিত হইনে? সে বাধ্যতা হতে মুক্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর যদি পরমা সুন্দরী ভার্যা লাভ করে, যেমন সে এখন করেছে তা হলে আমার বিষাদের অপনোদন হয়?—বিষাদের অপনোদন ত হয়ই হয়, আরো অপার আনন্দ জন্মে। লীলাবতী সম্বন্ধে কি সেইরূপ? বিবেচনা কর নদের চাঁদ দূরীভূত হয়ে সর্বসদ্‌গুণ-মণ্ডিত একটি নবীন সুপুরুষ যদি পাণি-গ্রহণ করে, তা হ'লে কি আমার বিষাদধ্বংসে আনন্দ উদ্ভব হয়? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) নিশ্চয় বল

অচেতন হলে যে, হয় অবজ্ঞা হয়—এইবার মন মনের কথা বল্লে, না গোপন কল্লে।—গোপন করব কেন? তা হ'লে সে ত সুখে থাকবে। মন, ধরা পড়েছ, আমার উপায় কি হবে?—যে বিষাদ সেই বিষাদ। আমার প্রাণ যায় যাবে, যাকে আমি এত ভালবাসি, সে ত ভাল থাক্‌বে। হোক্ লীলাবতী অপর কোন সুপাত্রে অর্পিত হোক, না, না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়, আমি সম্মতি দান কত্তে অক্ষম; কিসে সে সুখী থাক্‌বে আর কেউ যত্ন ক'রে জানবে না, অপরের কাছে পাছে সে যা ভালবাসে তা না পায়, আমি তার সুখের জন্যেই তাকে অপরের হস্তে অর্পণ কত্তে বল্‌তে পারিনে। কেউ যেন কামিনীর কোমল মনে ক্লেশ না দেয়।

জানিত না পুরা কালে মহাকবিচয়,
একাধারে এতরূপ বিরাজিত রয়,
তাই তারা বলিয়াছে অজ্ঞান কারণ,—
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,
মৈথিলী মেদিনীজয়ী হরিণনয়নে,
বঙ্গবিলাসিনী দন্তে বসায় মদনে,
উৎকল অঙ্গনা-উরু অনঙ্গ-আলয়
নিতম্বে তৈলঙ্গী সবে করে পরাজয়,
সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল
কর্ণাট-কামিনী-কটি ভুবনে অতুল,
গুর্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন
মকরকেতন কেলি চারু-নিকেতন,
লীলায় দেখিত যদি তারা একবার,
একস্থানে ব'সে হ'ত রূপের বিচার।
নবাঙ্গী নূতনকান্তি নবীন নলিনী,
অমলিনী, অনঙ্কিত তোলেনি মালিনী।
সুকোমল ভুজবল্লী, গোলাল-গঠন,
ইচ্ছে করে থাকি বেড়ে হইয়া কঙ্কন।
সুশ্যামল দোল দোল অলক কুন্তল
মুখপদ্ম প্রান্তে যেন নাচে অলিদল;—

চাই না চন্দ্রমা, রবি, নন্দনকানন,
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন,
লাজশীলা লীলাবতী চুচুক-চুম্বিত,
মদনদোলের লতা, অলেক কুঞ্চিত।
কি দায়! পাগল বুঝি আমি এত দিনে
হলেম অবনী-মাঝে বিলাসিনী বিনে;
নতুবা আমার কেন অচলিত মন,—
কেবল করিত যাহা সুখে দরশন
লীলাবতী-নিরমল-মনের মাধুরী,
দয়া, মায়া, সরলতা, বিদ্যা ভূরি ভূরি,—
ভাবে আজ ললনার লাবণ্য মোহন
বরণের বিভা, নিশানাথ নিভানন?
আবার পড়ে যে মনে আপনা আপনি
বারিজ-বদন বন-বিহঙ্গের ধ্বনি।
কি করি, কোথায় যাই কারে বা জানাই,
লীলাময় দেখি সব যে দিকে তাকাই। (চিন্তা।)

(ললিতের অজ্ঞাতসারে লীলাবতীর প্রবেশ এবং দুই হস্তে ললিতের নয়নাবরণ)

ললিত। যে চারুহাসিনী কিশোর-বয়সকালে,
ছড়ায়ে বিজলীছটা চঞ্চল চরণে,
বেড়াইত নত-মুখে সরোবর-তীরে,
হাত ধরাধরি করি বলিতে বলিতে
মধু-মাখা ছাই পাঁশ সুমধুর-তারে,
"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে—"
"ও পারে রে জস্তি গাছ জস্তি বড় ফলে—"
বিমোহিত হত যাতে শ্রবণ-বিবর,
যেমতি সুন্দর বনে বিহগের গান,
বিরহীর কাণ তোষে, যবে সে শরতে
কলিকাতা হতে যায় পুজার সময়
তরণী বাহিয়া বাড়ী, ধ্বনিতে হৃদয়ে

হৃদয়-গগন-শশী নবীনা রমণী :--
সেই সুলোচনা আজ আলোচনা করি
ধরেছেন আঁখি মম, দেখাতে আঁধার,
আবরিত যাতে আমি হব অচিরাৎ।

লীলা। (ললিতের নয়ন হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া)।
অগোচরে ধীরে ধীরে ধরেছি নয়ন,
কেমনে জানিলে তুমি আমি কোন্ জন ?

ললিত। যে নীল-নলিনী-নিভ নয়ন বিশাল,—
প্রশান্ত সুপ্রভা যার শীতলতা মনে
প্রদানে আনন্দ চক্ষে, হৃদয়ে পুলক.
কাদম্বিনী অঙ্গ-শোভা ইন্দ্রধনু-ভাতে
সুকুমার শান্ত বিভা যেমতি শরতে, — ইত্যাদি।

যাহা জীবনের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত তাহার রচনা কেবল মাত্র দীনবন্ধু কেন, সকলের নিকটই কৃত্রিম হইয়া উঠে। যে দীনবন্ধু তাঁহার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার হাতে পড়িয়াই অবান্তর প্রণয় দৃশ্যগুলি যে কত কৃত্রিম হইয়া উঠিতে পারে উদ্ধৃত নিদর্শনই উহার প্রমাণ। অথচ সেদিন ইংরেজী নাটকের অনুকরণে, বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে কোনও প্রকার যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও, এই প্রণয় কাহিনী মূলক নাটক রচনারও যে প্রেরণা এদেশে আসিয়াছিল, ইহা হইতে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে কোন প্রভাব সক্রিয় ছিল না তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলির ভিত্তিও প্রণয় কাহিনী, কিন্তু উপন্যাসের প্রণয় বৃত্তান্ত এবং নাটকের প্রণয় বৃত্তান্তে পার্থক্য আছে, উপন্যাস যাহা অনুভূতি এবং তাহার মানসিক বিশ্লেষণ মাত্র, নাটকে তাহাকেই সক্রিয় রূপে রঙ্গমঞ্চের উপর উপস্থিত করিবার প্রয়োজন হয়। রঙ্গমঞ্চের নাটক আচরণের মধ্য দিয়া যখন প্রেমের বিষয় মাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, তখনই ইহাদের স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতাও প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। বিবাহের পূর্বে প্রেমের প্রত্যক্ষরূপ প্রতিষ্ঠা করা এদেশের সমাজে সেদিন সম্ভব ছিলনা, কারণ সমাজে তাহা সত্যও ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জীবনে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহাও নাটকের মধ্য দিয়া সেদিন প্রত্যক্ষ করান সহজ ছিল না। তবে বঙ্কিমের অনুকরণেই প্রেমজ বিবাহের বৃত্তান্তও

সেদিন কিছু কিছু নাটকে আত্মপ্রকাশ করিলেও যুগে তাহার ক্রিয়া সুদূর প্রসারী হইতে পারে নাই।

সমাজ-জীবনে অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন মেলা-মেশা ব্যতীত প্রেমজ বিবাহ সহজে সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া এবং আমাদের সমাজে তাহার ব্যাপক প্রচলনের অভাব বশতঃ, এই শ্রেণীর নাটক প্রধানতঃ বহু দিন পর্যন্তই ইংরেজি নাটক-উপন্যাসের অনুকরণেই রচিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্তও ইহার বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। তবে যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা কেবল মাত্র সংলাপের ভাষাগত, দীনবন্ধু স্বাধীন মিলনের যে সকল প্রণয়-দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যেমন একদিকে নিতান্ত আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনই আর একদিকে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার অনুসরণ করিয়া পয়ার ছন্দের পদ্য-ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শ্রেণীর নাটকে এবং বিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই শ্রেণীর নাটকে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ১৯৩৯ সনে প্রকাশিত বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'মাটির ঘর' নাটকের একটি প্রণয়-দৃশ্যের সঙ্গে দীনবন্ধু রচিত উদ্ধৃত প্রণয় দৃশ্যের তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দীনবন্ধুর ললিত-লীলাবতী ইহাতে উৎপল-ছন্দার রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাহাদের আচার-আচরণ এবং সংলাপের ভাষাকেও আধুনিক করিয়া লইয়াছে। মাটির ঘরের নিম্নোদ্ধৃত সামান্য অংশ হইতেই এই বিষয় স্পষ্ট হইতে পারে -

'(সত্য প্রসন্নের বাহিরের ঘর। রাত্রি নয়টা, ছন্দা গান গাহিতেছিল)

গান

তোমার আসার আশায় আমার সকল দুয়ার রইল খোলা—
অচিন পথের বন্ধু আমার ওগো আমার আপন ভোলা।
কখন তুমি আসবে ফিরে
সুদূর হতে সীমার তীরে
কবে তোমার বাহুর বাঁধন চিত্তে আমার দিবে দোলা।

(গানের শেষে উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। চমৎকার!

ছন্দা। কী চমৎকার? কথা না সুর?

উৎপল। সুর।

ছন্দা । না কথা। কথা নিয়েই তো সুরের সৃষ্টি।

উৎপল। ঠিক উল্টো, সুরের প্রেরণা থেকেই কথার সৃষ্টি।

ছন্দা । তা হ'লে কবির কৃতিত্ব কোথায়?

উৎপল। সুরের কান্নাকে ভাষা দেওয়ায়।

ছন্দা । উঃ ভারি তো অমন সবাই পারে।

উৎপল। না, পারে না। তুমি চটো ছন্দা, না কিন্তু সত্যি বলছি, কাব্য-রচনা সকলের জন্য নয়।

ছন্দা । ওটা আপনারই এক চেটে বুঝি?

উৎপল। না, তাও বলছি না! কিন্তু কি আশ্চর্য! তুমি আমাকে 'তুমি' বলবে কবে? 'আপনি' বলাটা এখনও ভাল লাগে তোমার?

ছন্দা । কেন লাগবে না।

উৎপল। কেন লাগবে না? যারা একমাসের ভিতর স্বামী-স্ত্রী হ'তে চলেছে, তারা এখনও পরস্পরকে আপনি বলা ছাড়তে পারল না, সভ্য জগৎ এ কথা শুনলে বল্‌বে কি!

* * *

ছন্দা, তুমি রাগ করেছ?

ছন্দা । হুঁ

উৎপল। তোমার রাগে আমার পৃথিবী ম্লান হয়ে আসে, ছন্দা।

যাই হোক পিতার বৈঠকখানায় তাহার অনুপস্থিতিতে বয়স্থা কন্যা অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে এইভাবে স্বাধীন প্রণয়ের অভিনয় করিতেছে, কিন্তু একমাসের মধ্যেই যে তাহাদের স্বামী-স্ত্রী হইবার সম্ভাবনার কথা শুনিতে পাওয়া গেল, তাহা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হইল না এবং কেন যে হইল না তাহার কারণটি খুবই যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহার কাহিনীটি নিম্নে বর্ণনা করা যাইতে পারে, কারণ, এই শ্রেণীর নাটকের এই প্রকার প্রণয় দৃশ্যগুলিকে 'মডেল' বা ছাঁচ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়;—

সত্য প্রসন্ন উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত বিপত্নীক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিপত্নীক জীবনে তিনটি কন্যা লইয়া তাঁহার সংসার যাত্রা চলিতেছে। মেয়েদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সংসারে তাঁহার আর কিছু কর্তব্য নাই।

নিজে পুত্রহীন বলিয়া জ্যেষ্ঠ জামাতা কল্যাণকে নিজের সংসারেই কন্যাসহ রাখিয়া দিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা তন্দ্রা, অলক নামক এক যুবকের সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই স্বাধীন প্রেম-লীলার অভিনয় করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিত যুবক কল্যাণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ব্যর্থ প্রেমের হাহাকারে অলকের জীবন পূর্ণ হইয়া উঠে, তন্দ্রা নূতন জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কোন বেগ পায় না। এক ধনীর সন্তান চঞ্চলের সঙ্গে দ্বিতীয়া কন্যা নন্দার বিবাহ হয়। এই বিবাহ-প্রেমজ বিবাহ ছিল কি না, তাহা নাটক হইতে বুঝিতে পারা না গেলেও যে পরিবারে স্বাধীন প্রেম সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, নন্দার সম্পর্কেও তাহার ব্যতিক্রমের কোন কারণ ভাবা যায় না। বিবাহের পূর্বাবস্থা ইহার মধ্যে বর্ণিত না থাকিলেও সেও চঞ্চলকে ভাল-বাসিয়া বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। যাই হোক চঞ্চলের চরিত্রহীনতার জন্য শেষ পর্যন্ত নন্দা পিতৃগৃহে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। তন্দ্রার শয়ন-গৃহে রাত্রির গভীর অন্ধকারে তাহার প্রাক্-বিবাহিত জীবনের বন্ধু অলকের অবির্ভাব হয় এবং এখান হইতেই নাটকের সূত্রপাত হয়। অলক তন্দ্রাকে তাহার সঙ্গে গোপনে বাহির হইয়া যাইবার জন্য বলে, কিন্তু তন্দ্রা তাহাতে রাজী হয় না। ক্রমে কল্যাণের মনে তন্দ্রা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। অন্যদিকে ছন্দার সহপাঠী উৎপলের সঙ্গে ছন্দার ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। নন্দাকে শ্বশুর বাড়ী ফিরাইয়া লইবার জন্য তাহার ননদ চেষ্টা করে ও পরে আইনের সাহায্য লইবে বলিয়া তাহার বাড়ীর লোকদিগকে ভয় দেখায়। তন্দ্রা সম্পর্কে কল্যাণের সন্দেহ যখন বাড়িয়া উঠে, তখন তন্দ্রা উভয় সঙ্কটের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া অলকের সঙ্গে যাইতে রাজি হয়। এক গভীর রাত্রিতে তন্দ্রা অলকের সঙ্গে পলাইয়া যাইবে এই প্রকার স্থির হয়। তাহারা বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময় শুনিতে পায় নন্দা বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। উত্তেজনায় ক্লান্ত তন্দ্রার স্নায়ু এই আঘাত সহ্য করিতে পারে না—সে পাগল হইয়া যায়। সত্য প্রসন্নের সংসার দুর্যোগের কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ছন্দা যখন তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎপলকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন উৎপল একদিন তাহাকে জানাইল, তাহার পিতা এই বিবাহে রাজি নহেন, সুতরাং সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাতে ছন্দার জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। কল্যাণ সিমলায় বদলী হইয়া যান তন্দ্রাকেও সে তাহার

সঙ্গে লইয়া যায়। সিমলায় কল্যাণ হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িলে প্রতিবেশী আশোকের সাহায্যে অলক ও সত্যপ্রসন্নকে খবর পাঠায়। অলক, সত্য প্রসন্ন, ছন্দা সিমলায় আসে। চঞ্চলও সঙ্গে আসে, তাহার মনে ছন্দাকে বিবাহ করিবার অভিসন্ধি ছিল। অলকের কাছে চঞ্চলের আসল রূপ প্রকাশ পায়, অলক ভয় দেখাইয়া চঞ্চলকে তাড়াইয়া দেয়। তারপর কল্যাণের শেষ মুহূর্ত আসে। কল্যাণের অনুরোধে অলক ছন্দাকে বিবাহ করতে রাজি হয়। কল্যাণের অন্তিম মুহূর্তে, সত্যপ্রসন্নের তীব্র হাহাকারের মধ্যে নাটকের যবনিকা নামিয়া আসে।

প্রেমজ বিবাহ সম্পর্কে আমাদের দেশের সমাজের মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল। ইহার যে মহিমা যিনিই কীর্তন করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত বিবাহের পূর্ববর্তী প্রেমকে সকলেই অভিশপ্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাকে মিলনাত্মক পরিণতির মধ্যে কেহই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই। 'মাটির ঘরে'র মধ্যেও তন্দ্রা-অলক এবং উৎপল-ছন্দার প্রেম এমনই অকারণে অভিশপ্ত হইয়া মিলনাত্মক পরিণতিতে বাধা সৃষ্টি করিল। ইহার কারণ এদেশের সমাজে যাহা সত্য ছিল না, তাহা বিদেশী সমাজ হইতে ধার করিয়া আনা হইয়াছে তাহা জীবনে কেহ স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলি রচিত হইবার সময় হইতেই আমাদের সমাজ জীবনেও বিবাহের পুর্বে প্রেমের বিষয় অনুসন্ধান করিবার প্রবণতা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু উপন্যাসেও তাহাদের পরিণাম সর্বদাই বিয়োগাত্মকই নির্দেশ করা হইত, জীবনের প্রথম প্রেমে অভিশাপ আছে মনে করিয়া তাহার পরিণতি সর্বদাই করুণ করিয়া তোলা হইত। যে ভাবে প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্য-প্রেম অভিশপ্ত হইয়াছিল, সেই ভাবেই শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আসিয়াও দেবদাস-পার্বতীর বাল্য-প্রেমকেও অভিশপ্ত করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছিল, নাটকেও সর্বত্রই এই নীতিই অনুসরণ করিতে দেখা যায়। তবে এ কথাও সত্য এই বিষয়ের উপন্যাস সে যুগে যত রচিত হইয়াছিল, নাটক সেই পরিমাণে রচিত হইতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের এই বিষয়ক নাটকের মধ্যে 'মাটির ঘর' নাটকটিকে একটি মডেল বা type হিসাবে ধরা যায়। ইহার মধ্যে প্রেমোদয়েরও যেমন সুগভীর কোন কারণ নাই, তেমনই বিচ্ছেদেরও কোন অর্থ নাই। মিলন যেমন আকস্মিক, বিচ্ছেদও তেমনই আকস্মিক। ছন্দার সঙ্গে উৎপল এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশা করিবার পরও কেবল মাত্র তাহার

পিতার এই বিবাহে মত নাই এই জন্যই ইহার কাহিনী বিয়োগান্তক হইতে পারে না। সুতরাং উৎপলের প্রেম প্রেমই নহে, যে প্রেম স্বার্থত্যাগে কিংবা আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করে না, তাহা লালসা বা মোহ মাত্র; উৎপলেরও তাহাই ছিল, অথচ নাট্যকার ইহাকেই অকৃত্রিম প্রেমের একটি বহিরাবরণ দিয়া নাটকে উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

নাগরিক জীবনই আধুনিক সমাজের নাটকের উপজীব্য হইয়াছে। কলিকাতার নাগরিক সমাজ এখনও এদেশে স্থিতিলাভ করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, অতএব এখন ইহার মধ্যে যে সমস্যা দেখা যায় তাহা যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনই লঘু। সুতরাং সমাজ জীবনের পরিবর্তনের মুখে নূতন সমাজের এই ক্ষণিক সমস্যাগুলি যত জটিল বলিয়াই মনে হউক, যতদিন পর্যন্ত ইহারা একটি স্থির সমাজ দেহে অন্তর্নিবিষ্ট না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত ইহাদিগকে উপজীব্য করিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নাটক রচনাই স্থায়ী কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারে না। জীবনের প্রথম প্রেম জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ এবং শরৎচন্দ্র দেবদাসের মধ্য দিয়া তাহার শক্তি যথার্থ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন সার্থক বাংলা নাটকের মধ্য দিয়া সেই শক্তি যথার্থ অনুভূত হইতে দেখা যায় না। বিংশ শতাব্দীর নাটকেও বিষয়টিকে যে যথার্থ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে। ইহার আরও কতকগুলি কারণ আছে। যে দেশের সমাজের মধ্যে সকলের অধিকার সমান নহে সে দেশের সমাজে স্বাধীন প্রেম বিকাশের কতকগুলি স্বাভাবিক অন্তরায় আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, নবশাখ প্রভৃতি দ্বারা এই দেশের সমাজ শত শত ভাগে খণ্ডিত। সুতরাং নারীই হউক কিংবা পুরুষই হউক, তাহাদের প্রণয় চিন্তা সাধারণতঃ নিজস্ব সাম্প্রদায়িক পথ অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হইতে পারে, অথচ ইহা প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। ইহা নরনারীর ধর্ম কিংবা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ এক শাশ্বত অনুভূতি। সুতরাং যে দেশের সমাজের একটি অখণ্ড রূপ আছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে যেখানে কোন বিরোধ নাই, কেবলমাত্র তাহাতেই এই প্রেমের অনুভূতি বিকাশ লাভ করিতে পারে। এ কথা সত্য, আধুনিককালে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে বর্ণাশ্রম ধর্মের বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছে; তথাপি দীর্ঘ দিনের সমাজ জীবনের একটি সংস্কারের

প্রভাব ব্যক্তির জীবন হইতেও সহজে মুছিয়া যাইতে পারে না, সেইজন্য প্রেমানুভূতি বিকাশ লাভের পথেই সহজ স্ফূর্তির ভাবটি কিছুতেই আসিতে পারে না। কেবলই আশঙ্কা, কেবলই ভয়,কেবলই সঙ্কোচ এই অনুভূতির স্বাধীন বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেই জন্য যে সকল পরিবারের মধ্যে স্বাধীন প্রেমের কাহিনী সন্ধান করা হইয়া থাকে, তাহাদের কৌলিক পরিচয় সাধারণতঃ গোপন করিয়া রাখা হয়। 'মাটির ঘরের' মধ্যেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি-আধুনিক (ultra modern) নাগরিক ভাবাপন্ন কলিকাতার সমাজের বহিরঙ্গ পরিচয়টি তখনও খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই, একটি সাধারণ ব্রাহ্ম-ভাব প্রধানতঃ ইহাদের লক্ষ্য হইয়া থাকে, অথচ তাহা যদি পুরাপুরি ব্রাহ্মই হইত, তথাপি তাহার একটি বিশেষ গুণ থাকিত, ব্রাহ্ম-সমাজও জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করে না, কিন্তু তাহা প্রকৃত ব্রাহ্মও নহে, অথচ হিন্দুও নহে। কাহিনী এবং তাহার প্রয়োজনীয়তায় যখন যাহা আবশ্যক, তাহাই ইহাদের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করা হয়। 'মাটির ঘরে'র পরিবারের অনূঢ়া কন্যারা পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বাধীনা নারীদিগের মত 'কোর্টশিপ' করিয়া নিজেরাই নিজেদের বিবাহ স্থির করিতেছে, পিতা এই বিষয়ে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার, কেবল মাত্র হা-হুতাশ করা ছাড়া তাঁহার জীবনে আর কোন কর্তব্য নাই, তারপর সেই বিবাহ ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, পুনরায় জোড়া লাগিতেছে, তাহা সমাজের নিয়মে কিছুই হইতেছে না, ব্যক্তি এবং পরিবারের খাম-খেয়ালিতে তাহা হইতেছে, সুতরাং ইহার মধ্যে কোন গুরুত্বই নাই। এদেশের নাগরিক সমাজের পরিবারের কোন সমস্যা, এ দেশের সমাজের কোন সুগভীর সামাজিক সমস্যা নহে—ইহা বিশেষ বিশেষ পরিবারেরই কতকগুলি স্বাধীন সমস্যা মাত্র; সামগ্রিক ভাবে সমাজ-জীবনের সঙ্গে ইহার কিছুমাত্র যোগ নাই। একদিন যেমন বহু বিবাহ, বাল্য-বিবাহ সমগ্র সমাজের সমস্যা ছিল, আজ প্রাক্-বিবাহ প্রেম এবং তজ্জাত বিবাহের ফলাফল বৃহত্তর সমাজের কোন সামগ্রিক সমস্যা নহে। বৃহত্তর বাস্তব সমাজ হইতে তাহার জীবন এবং সমস্যাগুলিকে সন্ধান করিতে না পারিলে, তাহা সুগভীর ভাবে সমাজের মনেও কোন সাড়া জাগাইতে পারে না। রামনারায়ণ কিংবা দীনবন্ধুর নাটকের সাহিত্যগুণ যাহাই থাকুক না কেন, একদিন যে সমস্যাগুলির তাহাতে আলোচনা এবং রূপদান করা হইয়াছে, তাহা সমাজের সামগ্রিক সমস্যা ছিল বলিয়া সকলেরই

দৃষ্টি তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে, সকলেই ইহাদের বিষয় লইয়াও চিন্তা করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার পরিবর্তে এই শ্রেণীর নাটকের সমস্যা বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাতে সমগ্রভাবে সমাজের সুগভীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে না। কল্পিত সমাজ হইতে কল্পিত সমস্যা গ্রহণ না করিয়া বাস্তব সমাজ হইতে প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলি উদ্ধার করিবার প্রয়াস এ'যুগে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অথচ নাটকের মধ্যদিয়া সামাজিক সমস্যা রূপায়িত করিবার সংস্কার পূর্বের মতই অক্ষুণ্ণ আছে। সেইজন্যই প্রধানতঃ এই যুগের সামাজিক নাটকগুলি যথার্থ শক্তির অধিকারী হইতে পারে নাই।

'মাটির ঘর' রচিত হইবার পর হ আধুনিকতম কাল পর্যন্ত কেবল মাত্র প্রেমজ-বিবাহ কিংবা বিবাহের পূর্বে প্রেম এই বিষয়কেই মুখ্য করিয়া সাধারণতঃ কোনও উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয় নাই। বরং অন্যান্য মুখ্য বিষয়ের সঙ্গে কোন কোন সময় প্রেমের বিষয় প্রসঙ্গতঃ আসিয়াছে মাত্র, কিন্তু এই বিষয়টিকেই সুস্পষ্ট পরিণতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রয়াস দেখা যায় না। বিশেষতঃ প্রেম বিষয়টিকে রূপজ মোহ কিংবা দেহজ লালসা ইত্যাদি বিষয় হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করা আবশ্যক। অনেক সমাজে রূপজ মোহ কিংবা দেহজ লালসা অতিক্রম করিয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইতেও যে না দেখা যায় তাহা নহে, তবে তাহাও কোন নাটকেরই মুখ্য বিষয় হইতেও বিশেষতঃ দেখা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে কোর্টশিপ করিয়া বিবাহের কথা আছে, সেখানেও হয়ত অভিভাবকের আপত্তিতেই হউক, কিংবা সমাজের সমর্থনের অভাবেই হউক শেষ পর্যন্ত কাহিনী বিয়োগান্তক হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিঁথির সিঁদুর' নাটকটির নাম উল্লেখ করা যায়। ইহার মধ্যেও পৌত্রের স্বাধীনভাবে বিবাহ পিতামহ সমর্থন না করিলেও পৌত্রবধূকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করেন, 'কিন্তু আমার এই দিদিমণির 'সিঁথির সিঁদুর' যেন অক্ষয় হয়।' ইহার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেলেও, এই প্রয়াস যে সার্থক হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না।

স্বাধীন প্রেমের বিচিত্র কাহিনী জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি-ডব্লিউ-ডি' নাটকটির মধ্য দিয়াও বর্ণিত হইয়াছে, অথচ ইহাও নাটকটির মুখ্য বিষয় নহে। ইহার কাহিনীটি বাংলার পারিবারিক জীবনাশ্রিত নহে বলিয়াই ইহা হইতে বাঙ্গালীর বৃহত্তর সমাজ-জীবনের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

'সেবিকা-সঙ্ঘ', তাহার সেক্রেটারী, কয়েকজন সেবিকা (nurse) ও তাহাদের পাণিপ্রার্থীর বিবরণ লইয়া এই কাহিনী রচিত। ইহাদের কাহারও সুস্থ সামাজিক পরিচয় নাই, সেইজন্য এই কাহিনী এই বিষয়ের কোন সামজিক রূপও নহে। ইহার নায়িকার নাম শ্যামলী, সে সঙ্ঘের একজন সেবিকা, এক ধনশালী বৃদ্ধের পরিচর্যার ভিতর দিয়া তাহার জীবনের বিচিত্র গতিপথ রচিত হইয়াছে। শেষ দৃশ্যে 'সেবিকা-সঙ্ঘে'র সেক্রেটারীর মুখের উপর রিভলবার ধরিয়া এক পকেটমার-ভবঘুরে, শ্যামলী নিষ্পাপ কি না তাহা জিজ্ঞাসা করে, তাহার উত্তরে সে নারী চরিত্রের রহস্য এই ভাবে প্রকাশ করিয়া বলে, 'এই শ্যামলীকে আমি ভালবাসি, অত্যন্ত ভালবাসি, পাঁচ বছর সে ছিল আমার কাছে, কখনো তার মুখের দিকে কুভাবে তাকাইনি ছোট-বোনটির মতই দেখছি। তোমার কাছে সে ছিল মাত্র পনর দিন। তাতেই আজ তাহার কুমারী-জীবন কলঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। শ্যামলী আজ তোমাকেই ভালবাসে, আর আমাকে করে ঘৃণা। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনে যে কত বড় একটা ভুল ধারণা ছিল, তা আজ আমি বুঝতে পারছি'। ইহাই নাটকের বক্তব্য বিষয়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, প্রেমানুভূতি বলিতে যাহা বুঝায়, যে প্রেমানুভূতি ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ ত্যাগ বৈরাগ্য সকল কিছুই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, এখানে তাহার লেশমাত্র নিদর্শন নাই, ইহা প্রেমের কথা নহে, লালসার কথা অথচ এই শ্রেণীর বিষয়ই সাম্প্রতিক বাংলা-নাটকে সাধারণতঃ প্রেম বলিতে বুঝায়।

তবে প্রেমজ-বিবাহ বিষয়ে এই যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক রবীন্দ্র মৈত্র প্রণীত 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রেমের যে অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাহা নাটকখানিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। কাহিনীর অগ্রগতি এবং চরিত্রের সূক্ষ্মতম বিকাশ নির্দেশ করিতে গিয়া নাট্যকার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সুতরাং ইহার বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

মানসমোহন মুখোপাধ্যায় একজন গ্রাজুয়েট্ বেকার যুবক, বহু চেষ্টা করিয়াও একটি সামান্য চাকুরি জোগাড় করিতে পারিতেছে না। ফলে চরম অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। এমন সময় একদিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে লাইটপোষ্টে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপনের সন্ধান পাইল। পাড়াগাঁয়ের কোন এক মানময়ীস্কুলের জন্য একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষয়িত্রীর পদের জন্য

দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু চাকরীর প্রধান সর্ত হইল এই যে, উক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী হইতে হইবে। সুতরাং অবিবাহিত মানসমোহনের কোন আশা রহিল না। ইতিমধ্যে নীহারিকা গাঙ্গুলী নামে অপর একটি বেকার খৃষ্টান যুবতীর আবির্ভাব হইল। সে ডায়োসেশানের গ্রাজুয়েট। টুইশনি সম্বল করিয়া কোন মতে দিন যাপন করিতেছে। কোথাও সামান্য একটি চাকুরি মিলিতেছে না। পথের পাশে কর্মখালির বিজ্ঞাপনে সেও আকৃষ্ট হইল। নীহারিকাও কুমারী। সুতরাং বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নিরুপায় মানসমোহন তখন স-সংকোচে নীহারিকার কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করিল। তাহার প্রস্তাবটি হইল এই যে, তাহারা দুইজন স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলে এমন একটি লোভনীয় চাকুরি অনায়াসে তাহাদের হইতে পারে। বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রামে যদিও নীহারিকা মানসের মতই বিপর্যস্ত তবু স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সংস্কার বশে এই প্রস্তাবে সে সম্মত হইতে পারিল না।

এদিকে এক কৃষ্ণবর্ণ সাহেব মিঃ ফার্ণাণ্ডেজের কাছ হইতে নীহারিকা তাহার বি, এ, পরীক্ষার আগে কিছু টাকা ধার করিয়াছিল। অনেক দিন পরে তাহার সঙ্গে নীহারিকার দেখা হইয়া গেল এবং টাকার জন্য সে জঘন্য ভাষায় শাসাইয়া গেল। এমন কি, এ কথাও বলিয়া গেল যে এক মাসের মধ্যে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ না করিলে হয় তাহাকে মিসেস্ ফার্ণাণ্ডেজ হইতে হইবে অথবা কারাবাস বরণ করিতে হইবে। নীহারিকার প্রতি এই দুষ্ট প্রকৃতির কৃষ্ণবর্ণ সাহেবের বহুদিনের আসক্তি। অপমানিতা নীহারিকা অনেকটা নিরুপায় হইয়া শেষ পর্যন্ত মানসমোহনের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। মানস-মোহনকে মোটামুটি একজন ভদ্র যুবক বলিয়াই তাহার মনে হইল এবং স্বামী-স্ত্রীর ছদ্ম পরিচয়ে তাহারা উক্ত চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়া দিল।

মনময়ী গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা দামোদর চৌধুরী একজন গ্রাম্য জমিদার। পাশের গ্রামের বিত্তশালী ব্যবসায়ী বদন সরকারের সঙ্গে জেদ করিয়া স্ত্রীর নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লেখাপড়া যতটা হউক বা না হউক, বদন সরকারের স্কুলের চেয়ে সব দিক দিয়া বড় স্কুল গড়িতে হইবে, ইহাই দামোদর চৌধুরীর পণ। সেইজন্য যথেষ্ট লোভনীয় মাহিনাতে গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর নাম রাজেন্দ্রনাথ বাড়োরী, 'মুকটিয়ার ইন্ দি কোর্ট অব হিজ অনার দি সাব-

ডিভিসানেল অফিসার অব্ বদরতলা—রেভিনিউ।' স্কুল সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে সে হইল দামোদর চৌধুরীর দক্ষিণ হস্ত। তাহারই পরামর্শে স্বামী-স্ত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পিছনে অবশ্য আর একটু রহস্য আছে। রাজেন বাড়োরী আবার দামোদরের কন্যা চপলার প্রতি প্রেমাসক্ত, যদিও বহু চেষ্টায়ও চপলার মন সামান্য মাত্রও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। পাছে একক গ্রাজুয়েট শিক্ষক আসিলে চপলা একেবারে হাতছাড়া হইয়া যায়—এই তাহার ভয়। দামোদর চৌধুরী এসবের কোন খোজ রাখেন না। তাহার স্কুলে একজোড়া গ্রাজুয়েট আসিবে—এই আনন্দেই তিনি আত্মহারা। যেমন করিয়াই হউক বদনের স্কুলকে হারাইতে হইবে—এই তাহার সংকল্প।

মানসমোহন এবং নীহারিকা যথারীতি স্বামী-স্ত্রীর ছদ্মবেশে একদিন মানময়ী গার্লস্ স্কুলে যোগদান করিল। নীহারিকা চিরকাল শহরে মানুষ খ্রীষ্টীয় শৌখিন জীবনের আদব কায়দায় অভ্যস্ত, কিন্তু এই গ্রাম্য পরিবেশে এখানকার মানুষের গায়ে পড়িয়া আলাপ ও অতিরিক্ত সহৃদয়তায় শীঘ্রই হাঁপাইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া দামোদর ও দামোদর গিন্নীর পাড়াগাঁয়ে আদি রসাত্মক ঠাট্টা ও রসিকতায় সে একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে দিনরাত্রি স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয়, দামোদর ও দামোদর গিন্নীর এইভাবে যখন তখন নাত বৌ বলিয়া সম্বোধন, পায়ে আলতা পরানো কপালে সিন্দুর মাখা, ঘোমটাটানা হিন্দুয়ানীর এসব অনাচার সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সেইজন্য সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। অভিনীত ভূমিকার আড়ালের সত্য সম্পর্ক কোন্ সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে মানস এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আছে। তাহার উপর নীহারিকার এই পালাই পালাই ভাব তাহাকে আরো ভাবনার মধ্যে ফেলিল। নীহারিকাকে অনেক বুঝাইয়া অন্তত একমাসের জন্য এই সব উৎপাত কোন রকমে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে রাজি করাইল। স্থির হইল প্রথম মাসের মাহিনা পাইলেই তাহাকে ছুটি দিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী রাজেন বাড়োরীর যত ভাবনা চপলাকে লইয়া। নূতন মাস্টারের বাসায় চপলার যথেচ্ছ যাওয়া আসা তাহার মোটেই পছন্দ নয়। তাহার সন্দেহ মানসমোহনও চপলার প্রতি প্রেমাসক্ত এবং প্রেমের স্বাভাবিক

নিয়মেই রাজেন বাড়োরী গ্রাজুয়েট মানসমোহনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। সে মাস্টারের বাসার সব কিছু গোপনে জানিবার জন্য চাকর হারানিধিকে উৎকোচে বশীভূত করিল।

নীহারিকার বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। দুইজন নিঃসম্পর্কিত নারীপুরুষ—কেবলমাত্র বাঁচিবার সংগ্রামে তাহাদের এই স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়। তবু এতদিনের পরিচয় ও এক সঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়া অভিনয়ের অতীত আর এক জীবন-সত্য কখন যে আপনার নিয়মে তাহাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাহারা কেউ যেন জানিয়াও জানিতে পারিল না বা চাহিল না। তাহারা দুই জনেই ভদ্র মার্জিতরুচি যুবক-যুবতী। সেইজন্য আসন্ন বিদায়কে সহজ ভাবেই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল।

এদিকে বেচারী রাজেন। মোক্তারী ছাড়িয়া স্কুলের সেক্রেটারী হইয়াছিল —চপলাকে কাছে পাইবার আশায়। কিন্তু কিছুতেই কিশোরী চপলার হৃদয় জয় করিবার মন্ত্রটি আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। বিশেষ করিয়া নূতন মাস্টার আসিবার পর হইতে সে যেন আরো দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং এখন মাষ্টারণী চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া সে যেন আরও চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়িল।

নীহারিকার বিদায়ের আর একদিন মাত্র বাকী। দামোদরের বাড়ীতে আজ তাহাদের নিমন্ত্রণ। মানস ভাবিতেছে আর একটা দিন কোন রকমে ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গেলে হয়। কিন্তু রাত্রে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল। খাওয়া দাওয়ার পর দামোদর গিন্নীর কৌশলে মানস ও নীহারিকা দামোদরের গৃহের এক শয়নকক্ষে বন্দী হইল। মানস অনেক রাত্রে তাহার জন্য নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে গিয়া যখন নীহারিকাকে আবিষ্কার করিল তখন সে নিরুপায়। কারণ বাহির হইতে ততক্ষণে শিকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাছে সব জানাজানি হইয়া সব মাটি হইয়া যায় এই ভয়ে মানসমোহন ট্রেনের যাত্রীর মত একটা রাত্রি কাটাইয়া দিবার মনস্থ করিল। কিন্তু কুমারী নারীর চিরন্তন সংস্কার বশে নীহারিকা এ প্রস্তাব কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিল না, বরং সে আরও বেশী ঘাবড়াইয়া গেল। মানস তখন গত্যন্তর না দেখিয়া দোতলার খোলা জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া মান সম্মান ও প্রাণ বাঁচাইল এবং নীহারিকাকে মুক্তি দিল। বলাবাহুল্য এই ছদ্ম স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারে যে একটা অসঙ্গতি ছিল তাহা দামোদর ও দামোদর গিন্নী দুজনেই লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ইহাকে ভাবিয়াছিল ক্ষণিকের দাম্পত্য

কলহমাত্র। সেইজন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য মিটাইবার আশায়ই উপরোক্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। নীহারিকার বিদায় সভা—চপলা অভিনন্দন পত্র পাঠ করিল এবং অন্যান্য ছাত্রীরা গান করিল। এই অভিনন্দন পত্র ও গান দুই-ই মানসের রচনা এবং তাহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে মানস যেন অনেকটা নিজের হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বিদায় মুহূর্তের যন্ত্রণার ভার লাঘব করিয়া দিয়াছে। কিন্তু নীহারিকা ছাড়া আর কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। শেষ-বিদায় লগ্নে নীহারিকা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, এখানে গত একমাসের চাকুরীর অন্তরালে সে এই গ্রামে, এই পরিবেশ এবং সর্বোপরি যাহার জন্য এই চাকুরী সেই মানুষটিকে অজ্ঞাতে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য স্বভাবতঃই আজ অকারণে কোথায় যেন একটা অভিমান ক্ষুব্ধ বেদনা উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। বিদায় সভার পর নীহারিকা যখন এই যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ের মুখোমুখি হইয়া নানাভাবে স্মৃতি চারণা করিতেছে তখনই সেখানে রাজেনের আবির্ভাব হইল এবং ব্যর্থ প্রেমিক রাজেন হিতৈষীর ছদ্মবেশে গোপন চিঠিতে মাষ্টারের চপলতার প্রতি আসক্তির ইতিবৃত্ত নীহারিকাকে জানাইয়া গেল। ইতিমধ্যে ধূর্ত চাকর হারুর মারফৎ রাজেন জানিয়াছে যে, মাষ্টারণী জাতিতে খ্রীষ্টান। শুধু তাহাই নয়, অর্থের বিনিময়ে হারানিধি তাহাদের স্বামী স্ত্রীর ছদ্ম সম্পর্কের আবরণও উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমিক রাজেন দামোদর ও মানময়ীকে সঙ্গে লইয়া চুপি চুপি মাষ্টারের বাসায় চলিল—রহস্যের সম্পূর্ণ উদ্ঘাটনের আশায়। অশ্রুসজল এক প্রেমিকা কখন জাগিয়া উঠিয়াছে নীহারিকার মধ্যে—সে নিজেও জানিত না, কিন্তু চপলার প্রতি মানসের সেই আসক্তির সংবাদ জানিয়া সে আর যেন নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে কখন অজ্ঞাতে সে মানসকে তাহার কুমারী হৃদয়ের সবটুকু দান করিয়া ফেলিয়াছে—অভিমানহত শাশ্বতী নারী আজ আর কোন বাধা মানিতে চাহিল না। সমস্ত মিথ্যা অভিনয়ের খোলস কখন খুলিয়া পড়িয়া গেল। এদিকে মানসের সমগ্র সত্তাও কখন যে সহৃদয়তার ঐশ্বর্যে ও স্নেহের বেদনায় পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে, এই খাম-খেয়ালি সহায়-সম্বলহীনা সংসার অনভিজ্ঞা নারীর প্রতি—প্রত্যহের পরিচয়ের পথে ধীরে ধীরে, এতদিনে তাহা সে প্রথম জানিতে পারিল। সেইজন্য দুই জনই দুইজনের কাছে সমস্ত অতীত বিস্মৃত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল চিরন্তন নর ও নারীরূপে প্রেমসিক্ত যাত্রাপথের সপ্তপদীর মধ্য দিয়া তাহাদের যেন নব জন্ম

হইল। এক আবেগ-বিহ্বল আনন্দ-বেদনার মধ্যে তাহারা সত্যকারের স্বামী-স্ত্রীতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। নীহারিকার চলিয়া যাওয়া আর হইল না। বৃদ্ধ দামোদর চৌধুরী তাঁহার স্কুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন আর রাজেন বাড়োরী—সেও ঈর্ষার দংশন হইতে শান্তি পাইল। অবশ্য চাকর হারুর চাকরীটি যে গেল; সেকথা বলাই বাহুল্য।

প্রেম বিষয়টি যে লঘু কৌতুকের বিষয় নহে ইহার যে একটি সুগভীর গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে এবং ইহার এই গুরুত্ব সর্বদাই সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া না দিয়া অনেক সময় যে জীবনে কল্যাণের সন্ধান দিতে পারে, তাহা এই নাটক হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই শ্রেণীর নাটক এই যুগে আর খুব বেশি রচিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে প্রেম অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ বা প্রহসনের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। তাহার 'চিরকুমার সভা' কিংবা 'গোড়ায় গলদ' তাহার প্রমাণ কিন্তু উপরে যে নাটকটির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাতে কৌতুকের পথ ধরিয়াই প্রেমানুভূতি জীবনের গভীরতম স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ইহা এই নাটকটির একটি বিশেষ গুণ। আমাদের সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক অসমতাও স্বাধীন বা প্রেমজ বিবাহের একটি প্রধান অন্তরায়। কারণ অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তর অনুসরণ করিয়া সামাজিক জীবনের মেলা মেশা সাধারণতঃ সম্ভব হইয়া থাকে। যদিও সাম্প্রতিক প্রেমজ বিবাহ বিষয়ক অধিকাংশ নাটকেই বিত্তশালী পিতার কন্যার আদর্শে প্রণোদিত দরিদ্র যুবককে বিবাহ করিবার কথা বর্ণিত হইয়া থাকে, তথাপি বাস্তব জীবনে ইহা সর্বত্র সত্য হইতে পারে না। কারণ, একদিন বর্ণাশ্রম ধর্ম যে সামাজিক বিভাগকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল, আজ পারিবারিক জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থা সেই বিভাগ সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। তারপর এক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর সমাজের শিক্ষার অভাবের ফলে শিক্ষার বিষয়েও আরও একটি বিভাগ সৃষ্টি হইতেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের এই সকল বিভাগের মধ্যে নর-নারীর প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ নিজস্ব স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া যায় সুতরাং ইহা স্বাধীন প্রেমের যথার্থ অবকাশ সৃষ্টি করিতে পারে না। বাঙ্গালী যুবক একটি বিষয়ে পিতার এখন পর্যন্ত বড় অনুগামী তাহা বিবাহের বিষয়। সাধারণতঃ নিতান্ত বেপরোয়া (desperate) না হইলে কেহই পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে

পারে না। বাঙ্গালীর উত্তরাধিকারের যে নিয়ম তাহাতে পিতাকে স্বীকার না করার অর্থ, তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা। সুতরাং পুত্রের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও এই বিবাহের সহায়ক নহে। সুতরাং এই সকল নানা কারণে বাংলার সমাজে স্বাধীন প্রেমের যথার্থ অবকাশ এখনও রচিত হইতে পারে নাই।

সাম্প্রতিক কালে প্রেমজ বিবাহ সম্পর্কিত নাটক মধ্যে মধ্যে রচিত হইলেও ইহাদের সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট 'মডেল' বা ছাঁচ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে ইহাদের মধ্যে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীনতা দেখা যায়। যেমন, এই শ্রেণীর নাটকের নায়িকাগণ মাতৃহীনা হইবে; ধনী পিতার একান্ত স্নেহের দুলালী হইয়া যথেচ্ছাচারিতা করিবার অধিকার লাভ করিবে, তারপর স্বাধীনভাবে বিত্তহীন কোন যুবককে বিবাহ করিবে। বিবাহের পরও পিতৃসম্পত্তির উপর যথেচ্ছ অধিকার স্থাপন করিয়া স্বামীর বিত্তের অভাব পূর্ণ করিবে। এই কাহিনীর কাঠামোর মধ্যেই কিছু কিছু মান-অভিমান, বুঝা না বুঝার বৃত্তান্ত রচিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলনের পথে কোন বাধা হয় না। কিন্তু লেখক যদি রক্ষণশীল হয়, তবে কাহিনী মিলনান্তক না হইয়া বিয়োগান্তক হইতে পারে। অর্থাৎ পিতা যতই কন্যার প্রতি স্নেহপরবশ হোন না কেন, তিনি কন্যার স্বাধীন বিবাহে আপত্তি করিবেন। ইহাতেই কাহিনী বিয়োগান্তক হইয়া উঠিবে।

এ কথা সত্য, আমাদের সমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার পথে যতই অগ্রসর হোক না কেন, এখনও ভিতরে ভিতরে ইহার রক্ষণশীলতার প্রেরণা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইতে পারে নাই, সুতরাং প্রেমজ বিবাহের বিষয় কিংবা ঘটনা এখনও আমাদের সমাজে ঘটিবার পূর্ণ সুযোগ রচিত হয় নাই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেখানে বয়স্কা কুমারী অভিভাবকহীনা, কিংবা উচ্চশিক্ষা কিংবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া মাতাপিতার অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিয়াছে, সেখানে কয়েক ক্ষেত্রে এইভাবে স্বাধীন প্রেমমূলক বিবাহ সম্ভব হইতেছে। এমন কি, স্বাধীন বিবাহও যে সকল ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, সে সকল ক্ষেত্রেই অধিকাংশ স্থানে সবর্ণ-বিবাহই হইয়া থাকে, তবে কচিৎ তাহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। সুতরাং যেখানে সবর্ণের প্রতি লক্ষ্য থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেমজ কিংবা স্বাধীন বিবাহ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কদাচ সম্ভব হয় না। জাতি-বর্ণ

বিষয়ে সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীন প্রেম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কখনও বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার আরও একটি অন্তরায় আছে। পাশ্চাত্ত্য সমাজে প্রেমজ বিবাহ যেমন সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত, বাংলার সমাজে এখনও তাহা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নহে, বরং নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর বিবাহ স-বর্ণের মধ্যে হইলেও সাধারণতঃ হিন্দু বিবাহ হয় না, বরং তাহার পরিবর্তে নাগরিক অধিকার সূত্রে রেজিষ্ট্রি বিবাহ (civil marriage) হইয়া থাকে; এই শ্রেণীর বিবাহকে সমাজ এখন পর্যন্তও খুব ভাল চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও প্রেমজ বিবাহ যে সর্বদাই দাম্পত্য জীবনে শান্তি এবং স্থায়িত্ব আনিয়া থাকে, তাহা সত্য নহে; কারণ, সে সকল দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তবে পাশ্চাত্ত্য দেশে নারীর বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও যেমন, তাহার পুনর্বার বিবাহ হইতে কোন সামাজিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বাধা নাই, বাংলার সমাজে এখন পর্যন্ত সেই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে নাই। প্রেমজ বিবাহ এ' দেশে পরিবার কর্তৃক সমর্থিত নহে বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনে নানা ব্যবহারিক অসুবিধা দেখা দেয়। তাহার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদও হয়, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইবার পর নারীর পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে।

নবম অধ্যায়

অসবর্ণ বিবাহ

বিবাহ সম্পর্কে মনুসংহিতায় উল্লেখিত আছে,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥

অর্থাৎ দ্বিজাতি বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত পুনর্বিবাহে নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকই পর পর শ্রেষ্ঠ হয়,

শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচা প্রজন্মনঃ ॥

অর্থাৎ শূদ্রা ও বৈশ্যা বৈশ্যের বিবাহ-যোগ্যা, শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা এবং শূদ্রা, বৈশ্যা ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণের বিবাহ-যোগ্যা হইবে।

ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে অনুলোম বিবাহ বলে। মনু যখন তাহার স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন, তখন যে কোন কারণেই হোক, এই শ্রেণীর অনুলোম বিবাহকে তিনি সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্ত্রী যদি রত্ন-স্বরূপ বিবেচিত হয়, তবে তাহাকে হীনকুল হইতেও সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এই প্রকার মনোভাব 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' এই প্রকার উক্তি হইতেও জানিতে পারা যাইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু বাংলা দেশে পরবর্তী কালে যে সকল স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রকার অসবর্ণ বিবাহই নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যে বাংলা দেশেরই একটি বিশিষ্ট আচার ছিল, তাহা নহে, ক্রমে সমগ্র ভারত ব্যাপিয়াই হিন্দু সমাজের সকল স্মৃতি শাস্ত্রেই অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালা দেশের হিন্দু সমাজের উপর তাহারই প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালীর বিশিষ্ট কোন সামাজিক অবস্থা তাহার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী নহে। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য

করা যায় যে, বাংলা দেশের কোন কোন স্মৃতিশাস্ত্রের লেখক, যেমন জীমূত বাহন ও রঘুনন্দন তাঁহাদের 'দায়ভাগ' এবং 'দায়তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে পিতার সম্পত্তিতে অসবর্ণ বিবাহ-জাত পুত্রের অধিকার আছে কি না, তাহা লইয়া বিচার করিয়াছেন। তাহা হইতে এ'কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রঘুনন্দনের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সমাজ পর্যন্ত অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকা অসম্ভব ছিল না, নতুবা তাঁহাদের এই বিষয়ে আলোচনা করিবার বিশেষ কি কারণ ছিল? তবে আবার কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, ইঁহারা প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ীই তাঁহাদের আলোচনা করিয়াছেন, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার উপর তাঁহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। এই দাবী সর্বাংশে সত্য নাও হইতে পারে।

উপরি উদ্ধৃত মনুসংহিতার শ্লোক হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অনুলোম বিবাহের মধ্য দিয়া অসবর্ণ বিবাহের আংশিক স্বীকৃতি থাকিলেও তাহাও নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, মনুর উল্লেখ হইতেও দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় শূদ্রাকে কদাচ বিবাহ করিতে পারিত না। মনু লিখিয়াছেন,

ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্যোপদিশ্যতে॥

অর্থাৎ ইতিহাসাদি কোনও বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের বিপদকালেও শূদ্রকে ভার্যাত্বে গ্রহণের কথা নাই।

দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রা পত্নী গ্রহণের কি ফল হইতে পারে, এই বিষয়ে মনুসংহিতা বলিয়াছেন,

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ যদি মোহ বশতঃ হীন জাতীয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাহারা পুত্র পৌত্রাদি সহ সবংশে শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্য তনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥

অর্থাৎ শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন, ইহা অত্রি ও উতথ্য পুত্র গৌতম মহর্ষির মত। শৌনক মুনির মতে শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে পতিত হইতে হয়।

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥

অর্থাৎ শূদ্রাতে গমন করিলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয় এবং তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য থাকে না।

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তাং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি ॥

অর্থাৎ যে দ্বিজের দৈব, পিত্র্য ও আতিথ্য কার্য শূদ্র প্রধান, অর্থাৎ শূদ্রা গৃহিণী স্বরূপা হইয়া যাঁহার এই সকল কার্যে যোগ দেয়, তাঁহার সেই হব্য-কব্য দেব ও পিতৃলোকেরা গ্রহণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য দ্বারা স্বর্গ লাভও করিতে পারেন না।

বৃষলীফেন পীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্নবিধীয়তে ॥

অর্থাৎ শূদ্রার অধর-রসপানকারী, তাহার নিঃশ্বাস গ্রহণকারী এবং সেই শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদনকারী দ্বিজের আর নিষ্কৃতি নাই।

উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন হিন্দু-সমাজে অনুলোম বিবাহের ভিতর দিয়া অসবর্ণ বিবাহ আংশিক মাত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ সম্পর্কে প্রাচীন কিংবা পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্র সমস্তই সম্পূর্ণ নীরব। ইহা তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্তই ছিল না, তবে এই প্রকার বিবাহে প্রায়শ্চিত্তের বিধানের কথা কোন কোন স্মৃতিশাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়।

অসবর্ণ বিবাহ ব্যতাতও সগোত্র বিবাহ এবং যে-কন্যার সঙ্গে সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ আছে তাহার সঙ্গেও বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া বাংলা দেশের পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সাপিণ্ড্য বিচার অত্যন্ত জটিল, বিশেষতঃ এই বিষয়ে বিভিন্ন স্মৃতিকার বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন, তথাপি সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত সম্পর্কগুলিকে সাপিণ্ড সম্বন্ধ বলা হয়, যেমন—

১। 'পাত্রের পিতা এবং তাহার ঊর্ধ্ব ছয় পুরুষের প্রত্যেকের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত পাত্রের পিতৃ-সপিণ্ড, সুতরাং ইহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

২। পাত্রের পিতৃবন্ধু অর্থাৎ পিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভগ্নীপুত্র, পিতামহীর ভ্রাতৃপুত্র ইহাদের ঊর্ধ্বতন ছয় পুরুষের প্রত্যেকের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত পাত্রের পিতৃ-সপিণ্ড।

৩। পাত্রের মাতামহ ও তাহার ঊর্ধ্বতন চারি পুরুষের প্রত্যেকের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত পাত্রের মাতামহ-সপিণ্ড।

৪। পাত্রের মাতৃবন্ধু ও তাঁহার ঊর্ধ্বতন চারিপুরুষের প্রত্যেকের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত পাত্রের মাতামহ-সপিণ্ড।

নিম্নলিখিত সম্বন্ধগুলিকে পিতৃবন্ধুরূপে ধরা হয়, যেমন

১। পিতামহের ভাগিনেয়।

২। পিতামহীর ভগ্নীপুত্র।

৩। পিতামহীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

নিম্নলিখিত সম্বন্ধগুলিকে মাতৃবন্ধুরূপে ধরা হয়, যেমন—

১। মাতামহীর ভগ্নীপুত্র।

২। মাতামহের ভগ্নীপুত্র।

৩। মাতামহীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

উক্ত নিয়মগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে অমান্য করিলে কোন ত্রুটি হয় না। যেমন—

১। পাত্রের পিতৃকুল, পিতৃবন্ধুর কুল এবং মাতামহ-কুল ও মাতৃবন্ধুকুল হইতে ত্রিগোত্রান্তরিত করা হইয়াছে এরূপ কন্যা, উক্ত সপ্তম অথবা পঞ্চম পুরুষের মধ্যে হইলেও, বিবাহযোগ্যা বলিয়া গণ্য।

২। উপরোক্ত নিয়মের পরিবর্ত হিসাবে কেহ কেহ প্রধানতঃ পৈঠীনসি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, পিতৃপক্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ও মাতৃপক্ষের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ বর্জন করিয়া অন্য পুরুষের কন্যা বিবাহযোগ্যা বলিয়া বিবেচিত। শূলপাণির মতে, এই পরিবর্ত ব্যবস্থা (ব্রাহ্মণের পক্ষে ?) আসুরাদি চারিপ্রকার নিন্দিত বিবাহে এবং ক্ষত্রিয়াদির (সমস্ত প্রকার ?) বিবাহে প্রয়োগ যোগ্য। শূলপাণির এই মত-সম্বন্ধে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, 'যোগ্যতর পাত্রের অভাবেই শুধু এই নিয়ম চলিতে পারে। কিন্তু শূলপাণির গ্রন্থ হইতে এরূপ কথা বুঝা যায় না। রঘুনন্দন বলেন, পৈঠীনসির বচনের মর্মার্থ এই যে, পঞ্চম ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে বিবাহ অধিকতর পাপজনক ; সপ্তম ও পঞ্চম পর্যন্ত পুরুষের মধ্যে বিবাহ জনিত পাপ অপেক্ষাকৃত হাল্কা। পাত্রের বিমাতার ভ্রাতুষ্পুত্রী, এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর কন্যাও তাহাদের বিবাহের অযোগ্যা।' (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী' ; ১৩৬৮ পৃঃ ৬১-২)।

হিন্দুসমাজে সগোত্র বিবাহও নিষিদ্ধ। নিজের গোত্রের বাহিরে বিবাহ

করিবার রীতিকে ইংরেজিতে Clan exogamy বলে, ইহার আর একটি রূপ territorial exogamy, নিজের গাঁই বা অঞ্চলের বাহিরে বিবাহ করিবার রীতিকেই territorial exogamy বলা হয়। পৃথিবীর বহু আদিম সমাজেই exogamous বিবাহ পদ্ধতি অর্থাৎ নিজের গোত্রের কিংবা নিজের অঞ্চলের বাহিরে বিবাহ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর বিবাহের উপকারিতা সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিত সমাজ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ মনে করেন, হিন্দু সমাজে প্রচলিত সবর্ণ এবং অসগোত্র বিবাহ পদ্ধতি আদর্শ স্থানীয়। কারণ, ইহার মধ্য দিয়াই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা সহস্র বৎসর ধরিয়া রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ আজও যে সমাজের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত, ইহার কারণ, নিজের বংশধারার পবিত্রতা যাহাতে রক্ষা হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক হইয়াই হিন্দুর বিবাহ বিধি রচিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগ হইতেই যদি বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্টি না হইত, আর্য এবং অনার্যের তখন হইতেই যদি যথেচ্ছ সংমিশ্রণ হইতে আরম্ভ করিত, 'দাস' এবং 'দস্যু'-দিগের সঙ্গে তখন হইতেই যদি বৈদিক সমাজ সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া না চলিত, তবে আজ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অন্য প্রকার হইত। দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা মার্কিন দেশে যে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গের বিবাহ ব্যাপারে এত বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্য ইহাই। সুতরাং সবর্ণ বিবাহের ভিতর দিয়াই কেবলমাত্র কৌলিক সংস্কারের ধারা অব্যাহত থাকিতে পারে। তবে কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক এবং জৈব কারণে একান্ত সবর্ণ বিবাহও যে কল্যাণজনক নহে, তাহাও এ'দেশের সমাজ উপলব্ধি করিয়াছিল ; সেইজন্যই সগোত্র বিবাহ এবং সপিণ্ড সম্বন্ধ যে কন্যার সঙ্গে যে পাত্রের আছে, সেই কন্যা তাহার বিবাহের অযোগ্যা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আধুনিক কোন কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এ'কথা নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন যে, সগোত্র বিবাহই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, অসবর্ণ বিবাহ ত দূরের কথা, অসগোত্র বিবাহও তাঁহারা সমর্থন করিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন যে, সাম্প্রতিক কালে পৃথিবী ব্যাপী পাশ্চাত্ত্য জাতির সঙ্গে প্রাচ্য জাতির মিশ্রণ হইয়াছে, তাহার ফলে ভারতে Anglo Indian, ব্রহ্মদেশে Anglo-Burmese চীনদেশে Anglo Chinese এই সমস্ত সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে ; অসবর্ণ বিবাহের পরাকাষ্ঠা ইহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এই সকল জাতির মধ্যে প্রকৃত মনীষা বলিতে যাহা বুঝায়, আজ পর্যন্ত

তাহা সৃষ্টি হইতে পারে নাই। অথচ বর্ণাশ্রম ধর্ম পীড়িত, সবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হিন্দুসমাজের মধ্যেই যুগে যুগে বিস্ময়কর মনীষার আবির্ভাব হইয়াছে। ব্রাহ্মণের সমাজ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগে বিভক্ত—সগোত্র কিংবা সাপিণ্ড্য সম্পর্ক বাদ দিয়াও এক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই ইহাতে বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা সত্ত্বেও শঙ্করাচার্য হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ, ইঁহাদের মত মনীষা ইহার মধ্য হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। ইংরেজ একটি শ্রেষ্ঠ জাতি, তাহার সঙ্গে অনেক ভারতীয়ের বিবাহাদি হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দুই শত বৎসরের ইতিহাসে ইহাদের এমন কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই, যাহাদিগকে হিন্দু বিবাহপদ্ধতি-শাসিত সমাজের উপরোক্ত সুসন্তানদিগের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। অথচ ইংরেজ জাতির সমাজে যেখানে সগোত্র কিংবা সাপিণ্ড্য বিবাহে কোন বাধা নাই, সেখানেও প্রতিভাশালী সন্তানের জন্ম হইতেছে; সুতরাং তাঁহাদের মতে রক্তের সম্পর্ক যাহাদের যত নিকট হইবে, তাহাদের বিবাহে সন্তানের জন্ম সেই পরিমাণে শুভদায়ক হইবে এবং সম্পর্ক যতদূর হইবে, সেই পরিমাণেই মনীষী সন্তানের জন্মের সংখ্যা হ্রাস পাইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে সগোত্র বিবাহই আদর্শ বিবাহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুকাল পূর্বে নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মিলনীতে সগোত্র বিবাহের সপক্ষে নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ নানাদিক হইতে আলোচনা করিয়া ইহার স্বপক্ষেই সকলে নিজেদের মত ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে সগোত্র বিবাহই আধুনিক জীব-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হয়, সেখানে অসবর্ণ বিবাহের বৈজ্ঞানিক সমর্থনের কথা আসিতেই পারে না। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ যেমন হিন্দুর শাস্ত্র-সম্মতও নহে, তেমনই বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে যাঁহারা পরিবারের ভবিষ্যৎ কল্যাণ কামনায় বিবাহাদি সংস্কার পালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষেও সমর্থনযোগ্য নহে। আমাদের নাগরিক সমাজে ইহা এখনও ব্যক্তিগত ব্যাপার (Personal affair) হইয়া আছে, সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবনে ইহার কোন স্বীকৃতি নাই। এই শ্রেণীর বিবাহ হিন্দুবিবাহও নহে, রেজিষ্ট্রি বিবাহই করিতে হয়, এই বিবাহ-জাত সন্তান পিতৃপিণ্ডদানের অধিকারী হইতে পারে না।

অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কিত কোন নাটক উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয় নাই, হইবার কথাও নহে। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতে যে সামাজিক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, তাহা মানবিকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ-সংস্কার মূলক আন্দোলন ছিল, সমাজ-বিদ্রোহ মূলক আন্দোলন ছিল না। বিশেষতঃ অসবর্ণ বিবাহ, যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে আজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা কোনদিন বৃহত্তর সামজিক আন্দোলনের বিষয়ীভূত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ সমাজ সংস্কারের প্রেরণা হইতে ইহার প্রচলন হয় নাই। নিতান্ত ব্যক্তিগত খেয়াল খুসী মিটাইবার জন্যই ইহাদের এক একটি অনুষ্ঠান এখনও যেমন হইতেছে, পূর্বেও তেমনই হইত, তবে ইংরেজ প্রবর্তিত Civil Marriage Act অনুসারে ইহা আইনগত স্বীকৃতি লাভ করিবার পর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত পরিবারে ইহার কিছু কিছু প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন পরিবারের মধ্যে ইহা প্রচলিত হইয়াছে, এই কথাটিকেও বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যৌথ পরিবারের মধ্যে যদি কেহ অসবর্ণ বিবাহ করে, তবে পরিবারের সহযোগিতায় এবং সমর্থনেই যে তাহা করে, তাহা নহে—অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া স্বাধীন ভাবেই ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। Civil Marriage Act অনুযায়ী এই সকল বিবাহ কেবল মাত্র দুইজন সাক্ষীর দস্তখতের উপরই, সাধারণতঃ পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে গোপন করিয়াই হইয়া থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের প্রগতিশীল পরিবার যদি উচ্চবর্ণের কন্যা কিংবা পাত্র লাভ করিতে পারে, তবে Civil Marriage Act-এ রেজিষ্ট্রি হইবার পরও একটি সামাজিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অর্থ দ্বারা পুরোহিত পাইতে আজকাল নাগরিক সমাজে অভাব হয় না। এই প্রকার অর্থলোভী পুরোহিত দ্বারা একটি বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া ইহার একটি সামাজিক রূপ প্রকাশ করা হয়। গৃহে যদি এই অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হয়, তবে কালীঘাটে এক শ্রেণীর পুরোহিত অতি সহজেই এই কার্য নিষ্পন্ন করিয়া দিয়া তাহাদের নিধারিত অর্থ গ্রহণ করে। ঘর পালানো ছেলেমেয়েও কালীঘাটে আসিয়া কোন পুরোহিতের দ্বারা সামান্য মালাবদলের মত একটি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সম্প্রতি পুলিশ এই কার্যে লিপ্ত পুরোহিতদিগের উপর নির্দেশ দিয়াছে যে, এই শ্রেণীর প্রতিটি বিবাহের সংবাদ

বয়কন্যার নাম-ধাম থানায় জানাইয়া তবেই বিবাহ নিষ্পন্ন করিতে হইবে। পরিণত বয়স্ক পাত্রপাত্রী যদি স্বেচ্ছাক্রমে এই পথে পা বাড়াইয়া থাকে, তবে পুলিশ কিংবা অভিভাবকগণ আইনতঃ কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু কন্যা যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া অভিভাবক অভিযোগ করে, তবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান হয়, অনুসন্ধানের ফলে যদি জানিতে পারা যায় যে, কন্যা প্রকৃতই অপ্রাপ্তবয়স্কা, তবে তাহার জন্য পাত্রকে দণ্ডভোগ করিতে হয়।

সুতরাং এই শ্রেণীর বিবাহ সামাজিক সমর্থন লাভ করা দূরের ত কথা, পারিবারিক সমর্থনও লাভ করিতে পারে নাই। এখনও বাংলার সমাজ-জীবন যে সকল পরিবার দ্বারা গঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে তিন পুরুষ অনেক ক্ষেত্রেই একসঙ্গে বাস করে, এই তিন পুরুষের রুচি এবং নীতি বোধ এক নহে, বরং তিন প্রকারের হইবারই সম্ভাবনা অধিক। তিন পুরুষ যে পরিবারে নাই, সেই পরিবারে দুই পুরুষ এক সঙ্গে বাস করে। এই দুই পুরুষের মধ্যেও নীতিগত আদর্শের দিক দিয়া পার্থক্য অনুভব করা যায়। পুত্র অসবর্ণ বিবাহ করিলে মাতাপিতা তাহার বিরোধী হইয়া থাকেন, পুত্রকে বাধ্য হইয়া পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হয়। আর্থিক কারণে কোন কোন সময় পুত্রের উপর নির্ভরশীল মাতাপিতা এমন পুত্রের পরিবারে বাস করিলেও, পরিবারস্থ সকলের মধ্যে কোন আন্তরিকতার যোগ স্থাপিত হইতে পারে না, কোন উপায়ে দিনগত পাপক্ষয় ব্যতীত এই সকল পরিবারের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হইবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে ব্যবস্থা পরিবারই গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেই ব্যবস্থা সমাজ কি ভাবে গ্রহণ করিবে? অন্যান্য বিষয়ের মত অসবর্ণ বিবাহ কোন সামগ্রিক সামজিক চেতনার ফল নহে, ইহার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সামগ্রিক ভাবে সমাজের মধ্য দিয়া কোনদিন বিকাশ লাভও করিতে পারে নাই ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী চরিতার্থ করিবার জন্য সমাজ, ধর্ম ও পরিবার নিরপেক্ষ এই প্রকার যে কয়েকটি অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়, তাহাও ব্যাপকভাবে সামাজিক দুশ্চিন্তার কারণ হয় নাই।

সুতরাং ইহার মধ্যে সামাজিক নাটক রচনার যে উপাদান আছে, তাহা নহে। তবে বিংশতি শতাব্দীতে দুই একটি সামাজিক নাটক যে এই বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর কোন নাটকই বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ব্যবসায়ী রঙ্গ-মঞ্চের ভিতর দিয়াই হউক, এমন কি সৌখীন রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া বৃহত্তর

দর্শকগোষ্ঠীর মধ্যেই হউক, এই শ্রেণীর নাটক অভিনীত হয় নাই। ক্বচিৎ এক আধটি সৌখীন অভিনয়ের মধ্যেই ইহাদের পরীক্ষামূলক কার্য সীমাবদ্ধ আছে। সুতরাং বাংলা সামাজিক নাটকের ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়া যে এই শ্রেণীর নাটক বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা নহে। সুতরাং এই গ্রন্থে এই পরিচ্ছেদটি সংযোগ না করিলেও কোন ক্ষতি হইত না, তথাপি দুই একজন সাম্প্রতিক শক্তিশালী লেখকও এই শ্রেণীর দুই একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ যোগ করিয়াছি।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রয়োজনেও আজ যে দুই একটি অসবর্ণ বিবাহের অনুষ্ঠান না হইতেছে, তাহা নহে ; কিন্তু ইহাদের সম্পর্কে প্রথম এবং প্রধান কথা এই যে, ইহারা ব্যক্তিগত বিষয়ের সীমাবহির্ভূত কদাচ হইতে পারিতেছে না। তবে ইহার মধ্যে যে একটি মনস্তাত্ত্বিক সামঞ্জস্য বিধানের দিক আছে, তাহা লইয়া নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টির যে অবকাশ আছে, তাহা অস্বীকার করতে পারা যাইবে না। অসবর্ণ বিবাহের সম্ভাব্য পরিণতি কি হইতে পারে, তাহা এখনও খুব স্পষ্ট নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিতে বেগ পাইবার প্রয়োজন হয় না। মানসিক এবং পারিবারিক জীবনে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয় লইযা এই শ্রেণীর নাটক রচিত হইতে পারে, কিন্তু 'বর্ণ' সম্বন্ধে সমাজ যে কেবল আজ গুরুতরভাবে কিছুই চিন্তা করে না, তাহা যেমন সত্য, আবার বর্ণের বিষয় লইয়া মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার মধ্যেও হিন্দুর জাতি-বিভাগকে গুরুত্ব দিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে ইহার যে স্থানই থাকুক না কেন, বিংশতি শতাব্দীর সমাজে যে তাহা নাই, তাহা সত্য ; সুতরাং হিন্দুসমাজের বর্ণ কিংবা জাতিকেই একান্ত ভিত্তি করিয়া এ যুগে কিছুই রচিত হইতে পারে না ! বিংশতি শতাব্দীতে যে সকল সামাজিক নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা শুধু জাতি এবং বর্ণ কেন, হিন্দুসমাজের কোন সমস্যাই তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই ; একদিকে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের আদর্শের সঙ্গে বিশ্বমানবিকতা বোধের সংঘর্ষ, কিংবা সমাজের নিকট ব্যক্তির দাবী ইত্যাদি বিষয় লইয়াই এই যুগে সামাজিক নাটক রচিত হইয়াছে। অসবর্ণ বিবাহ কোন দিনই একটি দাবী হিসাবে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই। ইহার মধ্যে জাতি এবং বর্ণগত সঙ্কীর্ণতার কথা আসিয়া যায় বলিয়াই ইহার চিন্তাও আধুনিক সমাজ সর্বতোভাবেই পরিহার করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং

যে কারণেই অসবর্ণ বিবাহ আজ সমাজের মধ্যে দুই একটি সংঘটিত হোক না কেন, তাহা সমাজে প্রচলিত হয় নাই, এ কথা সত্য।

বিধবা-বিবাহও অন্তরের দিক দিয়া যে বৃহত্তর সমাজ কোন দিন চাহে নাই, ইহা আইন দ্বারা সমর্থিত হইবার পরও যে-ভাবে সমাজের উপেক্ষার বিষয় হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহের সম্পর্কে ইংরেজ প্রবর্তিত আইনের যে সমর্থনই থাকুক না কেন, হিন্দু সমাজের জীবনে তাহা যোগ স্থাপন করিবার দিন আজও আসে নাই। সেইজন্যই ইহা বাংলার সামাজিক নাটক-উপন্যাসের বিষয়ও হইতে পারে নাই। তথাপি পূর্বেই বলিয়াছি, সাম্প্রতিক কালে দুই একজন শক্তিশালী লেখক এই বিষয়ে দুই একখানি নাটক রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' নাটকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার কাহিনী অনুসরণ করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন সুস্থ এবং স্বাভাবিক সমাজ জীবনের মধ্য হইতে নাট্যকার এই বিষয়বস্তুর সন্ধান লাভ করেন নাই, বরং পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু-জীবনের অধিবাসী সমাজের মধ্য হইতেই ইহার বিষয়বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতেও বাংলার সমাজ জীবনের স্বাভাবিক কোন রূপের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। ইহার কাহিনীটি এই প্রকার,—

শহরের উপকণ্ঠে উদ্বাস্তুগণ আসিয়া সাময়িক বাসস্থান নিজেরাই গড়িয়া লইয়াছে, ইহার নাম দিয়াছে 'শান্তি কলোনি'। নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এখানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া কায়ক্লেশে দিন যাপন করে। পূর্ব বাংলার কোন গ্রামের সাধারণ এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরেন মাষ্টার স্ত্রী শঙ্করী আর অনূঢ়া কন্যা গৌরীর হাত ধরিয়া এই 'শান্তি কলোনী'তে আসিয়া উঠিয়াছেন। অত্যন্ত কষ্টে দিনপাত করেন। একটি পাঠশালা করিয়াছেন, সেখানেও ছাত্রের অভাব, যাহারা আছে, তাহারাও মাহিনা দিতে পারে না, সুতরাং ইহার আয়ে তাঁহার কিছুই হয় না, তথাপি কেবল মাত্র অর্থের জন্যই নহে, আদর্শের জন্যই হরেন মাষ্টার প্রত্যহ পাঠশালা ঘরের শূন্য বেঞ্চির দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন। ছোট ভাই কেশবলাল কর্মের সন্ধানে শহরে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ নাই। হরেন মাষ্টারের মনে নিদারুণ দুঃখ, মাথায় সুগভীর চিন্তার জট, এই ছিন্নমূল জীবনের পরিণতি কোথায়? শ্মশানের ডোমের মত মড়া আগলাইয়া আর কতদিন বসিয়া থাকিতে হইবে কে জানে? এমন সময় শহর হইতে কেশবলাল স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে সে রশনিং ডিপার্টমেণ্টে অস্থায়ীভাবে

চাকুরি পাইয়াছে, তাহার শহরের বাড়ীতে দাদা বৌদি আর গৌরীকে লইয়া যাইতে চায়। মরা গাঙ্গেও জোয়ার আসে। দারিদ্র্যপীড়িত হরেন মাষ্টারের অত ছোট্ট সংসারেও সেই সংবাদে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। জিনিসপত্র গোছ গাছ সুরু হইল। হরেন মাস্টার এবং তাহার পরিবার শহরে আসিল। কিন্তু ছিন্নমূল জীবনে শান্তি কোথায়? কেশবের চাকুরী সামান্য। তাহার আয়ে সংসার চলে না। বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে। জমিদারের দারোয়ান বকেয়া ভাড়ার জন্য তাহাকে অপমান করিয়া যায়। হরেন মাস্টার নিরুপায়—গুরুগিরি ছাড়া জীবনে আর কিছুই জানা নাই,—তবু ভগ্নহৃদয় হন না। সবার অলক্ষ্যে কলিকাতার রাস্তায় ছোট ছেলেদের খেলনা পুতুল ফেরি করিয়া বেড়ান। পরিশ্রম হয়, কিন্তু আয় বাড়ে না। অবশেষে একদিন বাড়ীওয়ালা আসিয়া মারধর করিয়া তাঁহাদের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। কেশবকে জেলে ধরিয়া লইয়া গেল। আবার পথ। প্রতিবেশী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জনতা সমবেতভাবে সহানুভূতি জানাইল, কিন্তু বাড়ীর বারান্দার নীচটুকুও কেহ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না; সাহায্য আসিল অপ্রত্যাশিত ভাবে;—নিকটস্থ বস্তির সর্বজনীন মাতা শৈলবুড়ী আসিয়া ছিন্নমূল পরিবারটিকে তাহাদের বস্তির তাড়ীঘরে আশ্রয় দিল। ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। হরেন মাস্টার শ্রমিক জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য, সহানুভূতি, নীচতা সব কিছুর সাক্ষাৎ পাইলেন। দেখিলেন, ভালয়-মন্দয় মানুষ হিসাবে ইহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। শঙ্করীর কিন্তু ভাল লাগে না। আজীবন মধ্যবিত্ত সংস্কার তাহার মনকে আরও বিরক্ত করিয়া তোলে। তাহার উপর কন্যা গৌরীর সহিত শৈলীবুড়ীর ছেলে কানাইয়ের ঘনিষ্ঠতা তাহার ভাল লাগে না। এই ঘনিষ্ঠতার কথা হরেন মাস্টারও জানেন। নাটকীয় ভাবে একদিন তাঁহার কাছে ইহাদের অন্তরের কথাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বিচলিত হয়ত হন, কিন্তু ধৈর্য হারান না। দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—'পিছু হটি নাই, পিছু হটবোও না। আমার বাধা এক সংস্কার। কিন্তু ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যেটা সত্য, তারে আমি অস্বীকার করতে পারুম না। এ বিয়াই হইব।' সানাই বাজে। মধ্যবিত্ত স্কুলশিক্ষক হরেন মাস্টারের কন্যার সহিত বস্তিবাসী শৈলীবুড়ীর শ্রমিক সন্তান কানাইয়ের বিবাহ হয়। বিবাহ রাত্রেই অভাবনীয় আর এক দুর্যোগ ঘনাইয়া আসে। বহুদিন ধরিয়া বস্তি উচ্ছেদের জন্য জমিদারের সহিত বস্তিবাসীর কলহ চলিতেছিল; সেই কলহ মার মূর্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইল। বিবাহ রাত্রেই জমিদার দলবল আনিয়া বস্তিতে

আগুন দিয়া বস্তি উচ্ছেদ পর্ব সুরু করিল। অসহায় বস্তিবাসীর আর্তকণ্ঠে—শৈলী বুড়ীর কান্নায় আকাশ বাতাস মুখরিত হইল। হরেন মাস্টার বিচলিত হন না। আজীবন সংগ্রামের কষ্টিপাথরে জীবন-সত্য যাচাই করা হইয়া গিয়াছে—সেই দারুণ দুর্দিনে অন্নক্লিষ্ট বৃদ্ধ হরেন মাস্টারের দেহ জ্যামুক্ত ধনুকের মত ঋজু হইয়া যায়; সমবেত বস্তিবাসীদের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া তিনি ঘোষণা করেন জীবন-সংগ্রামের বাণী—'টিপ নি দেখছ বুড়ী রক্ত চন্দনের—এই দেখ আর হুই দেখ। বিয়া গেছে কাইল, আইজ হবে বাসি বিয়া। কোন রাজার বেটার বিয়ায় এমন ধুম হইছে কইতে পার বুড়ী—এত বাজনা - এত বাইন্থ —হেই বিশ্বকর্মার পুতের দল, চুপ কইর্যা খাড়াইয়া আছস--হাত লাগাইতে পারসনা তরা—হাত চালাও, কাম কর--উঠাও বস্তি'—হাতে হাতে আবার ঘর গড়িয়া উঠে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার স্বাভাবিক সমাজ জীবন হইতে নাট্যকার এই কাহিনীর সন্ধান পান নাই, বিপর্যস্ত উদ্বাস্তু জীবন হইতেই ইহার সন্ধান লাভ করিয়াছেন। উদ্বাস্তু জীবনের বিপর্যয়ের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে, তাহা কোন ক্ষেত্রেই বাংলার স্বাভাবিক সমাজ জীবনের রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং ইহাদের মধ্য দিয়া বৃহত্তর বাংলার সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক বিবর্তনের কোন ধারারই সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে না। তথাপি বাঙ্গালী নাট্যকারের মধ্যেই যে এই চিন্তার উদয় হইয়াছে. এই পরিবেশে অসবর্ণ বিবাহকেও সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চাহিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখা যাইতে পারে।

বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইয়ের সঙ্গে শিক্ষকের কন্যা গৌরীর একটি সহজাত প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহার যে পরিণতি এই নাটকে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নাট্যকারের ভাষাতেই এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

[বেরুতে গিয়ে মুখোমুখি হয় গৌরীর।

গৌরী। কেমন আছ কানাইদা। খবর নিতে আসলাম।

কানাই। ভাল, খুব ভাল। ভাল আছি আমি।

গৌরী। আচ্ছা কানাইদা?

কানাই। আচ্ছা। (যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়) কি, কিছু বলছিলে আমাকে?

গৌরী। বলছিলাম ··

কানাই। কি হল? বলো।

গৌরী। (সলজ্জে) না, বলছি…

কানাই। তোমারও হল তো? আমারও হয় অমনি তোমার দিকে তাকিয়ে। বলতে গিয়ে কথা ভুলে যাই। একটা কাজের কথা বলবার সময় এই রকম হলে এমন বিশ্রী লাগে!

গৌরী। আমার দিকে তাকাইয়া তোমারও বুঝি এই রকম হয় কানাইদা। তা কই, কও নাই তো?

কানাই। এ বলবার কি আছে? এ একটা আহাম্মকির কথা—নিজেকে এমন বোকা বোকা লাগে। কোথাও কিছু নেই, ঝট্‌সে হাবাগোবা হয়ে গেলাম। মাথা সাফ্‌ বিলকুল বুদ্ধু, আ রে!

[কানাই হাসে মন খোলা আনন্দে।

যাক, এই একটা ব্যাপার হয় বুঝলাম। তা, কি যেন বলবে বলছিলে?

গৌরী। তোমারে বলা? না, থাক কানাইদা। তুমি অন্য মানুষ; তুমি বুঝবা না।

কানাই। —অন্য মানুষ ঠিকই। তবু মানুষ তো। বললে ঠিকই বুঝবো। বলো।

গৌরী। বাবা তোমারে কিছু কইছে? এই যাওয়ার বিষয়? আমার মতামতের তো কোনো মুল্য নাই। বাবা মা যা ঠিক করব তাই তো হইব।

কানাই। হ্যা মাষ্টারমশাই যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন। আমাকে ঘর খুঁজতে বললেন। দেখি, আজই একটা সন্ধান পাবার কথা আছে। এখানে থাকা নিয়ে আমি তো তাঁকে জোর করতে পারি না।…কত করে এই ইস্কুলটা গড়লাম। মাষ্টারমশাই চলে গেলে ইস্কুল টিকবে না। মাষ্টার মশাই যাবেন, তুমিও যাবে—কি করে চলবে ইস্কুল?

গৌরী। তুমি চালাবে।

কানাই। সে হয় না গৌরী। তোমরা ছাড়া কি করে চলবে ইস্কুল? …যাগ্‌গে, এবারে হল না, আর বারে হবে। হবে ঠিকই। তবে কি জানো গৌরী, বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। ঝুটমুট দেরী হয়ে যাচ্ছে

কিছু এগোচ্ছে না। কি করব? যাবে, যাও।...আর সত্যি এখানে তোমাদের অনেক অসুবিধা, ঠিক ঠিক মানায়ও না বুঝি। এখানে কি আছে? কিছু নেই। কারো ভালবাসার মত করে তো এখনও বস্তিটা গড়তে পারিনি।...ভাল না বাসলে কেউ কি কখনও থাকে? কেউ থাকে না। (কানাই-এর প্রস্থান)

(নেপথ্যে হরিধনের কণ্ঠে...'হয়ে গিয়েছে' 'হয়ে গিয়েছে' – দলবল সহ হরিধন এসে হল্লা করে পরোয়ানা টাঙিয়ে যায়।)

হরিধন। বুড়ী, অ বুড়ী। নেই। তো দে লটকে ডিক্রী। দরজার গায়ে বেশ করে সেটে দে।...ঠিক আছে। উঠবে না! এইবার বাপ্ বাপ্ বলে উঠতে হবে।

(দলবলসহ হরিধনের প্রস্থান। শঙ্করী সচকিত হন দেখে শুনে। হরেন্দ্রর প্রবেশ)

শঙ্করী। শোন, আইজ কিন্তু আস্তানা একটা স্থির কইরাই ফিরবা। এইখানে আর এক মুহূর্ত না।

হরেন্দ্র। কেন কি হইছে কি?

শঙ্করী। হইছে, কারণ আছে। মন স্থির কইরা যাও।

হরেন্দ্র। মন তো স্থিরই ছিল, আবার অস্থির হইয়া গেল।...পিছাইলাম কতখানি তুমি খালি তাই দেখ। সেই সাথে আউগাইলাম যে কতদূর তা তোমার নজরে পড়ে না। কি কমু! তুমি দেখলা আমারে পরাজিত, অপহত একটা বেটা ছেইল্যা, যার একটা কোনো শিরদাঁড়া নাই। কিন্তু একটা কথা আইজ তোমারে আমি কই। শঙ্করী, দুঃখে পড়ছি ঠিকই, তামসিক পুরুষকারের আস্ফালন— সেও আমি করতে পারলাম না যা নাকি তোমার চোখে ভাল ঠেকতো। কিন্তু তুমি তো আমার দেশের স্ত্রী, আমার দেশেরই মা-জননী।—তোমারে কিন্তু আমি আমার দুদিনে খুঁইজা পাইলাম না।

("একলা চল একলা চল" লাইনটা জোরে বাজতেই হরেন্দ্রর প্রস্থান।)

শঙ্করী। আমার হইছে উভয় সংকট। রামেও মারব, রাবণেও মারব। এত মাইনষের মরণ হয়, আমারে যম চক্ষে দেখে না। (শঙ্করীর প্রস্থান)।

কানাইয়ের প্রবেশ

কানাই। মাষ্টারমশাই, মাষ্টারমশাই, মাষ্টারমশাই?

গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। কি! ঘরের খবর আনছ বুঝি কানাইদা?

কানাই। হ্যাঁ•• পেলাম একটা তাই সন্ধান দিতে এলাম।

গৌরী। তুমিও তাড়াইতে চাও কানাইদা?

কানাই। তাড়াতে চাই? কি বলছ গৌরী? এত করেও রাখতে পারলাম না তোমাদের, আবার বলছ তাড়াচ্ছি?

গৌরী। এত করে, কত করে কানাইদা? কয়টা দিন নয় থাকতেই দিছ। কিন্তু আজ তো তাড়াতেই চাও।

কানাই। তাড়াতে চাই?

গৌরী। চাও-ই তো। ঘরের সন্ধান দিবার মানে কি কইতে পার? কিছু বুঝি না, না?

কানাই। কি বলব তোমরা ভদ্দরলোক, তোমাদের বুঝ্-ই আলাদা। আমাদের মত গরীবগুরবো লোক তোমাদের মন পাবে না গৌরী। এলে দায়ে পড়ে, থাকলে গরজে, ভাব দেখালে কৃতার্থ করলে আমাদের। আজ সুবিধামত চলে যাবে—বলছ তাড়িয়ে দিচ্ছি—আমরা হলাম বদনামের ভাগীদার। কি বলব, ভগবান থাকলে তাকে তোমাদের দয়া করতে বলতাম গৌরী। যাগ্‌গে সে কথা। চলে যখন যাবেই তখন যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি······ মাষ্টারমশাইকে দিতে ভরসা হয় না, তিনি হয়তো রাগ করবেন। তাই তোমাকেই দিচ্ছি আমাদের বস্তির পক্ষ থেকে এই টাকাটা। গরীব ইস্কুল আমাদের, এর চেয়ে বেশী কিছু তোমাদের দিতে পারল না গৌরী! (গৌরী টাকার তোড়া ফেলে দেয়।)

গৌরী। গরীব গরীবের মত থাকো। পুরস্কারের দরকার নাই আমাদের।

(কেঁদে ফেটে পড়ে।)

কানাই। এ আমার অনেক কষ্টের সঞ্চয় গৌরী, তুমি ফেলে দিলে?

নেপথ্যে শঙ্করী। গৌরী!!

গৌরী। হ্যাঁ দিলাম, আমি ফেলেই দিলাম কানাইদা। তুমি যাও, তুমি কি?

কানাই। গৌরী, তুমি কাঁদছ। আমি তো অপমানের কথা তোমাকে কিছু বলিনি।

গৌরী। থাকতে দিলা না, আবার পুরস্কার দিয়া অপমান।

কানাই। গৌরী, গৌরী, গৌরী, গৌরী, গৌরী, গৌরী, গৌরী…

শঙ্করীর প্রবেশ

শঙ্করী। এ কি, গৌরী! গৌ…। (কানাইয়ের দ্রুত প্রস্থান)…কি হয়েছে, আমারে তুই কবি তো!

গৌরী। তুমি যাও না মা। (গৌরীর প্রস্থান।

শঙ্করী। আমি জানি একদিন একখান হইবই। ছি ছি ছি ছি! বে ইজ্জতির আর বাকি থাকল কি? কত কইছি, দেখ—এই সব ছোটলোকগুলার থিকা মাইয়ারে বাঁচাও, রক্ষা কর মান ইজ্জত। না, বস্তি আমার বড় ভাল। এখন সামলাউক আইসা। ছি ছি ছি ছি।

হরেন্দ্রর প্রবেশ

হরেন্দ্র। কি, হয়েছে কি? কি ব্যাপার?

শঙ্করী। ব্যাপার কি, দেখ যাইয়া। এত বড় আস্পর্দা ঐ কানাইয়ের যে চোখের উপুর মাইয়ারে আমার বে-ইজ্জতি করে?

হরেন্দ্র। গৌরী, গৌরী!

শঙ্করী। মাইয়ারে ডাক, কি হইছে মাইয়া তোমারে অখন খুইল্যা কইব নাকি? তাই কি কোন মাইয়া কয়? ঘরের থিকা বাইর হইতেই দেখি মাইয়া আমার আকুল হইয়া কান্তাছে, আর ঐ অলপ্পাইয়া বেটা কানাই, সুট সুট সুট সুট কইরা পলাইতেছে। ডাকলাম—কানাই, কানাই, তা দে চম্পট। এখন বোঝ।

হরেন্দ্র। বুড়ী, ও বুড়ী, বুড়ী!

শঙ্করী। আমি কবে থিকা কইত্যাছি, দেখ, বয়স্থা মাইয়া…

শৈলীর প্রবেশ

শৈল। কেন, কি হইছে কি? বাবারে, যেন ডাকাত পড়েছে। কি, হয়েছে কি?

হরেন্দ্র। এই যে বুড়ী! শুনছ ঘটনা। এ সব ব্যাপার কি বুড়ী? টিকতে দিবা না স্থির করছ?

শৈলী। কি, হয়ছে কি?

হরেন্দ্র। আমি তো বাড়ী ছিলাম না।

শৈলী। —না, ঘর ঠিক করতে গিছলে শুনলাম।

হরেন্দ্র। হ, তা সকাল বেলা বাইর হইছি, বাড়ী ফিরা৷ শুনি—কি বিশ্রী ঘটনা বল—তোমার ছেলে কানাই, আমার মাইয়ারে নাকি বে-ইজ্জতি করছে।

শৈলী। কি করেছে আমার ছেলে তোমার মেয়ের ?···

হরেন্দ্র। দেখ যাইয়া সে মেয়ে কাইন্দা কাইটা···ছি ছি ছি ছি।

শৈলী। কি করে ? তা হয় না মাষ্টার। (ডাকে) কানাই। এই কানাই!

নেপথ্যে কানাই।—যাই।

হরেন্দ্র। মাত্র তো দুইটা দিন। আজ বাদে কাইল হয়তো চইলা যামু···

কানাই-য়ের প্রবেশ

শৈলী। কানাই!

কানাই। কি।

শৈলী। কি তা তুই বল। কি করেছিস্ তুই মাষ্টারের মেয়েকে ? কি বলেছিস ?

(কানাই নির্বাক। শৈলী গিয়ে কানাই-এর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকায়)

কি করেছিস্ বল। নয়তো আমি তোকে আজ খুন করে ফেলব। বল কি করেছিস্ ? কি করেছিস্ ? (কিল, চড়, ঘুসি মারে) বল কি করেছিস ? হারামজাদা ছেলে, তোমার আমি আজ···বল, জবাব দে, বল···(উন্মাদের মত মারতে থাকে শৈলী ছেলেকে) বল কি করেছিস, বল···

(নেপথ্যে গৌরীর কান্না)

বল, বল শিগগির···

গৌরীর প্রবেশ। বাধা দেয়।

গৌরী। না, না, না, ।······

[গৌরী জোড়করে ভিক্ষা চায়, কি যেন বলে। শৈলী লাঠিটা ফেলে দিয়ে কানাইকে নিয়ে প্রস্থান করে।]

হরেন্দ্র। পিছু হটি নাই, পিছু হটবও না। ঠিক আছে। না, ঠিক আছে

শঙ্করীর প্রবেশ

শঙ্করী। কি ঠিক আছে ?

হরেন্দ্র। সব ঠিক আছে। কানাই, কানাই।

শঙ্করী। হ্যাঁ, শুনত্যাছি।

হরেন্দ্র। কানাইয়ের লগে গৌরীর একটা বুঝ হইছে।

শঙ্করী। বুঝ হইছে ?

হরেন্দ্র। হ হ, গৌরীরও একটা বুঝ হইছে কানাই-য়ের লগে।

শঙ্করী। কি বুঝ ?

হরেন্দ্র। বুঝ, অখন কেমনে বুঝাই তোমারে,—কানাই গৌরীরে ভালবাসে।

শঙ্করী। গৌরীরে ?

হরেন্দ্র। গৌরীও কানাইরে ভালবাসে।

শঙ্করী। তুমি কি কইতে চাও ?

হরেন্দ্র। আমি কিছু কই না। তারা যা কয় আমি শুধা তাই তোমারে কইলাম। ওরা দু'জনেই একটু আগে আমার কাছে কবুল কইরা গেল।

শঙ্করী। এ অসম্ভব।

হরেন্দ্র। অসম্ভবই তো সম্ভব হইছে দেখি।

শঙ্করী। তুমি এইটা ঠিক কও ?

হরেন্দ্র। বেঠিক কই কেম্‌নে ? আমার বাধা এক সংস্কার। কিন্তু ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যেটা সত্য, তারে আমি অস্বীকার করতে পারুমনা। ঠিক আছে, ঠিকই আছে। ভগবান সাক্ষী—ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আমি না কইতে পারুম না। ঠিক আছে। এ বিয়া হইব। এই বিয়াই হইব।

[মঞ্চ অন্ধকার]

(একটু পরেই বেজে ওঠে মাঙ্গলিক সানাই। শোনা যায় বিয়ের ব্যাণ্ড। আলোকমালা ও রাজহংসের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের শোভা বর্দ্ধন করে। গান গাইতে গাইতে এয়োস্ত্রীরা আসে পূর্ণ কুম্ভ কাঁখে আর বরণডালা হাতে। অনুষ্ঠানিক ভাবে বরবধূ প্রদক্ষিণ করে এয়োদের বরণ চলতে থাকে জোকার পুকারে আনন্দ ওঠে। হরেন্দ্র আশীর্বাদ করেন নব বরবধূকে ধানদূর্বা দিয়ে। চাচা রঘুবীরও আশীর্বাদ জানায়)

হরেন্দ্র। কেশব ! কেশব গেল কৈ আবার ! (কেশবের প্রবেশ) এই যে কেশব। আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর।

[কেশব আশীর্বাদ করে ও সঙ্গে সঙ্গে জোকার ও শঙ্খধ্বনি ওঠে। এবার এয়োরা দুভাগে ভাগ হয়ে বরণডালা ও পূর্ণ কুম্ভ মাথায় সমানতালে

পিছু হটতে হটতে নিষ্ক্রান্ত হয়। বরবধূ সেই পদক্ষেপের সমতা রেখে জোড়ে সোজা এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আলোটা গুটিয়ে এনে ফেলা হয় চন্দ্রাতপের নীচে বিচিত্রত একটা ভৃঙ্গারের ওপর। উৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলে সেই ভৃঙ্গারের ওপর কালো ছায়া ফেলে এসে দাঁড়ায় হরিধন। ইশারায় সর্বনাশ ডেকে আনে ঘুমন্ত বস্তীর মাথায়। চমকে ওঠে সৃষ্টি।

হরিধন তার গুণ্ডা লেঠেলদের নিয়ে আক্রমণ করে বস্তী। লাঠি চলে, চালা ওড়ে—দুর্বৃত্তের দাপটে উৎসবের প্রাণ প্রেতরাত্রির কোলে চমকে চমকে ওঠে। ভোর হয়। জাগর প্রহরীরা সারি দিয়ে দাঁড়ায় তখন মৃত্যুর মুখোমুখি। ভেঙে চুরে তচ্‌নচ্ হয় বস্তী তবু প্রতিরোধ বজ্রকঠিন। চীৎকার ওঠে ঘন ঘন—হুঙ্কার আর আর্তনাদ।

সূর্য ওঠে পরে। আততায়ীর লাঠির ঘায়ে দেখা যায় রক্তধারা নেমেছে হরেন্দ্রর কপালে। বজ্রকঠিন প্রতিরোধের চাপে তখন পিছু হটে গেছে পাপ আর পাপী। তবু সাধসোহাগের ঘর গেরস্তি, ছেলে বউ-এর জন্যে শৈলীর আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। রোদন করছেন মা জননী]

শৈলী। মাষ্টার! মাষ্টার! একি হলো মাষ্টার! এ আমার কি হলো মাষ্টার! সব যে ভেঙে গেল মাষ্টার।··· আমার সাধ-সোহাগের ছেলে, বউ, ঘর গেরস্থি, আমার বস্তি।

হরেন্দ্র। টিপ্‌নি দেখছ বুড়ী রক্ত চন্দনের। এই দেখ, এই দেখ, আর ঐ দেখ।

শৈলী। মাষ্টার!

হরেন্দ্র। ···বিয়া গেছে কাইল, আইজ্ঞ গেল বাসি বিয়া। কোন রাজার বেটার বিয়াতে এত ঘটা হইছে কইতে পার বুড়ী?—এত বাজনা, এত বাদ্য···

শৈলী। মাষ্টার!!

হরেন্দ্র। বুড়ী, জোকার দেও, শঙ্খ বাজাও মাইয়া উঠাও ঘরে। হেই বিশ্বকর্মার পুতের দল, চুপচাপ খারাইয়া আছস হাত লাগাইতে পারস না তরা? হাত চালাও, কাম কর, উঠাও বস্তি।

(হাতে হাতে সংসার গড়ে উঠে তখন আবার)

হেঁইয়া হো, হেঁইয়া হো, হেঁইয়া হো, হেঁইয়া হো,···

[সববেত কণ্ঠে জয়গান ওঠে জীবনের]

সমাজ-জীবনের সাময়িক বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া যে নাটক রচিত হয়, তাহা সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক কোনও পরিচয় বহন করিতে পারে না ; সেই জন্য 'গোত্রান্তর' নাটক হইতে সামাজিক নাটকের-বির্বতনের কোন রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যাইবে না। তবে অনেক সময় এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াই কোন নূতন ব্যবস্থার শুভ সূচনাও হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাহাও নহে, ইহাতে যে সমাজ-জীবনের ভবিষ্যৎ রূপ-বির্বতনের কোন ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই।

সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার সদ্য পরলোকগত তুলসী লাহিড়ী তাঁহার 'বাংলার মাটি' নামক একখানি নাটকে অসবর্ণ বিবাহের সীমা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হিন্দু-মুসলমানের বিবাহের যৌক্তিকতা নির্দেশ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য ইহাও নাট্যকারের স্বপ্নবিলাসিতা মাত্র, সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেইসূত্রে তাঁহার এই নাটকখানি অত্যন্ত শক্তিশালী রচনা হওয়া সত্ত্বেও জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। দেশ-বিভাগে বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থা ইহারও ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নাটকের প্রারম্ভেই নাট্যকার একটি সুদীর্ঘ 'নিবেদন' প্রকাশ করিয়া এই নাটক রচনায় তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'একটা বিশেষ তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলার পরোক্ষ দায়িত্বও নাট্যকারের আছে। তাই নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে নাট্যকারের ঐ সব সৃষ্টি বিন্যাস ও ব্যঞ্জনা শক্তির উপর। নাট্যকার হিসাবে এ সত্য আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসের প্রকৃত শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে এই নাটক রচনা ক'রেছি'। তিনি এই সম্পর্কে আরও লিখিয়াছেন, 'আজকের যুগে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি সব কিছু সমস্যাই যেন জড়িয়ে গেছে। এর যে-কোন একটা ধরে টান্‌লেই অপরগুলি এত স্বাভাবিক ভাবে, সজোরে সবেগে এসে দাঁড়ায় যে, তাদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। তাই এই নাটকে সব কিছু সমস্যা জড়িয়ে একে একটা বিশেষ বিশেষণ দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নাটক সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক যাই হোক না কেন, এটা ভাঙ্গা বাংলার বর্তমান ভাঙ্গা মনের কাহিনী। বাংলার ভাগের পর থেকে যা' দেখেছি, শুনেছি, ভেবেছি, বুঝেছি, তাই দিয়ে এ নাটক সাজিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমার চিন্তায় যতটুকু পেয়েছি তারও একটু ইঙ্গিত দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা ক'রেছি, যদিও বেশ জানি

যে সেই চিন্তাধারার সঙ্গে কেউ হয়ত একমত হবেন, কেউ হয়ত বা হবেন না।' ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, বিভক্ত বাংলার বিচিত্র সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া নিজের দিক হইতে তাহাদের যে সমাধান তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সমাধান যে সকলের গ্রহণীয় নাও হইতে পারে, এই বিষয়েও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বাংলার মাটিকে যথার্থ নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া নৈর্ব্যক্তিক কোন পরিচয় তিনি এখানে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, একথা তাঁহার নিজের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, নাটকের এই কাহিনীর মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে—

কিছুদিন হইল বাংলা বিভক্ত হইয়া তাহার পূর্বাংশে পাকিস্থান স্থাপিত হইয়াছে দলে দলে হিন্দু বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া যাইতেছে। অবসরপ্রাপ্ত কালীবাবু বিধবা পুত্রবধূ কিরণশশী, বয়স্কা অবিবাহিতা নাতনী চিত্রা ও নাতি লট্‌কাকে লইয়া এখনও পাকিস্থানে স্বগৃহেই বাস করিতেছেন। অন্তহীন আশঙ্কা ও অশান্তির মধ্যে তিনি প্রতিদিন জীবন যাপন করিতেছেন; তিনি বৃদ্ধ, নিঃসহায়; পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর তাহার পরিবারটির দায়িত্বও তাঁহার উপরই পড়িয়াছে। কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। নাতি নাতনীর পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে, স্কুল কলেজ যাইতে পারে না। লট্‌কা পলিটিক্সে ঢুকিয়াছে। তাঁহার প্রতিবেশী আবু মিঞা বয়স্ক ব্যক্তি, ব্যবসায় দ্বারা পশ্চিম বঙ্গে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন, তিনি সম্প্রতি পাকিস্থানে স্বগৃহে আসিয়াছেন। তিনি কালীবাবুর শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বাস দিয়া দেশে ধরিয়া রাখিতে চাহেন, অন্যায় অবিচার জুলুম হইতে রক্ষা করেন। আবু মিঞার পুত্রের নাম নুরু মিঞা, তরুণ যুবক, গ্রাজুয়েট, লীগ কর্মী—প্রতিবেশিতা সূত্রে চিত্রার সঙ্গেও পরিচিত। চিত্রা বি, এ, পর্যন্ত পড়িয়াছে, পরীক্ষা দিতে পারে নাই, সে নুরু মিঞাকে তাহার জন্য কলিকাতায় একটি চাকুরির সন্ধান করিয়া দিবার সাহায্য করিতে অনুরোধ করিল। দুইজন এই উদ্দেশ্যে গোপনে কলিকাতায় রওয়ানা হইল; কিন্তু, ধরা পড়িয়া গেল, এই লইয়া সহরে একটা ঢী ঢী পড়িল। বিপত্নীক ধূর্ত উকিল সদানন্দবাবু চিত্রাকে বিবাহ করিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিবার অভিলাষী ছিলেন; তিনি কালীবাবুকে নুরুর বিরুদ্ধে নারীহরণের অভিযোগ করিবার পরামর্শ দিলেন। সহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল। চিত্রা সদানন্দবাবুর বিবাহ প্রস্তাবে রাজি ছিল না, তাহার কোনও পরামর্শ গ্রহণ

করিল না। কালীবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আবু মিঞা তাহার পুত্র নুরুর সঙ্গে চিত্রার বিবাহ দিয়া সকল দুশ্চিন্তা হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কালীবাবুর আজন্মসঞ্চিত সংস্কারে নিদারুণ আঘাত লাগিল। চিত্রাও এই প্রস্তাবে রাজি হইল না। কালীবাবু সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। যাত্রার দিন উপস্থিত হইল, জিনিসপত্র বাঁধাছাদা হইল। এমন সময় লটকা পথে এক বে-আইনী শোভাযাত্রায় যোগ দিবার জন্য বিহারী পুলিসের লাঠিতে আহত হইল, লট্‌কাকে ঘর হইতে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। মুসলমান যুবকেরা তাহার জামিনের জন্য মহকুমা হাকিমের নিকট দরখাস্ত লইয়া ছুটিল। তথাপি কালীবাবু চিত্রাকে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, চিত্রা এই বলিয়া আবু মিঞার নিকট তাহার প্রতিবাদ করিল, 'নানা, দিনের পর দিন, নিরঙ্কুশ অত্যাচার দেখে দেখে, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আজ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, এখানেও প্রতিবাদ আছে, অত্যাচারকে বাধা দেবার মানুষ আছে। দুঃখকষ্ট নির্যাতনে আমি ভয় পাই না, নানা। আমি মরে যাচ্ছিলাম আত্মার অপমানে। আজ ওরা লড়্‌বে আর আমি পালাব? এ' আমি পার্ব না, কিছুতেই পার্ব না' [আবু চিত্রার মাথায় হাত দিল।]

বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার হিন্দুর পারিবারিক জীবনের সমস্যাটি এখানে বাস্তবরূপ লাভ করিলেও, ইহার সমাধান নিতান্ত অবাস্তব। সেইজন্য শক্তিশালী রচনা হওয়া সত্ত্বেও নাটকটি আশানুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে আবু মিঞা চরিত্রটিও নিতান্ত আদর্শমূলক। তাহার মুখে হিন্দু মুসলমানের মিলনাত্মক যে সকল বক্তৃতা শুনা গিয়াছে, তাহা কাহিনীর গতি একদিক দিয়া যেমন শিথিল করিয়াছে, তেমনই ইহার বাস্তব মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছে। নাট্যকার তাহার মধ্য দিয়াই যে এই সম্পর্কিত তাঁহার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সাম্প্রদায়িক কলহের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও যে আমরা আবু মিঞার মুখে শুনিতে পাই, 'আমরা হিন্দু হই, মুসলমান হই, আমরা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান যাই হই, সবার আগে আমরা বাঙ্গালী', তাহা রোমান্টিক নাটক রচনার যুগের 'সিরাজদ্দৌল্লার' অনুরূপ বক্তৃতার প্রতিধ্বনি মাত্র। অনেক ক্ষেত্রেই তুলসী লাহিড়ী পূর্ববর্তী যুগের নাট্য-রচনার সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পান নাই, এই শ্রেণীর চরিত্রের পরিকল্পনাই তাহার প্রমাণ। লট্‌কার চরিত্রটি শেষভাগে

নিতান্ত আদর্শ-ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, নায়িকা চিত্রাও ইহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। এই নাটকে মুসলমান চরিত্র সম্পর্কে যে পক্ষপাত প্রকাশ পাইয়াছে, নাট্যকার এই 'অভিযোগ' বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। তিনি তাহার জবাবে নাটকের 'নিবেদন' লিখিয়াছেন, 'আমি হিন্দু হয়ে, হিন্দুর ত্রুটি যদি কিছু বেশি ক'রেই দেখিয়ে থাকি, সেটা কোনও বিদ্বেষ থেকে আসে নি।' কিন্তু ত্রুটি 'কিছু বেশি করেই' দেখাইবার ফলে নাট্যকাহিনী যে অবাস্তব হইয়া যায়, নাট্যকার সেদিকে লক্ষ্য করেন নাই। এই সকল বক্তৃতা এবং উদ্দেশ্য প্রচার ব্যতীতও নাটকখানি রচনায় নাট্যকারের যে শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সংলাপের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সনে ইহা প্রথম অভিনয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। সৌখীন রঙ্গমঞ্চে ইহার কয়েকবার অভিনয়ও হইয়াছে।

অতি-আধুনিক কালে রচিত এই বিষয়ে আরও দুই একটি নাটকের উল্লেখ করিতে পারা যায়। তাহার মধ্যে সুনীল দত্ত রচিত 'খর নদীর স্রোতে' নাটকখানি উল্লেখযোগ্য। গ্রামের জমিদার বংশ-মর্যাদার ঐতিহ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার কন্যা কাঞ্চন, বিবাহের পূর্ব হইতেই নমঃশূদ্র ঘরের 'দুখের বেটা সাগর'-কে ভালবাসিত। সাগরের জন্ম নিচু জাতের ঘরে হইলেও সে গ্রামের একজন সত্যকারের সু-সন্তান। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, আচারে-আচরণে সমস্ত কিছুতেই গ্রামের সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র। কাঞ্চন সাগরের চরিত্র ও বুদ্ধিকে বাল্যকাল হইতে শ্রদ্ধা করিয়া শেষে তাহাকে মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু জমিদার প্রতাপ চৌধুরী একমাত্র কন্যার এই প্রেমের কোন মূল্য না দিয়া শুধুমাত্র শূন্য বংশ মর্যাদার আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হইয়া লম্পট, চরিত্রহীন এক যুবক মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। অসবর্ণ এবং অসম বিবাহ কিছুতেই সম্ভব নহে জানিয়া আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত কাঞ্চন রাত্রের অন্ধকারে নদীর খর স্রোতে আত্মবির্জসন করে।

এখানে আমরা এই নাটকের কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া নাটকীয় দ্বন্দ্বের মূল কেন্দ্রটির পরিচয় লইতে পারি :—

কাঞ্চন। একটা কথা বলবার ছিল বাবা—

প্রতাপ। বল্ মা বল্। নিশ্চয়ই বলবি। তুই যে আমার মা। পাগলি মেয়ে আবার জিজ্ঞেস করছে—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

কাঞ্চন ॥ সাগর বলছিল ও একটা ইস্কুল করবে, তাই তোমার কিছু সাহায্য চায়—

প্রতাপ ॥ (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে) কি? ইস্কুল! সাগর তাহলে লেখা-পড়া শিখে এসে এই সব আরম্ভ করেছে? ওঃ। আর তুমি রায়-চৌধুরী বংশের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে ওকে সাহায্য করছ?

কাঞ্চন ॥ (একটু ভয় পেয়ে) না বাবা না। আ—আমি শুধু তোমায় খবরটা বললুম। আর আমি কিছু জানি না।

প্রতাপ ॥ আমি বেঁচে থাকতে দুখের বেটা সাগর আমার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে যা ইচ্ছে তাই করবে! আর তুমি আমায় ওর ধৃষ্টতাকে সমর্থন করতে বল? উঃ!

কাঞ্চন ॥ তুমি আমায় ক্ষমা করো বাবা—আমি ঠিক—

প্রতাপ ॥ সাগরের এতোদূর স্পর্ধা! সে আমারই গাঁয়ে বাস করে আমারই ওপর টেক্কা মারবে। না-না এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যাবে না। গাঁয়ের কর্তা হতে চলেছে সাগর। আর আমি প্রতাপ রায়চৌধুরী তাই নীরবে মেনে নেব—না-না এ কিছুতেই হতে পারে না।

কাঞ্চন ॥ (সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে) বাবা! তুমি একটু স্থির হও। আমারই ভুল হয়েছে বাবা—

প্রতাপ ॥ না না এ ভুল নয়। এইটেই হচ্ছে সত্য। আর এই সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই আমাকে করতেই হবে।

কাঞ্চন ॥ বাবা! আমার ভুল হয়েছে। আমি ঠিক আগে বুঝতে পারিনি। তুমি স্থির হও—বাবা তুমি—

প্রতাপ ॥ (ভেঙ্গে পড়ে) কাঞ্চন, মা আমার! তোকে ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কাউকেই যে আমি চিনিনা রে!

কাঞ্চন ॥ বাবা!

প্রতাপ ॥ তোর কাছে আমি জোর করে যা বলতে পারতুম তা আমি বলতে পারবনা রে। শুধু আমার মায়ের কাছে স্নেহের দাবিতে একটা অনুরোধ করব, বল মা রাখবি? কথা দে মা—চুপ করে থাকিস নি।

কাঞ্চন। বাবা, ও কি বলছ তুমি?

প্রতাপ। আমার এইটুকু অনুরোধ তোকে রাখতেই হবে মা! স্বর্গ থেকে

বাবা আমার কাছে যেটুকু আশা করেছিল, আমিও তোর কাছে সেইটুকু অনুরোধই করব মা।

কাঞ্চন। অনুরোধ নয় বাবা, বল আদেশ!

প্রতাপ। যার কাছে স্নেহের বন্ধনে আমি আবদ্ধ, তাকে আদেশ করা যায় না, মা! তাই তোকে বলছি মা, তুই বল তোর পিতৃপিতামহের যে সমাজ, যে প্রতিপত্তি, যে দম্ভ ছিল একদিন, তুই তাকে জীবন দিয়েও রক্ষা করে যাবি! সেই আভিজাত্যকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়, বল মা তাও করবি! বল্, চুপ করে থাকিস নি।

কাঞ্চন। হ্যাঁ—বাবা, তোমার জন্যে আমি তাই করব। তাই করে যাবো, তোমার জন্যে বাবা—তা-ই-ক-রে যা-ব—

[গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে। প্রস্থান]

প্রতাপ। মা আমার ব্যথা পেল। উপায় নেই, উপায় নেই! যেখানে সমাজ সেখানে কোন স্বার্থেরই কোন দাম নেই। কিন্তু সাগর! সে কিনা ইস্কুল করতে চায়? এতোদূর—

[প্রবেশ করে বীরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবানী]

শিবানী। বল দাদা, বল আমায় না বলে, ওকেই বল!

প্রতাপ। কি হয়েছে?

শিবানী। দাদা কি বলছে শোন।

প্রতাপ। বলো।

বীরেন্দ্র। কাঞ্চন মায়ের শুনলুম বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

প্রতাপ। হুঁ! সব ঠিকঠাক।

বীরেন্দ্র। তাদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আমি জোগাড় করেছি।

প্রতাপ। তাদের সামাজিক মর্যাদা আছে তো—

বীরেন্দ্র। তা আছে।

প্রতাপ। তাদের প্রচুর অর্থ আছে—এ-এ সংবাদও সত্য তো?

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ—সত্য।

প্রতাপ। তাহলে মর্যাদাসম্পন্ন ঘরেই কাঞ্চন মা আমার যাচ্ছে।

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ তা যাচ্ছে। কিন্তু—

প্রতাপ। আবার কিন্তু কিসের?

বীরেন্দ্র। ছেলেটা লম্পট, চরিত্রহীন।

প্রতাপ। অত বড় ঘরের ছেলের ও রকম একটু-আধটু দোষ থাকাই স্বাভাবিক।

বীরেন্দ্র। কিন্তু কাঞ্চন মা—

প্রতাপ। তোমার বাবা যখন আমার সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে দিয়েছিল— তখন ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিল। সেদিন যদি আমায় দেখে তোমার বাবা বিয়ে দিত, সেইখানেই তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে যেত।

বীরেন্দ্র। আপনি তাহলে স্থির সিদ্ধান্তেই এসে গেছেন?

শিবানী। আমার মনে হয়, তুমি আর একটু ভাব। একেবারে—

প্রতাপ। এ ছাড়া আর একটা পথই আছে।

শিবানী। বলো সেইটেই বলো।

প্রতাপ। সাগরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে?

দুজনেই। সাগর!

প্রতাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ দুখের বেটা সাগর। যে আমাদের পা টিপত, সেই নমঃশূদ্র ঘরের ছেলে সাগর—বলো, রাজি আছ?

শিবানী। সে কি করে হয়?

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ চিনেছি ছেলেটিকে? ও যদি স্বজাতি হোত, তাহলে আমি বলতুম ওরই সঙ্গেই বিয়ে দিন। অমন ছেলে আমাদের ঘরে আর জন্মাবে না।

প্রতাপ। আমি হলে পারতুম না। আমার কাছে বংশমর্যাদা, সমাজমর্যাদা, অর্থবলে বলীয়ান তার মূল্য অনেক বেশী। [প্রস্থান]

শিবানী। তাহলে কি হবে দাদা?

বীরেন্দ্র। আর কোন উপায় নেই বোন, আর কোন উপায় নেই। চৌধুরী মশাই একবার যখন ঠিক করে ফেলেছেন—তখন তাঁর কথা নড়ান আর পাহাড় টলান দুটোই এক ব্যাপার। [প্রস্থান]

[প্রবেশ করে কাঞ্চন]

কাঞ্চন। মা মাগো—তুমিই বলো মা, আমি কি করি?

শিবানী। কিছুই করার নেই মা, কিছুই করার নেই। পর্বতকে কাঁদানর ক্ষমতা আমার নেই রে, নেই! সারা জীবন শুধু নিজেই কেঁদেছি।

কখনও কাউকে কাঁদাতে পারিনি মা, কখন কাউকে কাঁদাতে পারিনি। [প্রস্থান]

[কাঞ্চন কি ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে প্রস্থান করল।]

নাট্যকার তাঁহার এই নাটকের মধ্যে পুরাতন 'ঘুণে ধরা' সমাজের সংস্কারের সহিত আধুনিক জীবন ও মানবিকতাবোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন; জন্ম দিয়া মানুষের বিচার নয়, কর্ম দ্বারাই তাহার প্রতিষ্ঠা, এই সত্যকে এই নাটকের মধ্য দিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অসবর্ণ বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া অভিজিৎ একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহার নাম 'অসবর্ণা'। বিনয় চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে সদ্য ডাক্তারী পাশ করিয়া আসিয়া গ্রামে প্র্যাকটিশ সুরু করিয়াছে। শুধু ডাক্তারী নয়, গ্রামের আরও বহু জন-হিতকর কার্যের সহিত বিনয় যুক্ত। বিনয়ের প্রতিবেশী অবিনাশ দত্তের কন্যা মালা তাহাকে ভালবাসে, উভয়ে উভয়ের কার্যে প্রেরণা দেয়। শেষে এক সময় বিনয় বুঝিতে পারে যে মালাকে বিবাহ করিলে উভয়ের জীবনই সুখী হইতে পারে। কিন্তু বিনয়ের পৃষ্ঠপোষক ও জ্যেঠামশাই শশাঙ্ক চ্যাটার্জি কোন মতেই এই অসবর্ণ বিবাহে রাজী হইতে পারেন না। এইখানেই সমগ্র নাটকটির মূল দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হইয়া উঠে। অবশেষে বন্ধু গোবিন্দ রায়ের পরামর্শে ও চেষ্টায় শশাঙ্কবাবু নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া মালা ও বিনয়ের মিলনের মধ্যকার সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া লন।

নাট্যকার অসবর্ণ বিবাহের সমস্যার সমাধানের আশা করিয়া মিলনাত্মক পরিণতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবশ্য আজিকার দিনের সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা হিসাবে অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও, সমগ্র সমাজ যে ইহাকে সমর্থন করে না, তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাই এই নাটকটির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হইলেও নাট্যকার সমগ্র সমাজ-সমস্যার প্রতিবেদনটিকে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। তথাপি একান্ত ব্যক্তিগত হইলেও এই প্রকার অসবর্ণ প্রেম ও পরিণয় যে নাটকীয় জটিলতা ও মানস-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার প্রমাণ এই সকল নাটকগুলি হইতে সংগ্রহ করা যায়।

দশম অধ্যায়

বিবাহ বিচ্ছেদ

আমাদের দেশের একটি সুপরিচিত সংস্কৃত প্রবচন এই—

অজাযুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে।
দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যে হিন্দুবিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে দাম্পত্য কলহ অনেক সময় কেবলমাত্র লঘুক্রিয়াতেই পর্যবসিত হয় না, তাহা কোন সময় গুরুতর আকার ধারণ করিয়া দাম্পত্য জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তারপর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কাহারও পুনর্বার আর স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন কোন সামাজিক আন্দোলনের ফলে যে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে, ইহার বিষয়ে জনমত কোনদিক দিয়াই, সামগ্রিকভাবে, দেশের কোন অংশেই সচেতন হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ইহা লইয়া যে আইন রচিত হইয়াছে, তাহা সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইন পরিষদের সদস্যগণ তাহা করিয়াছেন, এমন কি, এই বিষয়েও যে সকলে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাও নহে। তবে হিন্দুসমাজের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত না থাকিবার জন্য দাম্পত্য জীবনের সম্ভাবিত অসন্তোষ দূর করিবার একমাত্র উদ্দেশ্যেই এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু আইন করিয়া একটি বিষয়ের স্বীকৃতি দিলেই ইহা দ্বারা যে কেবলমাত্র সমাজের কল্যাণই হইয়া থাকে, তাহা নহে, অনেকেই আইনের সুযোগ লইয়া তাহার অপব্যবহার এবং স্বেচ্ছাচারও করিয়া থাকে, তাহারও নিদর্শনের অভাব দেখা যায় না। সাম্প্রতিক প্রবর্তিত এই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সুযোগ লইয়া এই বিষয়ে যে কেহ কেহ অযথা স্বেচ্ছাচারিতা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন না, তাহা বলিবার উপায় নাই।

কতকগুলি বিষয়ে হিন্দুসমাজের স্মৃতিশাস্ত্রও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়াছে, এমন কি, বিবাহ-বিচ্ছেদের পর নারীকেও পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার দিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে শ্লোকটির উপর ভিত্তি

করিয়া বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করিবার জন্য আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও নারীকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এক পতি ত্যাগ করিয়া অপর পতি গ্রহণ করিবার বিধান দিয়াছে, যথা—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধিয়তে ॥

অর্থাৎ স্বামী নষ্ট হইলে, তাহার মৃত্যু হইলে, সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে, ক্লীব বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে কিংবা তাহার পাতিত্য ঘটিলে স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র বহির্ভূত বিধি নহে; কিন্তু কালক্রমে স্মৃতিশাস্ত্রের যে সকল বিধান সমাজে অচল হইয়া গিয়াছিল, বিধবা-বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা তাহাদের অন্যতম।

উপরোক্ত পাঁচটি কারণ ব্যতীতও হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র আরও কতকগুলি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করিয়াছে, যেমন, 'অজ্ঞানতা বশতঃ কেহ যদি সগোত্রীয়া কন্যাকে বিবাহ করে, তবে সেই স্ত্রীর উপর তাহার আর দাম্পত্য অধিকার থাকিবে না এবং সেই স্ত্রী তাহা কর্তৃক পোষনীয়া হইবে। সজ্ঞানে ঐরূপ বিবাহ করিলে পতি পত্নীকে ত্যাগ করিবেন এবং চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন; অবশ্য ঐ স্থলেও স্ত্রীকে তাহার ভরণ-পোষণ করিতে হইবে।' স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে যদি কেহ মাতৃনামধারিণী কন্যাকে অজ্ঞানতা বশতঃ বিবাহ করে, তবে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে নিজ সমাজে গৃহীত হইতে পারে।

উল্লেখিত যে কয়টি কারণ নির্দেশ করা হইল, তাহাতে স্ত্রী পরিত্যজ্যা হইলেও ভরণ-পোষণ যোগ্যা,স্ত্রীকে স্ত্রীরূপে পরিত্যাগ করিবার পরও স্বামীকেই তাহার ভরণ-পোষণ করিতে হইত, এই প্রকার পরিত্যক্ত স্ত্রীর অন্য কোথাও বিবাহ হইত না। সুতরাং ইহাকে পরিপূর্ণ বিবাহ-বিচ্ছেদ বলিতে পারা যাইবে না। তবে কতকগুলি এমন কারণও আছে, যাহাদের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পূর্ণই হইতে পারিত, যেমন—

(১) নিম্নতর বর্ণের ব্যক্তির সঙ্গে সহবাসের ফলে স্ত্রী যদি অন্তঃসত্ত্বা হইত,

(২) শিষ্য বা পুত্রের সহিত সহবাসের ফলে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হইত।

(৩) অপর কোনরূপে যদি স্ত্রী অত্যন্ত হীন ব্যসনসক্তা হয় বা ধননাশ করে

(স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী পৃঃ ৬৫)

প্রথম যে অপরাধের কথা উল্লেখ করা হইল, তাহাতে স্ত্রী পরিত্যজ্যা এমন কি তাহাকে বধ করিয়া ফেলিলেও স্ত্রীবধের পাপ হইবে না। কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে, 'উক্ত সহবাসাদির ফলে যতক্ষণ স্ত্রী গর্ভবতী না হইবেন, ততক্ষণ তিনি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দোষ মুক্ত হইতে পারেন। বাংলা দেশে যে সকল স্মৃতিগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাদের মতে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহা হইতে এ'কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, একমাত্র ব্যভিচার দোষের জন্যই স্ত্রী যথার্থ পরিত্যাজ্যা হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে স্বামীর ব্যভিচার দোষের জন্য স্ত্রীকে স্বামী-পরিত্যাগের কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই, সেই অধিকার সাম্প্রতিক বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন স্ত্রীকে দিয়াছে।

হিন্দুবিবাহ একবার যদি অনুষ্ঠানিক ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া যাইত, তবে তাহা আর অসিদ্ধ হইতে পারিত না, তবে কন্যা সম্প্রদানকারী ব্যক্তি যদি উন্মাদ কিংবা পতিত হয়, তবে বিবাহ অসিদ্ধ হইত। কিন্তু একবার যদি বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া যাইত, তবে তাহাও উপরোক্ত কোন দোষ-ত্রুটির জন্য অসিদ্ধ হইতে পারিত না। ইহার যুক্তি স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'যদি তু বিবাহো নিবৃত্তস্তদা প্রধানস্য নিষ্পন্নত্বেনাধিকারি বৈকল্যান্ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ' অর্থাৎ 'কোন গৌণ ব্যাপারের দোষ হেতু মুখ্য ব্যাপার অসিদ্ধ হইতে পারে না।' হিন্দুবিবাহ বিধির এই অনমনীয়তার (Factum valat) জন্য হিন্দুবিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রণয়ণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন প্রণয়ণের ফলে হিন্দুসমাজে এই কয় বৎসরেই যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, তাহাও আজ গভীর ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক হইয়াছে। এই বিষয়ে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র ১১ই কার্ত্তিক ১৩৭০ মঙ্গলবার (২৯শে অক্টোবর ১৯৬৩) কলিকাতা সংস্করণে ষ্টাফ্ রিপোর্টার কর্তৃক প্রদত্ত 'বিবাহ-বিচ্ছেদের সালতামামি' শীর্ষক একটি প্রামাণ্য এবং চিন্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে না পারিয়া আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'স্বামী-স্ত্রীর কলহ ভাদ্রের বৃষ্টির মত ক্ষণস্থায়ী, একথা অনেকেই বলে থাকেন। বহু ক্ষেত্রেই যে কথাটা সত্য, তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু অনেক সময় আবার কলহের ফলে দাম্পত্য জীবন বিষময়ও হয়ে উঠে। এমন বিষময় হয় যে, হয় স্বামী না হয় স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন হন।

আজকাল আদালতের আশ্রয় নেওয়ার ঝোঁক দিনদিনই বাড়ছে। হিন্দু সমাজে দাম্পত্যজীবনের অশান্তি যে কত গভীর ও কত বেদনাময় তার পরিচয় বোধ হয় এতে কিছুটা পাওয়া যায়।

১৯৬০ সালে আলিপুর জেলা জজের আদালতে দাম্পত্য কলহঘটিত মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৬টি। ১৯৬১ সালে সংখ্যা বেড়ে ৪২০টি হয়। ১৯৬২ সালে রুজু হয় ৪০২ মামলা। মামলার সংখ্যা প্রতি বৎসরেই বেড়ে চলছে। কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টেও বিবাহ-ঘটিত মামলার সংখ্যা দেখলে একই চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। ১৯৬০ সালে রুজু হয় ১২৩, ১৯৬১ সালে ১২৫ ও ১৯৬২ সালে ১০৩।

আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ব্যাপারে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর ঝোঁক যে নেহাৎ কম তা বলা চলে না। আলিপুরে ১৯৬০ সালে যে ২৮৬টি মামলা রুজু হয়, তার মধ্যে ১২৭টি রুজু করেন স্ত্রীরা। ঐ আদালতেই ১৯৬১ সালে ১৯৯ জন পত্নী তাঁদের অত্যাচারী পতিদের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। ১৯৬২ সালে মামলাবাজ স্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৪ জন। এই তিন বৎসরে কত ভর্ত্রী তাঁদের দুশ্চরিত্র ভর্তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন, তার হিসাব পাওয়া যায়নি।

দাম্পত্য জীবনঘটিত মামলা তিনটি আইন অনুসারে দায়ের করা যায়— স্পেশ্যাল ম্যারেজ আইন, (যে আইনে রেজেস্ট্রি করে বিবাহ হয়), ভারতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন শুধু (খৃষ্টানদের জন্য) এবং ১৯৫৫ সালের হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট। হিন্দু সমাজে বিবাহবন্ধন চিরকালই অবিচ্ছেদ্য ছিল। তৃতীয় আইনেই প্রথম হিন্দু স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আইনটি ১৯৫৬ সালে চালু হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি বা আদেশ আদালতের কাছ থেকে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণেই বিচ্ছেদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। প্রমাণ সহ এইসব কারণ দেখান সহজ ব্যাপার নয়। একটা সামাজিক বিপ্লব যাতে না ঘটে, সেই ভয়েই হয়ত আইনপ্রণেতারা এত বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। কিন্তু বিধিনিষেধ সত্ত্বেও প্রতি বৎসর বহু স্বামী তাঁদের স্ত্রীদের তালাক্ দিতে এগিয়ে আসছেন। তালাক্ দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীরাই যে স্ত্রীদের চেয়ে অগ্রণী, তা' বলা বাহুল্য।

১৯৬০ সালে আলিপুরে আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের (Divorce) মামলা হয় ১২৪টি, ১৯৬১ সালে ১৬৫টি এবং ১৯৬২ সালে ১৫১টি ; সব কয়টি মামলাই হয় হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে। এই আইনে স্বামী স্ত্রীর আইনত পৃথক

থাকার (judicial seperation) ব্যবস্থাও আছে। সম্পর্কচ্ছেদের মামলাও প্রতি বৎসর বেড়ে চলেছে—১৯৬০ সালে ৫৪, ১৯৬১ সালে ১০২ ও ১৯৬২সালে ৮৬ (সবই আলিপুরের আদালতের হিসাব)। তিন বৎসরে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পৃথক থাকার মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৪০ ও ২৪২। হিসাবে দেখা যায়, দাম্পত্য জীবন-ঘটিত যত মামলা হয় তার অর্ধেকেরই বেশী বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য।

প্রতি জেলার জজের আদালতগুলিতে কত মামলা হচ্ছে, তার হিসাব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাখাও হয় না। কোন সমাজ-তাত্ত্বিক হয়ত এইসব মামলার নথি ঘেঁটে সারা বাংলা। দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে ব্রতী হতে পারেন। যা হউক, প্রশ্ন এই সমাজের কোন শ্রেণীর লোক সুখের সংসারে অনর্থ সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছেন, অথবা তৎপর হতে বাধ্য হয়েছেন ?

বিবাহঘটিত যাবতীয় মামলার শুনানী হয় গোপনে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আইনের এই-ই বিধান। নাম ধাম বাদ দিয়েও মামলার বিবরণ প্রকাশ করা যায় না। তবে উভয় পক্ষেই উকিল থাকেন। অন্ততঃ দশজন উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। সকলেই একবাক্যে বলেছেন, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও স্বামী-স্ত্রীর 'সেপারেশনের' জন্য যারা মামলা করেন তাঁদের শতকরা ৭৫ জনই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সমস্যাটি ধনীরই বেশী, গরীবদের ততটা নয়।

উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক স্ত্রীই আজকাল মদ্য ও ধূমপান করেন, হোটেলে নৃত্যও করেন, মদের গ্লাস নিয়ে একটু নেশায়ও বিভোর হন। শারিরীক সৌন্দর্য আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাবি মেটাতে তাদের ধনী স্বামীদেরও গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়। এসব কারণে তাঁদের মেজাজ হয়ে ওঠে খিট্‌খিটে, স্বামীর উপর খবরদারী করার স্বভাব তাঁদের পেয়ে বসে। খবরদারী ও খ্যান খ্যানানি বেশীদিন চললে অশান্তি দেখা দেয়, বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

আমার উকিল বন্ধুরা কয়েকটি মামলার বিবরণ আমাকে দিয়েছেন, মনস্তাত্ত্বিকরা হয়ত তাতে মনের খোরাক পাবেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করছি। অবশ্য তাঁরা একটু রঙ চড়িয়ে বলেছেন। কিন্তু গল্প কয়টির উপাদান আদালতের মামলার বিষয়বস্তু।

স্বামী : এম. এ. পাশ ধনীর দুলাল। স্ত্রী—ধনীর দুলালী—তিনিও এম.

এ.। সুখী পরিবার। বিবাহের দুই বৎসর পর। সময় সন্ধ্যা—স্ত্রী স্বামীকে বল্লেন, "ওগো শোন। আমার আর এখানে থাকা চলবে না। কত কাল আর এ অশান্তি সহ্য করব।"

"কেন কি হল আবার ?" বলে স্বামী বিস্মিত হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

স্ত্রী : "কি হল ? খুলে বলতে হবে ? এই সেকেলে শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিয়ে আর কত কাল ঘর করা চলে। কোথাও বেরুতে দেবে না, শুধু ঘরে বসে থাক আমি কি সে যুগের কুনো বউ ?" স্বামী বুড়ো, বাপ-মাকে ছেড়ে অন্য বাড়ীতে যেতে রাজী হলেন না। পরিণাম : স্ত্রীর আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু। কারণ, নিষ্ঠুর নির্যাতন।

স্বামী সাহিত্যিক—রবীন্দ্র-সাহিত্যে বেশ নাম। সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপারে অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী।

স্ত্রী নাচে, গানে ও রূপে "এমনটি আর হয় না" বলে হামেশা বন্ধুবান্ধবের কাছে বলে বেড়ান।

স্ত্রী এখানে ওখানে নেচে গেয়ে বেড়ান। স্ত্রীর অবাধ গতি স্বামীকে পীড়া দেয়, ক্রমে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হতে থাকে। একদিন স্ত্রী অনেক রাত্রে এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে গানের জলসা হতে বাড়ী ফেরেন। সন্দিগ্ধ স্বামী বাড়ীর দোর খুলতে রাজী না হওয়ায় তিনি বন্ধুর বাড়ী যান। পরদিন প্রাতে বাড়ী ফেরেন। তারপর যত দিন যায় অহরহ চলতে থাকে কলহ, দুজনে মারামারিও হয় কোন কোন দিন। অবশেষে স্বামী একদিন স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেন।

পরিণাম : স্ত্রী আদালতে 'সেপারেশনের' নালিশ করেন। মামলায় তার স্ত্রীর জিত হয়। তার পক্ষ হয়ে সাক্ষী দিয়েছেন একজন পি. আর. এস. ও একজন সাহিত্যে ডক্টর উপাধিধারী।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এম. এ.। কলেজে পড়ার সময় দুজনের ভাব হয়; বিয়ের আগেকার মধুর দিনগুলি বৃথা কাটেনি।

বিবাহের পর কি যেন একটা হয়ে গেল। একের প্রতি অপরের সন্দেহ। অশান্তির মাত্রা বেড়েই চল্‌ল।

যুবতী স্ত্রী স্বামীকে তালাক্ দেওয়ার জন্য আদালতে নালিশ করলে।

কারণ ? সে জজকে বললে, "উনি আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমার আর কি করার আছে বলুন ? ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না, উনি আর একটি মেয়ের পেছনে ঘোরেন কিনা ?

জবাবে স্বামী বল্লেন, "আমি না হয় মেয়ের পেছনে ঘুরি। উনি কি পুরুষের পেছনে ঘোরেন না?' স্বামীর অভিযোগ: পরপুরুষগমন, আর স্ত্রীর—পরদারগমন। পরিণাম বিবাহ বিচ্ছেদ। উপাখ্যানটি বলতে গিয়ে জনৈক যুবক উকিল মন্তব্য করলেন, "মশাই শিক্ষিত যুবকরা আজকাল শিক্ষিত মেয়েকে বিবাহ করতে একটু ভয় পাচ্ছে।

স্বামী কেরানী। স্ত্রী বি. এ. পাশ। অফিসেই কথাবার্তা হয়ে শুভবিবাহ ঘটে। শ্বশুরবাড়ী পদার্পণ করেই স্ত্রী বল্লেন, "ও মা, কি নোংরা বাড়ী তোমাদের, ঘর গুলি কি ছোট, কি সোঁতসেঁতে। এ বাড়ীতে আমার পোষাবে না, আমাকে এম-এ পড়তে হবে যে?" স্ত্রী নিজের দুঃখের কাহিনী বাপকে লিখলে। বাপ মেয়েকে নিয়ে গেলেন নিজ কর্মস্থলে—কল্‌কাতা থেকে অনেক দূরে।

নানা অছিলা দেখিয়ে বাপ তার মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাতে গড়িমসি করতে লাগলেন। অনেকদিন চলে গেল। স্ত্রী কবে ফিরবে তা বোঝা গেল না। পরিণাম—বেচারী স্বামী আদালতে সম্পর্কচ্ছেদের মামলা করলে। কারণ স্ত্রী পলাতক (desertion)।

আইনে বলা আছে, প্রথমে বিচারক বিবাদমান পতি-পত্নীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে চেষ্টা করবেন, যেমন মাতাপিতা করে থাকেন। বিচারকগণ তাই করেন। কিন্তু শতকরা একটি ক্ষেত্রেও পুনর্মিলন ঘটান সম্ভব হয় না। হলেও তা স্বল্প-স্থায়ী হয়। প্রবীণ উকিলেরা বলেন, আইনটি মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশী করেছে। কারণ, এতে যৌন সম্পর্কের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। সতীত্বের আদর্শ, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অবদান। এই আদর্শ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কল্পনার বাহিরে। আইনটি এই মহান্ আদর্শের পরিপন্থী। শত ঝগড়ার পরেও স্বামী-স্ত্রীর আবার বনিবনা হয়। এই বনিবনা করে থাকার মনোভাব ক্রমশঃই শিথিল হয়ে পড়ছে।

আলোচনা বাধা দিয়ে জনৈক যুবক উকিল বলে উঠলেন, "মশাই, এই সীতা সাবিত্রীর দেশে ত অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরীও ছিল। সে কথা ভুলে গেলেন কেন?"

যুবক উকিলরা মনে করেন, আইনটি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। কারণ, বিপথ-গামী স্বামীদের নির্যাতন যে সব মেয়েরা নীরবে সহ্য করত, তাদের একটা গতি হয়েছে। ভালই হোক আর মন্দই হোক' কত গুলি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর কত নারী মাসোহারা নিয়ে দিনাতিপাত করছে?

তাদের কতজনের সন্তানসন্ততির দায়িত্ব নিতে হয়েছে? সন্তানের ও নিজের মাসোহারায় দিন চলে কি? এই সব হতভাগিনীদের বয়স বা কত? তারা কি পুনরায় বিবাহ করে? করলে কতজন করে? এই সবের জবাব পাওয়া কঠিন। কোন সমাজতাত্ত্বিক এই সব বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন।"

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যাইতে পারে যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু সামাজিক আইনের মধ্যে একটি যুগান্তকারী আইন বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ, ইহা দ্বারা হিন্দুবিবাহের sacrament-এর মূল আদর্শের মধ্যেই আঘাত লাগিয়াছে। এই আইন হইবার পূর্বেও হিন্দুসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইত না, তাহা নহে, দুই একটি ক্ষেত্রে যেখানে সঙ্গতি থাকিত, কিংবা একান্ত প্রয়োজন বোধ হইত, সেখানে স্বামী নামে মাত্র মুসলমান কিংবা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিত, তারপর স্ত্রীকে মুসলমান বা খৃষ্টান হইবার জন্য বলিত, স্বভাবতই যে তাহা হইত না এইভাবে আইনতঃ এবং ধর্মতঃ, বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, নাগরিক অধিকারে যে রেজিষ্ট্রি বিবাহ হইত, তাহাতেও বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারিত। সেইজন্য যাহারা ব্যক্তিজীবনে একান্ত প্রগতিশীল, তাঁহারা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে যাহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারেন, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সিভিল আইন অনুসারে বিবাহ করিতেন। কিন্তু হিন্দুবিবাহের এখানেই বিশেষত্ব ছিল যে, কুশণ্ডিকা হইয়া গেলে সেই বিবাহ আর কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারিত না। স্মৃতিশাস্ত্র দুই একটি মাত্র ক্ষেত্রে যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবারও অধিকার দিয়াছে, সেক্ষেত্রেও স্ত্রীকে যাবজ্জীবন ভরণ-পোষণের ভার স্বামীকেই গ্রহণ করিবার জন্য দায়িত্ব দিয়াছে। সুতরাং আধুনিক অর্থে যাহাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলা যায়, ইহা তাহা নহে। সুতরাং বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, হিন্দু সমাজের মধ্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ হিন্দু-সমাজ এই বিষয়ে কোনও প্রতিবাদও যেমন করে নাই, তেমনই ইহার জন্য কোন আন্দোলনও করে নাই। একদিন বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হইবার সময় সমাজে ইহা লইয়া প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল; এমন কি, রাজা রামমোহন রায় যখন সহমরণ প্রথার মত একটি জঘন্য প্রথাও উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন, তখনও তাঁহার বিরুদ্ধে একটি সম্প্রদায় আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাধা দিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে বিবাহ-বিচ্ছেদের মত এমন একটি যুগান্তরকারী সামাজিক আইন যখন

বিধিবদ্ধ হইল, তখন তাহা লইয়া ইহার স্বপক্ষেও যেমন নহে, বিপক্ষেও তেমনই কোন আন্দোলন ত দেখা যায়ই নাই, এমন কি, এই বিষয়ে সাধারণ কোন উদ্বেগও কাহারও মধ্যে কোনদিন প্রকাশ পায় নাই। সেইজন্য এই বিষয় লইয়া নাটক ও প্রহসন যাহা রচিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

সাধারণতঃ সামাজিক উত্তেজনা হইতে সামাজিক নাটকের সৃষ্টি হয়, বিষয়ের গুরুত্ব হইতে তাহা হইতে পারে না, যাহা লইয়া কেহ কোনদিন আন্দোলন করে নাই, তাহার দিকে সাধারণ সমাজের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইতে পারে না। সেইজন্য এই বিষয়ে যে দুই একখানি মাত্র বাংলা নাটক সাম্প্রতিক কালে রচিত হইয়াছে, তাহাও বাংলা সামাজিক নাটকের ক্রম বিবর্তনের ফল নহে, বরং তাহার পরিবর্তে ব্যক্তিজীবনের চিন্তা-বিলাসিতারই ফল। বিবাহ-বিচ্ছেদ এখনও একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা নহে, ইহা ব্যক্তিগত সমস্যা। এই বিষয়ে সমাজ এখনও রক্ষণশীল, ইহাকে কেহই সহানুভূতির চক্ষে দেখে না। আদালতের নিকট হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভ করিয়া কোন নারী এখনও বাংলার সমাজে তাহার প্রাক্‌বিবাহিত জীবন, কিংবা কুমারী জীবনের পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। সন্তানবতী বিবাহ-বিচ্ছিন্ন নারীর ত কথাই নাই, নিঃসন্তানা, নারীও স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন করিয়াও পুনরায় সহজভাবে দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয় লইয়া সামান্য কয়েকটি নাটক এ'যাবৎ যাহা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও রক্ষণশীলতার মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকার না করিয়া লওয়াকেই গৌরব দান করা হইয়াছে। দুই একটি সাম্প্রতিক উপন্যাসের মধ্যে অবশ্য ইহার মহিমা কিছু কিছু কীর্তিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সমস্ত উপন্যাসের যে কোন সামাজিক ভিত্তি নাই, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

এই বিষয়ক নাটকের মধ্যে সুবোধ ঘোষ রচিত 'শ্রেয়সী'র কথা প্রথমেই উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সুবোধ ঘোষের উপন্যাস অবলম্বন করিয়া নাটকের প্রয়োজনে নানা পরিবর্তন করিয়া ইহা দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাট্যরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহা বৃহৎ উপন্যাসের নাট্যরূপ হইলেও মোটামুটিভাবে ইহাতে ঔপন্যাসিকের মূল বক্তব্য অনুপস্থিত নাই। অবশ্য পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য

নাট্যরূপদানকারীর অলক্ষিত হস্তক্ষেপ ইহার পশ্চাতে কতখানি আছে, তাহা জানা যায় না, যাহাই হউক, এই নাটকখানির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পূর্বে এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে যে রক্ষণশীলতার উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকার না করিয়া লওয়াকেই গৌরবদান করা, তাহা ইহার মধ্যেও দেখা গিয়াছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ-বিষয়কে অবলম্বন করিয়া লিখিত নাটকের সংখ্যা আজ পর্যন্ত বিশেষ অপ্রতুল বলিয়া এই নাটকের কাহিনীটি কিছু বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করিলাম। ইহা এই প্রকার ;—

রসিকপুরের নিঃস্ব জমিদার কমল বিশ্বাস ভাগ্যের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া 'রাজার মত বড়লোকের ঘরে ছেলে-মেয়ের বিয়ে' দিয়াছেন। নানা ফন্দি করিয়া একমাত্র মেয়ে বাসনার বিবাহ দিয়াছেন এলাহাবাদের বিখ্যাত ধনী পার্থবাবুর পুত্রের সহিত এবং একমাত্র পুত্র অতীনের বিবাহ দিয়াছেন খড়দার 'টাকার কুমির' রামকানাই মিত্রের মা-বাপ মরা ভাগিনেয়ী কেতকীর সহিত। 'একটা পয়সাও যার সিন্দুকে ছিল না'—সেই মানুষ'-এর পক্ষে ইহা একটি আশ্চর্যজনক কার্য বটে। কিন্তু এরূপ অসাধ্য সাধন করা সত্ত্বেও, বহু পরিশ্রম করিয়া পুত্র কন্যাদিগের লেখাপড়া শিখাইলেও, তাহারা মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করিবার পরিবর্তে ঘৃণা করিয়া থাকে। কমল বিশ্বাস কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অতীনের অমতে কেতকীর বড়লোক মামার অর্থের দিকে তাকাইয়া অতীনের সহিত কেতকীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ছেলের পণের টাকা ও পুত্রবধূর গহনা লইয়া তিনি কন্যা বাসনার বিবাহ দিয়াছিলেন। অতীন নিজের এই বিবাহ সম্বন্ধে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার সাধন চৌধুরীর একমাত্র কন্যা কাজরীর নিকট বলিয়াছে, 'বাবা আর মা একেবারে ক্ষমাহীন হয়ে দাবী করলেন, বোনের বিয়ের জন্যে খরচের সব টাকা আমাকেই দিতে হবে। কাজেই বাবার চক্রান্ত মেনে নিয়ে, একটা বিয়ে করে, নগদে-অলঙ্কারে দশ হাজার টাকা বাবাকে পাইয়ে দিয়েছি। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কাজরী, কোনদিনই স্ত্রী বলে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারব না।' কাজরীর সহিত অতীনের পূর্বেই প্রণয় ছিল। সেই প্রণয়ের মোহে এবং কাজরীর আধুনিক উগ্রতার আকর্ষণে সে বিবাহিত-স্ত্রী কেতকীকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল। এই বিষয়কে নিশ্চিত করিবার জন্য অতীন মিথ্যা অজুহাত দিয়া আদালতের নিকট কাজরীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রার্থনা করে। কেতকী স্বামীর এই নিষ্ঠুর

আচরণের কোন প্রতিবাদ না করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্তে সই করিয়া দেয় এবং অতীনকে তাহার সিঁথির সিঁদুর মুছাইয়া দিতে বলিলে অবলীলাক্রমে সে তাহা মুছিয়া দিয়া মাতা পিতা ও বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যায় এবং কাজরীকে বিবাহ করে। এই বিবাহের প্রথম দিকে সাধন চৌধুরীর মত না থাকিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাহা মানিয়া লন। কাজরীর চিত্র-কলা চর্চার শখ ছিল এবং এই বিষয়ে তাহার কয়েকজন গুণমুগ্ধ ও ধনী পুরুষ বন্ধু ছিল। বিবাহের পরেও কাজরী তাহাদের সঙ্গ ছাড়িতে পারিল না, এমন কি তাহারা কলিকাতার অভিজাত পল্লীতে কাজরী ও অতীনের জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া দিল এবং অতীনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতেও কাজরীর সহিত দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া গল্প-গুজব করিতে লাগিল, হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল--এই ব্যাপার ক্রমে ক্রমে অতীনের অসহ্য হইয়া উঠিল, শেষে একদিন কাজরী যখন ডাক্তার বান্ধবী বিজয়ার সাহায্যে, অতীনের অমতে—তাহার মা হওয়ার সম্ভাবনাকে চিরকালের মত নষ্ট করিয়া দিল, তখন উভয়ের বিরোধ চরমে উঠিল। এই দাম্পত্য কলহ শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় পরিণত হয়। কাজরীর সহিত অতীনের সম্পর্ক ছেদ হইয়া গেল। অপর দিকে কেতকীর একটি পুত্র সন্তান হইল এবং বারংবার তাহার মাতুল রামকানাইবাবু তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিলে, সে শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিল। সংসারের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরী লইল। কেতকী একান্ত নিষ্ঠাবতীর মত শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা, সন্তানের প্রতি ভালবাসা লইয়া সংসারের সমস্ত কিছু বিপদ আপদ সহ্য করিতে লাগিল। অবশেষে অতীন একান্ত অপরাধীর মত পিতা-মাতা ও স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিল। সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের পূর্বকৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিল। এক মিলন-মধুর পরিবেশের মধ্য দিয়া যবনিকা নামিয়া আসিল।

এই কাহিনীর মধ্য দিয়া সনাতন বিবাহ-রীতির যেমন শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, অপর পক্ষে তেমনি রমণীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় যে মাতৃত্বে, তাহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষার উৎকট উগ্রতার দিকটির প্রতিও নাট্যকার কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। এই কাহিনীতে আরও বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, কত তুচ্ছ কারণেই না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন বলবৎ হইবার পূর্বে

দাম্পত্য-অশান্তি আত্মহনন প্রভৃতি নানাপ্রকার করুণ পরিণতিতে পর্যবসিত হইত। আধুনিক কালে আইন সেই বিষয়কে রোধ করিলেও, ব্যক্তিগত ভাল-লাগা-মন্দলাগাকে স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিবার উপায় নির্ধারণ করিলেও অপরাপর বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে, পূর্বে উদ্ধৃত 'স্টাফ রিপোর্টারের' বিবৃতি দ্বারা এই বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই কাহিনীতে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন প্রধানতঃ স্বামীর দিক হইতে আসে, কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীর দিক হইতেও যে আসে না তাহা নহে।

ইহার পরেই এই বিষয়ক যে নাটকটির কথা উল্লেখ করিতে হয় তাহার নাম 'দাবী'। রচয়িতা দেবনারায়ণ গুপ্ত। এই নাটকটি মধ্য দিয়া নাট্যকার শেষ পর্যন্ত মাতৃত্বের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করিলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত সমস্যাটিকে বিশেষ যোগ্যতার সহিত উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার বিবাহটি যদিও প্রেমজ-বিবাহ এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই প্রকার বিবাহের যে প্রকার পরিণতি সাধারণতঃ হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। এখানে দ্বন্দ্ব মূলতঃ অর্থনৈতিক বৈষম্যগত, নর-নারীর প্রেম সম্পর্কিত নহে। অর্থকে মানদণ্ড করিয়া যে অসবর্ণ বিবাহ, তাহা শাস্ত্রগত অসবর্ণ বিবাহ অপেক্ষা যে ঘাত-প্রতিঘাত শূন্য, তাহা নহে। নিম্নে নাটকটি হইতে প্রয়োজন মত অংশ উদ্ধার করিয়া কাহিনীটি বর্ণনা করিলাম।

কলিকাতার কোন এক বাসাবাড়ীতে বীরেশ্বরবাবু তিনটি ছেলে, এক মেয়ে লইয়া সস্ত্রীক বাস করেন। আর্থিক সঙ্গতির দিক হইতে ইহারা একেবারে নিম্নতম মধ্যবিত্তের স্তরে স্থান পাইয়াছেন। তিনি নিজে বৃদ্ধ, দৃষ্টি প্রায় অস্তমিত, মাত্র পঁচিশ টাকার অভাবে তাঁহার একটি চশমা হয় না। বড় ছেলে অরুণ স্বদেশী যুগে পুলিশের গুলিতে একটি পা হারাইয়াছে, কিন্তু আজ এই সাংসারিক দুর্দিনে মনের জোর হারায় নাই। ক্রাচে ভর দিয়া সে খবরের কাগজে কাজ করে এবং তাহাতেই সমস্ত সংসারটি কোন রকমে গড়াইয়া চলে। ছোট দুই জন ছেলে ভোম্বল ও রাধু বছরের পর বছর স্কুলে ফেল করিয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছে; এখন একজন যাত্রাদলে এ্যাকটিং করে ও অপর জন বেহালা বাজায়। মেয়ে ফুলটুসি ওরফে মানসী বি.এ পাশ, কয়েকটা টুইশানি করে বটে, কিন্তু তাহা তাহার জামা-কাপড় ও প্রসাধন কিনিতেই ব্যয় হইয়া যায়, সংসারের দিকে আদৌ তাকায় না। ফুলটুসি দরিদ্র মাতা-পিতা বা ভাই-এর

এই সংসারকে ঘৃণা করে, বড়লোকের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে গোপনে প্রেমালাপ করে। বালীগঞ্জের বড় ব্যবসাদার মিঃ আচারিয়ার একমাত্র পুত্র সুবীর সম্প্রতি ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়াছে। তাহার সহিতই মানসীর কলেজে পড়িবার সময়েই আলাপ হইয়াছিল; কলিকাতার এক অভিজাত পাড়ার এক অভিজাত হোটেলে বসিয়া তাহাদের যে আলাপ হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই অবস্থায় যুবক-যুবতীদিগের আচরণ বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—

[হোটেল ডি-লুক্স। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে প্রবল বর্ষণ সুরু হয়েছে। হোটেলের একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে সুবীর ও ফুলটুসি (মানসী)-কে দেখা গেল। সম্মুখের টেবিলে বহুবিধ খাবার ও পানীয়। ফুলটুসি কাঁটা-চামচেয় কিছু খাদ্যবস্তু তুলিয়া সুবীরের মুখে তোলে। সুবীর খাদ্যবস্তুটুকু কাঁঠাচামচ থেকে মুখে তুলে নেয়।]

সুবীর । একি! বসে বসে আমাকেই যে খালি খাওয়াচ্ছ। নিজে যে কিছুই মুখে তোলনি?

ফুলটুসি । নিজে খাওয়ার চেয়ে তোমাকে খাইয়েই আমার বেশী তৃপ্তি। তাইত—

সুবীর । তোমাকে খাইয়েও আমার তৃপ্তি। তাই—
(কাঁটা চামচেয় সুবীর কিছু খাবার তুলিয়া ফুলটুসির মুখে ধরিল)

ফুলটুসি । সত্যি, সুবীর। আজ পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির কথা মনের কোণে রঙিন হয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

সুবীর । আর ভবিষ্যতের দিনগুলোকেও যে তেমনি রঙিন করে তুলতে হবে মানসী।

ফুলটুসি । তুলবো। বিশ্বাস কর, রামধনুর সাতরঙা রঙে রাঙিয়ে তুলবো আমাদের জীবন। যখন তুমি বিদেশে পড়তে যাও, তখন মনের কোণে কত ভয়-ভাবনাই না দোলা দিত—সেখানকার সুন্দরী-দের মোহের জালে তুমি হয়তো আটক পড়বে। আর হয়ত তোমাকে ফিরে পাব না।

সুবীর । কোন মোহেই আমি মুগ্ধ হইনি মানসী! যৌবনের মদির অঞ্জন

যা তুমি নিজের হাতে লাগিয়েছিলে সে চোখ সুদূর থেকেও তোমাকে বার বার খুঁজে ফিরেছিল—

ফুলটুসি । সত্যি!

সুবীর । সত্যি!

ফুলটুসি । (সহসা উত্তেজিতভাবে সুবীরের হাত দুটি ধরে) ওগো! সুদূরের পিয়াসী বলো-বলো—এমনি বাদল ঝরা শ্রাবণ সন্ধ্যাকে কবে আমরা একান্তভাবে একাত্ম করে তুলতে পারব?

সুবীর । আমি ত তার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত, শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষায়—

[আলোচনায় বাধা পড়ে যায়। সহসা জনৈক কোট-প্যান্টুলান পরা ভদ্রলোক ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে জলে ভিজতে ভিজতে হোটেলে প্রবেশ করেন এবং ওয়াটারপ্রুফটি গা থেকে খুলে সুবীর ও মানসীর সম্মুখের চেয়ারটি দখল করে বসেন। ভদ্রলোকের নাম যশোদা জীবন জোয়াদ্দার। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাজ করেন। যশোদাজীবন চেয়ারে বসে প্রথমেই সহাস্য মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সুবীর ও মানসীর ওপর তারপর সুবীরের দিকে চেয়ে বল্লেন]

যশোদা । উঃ। কী সাংঘাতিক বৃষ্টি হচ্ছে দেখেছেন?

সুবীর । বর্ষাকাল বৃষ্টি ত হবেই।

যশোদা । (বিজ্ঞের হাসি হেসে) হেঁ হেঁ তা ত বটে বর্ষাকাল।

(ইতিমধ্যে জনৈক হোটেলের বয় যশোদাজীবনের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, মেনু চার্ট সম্মুখে তুলে ধরে। চার্ট দেখে যশোদা বলেন—)

একটা কাটলেট। ব্রেষ্ট নয় - অর্ডিনারী। বেশ একটু কড়া করে দিও— (বয় চলে যায়। সুবীরের দিকে চেয়ে যশোদা বলেন) বুঝলেন, বর্ষার দিনে কাটলেট-টাটলেটগুলো একটু কড়া না হলে জমে না। আপনারা কি খেলেন? (সম্মুখের ডিস্‌গুলির দিকে চেয়ে) একি নিয়েছেন প্রচুর। খাননি যে কিছুই দেখছি পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখিয়ে অপর্যাপ্ত আহার কাজের কথা নয়— খেয়ে নিন্ —

সুবীর । আপনার অনাবশ্যক উপদেশের প্রয়োজন নেই।

যশোদা । ও আই অ্যাম সরি। সত্যই ত অহেতুক অনাবশ্যক উপদেশ দিয়ে ফেলেছি—না না। খাবেন না, কখখনো খাবেন না, পয়সা

দিয়ে কিনলেই খেতে হবে তার কি মানে আছে? (ইতিমধ্যে বয় আসে ও কাটলেট দিয়ে যায়। কাটলেটে ছুরি বসিয়ে) আমি ততক্ষণ খেয়ে নি। বর্ষার দিনে ভাজা জিনিস জুড়িয়ে গেলেই আম্‌সি! আপনারা ততক্ষণ গল্পগুজব করুন, না হয় মশলা চিবোন অথবা টুথপিক-এ দাঁত খুঁটুন। আই অ্যাম সরি, আবার উপদেশের মত হয়ে যাচ্ছে (কাটলেট খাইতে লাগিল)

স্ববীর। অভদ্রতা সরি দিয়ে চাপা দেওয়া যায় না—

মানসী। চলো, আমরা অন্য টেবিলে যাই—

যশোদা। না না, আপনারা যাবেন কেন? অতগুলো ডিস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া আপনাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। তার চেয়ে আমিই যাচ্ছি—ছোট্ট কাট্‌লেট—

(যশোদা ডিস্‌ ও জলের গ্লাস নিয়ে অদূরের টেবিলে সরে গেল)

মানসী। লোকটার বোধ হয় মাথা খারাপ!

স্ববীর। খুব সম্ভব!

মানসী। যাক্‌। কাজের কথা হোক। তারপর তোমার বন্ধুর খবর কি বলো?

স্ববীর। পরেশ ত খুব সাপোর্ট করলে। বল্লে, তার বাবা মা প্লিসেণ্ট ট্রিপ-এ বাইরে গেছেন। বাড়ী খালি। ম্যারেজ রেজিষ্টারকে এনে ওখানে বিয়েটা বিধিবদ্ধ করা হবে।

মানসী। কিন্তু তোমার মা-বাবা ও অরুণিমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন বলে মিসেস ব্যাণ্ডোকে কথা দিয়ে রেখেছেন।

স্ববীর। বিয়েটা কি প্রক্সিতে হয় মানসী? কথা যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা ত আমার প্রক্সি দিয়েছেন। কিন্তু আমার তাতে কতটুকু সম্মতি আছে তা তাঁরা জেনেছেন কি?

মানসী। তা হয়ত বা তাঁরা জানার প্রয়োজন মনে করেন নি। ভেবেছেন তারা যে ব্যবস্থা করতে চলেছেন তাতে তোমার কোন আপত্তি হবে না।

স্ববীর। ভাবাভাবির কথা নয় মানসী। উচিত ছিল আমার মতামত তাঁদের জেনে নেওয়া—

মানসী । ইচ্ছে করলে তুমিও ত কথাটা তাঁদের জানিয়ে দিতে পার।

সুবীর । তাতে আমার পক্ষে একটু অসুবিধা আছে।

মানসী । কি ?

সুবীর । বিয়ে করার পর জানালে, তাঁরা আর আপত্তি করার সুযোগ পাবেন না। কিন্তু বিয়ের আগে সম্মতি নিতে গেলে আপত্তি জানাবেন। তার ফল ভাল হবে না মানসী। তাই ভেবেছি বিয়েটা আগে হয়ে যাক্ তারপর তাঁদের জানাব যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

মানসী । কিন্তু বিয়ের পর তোমার বাবা-মা যদি আমাকে স্থান না দেন।

সুবীর । তাতেই বা কি আসে যায়। আমরা দু'জনে কি মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে নিতে পারব না।

মানসী । মোটা ভাত কাপড়ের জন্যে চেষ্টা করতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। কিন্তু তুমি কী সে কষ্ট সহ্য করতে পারবে ?

সুবীর । কেন পারব না ? ভালবাসার জন্য যে দুঃখ, সে দুঃখ মিলনের পথে অন্তরায় হয়না মানসী। সে দুঃখ মিলনকে মধুরতম করে তোলে।

(মানসী ও সুবীরের উপরোক্ত কথার মাঝে যশোদাজীবন কখন যে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কেহই তাহা টের পায় নাই। যশোদা সুবীরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে)

যশোদা । ঠিক বলেছেন। প্রেমের জন্যে দুঃখ সে দুঃখ সুগার কটেড।

সুবীর । আপনি ত আচ্ছা লোক ! চুপি চুপি এসে আমাদের কথা ওভার হিয়ার করছেন।

যশোদা । এক্সকিউজ মি। যদি আপনার কোন উপকারে লাগতে পারি, তাই—

সুবীর । থ্যাঙ্কস্। কিন্তু উপযাচক হয়ে আপনার কোন উপকারের দরকার নেই।

যশোদা । বলছিলাম কি। আমি ম্যারেজ রেজিষ্টার ফি মডারেট।

সুবীর । আপনি রেজিষ্টার ?

যশোদা । আজ্ঞে হাঁ। (পকেট থেকে কার্ড বাহির করিয়া) এই কার্ডটা দেখলেই বুঝতে পারবেন আমার নাম ধাম ঠিকানা সব লেখা আছে।

সুবীর । (কার্ডটি কাড়িয়া) আচ্ছা, সময় মত আপনাকে খবর দেব ।

যশোদা । যে আজ্ঞে। তবে বলছিলাম কি শুভস্য শীঘ্রম। ভাল কাজ ফেলে রাখবেন না। মনে প্রাণে যখন এক হয়েছেন তখন একাত্মা হয়ে যাওয়াই ভাল, আচ্ছা আসি—নমস্কার [প্রস্থান।

সুধীর । না মানসী, আর ইতস্ততঃ করব না। আজই পরেশের কাছে গিয়ে বলব, ওদের বাড়ীতেই আমাদের বিয়েটা রবিবার হবে। আলোচনার মাঝে যখন ম্যারেজ রেজিষ্টারের সন্ধান মিলে গেল, তখন বুঝতে হবে প্রজাপতির নির্বন্ধ।

এইভাবে প্রেমের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হইয়া সংসার অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতী পিতা-মাতার অ-মতে জীবনের চরম পরিণতির দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সাময়িক মোহের বশবর্তী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম চিন্তার অবকাশ থাকিল না। পূর্বেই বলিয়াছি যে যেখানে সত্যকারের প্রেম থাকে সেখানে নারী-পুরুষের হৃদয়ের বন্ধন সহজে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রেমজ-বিবাহগুলির প্রথম পর্যায়ে দৈহিক বা বাহ্যিক আকর্ষণই প্রধান থাকে, তাই যখনই সেই আকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়, তখনই অধুনা প্রবর্তিত বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এইভাবে যে কত জীবন নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই নাটকেও অ-সম (অর্থনৈতিক বৈষম্য) বিবাহের ফলে কিভাবে পূর্বোক্ত যুবক-যুবতীর জীবনে দুর্বিপাক নামিয়া আসিল দেখা যাইতে পারে।

প্রথমে উভয়ের তিন আইন মতে বিবাহের সংবাদ পাইয়া পুত্রের মাতা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়ে নিরাপরাধিনী কন্যাটির উপর—যে সমস্ত পরিবেশ ও পরিণাম না বুঝিয়া অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে,

[বালীগঞ্জ। মিঃ আচারিয়ার বাড়ীর ড্রইং রুম। মিঃ আচারিয়া চিন্তিত মনে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিলেন এবং মিসেস আচারিয়া একটি কোচে বসিয়াছিলেন]

মিসেস আচাঃ। ছিঃ ছিঃ ! আমি ভাবতেই পারিনি যে, সুবীর আমাদের এমন ভাবে অপদস্থ করবে। মিঃ এণ্ড মিসেস ব্যাণ্ডোর কাছে আমরা মুখ দেখাব কেমন করে ?

মিঃ আচাঃ। অরুণিমাকে বিয়ে করার ওর যখন ইচ্ছেই ছিল না সে কথাটা ত মুখ ফুটে বললেই পারত।

মিসেস আচাঃ। বলে নি পাছে আমরা আপত্তি করি। No never—ও মেয়েকে কিছুতেই আমি বৌ বলে accept করতে পারব না।

মিঃ আচাঃ। কিন্তু accept না করে উপায়ই বা কি? ছেলের বৌকে অস্বীকার করতে পারলেও ছেলেকে ত অস্বীকার করতে পারব না। ও যদি আজ আলাদা হয়ে থাকে। কষ্ট পায়?

মিসেস আচাঃ। নিজের ভুলের জন্যে যদি নিজে কষ্ট পায়, পাবে।

মিঃ আচাঃ। মুখে বলছ বটে, কিন্তু ছেলের কষ্ট কি তুমি সহ্য করতে পারবে?

মিসেস আচাঃ। একমাত্র ছেলে কষ্ট পাক, কোন বাপ-মাই তা চায় না। কিন্তু আমি ভাবছি, আমাদের society-তে যখন জানাজানি হবে, তখন আমি face করব কি করে? মিসেস ব্যাণ্ডোকে আমি কি বলব? এই ক'দিন আগে তাঁর সঙ্গে New Market-এ দেখা, বললেন Marketing স্বরু করে দিয়েছি কিন্তু।

মিঃ আচাঃ। একটু আগে মিঃ ব্যাণ্ডোকে Telephone-এ আমি সব কথাই জানিয়েছি।

মিসেস আচাঃ। জানিয়েছো?

মিঃ আচাঃ। হ্যাঁ ভেবে দেখলাম কথাটা চেপে রেখে লাভ নেই।

মিসেস আচাঃ। মিঃ ব্যাণ্ডো কি বললেন?

মিঃ আচাঃ। কি আর বলবেন? বললেন, ছেলের movement-এর ওপর নজর রাখেননি কেন? এক রকম আমাদের এক্সিডেণ্ট করলেন বলা চলে।

মিসেস আচাঃ। ছিঃ ছিঃ। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

মিঃ আচাঃ। সবই ভবিতব্য। নইলে এমনই বা হবে কেন?

মিসেস আচাঃ। ডোনট্ ইউজ অল দিজ ননসেনস্ ওয়ার্ড—ভবিতব্য। ও সব ভবিতব্য অদৃষ্টের দিন চলে গেছে।

মিঃ আচাঃ। ভুল করছ; চলে যায়নি। সত্যিই যদি চলে যেত তাহলে তোমার ছেলে মিঃ ব্যাণ্ডোর মেয়েকেই বিয়ে করত। তোমরা যাকে সেটেল্‌ড ফ্যাক্ট হিসেবে ধরে নিয়েছিলে—

মিসেস আচাঃ। তোমরা মানে? তুমি কি বলতে চাও—অরুণিমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা তুমি সেটেল্‌ড ফ্যাক্ট বলে ধরে নাওনি?

মিঃ আচাঃ। একেবারে নিইনি একথা বললে, মিথ্যে বলা হয়। তবে মনে সব সময়েই একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল।

মিসেস আচাঃ। সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল তা আমায় বলোনি কেন?

মিঃ আচাঃ। বলব বলব মনে করেও বলতে পারিনি।

মিসেস আচাঃ। কেন?

মিঃ আচাঃ। পাছে তুমি আঘাত পাও তাই—

মিসেস আচাঃ। আজকে যে আঘাত পেলাম তার চেয়ে সে আঘাত বোধ হয় বেশী হোত না।

মিঃ আচাঃ। সুবীরের জন্মদিনে মেয়েটি এলো, তোমার মুখেই শুনলাম মেয়েটি নাকি চমৎকার গান গেয়েছে। সুবীর গাড়ী করে তাকে পৌঁছে দিয়ে এলো, অথচ তোমার মনে যে খটকা লাগেনি তা কি করে জানাব বল?

মিসেস আচাঃ। সুবীর কি তাহলে সেই বস্তির মেয়েটাকে বিয়ে করলো নাকি।

মিঃ আচাঃ। তুমি বড্ড উত্তেজিত হয়েছো। মেয়েটি বস্তির নয়। ভদ্র ঘরেরই, তবে দরিদ্র।

মিসেস আচাঃ। দরিদ্র। মানে, হাভাতের ঘরের মেয়ে। ও মেয়েকে কোনদিনই আমি এ সংসারে স্থান দিতে পারব না।

মিঃ আচাঃ। কিন্তু ছেলে যখন বিয়েই করেছে, তখন তাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ না করলে আমাদের পক্ষেও কম নিন্দের কারণ হবেনা।

মিসেস আচাঃ। হোক নিন্দে, তবু ও মেয়েকে আমাদের সোসাইটির কাছে পুত্রবধূরূপে পরিচয় দিতে পারব না।

মিঃ আচাঃ। সোসাইটির কাছে সে পরিচয় দিতে না পারলেও—সুবীর আজ যাকে বিয়ে করেছে, তাকে পুত্রবধূ বলে অস্বীকার করার উপায় নেই।

মিসেস আচাঃ। তুমি কি ওদের এই বিয়েকে এ্যাক্‌সেপ্ট করতে চাও?

মিঃ আচাঃ। এ্যাকসেপ্ট না করার ফল ভাল হবে না মনে করেই, আমি ওদের আসতে খবর পাঠিয়েছি।

মিসেস আচাঃ। খবর পাঠিয়েছো ? বেশ, তাহলে তুমি তোমার ছেলে, ছেলের-বৌ নিয়ে থাক আমি অন্য কোথাও চলে যাই—

মিঃ আচাঃ। অবশ্য তুমি যদি এখানে থাকতে না চাও, তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে চলে যেতে হয়।

মিসেস আচাঃ। তুমি যাবে কোন দুঃখে ?

মিঃ আচাঃ। যে দুঃখে তুমি চলে যেতে চাইছো ?

মিসেস আচাঃ। সে দুঃখটাকে তুমি ত কাটিয়ে উঠেছ দেখতে পাচ্ছি। নইলে কি আর তাদের আসার জন্যে খবর পাঠাতে পারতে ?

মিঃ আচাঃ। ভেবে দেখলাম ওদের বিয়েটাকে এ্যাকসেপ্ট করলেও সোসাইটির কাছে ফেস করতে হবে। এ্যাকসেপ্ট না করলেও হবে। মাঝ থেকে একমাত্র সন্তানকে দূরে রেখে দুঃখ পাওয়াই সার হবে। তাই—

(সহসা সুবীর তার নবপরিণীতা বধূ মানসী ওরফে ফুলটুসীকে নিয়ে প্রবেশ করে। মিসেস আচারিয়া মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাড়ান। মানসী মিঃ আচারিয়া ও মিসেস আচারিয়াকে প্রণাম করে। সুবীর অপরাধীর ন্যায় দাড়িয়ে থাকে। মানসী— মিসেস্ আচারিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে)

মানসী। মা। (মিসেস্ আচারিয়া নিরুত্তর)

সুবীর। মা (মিসেস্ আচারিয়া কোন উত্তর দেন না)

মিঃ আচাঃ। সুবীরকে আমি ডেকে এনেছি, ও সাহস করেনি তোমার সামনে আসতে। এখন তুমি যদি ওকে এ বাড়ীতে স্থান দাও তবেই ওর এখানে স্থান হবে।

মিসেস আচাঃ। স্থান দেবার মলিক আমি ? না তুমি ?

মিঃ আচাঃ। মালিক তুমি, তুমি মা। সন্তানের জন্ম মায়ের জঠরে সন্তানের আশ্রয় মায়ের কোলে, সন্তানের মুক্তি মায়ের চরণে।

(মিঃ আচারিয়ার কথায় মিসেস্ আচারিয়া ভেঙ্গে পড়েন। সুবীরকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেন)

মিসেস আচাঃ। সুবীর।

সুবীর। মা।

মিঃ আচাঃ। সোসাইটির মুখ চেয়ে তোমার যে ভয় হয়েছিল, আশা করি সন্তানের মুখ চেয়ে সোসাইটির কথা তুমি ভুলে যাবে।

আশা করব, মা-ছেলের মধুর সম্পর্কের মধ্যেই যেন আমাদের নতুন সোসাইটি গড়ে ওঠে।

মিসেস আচারিরা কোন ক্রমেই এই ঘটনাটিকে নিজের জীবনে ও সংসারে মানাইয়া লইতে পারিলেন না। যে বিলাসিতা এবং ধনী সমাজের কৃত্রিম উন্নাসিকতার পরিবেশে তিনি মানুষ; পুত্রবধূকে সেই পরিবেশের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করিয়া পদে পদে অপমানিত করিতে লাগিলেন। এমন কি পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে 'একগাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে না'। সুবীরও তাহার মায়ের সঙ্গে একমত। তাহার চোখের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। গরীবের মেয়েকে শুধুমাত্র ভালবাসার মূলধনে বিবাহ করিবার বিলাসিতা তাহার মিটিয়া গিয়াছে। এখন সে আবার নূতন পুতুল লইয়া খেলা করিতে চায়। তাই সে মদের দোকানে বসিয়া ফেনায়িত রঙিন মদের গ্লাস সামনে রাখিয়া তাহার পূর্ব প্রণয়িনীকে বলে;—

সুবীর। সত্যি অরু, বাড়ীতে আর একদণ্ডও ভাল লাগে না। মনে হয় কয়েদখানায় রয়েছি।

অরুণিমা। কয়েদখানা?

সুবীর। মানসী প্রায় সেই রকমই ক'রে তুলেছে। এটা খেয়ো না, ওটা করো না। সকাল সকাল ফিরো—ইত্যাদি হাজার বায়নাক্কা।

অরুণিমা। তবে তো খুবই মুস্কিল।

সুবীর। হ্যাঁ। সবেতেই তার ভয়।

অরুণিমা। ও সব মেয়েরা ঐ রকমই হয়। দাঁড়কাক আর ময়ূরপুচ্ছের গল্প জান ত? সব তাতেই ওদের ভয়—পুচ্ছ খসে পড়লেই দাঁড়কাকের স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে।

সুবীর। যা বলেছো—

অরুণিমা। বিয়ের আগে তোমার চোখে যে ও কিসের কাজল পরিয়েছিল জানি না।

সুবীর। বোধহয় মায়া-কাজল। নইলে দেখছো না, এখনো মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

অরুণিমা। মায়া না ছাই—ওটা তোমার দুর্বলতা।

সুবীর । তুমি বিশ্বাস কর অরু, এখন ওর ওপর কোন দুর্বলতা আমার নেই।

অরুণিমা । কিন্তু তবুও তো ছাড়তে পারছো না ?

সুবীর । ছাড়তে পারছি না, বাচ্ছাটার জন্যে।

অরুণিমা । বাচ্চার প্রবলেম্ তো অনায়াসে সল্‌ভ্ করা যায়।

সুবীর । কী করে ?

অরুণিমা । একটা আয়া রাখালেই ত মিটে যায়। অমন মায়ের কাছে রাখার চেয়ে আয়ার কাছে বাচ্ছাকে রাখা অনেক ভাল। ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ আউট্-লুক্‌টা ভাল হবে।

সুবীর । তা যা বলেছ। গরীবের ঘরের মেয়ে কথায় কথায় মাথার দিব্যি দিয়ে বসে।

অরুণিমা । বল কি !

সুবীর । হাঁ, মদ খাওয়ার জন্যে মাথার দিব্যি দেবে, সকাল সকাল বাড়ী ফেরার জন্যে মাথার দিব্যি দেবে—পায়ে পড়বে। আরো কত কি—

অরুণিমা । ছিঃ তোমার কথা শুনে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। শোন, আর দেরী নয়। যা করতে হবে চট্‌পট্ করে ফেলাই ভাল।

সুবীর । আমিও তো তাই চাই। কিন্তু পারছিনা শুধু ছেলেটার জন্যে—

অরুণিমা । আইন বলে ছেলে বাপের।

সুবীর । সে কথা ঠিক। কিন্তু তারও একটা সময় আছে। মা ইচ্ছে করলে, সন্তানকে বেশ কিছুদিন আটকে রাখতে পারে।

অরুণিমা । শোন সুবীর, একটা উপায় আছে। তুমি ডাইভোর্স-এর দরখাস্ত ওকে দিয়ে কোন রকমে লিখিয়ে নিতে পার যে ও সন্তানকে প্রতিপালন করতে অক্ষম, তাহলেই আর কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না।

সুবীর । বাঃ ! তুমিত মন্দ বলোনি ? ঠিক আছে। দেখি, কি করতে পারি।

(সুবীর পানপাত্রে চুমুক দেয়। শূন্য পানপাত্র আবার পূর্ণ করে। অরুণিমা নিজের ব্যাগ থেকে একটা টাইপ করা দরখাস্ত বার করে বলে)

অরুণিমা । এটা রেখে দাও সুবীর, সময় মত একটা সই করিয়ে নিও—

সুবীর । কি এটা ?

অরুণিমা । পড়ে দেখ।

সুবীর । (দরখাস্তটা পড়ে) ওহো! তাই বল ? সত্যি তোমার ভালবাসার অন্ত নেই অরু। ধাপে ধাপে আমায় বেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ।

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী—
বল কোন খানে ভিড়িবে আমার
এ ভাঙ্গা তরী॥

(সুবীর দরখাস্তটা পকেটে পুরে শূন্য পানপাত্র অরুণিমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে) ঃ প্লিজ, দাও—আরো দাও—

অরুণিমা। আজ অনেক খেয়েছ আর না—

সুবীর । (জড়িত কণ্ঠে) হাঃ হাঃ হাঃ এ যে মানসীর মত কথা হোল অরু—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

(সুবীরের হাত থেকে শূন্য পানপাত্রটি মাটিতে পড়িয়া যায়)।

ইহার পর হইতে সুবীর ও মানসীর বিরোধ বাড়িয়াই যাইতে থাকে। সুবীরের মা মিসেস্ আচারিয়াও এই বিরোধে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন—তিনি আর কোন মন্ত্রেই মানসীকে মানাইয়া লইতে পারিলেন না। অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর প্রেমের যে সৌধ নির্মাণ করা হইয়াছিল তাহা অচিরেই ভূমিস্মাৎ হইল। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, তাই সুবীর যে দৃশ্যে মানসীকে বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্তে সই করিতে বাধ্য করিয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই শ্রেণীর নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলাম ;—

(সুবীরের শয়ন কক্ষ। পরের দিন সকাল। সুবীর খবরের কাগজ পড়িতেছে। মানসী প্রবেশ করে সুবীরকে জিজ্ঞাসা করে)

মানসী । আমায় ডাকছিলে ?

সুবীর । হ্যাঁ। শোন, গতকাল মা'র সঙ্গে তুমি যে ব্যবহার করেছ তার জন্যে মার কাছে তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে।

মানসী । আমার অপরাধ ?

সুবীর । মাকে তুমি অপমান করেছো।

মানসী । আমি অপমান করিনি। বরং তোমার মা-ই আমায় অপমান করেছেন।

সুবীর । মিথ্যে কথা।

মানসী । ইচ্ছে করলে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পার।

সুবীর । তার মানে তুমি বলতে চাও মা-র কথার সত্যাসত্য আমি যাচাই করতে যাব ?

মানসী । বাবাও মিথ্যে বলবেন না নিশ্চয়ই -

সুবীর । বাবাও যেমন মিথ্যে বলবেন না, মা-ও তেমনি মিথ্যে বলেন নি।

মানসী । কি করে জানলে ? মা-র কথা শুনে ?

সুবীর । হ্যাঁ।

মানসী । তাহলে তুমি ভুল শুনেছো। তোমার মা, আমার বাবা মা-র অসম্মান করেছেন। আমাকে বস্তির মেয়ে বলেছেন। আমি গরিবের মেয়ে হতে পারি, কিন্তু বস্তির নই।

সুবীর । তোমার আচার ব্যবহার কতকটা সেই রকম বলেই মা –

মানসী । ও! তাহলে তুমিও—

সুবীর । হ্যাঁ, আমিও। শোন, তোমাকে নিয়ে আর এভাবে সারা জীবন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়—

মানসী । কি চাও সেটা স্পষ্ট করেই বল না।

সুবীর । আমাদের সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মত যোগ্যতা তোমার নেই।

মানসী । যোগ্যতার যাচাই করতে একদিন ভুল করেছিলে বল ?

সুবীর । হ্যাঁ। কিন্তু আজ সে ভুলের সংশোধন করতে চাই।

মানসী । আমি তোমার মা-র কাছে ক্ষমা চাইলেই কি সে ভুলের সংশোধন হবে ?

স্ববীর । না। অন্য উপায়ে যে ভুল শোধরাতে হবে।

মানসী । থামলে কেন, বল অন্য উপায়ে—

স্ববীর । আগে মা-র কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো—তারপর জানাব।

মানসী । তোমার মা আমার পুজনীয়া তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় আমার লজ্জা নেই। কিন্তু স্বামীর কাছে স্ত্রীর অযোগ্যা আখ্যা—এর চেয়ে বড লজ্জা আর কিছু নেই। কাজেই অযোগ্যাকে জীবন-সঙ্গিনী করে তুমি যে ভুল করেছ—সে ভুল কি ভাবে সংশোধন করবে সেটা আগে জানা দরকার।

স্ববীর । তাহলে শোন, তোমাব সঙ্গে সকল সম্পর্কচ্ছেদ করে এর সংশোধন করতে চাই—

মানসী । কি বললে ?—

স্ববীর । আমি অনেক ভেবে দেখেছি এ ছাড়া আর পথ নেই।

মানসী । বেশ !

স্ববীর । খোকা আমার কাছেই থাকবে।

মানসী । চমৎকার ! কিন্তু খোকাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে ?

স্ববীর । তা জানি না। জানার প্রয়োজনও নেই আমার ?

মানসী । কারণ ?

স্ববীর । তোমার বা তোমাদের পরিবারের এমন কোন সঙ্গতি নেই যে তোমরা খোকাকে ভালভাবে মানুষ করতে পার।

মানসী । ভালভাবে মানুষ করার সঙ্গতি নেই সত্যি কিন্তু ঐটুকু শিশুকে কেড়ে রাখার অধিকারও তোমার নেই।

স্ববীর । আইনতঃ এখন হয়ত নেই। কিন্তু ক'বছর পরে সে অধিকার আইনতঃ আমারই হবে! কাজেই অনর্থক মায়া বাড়িয়ে, আর ছেলেটাকে কষ্ট দিয়ে তোমার লাভ কি ? ভাল খেতে দিতে পারবে না। ভাল পরতে দিতে পারবে না। শুধু বাচ্চাটাকে কষ্ট দেয়া হবে।

মানসী । কষ্ট! না না, ছেলের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারব না। তোমার ছেলে তোমাকেই দিয়ে যাব। বেশ তাই হবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুবীর । হবে নয়। শোন মানসী। অশান্তি পুষে রাখতে চাই না, এখুনি এর আমি ব্যবস্থা করতে চাই।

মানসী । আর দেরী সইছে না বুঝি!

সুবীর । না। দরখাস্ত আমি টাইপ করে এনেছি। সই করে দিয়ে যাও।

মানসী । প্রয়োজনটা এত জরুরী, আমি ভাবতেও পারিনি। বেশ দাও।

(সুবীর কাগজ দেয়। মানসী নিঃসঙ্কোচে কাগজে সই করিয়া যাইবার আগে খোকাকে একবার কোলে লইয়া আদর করে)

মানসী । যেতে পারি কি? না, সে অধিকারও হারিয়েছি?

সুবীর । মাকে বলে দেখতে পার।

মানসী । তাহলে থাক।

(মানসী ঘর হইতে বাহিরে যাইবে এমন সময় মিঃ আচারিয়া মানসীকে ডাকিতে ডাকিতে ঘরে প্রবেশ করেন। সুবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করে। মিঃ আচারিয়া বলেন)

মিঃ আচাঃ । মানসী! তোমাকেই এতক্ষণ খুঁজছিলাম মা।

মানসী । কেন বাবা?

মিঃ আচাঃ । সকল থেকে তোমায় এক বারও দেখতে পাচ্ছি না তাই—

মানসী । আজ থেকে এ বাড়ীতে আর আমায় দেখতে পাবেন না বাবা!

মিঃ আচাঃ । এত অভিমান কেন মা?

মানসী । অভিমান নয় বাবা! যে অধিকারে এত লাঞ্ছনার মাঝেও এখানে ছিলাম, সে অধিকার যে আর আমার নেই।

মিঃ আচাঃ । অধিকার নেই? কি বলছ তুমি? কি চুপ করে রইলে যে, আমার কাছে লজ্জা কি মা? বল……

মানসী । আপনার ছেলে আমার সব অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। আমি—

মিঃ আচাঃ । কেড়ে নিয়েছে?

মানসী । হ্যাঁ। এইমাত্র দরখাস্তে সই করিয়ে নিলেন।

মিঃ আচাঃ । তবে তো কাজ শেষ।

মানসী । (কাঁদিয়া) এরপর তো আর আমার এখানে থাকা চলে না বাবা।

মিঃ আচাঃ। না না, তা কি করে চলবে? সেপারেশন যখন--তখন চলে তো তোমায় যেতেই হবে। কিন্তু খোকা। তার কি ব্যবস্থা করলে?

মানসী । গরিব মায়ের কাছে ছেলেকে দিলে পাছে তার অযত্ন হয়— তাই—

মিঃ আচাঃ। মা-র কাছে ছেলের অযত্ন হবে?

মানসী । আমি যে গরীব মা। কিন্তু ছেলের বাপ তো গরীব নয়— .

মিঃ আচাঃ। সে কথা ঠিক। বাপের পরিচয়েই ছেলের পরিচয়। কিন্তু তাই বলে সন্তানের ওপর মায়ের দাবীও উপেক্ষিত নয়।

মানসী । কিন্তু আমি যে সব দাবী দাওয়াই ছেড়ে দিলাম, বাবা।

মিঃ আচাঃ। ছেড়ে দিলে। আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না মা? তোমার ছেলের কথা ভাবলে না ··আর আমার কি উপায় হবে তাও একবার ভাবলে না! তুমি নিঃস্ব হয়ে আমাকেও নিঃস্ব করে গেলে। (কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসে।)

মানসী । আমার যে উপায় ছিল না বাবা! আপনার ছেলে শান্তি চায়। সংসারের শান্তির জন্যে···

মিঃ আচাঃ। শান্তি? তুমি চলে গেলেই কি এদের সংসারে শান্তি ফিরে আসবে? এ তো শান্তির পথ নয় মা—এ যে পল্লবহীন শাখায় বসে শুধু শকুনির শিকার সন্ধান।

ইহার পরে ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কোলের শিশু সন্তানকে ছাড়িয়া মানসী থাকিতে পারে না। কেবলই কাঁদে, অন্যদিকে মিঃ আচারিয়ার মধ্যেকার অবরুদ্ধ স্নেহধারার উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছে, তিনি কন্যা সদৃশা মানসী ও তাহার শিশুপুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। মানসীর কান্না দেখিয়া তাহার ছোট ভাই একদিন বৈকালে পার্ক হইতে বাচ্চাটিকে চুরি করিয়া আনিয়া মানসীর বুকে তুলিয়া দেয়। মিঃ আচারিয়া উভয়কে দেখিবার জন্য মানসীর দরিদ্র পিতার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এক উত্তেজনা পূর্ণ মুহূর্তে সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি হইয়া যায় এবং গরীব বড়লোকের অ-সম সমাজ-মানের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়।

এই নাটকের মধ্য দিয়াও আমরা দেখিলাম যে, শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকার না করিয়া লওয়াকেই গৌরব দান করা হইয়াছে। প্রথমে আলোচিত

সুবোধ ঘোষের 'শ্রেয়সী' নাটকটির মধ্যেও যেমন মাতৃত্বকে আশ্রয় করিয়া নাটকটির মিলনাত্মক পরিণতি সম্ভব হইয়াছে, এই নাটকটির মধ্যেও তাহাই লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হইবার পর যেমন অকারণ নারী-নির্যাতন করিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইয়াছে, তেমনই কোন কোন ক্ষেত্রে এই আইনকে আশ্রয় করিয়া কেহ কেহ যে অযথা স্বেচ্ছাচারিতা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন না, তাহাও বলিবার উপায় নাই,—উপরে আলোচিত দুইটি নাটকের মধ্যে এই আইনকে অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা কিছুটা প্রশ্রয় পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নাট্যকারদ্বয় যেন দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, নর-নারীর ব্যক্তিগত খেয়াল (whim) চরিতার্থ করিবার উপায় এই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দুঃখের আগুনে পুড়িয়া নায়ক বা নায়িকা শেষ পর্যন্ত জীবনে সত্যকার প্রেমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

উপসংহার

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই যেমন কিছুকাল যাবৎ পল্লীর সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হইয়া নাগরিক ও শিল্পকেন্দ্রিক এক নূতন সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, বাংলা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মধ্য যুগের বাংলায় নগর এবং তাহার সমাজ যে ছিল না, তাহাই নহে; কিন্তু সে যুগে নাগরিক সমাজের পক্ষে দেশের বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করিবারও কোন শক্তি ছিল না। অর্থনৈতিক দিক দিয়াই হোক, কিংবা সামাজিক দিক দিয়াই হোক, পল্লীই বরং সেদিন নাগরিক সমাজের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু আধুনিক কালে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আজ পল্লীর সমাজ-জীবন শিথিলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার এই শৈথিল্যের অবকাশে এক শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের উপকরণ গিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মৌলিক রূপটি বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। তাহাতে নাগরিক জীবনের উপকরণ বিকৃত রূপ লাভ করিয়া তাহার মধ্যে গিয়া স্থান লাভ করিতেছে। একদিন বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সমস্যা লইয়া যে নাটক রচিত হইত, তাহা পল্লীর সংহত সমাজ-জীবনের সমস্যা ছিল, আজ পল্লীর সমাজ-জীবনের যেমন সংহতি নাই, তেমনই তাহার মধ্যেও এই সকল সমস্যা আর নাই। আজ নাগরিক জীবনের সমস্যাই পল্লীজীবনেরও সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার ফলে নাগরিক জীবনের আদর্শ দ্বারাই কেবলমাত্র বাংলার নাট্যসাহিত্য নহে, সকল শ্রেণীর সাহিত্য-রচনাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

নাগরিক জীবনের সঙ্গে পল্লীর সমাজ-জীবনের প্রধান পার্থক্য, নাগরিক জীবন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পল্লীর জীবন তাহা নহে, প্রথমতঃ পরিবার, তারপর বৃহত্তর সমাজ জীবনের আদর্শ দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত। নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক, পল্লী-জীবনের প্রধান সমস্যা নৈতিক (moral)। উচ্চ-নৈতিক আদর্শের সেবায় পল্লীসমাজে অর্থনৈতিক দুর্গতিও সহনীয় হইয়া উঠে। আধুনিক বাংলার পল্লীজীবনের মধ্যেও আজ নাগরিক জীবনের প্রভাবের ফলে তাহার নৈতিক আদর্শ শিথিল হইয়া পড়িয়া অর্থনৈতিক আদর্শই জয়লাভ করিতেছে। সুতরাং একদিন নাগরিক জীবন এবং পল্লীর সমাজ-জীবনের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাহা আজ ক্রমেই দূর হইয়া গিয়া একটি অখণ্ড আদর্শই সমাজের লক্ষ্য হইতেছে। সুতরাং সেই সূত্রে এক শ্রেণীর জীবনই আজ বাংলা নাটকের উপজীব্য হইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জীবনের মধ্যে

বৈচিত্র্যের অভাব সৃষ্টি হইয়াছে, সে কথা বলিতে পারা যাইবে না। কারণ, কলিকাতা মহানগরীর জীবনই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। বরং পল্লীর সমাজ-জীবন একই অভিন্ন আদর্শের অনুগামী ছিল বলিয়া তাহাতেই বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ' বা 'রমা' নাটকের সমস্যা বাংলার সমগ্র পল্লীরই সমস্যা ছিল, কিন্তু এক কলিকাতা মহানগরীরও বিচিত্র জীবনের মধ্যে সহস্র সমস্যার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং পল্লীর জীবন শিথিল বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে বাংলার সমাজে যে নাটকীয় উপাদানের অভাব হইয়াছে, তাহা নহে, তবে সামাজিক নাটক বলিতে এতদিন পর্যন্ত আমরা যাহা বুঝিয়াছি, এখন আর তাহা বুঝায় না। আজ যে সমস্যার কথা নাটকে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সমাজের সমস্যা নহে, বরং ব্যক্তির সমস্যা; সুতরাং ইহাদিগকে সেই অর্থে আর সামাজিক নাটক বলিতে পারি না।

এই কথা সত্য একদিন পল্লীজীবনের বহির্মুখী সামাজিক সমস্যাগুলিকে রূপ দিতে গিয়া ব্যক্তি চরিত্রের সুগভীর অন্তর্মুখীনতার দিকটি উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আজ বহির্মুখী সামাজিক সমস্যাগুলি গৌণ হইয়া পড়িবার ফলে ব্যক্তি চরিত্রের গভীরতার প্রতি নাট্যকারদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ফলে যে সার্থক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার অবকাশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই এই শ্রেণীর নাটকের সার্থকতার একটি লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজ আর সমস্যা বহির্মুখী নহে, অন্তর্মুখী মাত্র। সুতরাং নাটকও আজ আর সামাজিক নাটক নহে, ব্যক্তিচরিত্রমূলক নাটক মাত্র হইতেছে। এই ভাবেই বাংলার সামাজিক নাটকের শেষ পরিণাম স্থির হইতে চলিয়াছে।

নাগরিক জীবনের মৌলিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা, ইহা দ্বারাই ইহার জীবনের সকল স্তর প্রভাবিত হইয়া থাকে। আজ পল্লীসমাজের বহুবিবাহ নাই কিন্তু নাগরিক সমাজেও ব্যভিচার আছে এবং ব্যভিচারের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। যাহার অর্থ আছে, সে সেই যুগে যেমন বহুবিবাহ করিয়া তাহার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত, আজ তেমনই যাহার অর্থ আছে, সেও সহজেই ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে পারে এবং প্রকৃত পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে। কেবলমাত্র যে আমাদের দেশেরই নাগরিক জীবনের দোষ, তাহা নহে, পৃথিবী-ব্যাপী নাগরিক জীবন প্রায় একই আদর্শে আজ গঠিত হইতেছে। যন্ত্র-সভ্যতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়া একটি অখণ্ড আদর্শ স্থাপন করিতেছে। তাহার ফলে আজ যাহা শিল্পকেন্দ্রিক কলিকাতার

সমাজ জীবনের পক্ষে সত্য, তাহা পৃথিবীর যে কোন নগরীর সমাজ জীবনের পক্ষে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সেই জন্য প্রত্যেক নগর-নগরীরই আজ প্রায় একই সমস্যা। তবে বাংলা দেশের মধ্যে শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতা নূতন বিস্তার লাভ করিতেছে বলিয়া প্রাচীন সংস্কারের ধারা হইতে ইহা সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিতেছে না, এখনও শিল্পকেন্দ্রিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তাহার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু এই অবস্থাটি আরও ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। প্রাচীন সমাজ জীবনের উপকরণকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার মধ্যেই নূতন সমাজ-জীবনে আদর্শকে গ্রহণ করিতে গেলে, ইহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হইয়া উঠে, বাংলা দেশের সমাজের মধ্যে তাহা আজ এক ভয়াবহ রূপ লাভ করিয়াছে। একদিন অবশ্য সেই অবস্থা থাকিবে না, কিন্তু আজও তাহার সেই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ হয় নাই। একদিন বিপুল পৈত্রিক বিত্তের উত্তরাধিকারী সন্তান পিতৃশ্রাদ্ধে যে অর্থব্যয় করিত, তাহা পিতার সঞ্চিত বিত্ত হইতেই আসিত, আজ পুত্রের ব্যক্তিগত উপার্জনে এই কার্যে তাহার পক্ষে সেই ব্যয় সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে, কিন্তু সংস্কার এখানে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, কুলক্রমাগত রীতি ও আচার, জীর্ণ সমাজ-জীবনের অস্পষ্ট লৌকিকতা-বোধ এখানে যাহা সঙ্গত তাহা পালন করিতে বাধা সৃষ্টি ক । এই দুইয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া সমাজ এখনও বিভ্রান্ত হইয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, স্ত্রী-পুরুষে স্বাধীন মেলা-মেশা বাড়িতেছে, তথাপি কন্যা কিংবা পুত্র যদি স্বাধীন ভাবে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে চাহে সমাজ সেখানে বাধা দিতে আসে, মিলনের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া অনেক সময় মর্মান্তিক পরিণতির সৃষ্টি করে। এই সমস্যা আজ কলিকাতার নাগরিক জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। অথচ এই সমস্যা অন্য কোন পাশ্চাত্ত্য নাগরিক সমাজে নাই। এই বিষয়টি আধুনিক বাংলা নাটকের উপজীব্য হইয়া থাকে।

একান্ত ব্যক্তিস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নাগরিক জীবনে বৃহত্তর সামাজিক নীতি বিসর্জিত হইয়া থাকে। অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহার উন্মত্ততা সকল নীতি-নিয়ম সম্পর্কে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া তোলে। বাহিরে একটি কৃত্রিম সভ্যতার মুখোস পরিয়া সকলের অলক্ষ্যে ঘৃণ্যতম আচরণ করিতে এখানে ব্যক্তির রুচি ও নীতিবোধে বাধে

না। অথচ এই নাগরিক সমাজের মধ্যেও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত আদর্শবাদী এমন চরিত্রও আছে, যাঁহারা জীবনের একটি উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবন সাধারণ নাগরিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে না। অনেক সময় তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। কলিকাতার নাগরিক জীবনে ব্রাহ্মসমাজের যে আদর্শ একদিন স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বাংলার সমাজ-জীবন হইতে রস-সংগ্রহ করিবার পরিবর্তে এক সমুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর লক্ষ্য স্থির করিয়াছিল বলিয়া প্রাণরসে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং কোন মাত্র আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করিয়া কোন সমাজ-জীবনের পরিকল্পনা করিলে তাহা কেবলমাত্র শিক্ষাগত (academic) কৌতূহল পূর্ণ করিতে পারে, কোন সক্রিয় পরিচয় লাভ করিতে পারে না।

বাংলা সামাজিক নাটকের ভবিষ্যৎ রূপ কি হইবে, তাহা আজই বলিতে করিতে পারা যাইবে না। কারণ, কোন ধারায় যে সমাজ-জীবন পরিবর্তিত হয় তাহা পূর্ব হইতে কেহ বলিতে পারে না। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী সমাজ-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তবে সেই অনুযায়ই কেবলমাত্র বাংলার নাগরিক সমাজ-জীবনই যে পরিবর্তিত হইবে, তাহা নহে, বিশ্বব্যাপী সামাজিক জীবনই পরিবর্ত্তিত হইবে। অর্থনৈতিক জীবনই আজ ব্যাপকভাবে সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, একদিন ধর্ম সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। মধ্যযুগে ইউরোপের ধর্মযুদ্ধ বা crusade সমগ্র খৃষ্টান জগতের সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। পরবর্তী যুগে জাতীয়তাবাদ (nationalism) সেই স্থান গ্রহণ করিয়াছে। রাশিয়ার মত বিরাট দেশ ধর্মকে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের আনুষ্ঠানিক দিক হইতে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। যে সকল দেশে ধর্ম আনুষ্ঠানিক জীবনে বর্জিত হয় নাই, তাহাদের মধ্যেও ধর্ম শক্তিহীন, অতীতের নির্জীব সাক্ষীর মতই নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করিতেছে। একদিন ধর্মের জন্য যে জগৎ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে, আজ সেখানে দেশপ্রেমের জন্য জাতি প্রাণ বিসর্জন করিতেছে। দেশ আজ ধর্ম এবং দেবতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সমাজ-জীবনের আদর্শের এই পরিবর্তনের ধারায় দেশ-বিদেশের নাটকও তাহাদের জীবনের মধ্যে নূতন নূতন রহস্যের সন্ধান পাইতেছে। সাম্প্রতিক কালে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী নাট্যকার এ'সকল দিকেও লক্ষ্যস্থির করিয়াছেন।

শব্দ-সূচী